সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

৪র্থ খণ্ড

১ম বর্ষ] ১লা বৈশাখ শনিবার ১৩৩০, ইং ১৪ই এপ্রিল। [৩৭শ সংখ্যা

আলোচনা

আমরা সত্য কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সোজা সরল ভাবে স্পষ্ট ও সত্য উক্তি আমরা করিতে পারি না। দেশ ও জাতি কত দিন হইতে এই সত্য বলিবার সাহস হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, তবে পরের অধীনতা যেমন যুগ যুগ হইতে আমাদের নাগ পাশে বাঁধিয়া চালাইয়া আসিতেছে—স্বাধীনতার মুক্ত বাতাস আজ যেমন স্মরণাতীত কোন এক অতীত যুগের কাহিনী বলিয়া মনে হয়—সত্যও তেমনি এক [illegible] আমাদের মিথ্যা জীবন মন্দিরের দুয়ারে আসিয়া নিত্য আমাদের আত্মার বীণাটীতে ঝঙ্কার তুলিয়া চলিয়া যায়। [illegible] হারানিধিকে প্রাণের মাঝেই প্রাণে প্রাণে রাখিবার জন্য কত ব্যাকুলতা আসে। কিন্তু সে ব্যাকুলতা, যতক্ষণ স্বপন থাকে ততক্ষণই। স্বপ্ন ভঙ্গে জাগরণে আর সত্যের সে সুর আমাদের প্রাণে জাগে না। মিথ্যার মোহ আসিয়া আমাদের মন প্রাণ আবার অবশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

• • • •

ভারত জীবনের অতীত ইতিহাস খতাইয়া দেখিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই—খুব বেশী দিনের কথা নয়—একজন লোক সমগ্র জীবনের দিক দিক দিয়া পরিপূর্ণ ভাবে সত্যকে বরণ করিতে চাহিয়াছিলেন ও পারিয়াছিলেন। ইনি সত্যাশ্রয়ী মহাত্মা গান্ধী। জীবনের কাম্য সকল জিনিসের চেয়ে—এমন কি স্বরাজের চেয়েও সত্যকেই তিনি সার কাম্য ও সার ধর্ম মনে করিয়াছিলেন। আজ ভারত জীবনে সত্য যদি তেমন ভাবে সুপ্রকাশ ও বিকশিত হইয়া উঠিত তবে ভারতের অবস্থা ও শ্রী ফিরিয়া যাইত। যাহার সত্য নাই তাহার ধর্ম নাই—বীরত্ব নাই—মনুষ্যত্ব নাই—কিছু নাই তার। সত্য যে

সাহস সম্পদ, বল বীর্য্য, মনুষ্যত্ব—আর মিথ্যা এই সব উচ্চ প্রবৃত্তি গুলিতে ধলাঞ্জলি দিয়া মানুষকে পশু হইতে শিক্ষা দেয়।

• • • •

আজ ভারতের রাজনৈতিক জীবনে, সমাজ জীবনে, পারিবারিক জীবনে আমরা এই মিথ্যার প্রভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। মিথ্যার প্রভাবে ভারত জীবন আজ প্রাণ হীন। আমাদের জীবনে, সংসারে, কাব্যে, সাহিত্যে নাট্যে এই মিথ্যা এত চমৎকার হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, যে কোন প্রাণবান দর্শকের চোখেই তাহা ধরা পড়িয়া যায়। নিজ জীবনে, পারিবারিক জীবনে, দেশ জীবনে কোন কিছুতেই আমাদের প্রাণের সাড়া নাই। প্রাণ শক্তি লইয়া অপরাপর জাতিও দেশবাসীকে চলিতে দেখিয়া, তাহাদের সাহস ও হৃদয় বল দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া থাকি। তাহাদের জীবনে কাব্যে, সাহিত্যে নাট্যে এমন একটা সত্যের প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি যাহাতে মনে হয়—জীবন সম্পদে আমরা উহাদের কাছে কত হীন কত নীচ। উহাদের যেন একটা তৃতীয় নয়ন খুলিয়া গিয়াছে, তাহার প্রভাবে উহারা আমাদের অদৃষ্ট ও অপ্রাপ্য জিনিসকে সহজেই আয়ত্ত করিতে পারে। তাহারা করিতেছেও তাই। জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও আনন্দ ভোগী আজ তাহারা—আর আমরা সত্য বঞ্চিত, পর প্রত্যাশী, মিথ্যা বরিত জাতি—মিথ্যার পেষণ চাপে আজ মরিতে বসিয়াছি। অথচ এই দেশেরই অতীত ইতিহাস দেখা যায়—যত বীর চির স্মরণীয় ও চির বরণীয় হইয়াছেন, যাঁহারা যুগে যুগে বিশ্ব মানবকে আশার বাণী ও ধারতা দিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সত্যের কারণ অম্লান বদনে মিথ্যার লাঞ্ছনা সহিয়াও সত্যের প্রভাবেই অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ সেই দেশেই মিথ্যা এমন করিয়া ঘাঁটিয়া বসিল কি করিয়া? আজ দেশ জীবনের যে দিকে চাই—সেই দিকেই দেখি পুঞ্জীভূত মিথ্যা রাশি—আজ সত্য সম্পদ চাহিলে দেশকে এই মিথ্যা জঞ্জাল দূর করিতে হইবে—তাহাতে লাঞ্ছনা আছে, গঞ্জনা আছে, নির্য্যাতন আছে। কিন্তু প্রকাশের আনন্দ, জীবনের নূতন বিকাশ তাহা হইতেই উঠিবে। সত্য পরশমণি—সত্যের পরশে জীবন শুভ্র সুন্দর হইবে।

• • • •

বহুকাল পরাধীন থাকা—জাতীয় জীবনের সর্ব্বপ্রকার অবনতির একটা মস্ত বড় মূখ্য কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জাতির জীবনে প্রকাশের আনন্দ না থাকিলে সে জীবন-স্রোতস্বতী পঙ্কিল হইয়া যায়। কিন্তু মানুষের স্বভাব ধর্ম্ম চাহে নিত্য নূতন জীবনের আনন্দ লাভ করিতে। ইহা পাইবার বোধ তাহার আছে বা জন্মিয়াছে অথচ অন্তর হইতে বাহির করিয়া তাহাকে সে রূপ দিতে যখন পারে না তখন তাহার যাহা অবস্থা হয় সে অবর্ণনীয়। আজ ভারতের জীবন ধারা সত্যই এই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে! রাজার স্বার্থের জন্য রাজ রোষ যেখানে উদ্যত ফণা বিস্তার করিয়া আমাদের আক্রমণের ভয় দেখাইবে সে দিক ছাড়াও তো সত্য প্রকাশের স্থান দেশের বহুদিকেই রহিয়াছে। কিন্তু সে দিকেও মিথ্যা জগদ্দল, সত্যের স্থান নাই। জোর করিয়া এ মিথ্যা আমাদের ঘাড়ে চাপানো হয় নাই—এ মিথ্যা আসিয়াছে আমাদের মধ্যে পরের শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণের মধ্যে দিয়া—তাই মাহাত্মা বলিয়াছিলেন—দেশ কালোপযোগী না হইলে এ শিক্ষা ও সভ্যতার গ্রাস হইতে জাতিকে ও দেশকে যত শীঘ্র মুক্ত করা যায় তাই ভাল।

• • • •

আমরা অগ্রসর হইতে চাহিতেছি, উন্নতি চাহিতেছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের নিজেদের সামর্থ্য যতটুকু আছে তাহা পর্য্যন্ত নিয়োগ করিতে পারিতেছি না। লজ্জা সঙ্কোচ ভয় এ তিন থাকিতে প্রার্থিত আমাদের কোন দিন মিলিবে না। ইংরেজ কবি ব্রাউনিং বলিয়াছেন—

Man must pass from old to new,
from vain to real, from mistake to fact,
from what once seemed good, to what now
proves best.
How could man have progression otherwise?

সত্য যাহা বাস্তব যাহা তাহাকে বরণ করা ব্যতিত উন্নতির দ্বিতীয় পন্থা নাই। সাহিত্য, জীবনী শিক্ষা নীতি ও বিধিতে আমাদিগকে আত্মশক্তিতে আস্থাবান করিয়া দিবে তবেই তাহার সার্থকতা। মনীষী এমার্সন বলিয়াছেন,—'The whole value of history, of biography, is to increase my self trust, by demonstrating what man can be and do.' আমাদের দেশে শিক্ষনীয় পুস্তক সমূহ যাহা পাঠ করিয়া আমরা মানুষ গড়িয়া উঠিতে চাই তাহাতে আত্ম-বিশ্বাসী হইবার উপাদান কতটা সঞ্চিত আছে? শিক্ষা-নীতির প্রথম সূত্র সম্বন্ধে রাস্কিন বলিয়াছেন—You must begin your education with the distinct resolution to know what is true, and make choice of the straight and rough road to such knowledge.

• • • • •

দেশ প্রচলিত শিক্ষা নীতি ও বিধির সহিত জাতীয় উন্নতি অবনতির সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত যে আমাদের নিজেদের উন্নতির কোন কথা ভাবিতে গেলে সর্ব্বাগ্রেই আমাদের দেশের শিক্ষা বেষ্টনীর কথা মনে পড়ে। মনে হয় আমাদের দেহের ও মনের এতটা অবসাদ ও অবনতির মূলে আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতি একেবারে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়াইয়া আছে। শিক্ষা বলিব তাহাকে যাহাতে আমাদের যাহা জানা উচিত তাই জানাইবে—যাহা আমাদের প্রকৃতিসত্ত ও জীবন পথে কার্য্যকরী তাহাই শিখাইবে? রাস্কিন তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনায় বলিয়াছেন,—

'The entire object of true education is to make people not merely do the right things, but enjoy the right things—not merely industrious, but to love industry—not merely pure, but to love purity—not merely just, but to hunger and thirst after justice.

বিদেশীদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্ততঃ নিজেদের দেশের উপর শিক্ষার এ গুণ গুলির প্রয়োগ দেখিতে পাই—অন্ততঃ সে চেষ্টা আছে—আমরা এ গুণগুলির ধার দিয়াও কিন্তু যাই না। যাইতে পারি না—শিক্ষায় আমাদের বিকল পঙ্গু করিয়া দেয়। তাই দেশের উন্নতি চাহিলে এ শিক্ষা প্রথার আমূল সংস্কার চাই।

• • • •

কথা হইতে পারে সংস্কার করিবে কে? দেশের গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে সর্ব্ব দোষ চাপাইয়া আমরা অবসর লই। দেশের উন্নতির কার্য্য সরকারের সমালোচনা করিয়াই আমাদের শেষ হইল মনে করি। কিন্তু সরকারের বিন্দুমাত্র অর্থ সাহায্য ছাড়া কিম্বা অতি সামান্য অর্থ সাহায্য লইয়াই দেশের এই অকর্ম্মা প্রসবিনী প্রতিষ্ঠান গুলি যে বিপথে চলিতেছে তাহা আমরা চোখ খুলিয়া দেখি না। ১৯১৭ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত এই কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের শুধু ম্যাট্রিক ছাত্রদের দত্ত পরীক্ষা ফি সকল খরচ খরচা বাদে উদ্বৃত্ত হইয়াছিল পোনের লক্ষ টাকা। এই অর্থ দেশের গবর্ণমেণ্ট যেন যাই—ইহা দেশের শিক্ষাপ্রণালী পাশের আমদ্ধ লোভী ছাত্রকুলের পিতামাতার রক্ত শোষণ করিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু কেহ দেখাইতে পারিবেন কি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এ অর্থদ্বারা দেশের অভাব মিটাইবার মত শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের কি ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত করিয়াছেন? দেশ কার্য্যকরী শিক্ষা পদ্ধতি সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে চাহিয়াছিল—তারপর এ সম্বন্ধে দিনে দিনে দেশবাসী ক্রমেই বেশী চাহিয়াছে অথচ যাহাদের হাত এত পয়সা দেশের শিক্ষা চালাইবার তাহাদের হাতে রহিল তাহারা দেশমত একবারে উপেক্ষা করিয়া তাহাদের খেয়ালমত অকার্য্যকরী শিক্ষায় এই অগাধ অর্থ অতি বে-হিসাবী হইয়া জলের মত খরচ করিলেন—শুধু এ টাকা নয় আরও সাত লাখ ধার করিয়া তাহাও প্রায় সরকারের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিলেন—কিন্তু এত লাখে লাখে টাকা দেশবাসী দিয়া দেশ ও দেশের উপযোগী কি শিক্ষা পাইল। দেশবাসী অরণ্যে রোদন করিয়া মরিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দেশবাসী হইয়া দেশমত পূর্ণ-ভাবে পায়ে দলিলেন কেন? সরকার কি ইহাতে বাধা দিয়াছিলেন—নিশ্চয়ই নয়। তবে দোষ দেশবাসীর বেশী না সরকারের বেশী। নিজের হাতে ক্ষমতা পাইয়াও আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি না। দেশের কার্য্যে গিয়া আপনার খেয়াল ও স্বার্থকেই উচ্চস্থান দিই—তাই আমাদের দেশের এ দুর্দ্দশা, এ অধঃপতন!

• • • •

আমাদের কর্তৃপক্ষ Cultural শিক্ষার বড়াই করিবেন। কিন্তু যে দেশের লোক কুশিক্ষায় না খাইয়া মরিতেছে—সে দেশে এমন প্রাণঘাতী 'কালচার' চলিতে পারে কি? খুব ধনী দেশেও এমন ব্যর্থ Cultural শিক্ষার মূল্য কতটুকু তাহার প্রমাণ খুব বড় একজন বিশ্ব পণ্ডিতের উক্তিতে দেখাইতেছি—

'The wealth of nations depends obviously less on the possession of great natural resources as on the ability and activity of the men who exploit them. While a good general and classical education, given on traditional lines, produces men of culture who may be delightful talkers and companions, but who may possess no particular qualification for assisting or directing the production of wealth, a good practical and scientific education, given to the largest number of people, is a most powerful instrument for achieving national economic success.' আমাদের এ কালচারে কিন্তু স্ফূর্তিবাজ ও আনন্দিত নাগরিক দিতে পারে নাই। পারিবে কোথা হইতে? অন্ন চিন্তা যার চমৎকার—সর্ব্ব সময়ের জন্য প্রাণে হাহাকার ছাড়িতেছে কালচার ধোয়া জল খাইলে কি আর তার ক্ষুধার উপশম হইবে?

• • • •

বঙ্গের শিক্ষকেরা তাঁহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য কনফারেন্স ইত্যাদি করিতেছেন। আমার বিশ্বাস—সুফল ফলিলে সুখী হইব। কিন্তু আমাদের মনে হয়, শিক্ষকদের এ দুরবস্থা অপনোদনের জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় অনেক কিছু করিতে পারিতেন। আমাদের দেশের শিক্ষকদের আয় গড়ে মাসে তেত্রিশ টাকা। বড় বড় ইট পাথরের অনেক দালান ছাত্রদের জন্য উঠিলেও ছাত্রদের না খাইয়া যে শিক্ষকেরা কালচারের পথে লইয়া যাইতেছেন তাহাদের জন্য কোন ব্যবস্থাই হয় নাই—সরকারও করেন নাই—সরকারের যন্ত্র-মন্ত্রির স্বেচ্ছা-ধীন বিশ্ববিদ্যালয়ও করেন নাই।

• • • •

বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতিবাচক কার্য্যের বিপুল ব্যর্থতার উদাহরণ দিতেছি। কলিকাতার সাধুদাস রোডের সায়েন্স কলেজ যদ্যপি ধনীর বিপুল দানে উঠিয়াছে। কত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ইহার বিপুল মন্দিরের জন্য ব্যয় হইয়াছে। অথচ আজ ইহার গ্যাস টিউব, টেষ্ট টিউবের খরচও নাকি জুটিতেছে না। বাড়ী আছে রাজ প্রাসাদ, অথচ তার আলো জ্বালিবার তৈল বা বিদ্যুতের সংস্থান নাই। উত্তম ব্যবস্থা। এ অব্যবস্থা কেমন করিয়া হইল তার পরিচয় ক্রমে দিব।

• • • •

লবণ কর বাড়িল বলিয়া অনেকে অনেক রকম মতলব করিতেছেন যে কি উপায়ে দেশমতের সম্পূর্ণ অমতে প্রতিষ্ঠিত এই করের বিরুদ্ধাচরণ করা যায়। কেহ বলিতেছেন লবণ যাহা খাইতে তার অর্দ্ধেক খাও—কেহ বলিতেছেন লবণ খাওয়া একেবারে ছাড়। সত্য জীবনে এ যুক্তির কোন মূল্য আছে কি? তাহা সম্ভব হইবে কি? বোধ হয় না। দেশবাসী ইহার বিরুদ্ধে এক পূর্ণ অ-সহযোগ করিতে পারে—তবে ইহা সার্টিফিকেটী কর হইলেও পালাইবার পথ পাইবে না। আমেরিকার যুক্তি ব্যবস্থা এই নব নব কর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়াই আসিয়াছিল—সে খুব বেশী দিনের কথা নয়। ইতিহাসের মূর্ত্তি ব্যবস্থায় সে বাতাস হয় তো আমাদের দেশেও বহিবে।

• • • •

লবণ কর বসিয়াছে তার উপর বহীর প্রশ্ন অথচ আইনটিও যদি পাশ হয় তবে একেবারে সোনায় সোহাগা

হইবে। এখন হইতে ইহার সূচনা চলিয়াছে। দরিদ্র দেশবাসী আর কত দিন সহিবে। আজ তাহার দুবের গ্রাস জীবন সম্বল নূন ভাতের উপায়ও যাইতে বসিয়াছে। সরকার লাভের অঙ্ক যাহা খতাইয়া রাখিয়াছেন তাহা দু' চারিটি মাস হাসাহা এই সম্পর্কে হইলেই উবিয়া যাইবে। সুতরাং সে দিকে ফাঁকাই পড়িবে। কিন্তু দেশবাসীর এ কষ্টের উপশম ও অবসান কিসে হইবে?

• • • •

শুণ্ডা বিল হইয়াছে—অথচ শুণ্ডাদের উপদ্রব দেশে আরও বাড়িয়াই চলিয়াছে। শুধু বাংলা দেশেই বিদেশী শুণ্ডাদের এই শুণ্ডামী চলে, কারণ বাংলা—প্রাণহীন, আত্মরক্ষার ক্ষমতা তাহার নাই। অন্য কোন দেশে এত রাহাজানী শুণ্ডামো নাই। অথচ আমাদের জীবন রক্ষার ভার দেশের সরকার গ্রহণ করিয়া আছেন। জীবন রক্ষার ভার পরের উপর একান্তে অর্পণ করিয়া থাকিলে—জীবন যাওয়ার পর তাহা রক্ষার সুব্যবস্থাই অনেক স্থলে হয়—ইহার প্রমাণ যথেষ্ট পাইয়াও আমরা আত্ম রক্ষা করিতে শিখিতে পারিলাম না। এখন আবার দেখি শুধু ভিন্ন দেশী পুরুষ শুণ্ডাই নয় মেয়ে শুণ্ডাও ঢের পথে ঘাটে ঘোরে। ইহারা কখনো ভিখারিণী, কখনো বৈষ্ণবী—নানা ভাবে জোর করিয়া যেকপও হীন ভেতো বাঙ্গালীকে জব্দ করে। উপায় কি!

আভাস

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু

তোমার বুকের বাণী
　　পাপিয়ার মুখে, বঁধু
　　দিলে কি

তোমার অধর হ'তে
　　চাপা সে হরিয়া মধু
　　নিলে কি

তোমার রূপের রেখা
চাঁদে যে হইল লেখা
　　ঘুমায়ে তখন তুমি
　　ছিলে কি

তোমার কথাটি তুলে
মলয় লিখিল ফুলে
　　সে লিপি বুঝিল কেহ
　　ভিলে কি?

আপনি গোপন থাকি
　　আভাসে প্রকাশ সই
　　হবে কি

তোমারে ধরিতে গিয়া
　　ছায়া সে ছলিতে অই
　　রবে কি

তোমারি অনিটি প্রাণে
কেবলি বাজিবে গানে
　　তোমার বারতা কাণে
　　কবে কি

আসে আসে ঘুরি ঘুরি
এই চির লুকোচুরি
　　বারোমাস ছদি আর
　　সবে কি?

হৈ হৈ ব্যাপার। রৈ রৈ কাণ্ড।। থৈ থৈ রঙ্গ।।।

কলিকাতায় নূতন থিয়েটার

মহাসমারোহে "আইডিয়েল" খুলিতেছে।

আশ্বস্ত হউন, অধীর হইবেন না, প্রতীক্ষায় থাকুন।

সমস্ত সংবাদ আগামী সপ্তাহের বাসন্তীতে পাইবেন।

মতভেদের শুভফল।

(শ্রীহেমন্তকুমার সরকার)

কংগ্রেসে আজকাল মতভেদ প্রবল রকমে দেখা দিয়েছে। জাতীয় আন্দোলনে যে অবসাদ এসেছে, অনেকে বলেন সেটা এই মতভেদের জন্য—কিন্তু প্রকৃত কথা ঠিক তার উল্টো। মতভেদের জন্য অবসাদ আসেনি অবসাদের জন্যই মতভেদ এসেছে। যতদিন আন্দোলন জোরে চলছিল, ততদিন কর্মপন্থা নিয়ে মতভেদ হয় নি—যেদিন আন্দোলনের বেগ মন্দা হ'ল সেই দিনই কর্মীরা কি নতুন উপায় অবলম্বন করলে বেগ আবার জাগতে পারে তাই ভাবতে লাগলেন। স্বভাবের নিয়ম অনুসারে একদল বললেন গুরুজী যা বাতলে গেছেন তার উপর আর কথা নাই; এঁরা গুরুজী ও কংগ্রেসকে একই মনে করেন, এবং কংগ্রেস যাতে সেইভাবে চলে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এঁরা ব্রাহ্মণ ধর্মী। আর একদল আছেন তাঁরা ক্ষত্রিয় ধর্মী। তাঁরা কেবলই নতুন নতুন দিকে নিজেদের কর্মপন্থা বিস্তার করতে চান, এবং দরকার বোধে পুরাতন ভাঙতে বা ছাড়তেও রাজি হ'ন। ভারতের সভ্যতার ইতিহাসেও এই কথাটা অনেক দিন ধ'রে চলে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর বক্তৃতায় এই কথাটা আরও ফুটিয়ে তুলেছেন। হিন্দুর দশ অবতারের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য কম নয়। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ উপনিষদের সাধনার জন্মদাতা। রাজর্ষি জনক প্রভৃতিই সমাজের শ্রেষ্ঠ গুরু ছিলেন এবং ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য তাঁদের কাছেই যেতেন। এই ক্ষত্রিয়গণ সমাজের dynamic element, আর ব্রাহ্মণগণ static element। আজ কংগ্রেসে যে মতভেদ তা এই দুই ধর্মী লোকের মধ্যে আদর্শগত যে প্রভেদ তাই নিয়ে। অবশ্য চোর দুই দলেই আছে। আমি কথাটা বলছি সাধারণভাবে। No-change ও Pro-change দলের যতই Compromise হোক না কেন তা কিছুতেই স্থায়ী হবে না। স্বভাবের নিয়ম অনুসারে এই দুই শক্তিকেই কার্য্য করতে দিতে হবে। নদী যখন পাহাড়ের অজ্ঞাত প্রদেশ থেকে বেরোয় ছোট ছোট উৎস কোথা হ'তে এসে তাকে পুষ্ট করে একটা ধারা হ'য়ে সে শতবাধা অতিক্রম করতে করতে চলে তখন শক্তি সঞ্চয়ের জন্য তাকে দুকূল দিয়ে বাঁধা হ'য়ে চলতে হয়—কিন্তু সাগর সমাগমের পূর্ব্বে আবার তাকে নানা ধারায় বিভক্ত হয়ে প্রাণের প্রাচুর্য্যে হৃদয়ের আবেগভরা উল্লাসে শত হস্ত প্রসারিত ক'রে সে আপন-হারা পাগল-পারা হ'য়ে সাগর বঁধুর সঙ্গম লাভে কৃতার্থ হয়।

সেখানে বিভক্ত হওয়াই তার ধর্ম—সে ভেদে দোষ নাই, সে ভেদ শক্তির বিপুলতারই পরিচয় মাত্র। তেমনি আজ আমাদের জাতীয় জীবনকে আর দুধারের গণ্ডীতে বেঁধে রাখলে চলবে না—জীবনের সমস্ত প্রবাহকে শত ধারায় বিভক্ত হ'তে দিতে হবে, যেখানে যা আছে যে ভাবে পারে তাকে দেশ সেবার অবসর দিতে হবে—যে ভগীরথ এই জাতীয় জীবনের সুরধুনীকে নিজের অপূর্ব্ব সাধনায় স্বর্গ হ'তে মর্ত্তে আনয়ন করেছেন, তাঁর তপস্যা সার্থক হবে যদি তাঁরই আজ নূতন ভূমির সৃষ্টি ক'রে মরু প্রান্তরকে সুশ্যামল ক'রে শতমুখী হ'য়ে ধরাজের সীমাহারা সাগর সঙ্গমে সক্ষম হয়।

চিত্র পরিচয়

সূর্য্যমুখী—শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ অঙ্কিত।

চিত্রের নাম সূর্য্যমুখী দিবার সার্থকতা, সূর্য্যমুখী রোদে ফোটে—তাহার রূপ সৃষ্টি রোদ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই শিল্পী রোদে চকিতে রূপসী রমণীর মুখমণ্ডল দেখিয়া ভাবের ভুলে তাহাকে বিধুমুখী বা শশীমুখী কি চন্দ্রমুখী না বলিয়া সময়োপযোগী সূর্য্যমুখী আখ্যা দিয়াছেন।

সব বর্ষোৎসব

আমরা ওনিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ মণিকার মণিলাল এণ্ড কোং তাহাদের চিরন্তন প্রথানুযায়ী আগামী ১লা বৈশাখ ১০৩১ সনাগমোপলক্ষে সাহিত্যসেবীদিগের সম্মিলন ও নূতন খাতার উৎসব সমারোহে সম্পন্ন করিবেন। এবার সম্মিলনের সভাপতির আসন গ্রহণের জন্য আশুতোষ চৌধুরী এম্‌এ মনোনীত হইয়াছেন। এবারও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ঘড়াভিন্ন ও অন্যান্য নানাবিধ আমোদপ্রমোদ ও সাহিত্যালোচনার সুব্যবস্থা হইয়াছে।

কান্তকবি রজনীকান্ত*

[শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী]

বঙ্গসাহিত্যে জীবন চরিতের সংখ্যা অধিক নয়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রাজা রামমোহন, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর ও শ্রীমতী হেমলতা দেবী রচিত শিবনাথ চরিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় কান্ত কবির জীবনী রচনায় পূর্ব্ববর্ত্তী সুধী লেখক গণের সহিত, স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, নিজস্ব মৌলিকতার প্রভাবে আরো কিছু অর্জ্জন করিয়াছেন, যাহাতে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার স্থায়ী পদবী লাভের কোনও বাধা থাকিবে না।

মণি, খনির অন্ধকারে পড়িয়া থাকে,শ্রমিক ও ব্যবসায়ী তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন, ক্রয় করিবার ক্ষমতা ধনীর থাকিতে পারে, কিন্তু একমাত্র শিল্পী তাহাকে সুন্দর করিয়া তাহার প্রত্যেক অংশে আলোক পাতের সহায় হইয়া, মণিকাঞ্চন যোগের সার্থকতা সাধন করিয়া, বিশ্বের বিমুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে তাহার শোভা সম্পদ অক্ষয় করিয়া রাখেন। এই জীবনী গ্রন্থে পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন সেই শিল্প চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। জীবন চরিতে আমরা সমগ্র মানুষটির সাক্ষাৎকার লাভ করিব, প্রত্যাশা করি। মানুষ শুধুই মাত্র কবি কি গায়ক কি চিত্রকর কিম্বা সাধু মহাত্মা নহেন। তিনি একাধারে বহুর সমাবেশ। এই বিচিত্র বহুকে বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন অবস্থায় আত্মার আলোক পাতে, কিরূপ ধারণ করিয়াছিল, দেখাইতে পারাই জীবন চরিতকারের ক্ষমতার পরিচয়। মানুষকে এই কারণেই আমরা নামগোত্র, বংশ শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করি, এবং সেইভাবে জানাই তাঁহার সহিত পরিচয় লাভ। গৃহে কর্ম্মক্ষেত্রে, সামাজিক ব্যাপারে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে. স্বদেশ সেবায় এই মানুষটি কখন কি করিয়াছে বলিয়াছে, আত্ম-প্রকাশের এই বিভিন্ন পরিচ্ছেদগুলি সংযোজনা করিলে তবেই অখণ্ড মানুষটি আমাদের মনে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। এই চরিত কথার পাঠক সেই সুযোগ লাভ করেন বলিয়াই এখানি উপন্যাসের মত মনকে মুগ্ধ করে, এবং গ্রন্থের শেষ অবধি পড়িয়া শেষ না করিলে তৃপ্তি হয় না। কান্ত কবিকে শৈশবে, কৈশোরে ছাত্রাবস্থায়, সংসার ক্ষেত্রে গৃহীরূপে, কর্ম্মজীবনে উদ্যোগী পুরুষের মত, সাহিত্যক্ষেত্রে বাণীর সেবায় ভক্ত ভাবে স্বদেশ সেবায় আত্মবলিদানোদ্যত দেশ মাতৃকার যোগ্য পুত্ররূপে নানা অবস্থায় বহুভাবে দেখিয়া তাঁহার অখণ্ড মনুষ্যত্বের পরিচয় লাভ করি। তাঁহার দৃঢ় চিত্ততা, স্বদেশপ্রীতি, পিতৃ-মাতৃভক্তি, পত্নী-প্রেম, সন্তান বাৎসল্য স্বজন-পরতা ও ভগবদ্ভক্তির বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার জীবনের মণিকোঠায় নিয়ত কোন্ দেবতার আরাধনা হইত তাহা ভালই বুঝিতে পারি।

গঙ্গা জলেই গঙ্গা পূজা করিতে হয় সত্য, তবে ভক্তের প্রীতি সেই পাবনী ধারাকে আরো পবিত্র করে, দেবতার ফুল তাঁহারই অর্ঘ্যে নিবেদিত হইয়া ধন্য হয়। রোজ-নামচা হইতে চরিতকার সে নৈবেদ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কবি বন্ধু ও ভক্তিভাজনকে নিবেদন করিয়াছেন,সে আরতি দীপে সেই জীবনের রহস্যাগারকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন সেই পূজার উপচারেই গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে প্রভূত পরিশ্রম, বহুবর্ষব্যাপী অধিবাস অধ্যবসায় আবশ্যক হইয়াছে, সন্দেহ নাই—আর এমন পরিশ্রম মানুষ একান্ত প্রীতি বশতঃই করিতে পারে ও করে, এই দুঃখ স্বীকারই বন্ধুত্বের ও শ্রদ্ধার গৌরব, পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন শুধু কথায় নহে কার্য্যে সেই প্রীতি ও ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

এই পুস্তক খানির ভাষা সুন্দর, ইহাতে অযথা বাক্-বাহুল্য কি পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর নাই—ভাষার সরলতা থাকিলেও শিথিলতা কোথাও নাই—মালা যেমন পুষ্পের নিপুণ সংযোজনাগুণে দৃঢ় নিবদ্ধ হইয়াই সুন্দর হয়—এই পুস্তকের বাক্য নির্ব্বাচন ও বিন্যাসও সেইরূপ।

কান্তকবি তাঁহার কবিতা, পারমার্থিক সঙ্গীত, হাসির গান ও স্বদেশীগানের জন্য প্রশংসা পাইয়াছেন, তবে বিশেষ করিয়া স্বদেশীগানের দ্বারাই বঙ্গবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছেন—আজ তাঁহার মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ই দেশের লজ্জা নিবারণ করিয়া দারিদ্র্য দুঃখ দূর করিতেছে। বঙ্গবাসীর হৃদয়ে এই গানের কথা ও সুর চিরদিনই ধ্বনিত হইতে থাকিবে। প্রসাদীগানের মত ধনী দরিদ্র সকলেরই মনে সমভাবে চিরদিন ভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে।

পুস্তকখানির অঙ্গের সৌন্দর্য্য ও শক্তির কথা বলিলাম, ইহার বাহিরের সৌষ্ঠবও প্রশংসনীয়—পরিশেষে বক্তব্য এই যে গ্রন্থকারের চেষ্টা ও কষ্ট, বহুব্যয় ও প্রভূত পরিশ্রম যাহাতে সার্থক হয়, বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলী এখন তাহারি ব্যবস্থা করুন।

---

* কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের জীবন-চরিত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত। ডবীকেন সিরিজের সুদৃশ্য গ্রন্থ, মূল্য চারি টাকা মাত্র। ৪০০পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ৩০নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে বেঙ্গল বুক কোম্পানী হইতে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

একটা মস্ত বাটখারা তা ভাই দেখটা কি তবে উঠল ফেঁপে ['নিশির'এর সৌজন্যে]
মুখের ভাষা ওটা কি দাদা ?—দেখ না কেন বসে কেপে।

পায়ে ফেলে সাম্রাজ্য পড়লি যে আজ মোড়ায়
হাত পা বেঁধে বাসরা ঈশ কৌন্সিলেতে বসা ভাগ্যায়।
তাদের—দীনের ভুখের কাদে, যার পড়েছে, আঙুল তাদে
আপন পথা তা দুর ভাতা, ফলুক মুখে দেশের চাদে।

১ আর্তনাদ বাড়ী যুড়—চলছে খালো চলছে বেদম পুরোদমে
২ হাতের মড়ার মাথা বড়ই—আসল বিষে চলবা জানে।
৩ বিষ-কাঁথির কাঁদে ঘুসি বিষের ভরে বাটল ফাদ

আহা, কাজল ওলাই সময়ে কেঁদে, লিখছে কেবল—"আজাদ দি

দাসী

(শ্রীখুরসিদ জাঁহা বেগম)

আমি ঝি, আমার নাম বিমলা। আমি দত্ত বাড়ীর একমাত্র কন্যা নির্ম্মলা দিদিমণির ঝি। দিদিমণি আমাকে তাঁর স্নেহময় অন্তরের অনেক খানি স্নেহের ভাগ দিয়ে অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধে রেখেছে। তাঁর কৃপায় আমি ঝি হয়েও তাঁর কাছে ভগিনীর স্নেহাদর পাই। আমিও তাঁকে ভালবাসি, আমার এই ক্ষুদ্র তার হৃদয়ে যতখানি শক্তি আছে ভালবাসবার, সমস্তটুকু দিয়ে তাঁকে ভালবাসি। তাঁর মুখে তাঁর ব্যবহারে এমনই একটা অসাধারণ গুণ আছে যে, যে তাঁকে একবার ভালো করে দেখে, যে তাঁহার সাহচর্য্যে কিছুদিন কাটায়, সেই তাঁকে ভালোবাসে। দিদিমণি রূপসী, সোণালী মৌর রং, তাতে বড় বড় রস-ভরা দু'টী উজ্জ্বল চোখ। প্রশস্ত ললাট, নাকটীও সুন্দর অথচ বড়। ঠোঁট দু'খানি হাসি ভরা, রাঙ্গা পাতলা। অঙ্গের গঠন না স্থূল না শীর্ণ, মধ্যমাকৃতি। তাঁর এই রূপের বহ্নিতে কত পুরুষ পতঙ্গ যে পুড়ে মরেছে তার সংখ্যা নাই। মনে পড়ে সেই দিদিমণির বিয়ে, কত হট্টগোলের মধ্যে জামাইবাবুর অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, তিনিই এই রূপবতী গুণবতী ভার্য্যা লাভ করে আজ ভাগ্যবান। যাক, কি লিখতে কি লিখছি।

হেমন্তের সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব ডুবু ডুবু, তাঁর রক্তিম বর্ণচ্ছটায় আকাশ পাতাল শোভান্বিত। কোথাও লাল নীল, কোথাও নীলে সবুজে, কোথাও হলুদে লালে ধূসরে, কোথাও বা শুধু লোহিতে পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত। পূর্ব্বাকাশ ঘোর নীলবর্ণ। তার মাঝে পেঁজা তুলোর মত থাকে-থাকে সজ্জিত সাদা মেঘ আকাশ জুড়ে বাড়ীর পেছনের উঠান হ'তে রাশি রাশি হাসহাসানার, রজনী গন্ধার টাটকা সুগন্ধ ঝির ঝিরে হাওয়ার সঙ্গে ছুটে আসছে। আমি দিদিমণির এক গোছা কুঞ্চিত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রেশমী কোমল চুলের রাশি নিয়ে প্রসাধনে বসেছি। তিনি ধরে বসেছেন, আজ আমার জীবন বৃত্তান্ত শুনবেন। তাঁর স্নেহমাখা অনুরোধ অনেক দিন এড়িয়েছি, আজ আর আপত্তি করব না, তাই বলতে আরম্ভ করি। "আমার মত এমন অনাথা বিধবা এই শস্য শ্যামলা সোণার বাংলা দেশে প্রতি ঘরে বিরাজ করছে। কত শত শত অনাথিনী পরান্নভোজিনী বিধবা সংসারের কঠোর নির্য্যাতনে নিষ্পীড়িতা হয়ে অসহায় অবস্থায় পথে দাঁড়ায় তার কি সীমা সংখ্যা আছে? কয়জনে তাদের মূকতাময় হৃদয় কাহিনী শুনে? যদি কদাচিত কোন সকরুণ হৃদয় আশ্রয়দাত্রী মিলে, তা হ'লে হয়ত দু'চার জন তাঁদের আশ্রয়েই জীবন অতিবাহিত করে। আর বাকী সহস্র সহস্র অসহায়া অনাথা নিরাশ্রয়া নারী কেমন করে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহা ভগবানই জানেন। তাদের আত্মীয় সহায় থেকেও নাই। অনাথা বিধবারা এই স্বর্ণ প্রসবিনী বঙ্গভূমির কোলে আত্মীয় স্বজনের বিশেষতঃ ভ্রাতৃবধূ ও জা'দের সংসারে একটী ভেসে-আসা অনর্থক ভূতপ্রেত বিশেষ।

দুই

আমার বাপের বাড়ী শ্রীরামপুরে। বাবা জমিদারের বাড়ী সরকার ছিলেন। আমরা দু'বোন এক ভাই ছিলুম। আমার বয়স যখন ১১ বৎসর তখন পাড়ার আমার বিয়ে হ'ল। স্বামী আসামে ব্যবসা করতেন। আমি বিয়ের পর ছোট ছিলুম বলে কখনো বাপের বাড়ী, কখনো শ্বশুর বাড়ী থাকতে লাগলুম। স্বামীর সঙ্গে বছরে দু'একবার দেখা হোত। স্বামী সুন্দর ছিলেন, এখনও হৃদয়ের পরতে পরতে প্রাণের স্তরে স্তরে তাঁর সেই মূর্ত্তি আছে। তাঁর বাহিরের সৌন্দর্য্য যেমন ছিল, অন্তর তদপেক্ষা অধিক সুন্দর ছিল। যদিও তখন আমার ভালোবাসা বুঝবার বয়স হয় নাই, তবুও বুঝতুম যে তিনি আমায় অন্তরের সহিত স্নেহ করতেন। এমনি করে দু'তিন বৎসর কাটার পর আমি যখন চৌদ্দ বছরে পা দিলুম তখন স্বামী আমায় সঙ্গে নিয়ে কর্ম্মস্থলে যেতে

চাইলেন। এরই মধ্যে অদৃষ্টের ফেরে আমাদের সংসারের আশ্রয় স্নেহময় বাবা ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন। দাদা বাবার পদে কাজ আরম্ভ কর্লেন। সময়ে সকলেরই শোক নিবারণ হয়, আমাদেরও হল, স্বামীর সঙ্গে স্বদেশের ও মা ভাইবোনের নিকট অশ্রুসজল নয়নে বিদায় নিয়ে আসাম চললুম। যাকে ছেড়ে যেতে খুবই কষ্ট হোল, প্রিয়তম সোহাগে আদরে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তাঁর প্রেমের স্পর্শে হৃদয় আপনিই শান্ত হ'য়ে গেল।

তার পর তিনবৎসর আমাদের দাম্পত্য জীবন বড় মধুর বোধ হয়েছিল। কি সুখের সেই দিন গুলি! আমার প্রাণেশ্বর আমাকে তাঁর সমস্ত অন্তরের সুবিমল ভালোবাসায় ডুবিয়ে রেখেছিলেন। আমার মুখ একটু বিষণ্ণ দেখলে তাঁর চোকে জগত অন্ধকার হয়েছে, কাজে কর্ম্মে কোন রকমে আমার কাছে আসতে যদি কখনো দেরী হয়েছে, অমনি পরক্ষণে ছুটে এসে বলেছেন 'বিনু তুমি আমার কি যাদু করেছ যে চোকের আড়াল হলেই আমি পাগল হয়ে যাই, মন কেবল ছুটে তোমার ওই কোমল বাহু বেষ্টনে আসতে চায়!" দিদিমণি, তাঁর সেই ঐকান্তিক স্বর্গীয় ভালবাসা দেখে কেবলই আমার আশঙ্কা হ'ত বুঝি এ সুখ ক্ষণভঙ্গুর। ক্রমে আমার সেই ভালবাসাও সফল হয়েছে। আমাদের আনন্দের হাট পূর্ণ করতে একটী ফুল কোমলা কন্যারত্নের আবির্ভাব হ'ল, তার কচিমুখের সোহাগবাণী, তার ফুলাধরের মিষ্টি হাসি আমাদের সুখের জীবনে আনন্দের ঢেউ তুলল।

তিন

তখন দুর্জ্জয় শীত, আসামের দুর্জ্জয়নীয় শীতে প্রাণ অস্থির। হঠাৎ আমি অসুস্থ হলুম। স্বামী আমার জ্বর দেখেই ভয়ে উদ্বেগে অধীর হলেন। বললেন "বল ত তোমায় বাড়ী নিয়ে যাই, তোমার ভয় করে বিনু!" আমি তাঁর আদরে গলে গিয়ে মৃদু হেসে বললুম "তোমার কাছে থাকতে পেলে অরণ্যেও আমার ভয় নেই, এখানে ত সুন্দর বাড়ী ঘর, ডাক্তার সবই আছে, আর এইতো একটু জ্বর হয়েছে কেন তুমি উদ্বিগ্ন হচ্ছ?" কিন্তু তার পর সত্যি সত্যিই আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেম। নিউমোনিয়া ও জ্বরে মরনাপন্ন হলুম। কিন্তু অভাগী আমি মরব কেন? মর্‌লুম না, প্রিয়তম অক্লান্ত সেবায় অফুরন্ত প্রেমের জোরে আমায় বাঁচিয়ে তুল্‌লেন। আমাদের চাকর হরিচরণ তার স্ত্রী নিয়ে আমাদের বাড়ীতেই থাকত, সুস্থ হয়ে তাদের কাছে শুনেছি যে আমার অজ্ঞান-অবস্থায় স্বামী আমার আকুল হ'য়ে চোকের জল ফেলে বলেছেন যে "হায় আমার জীবনের সুখ শান্তি আনন্দ বিমলা যদি আমায় ছেড়ে যায়, আমি তাকে ছাড়া বাঁচব কেমন করে? তার মা ভাইবোনকেই বা কি জবাব দেব? তাঁদের কন্যাকে বিদেশে এনে বুঝি মেরে ফেল্‌লুম।" যাক্ আমি ভালো হলুম, আজও সংসারে বেঁচে আছি, শুধু সেই স্মৃতিগুলিই জীবনের আমার সম্বল করে বেঁচে আছি।

সেদিন বসন্তের বৈকাল। সমস্ত পৃথিবী পত্রে পুষ্পে ফলে মূলে বিকসিত। আমাদের ক্ষুদ্র অথচ প্রশস্ত বাড়ীটিতে যতগুলি কলা ফুলের গাছ ছিল, সবগুলি নূতন পাতায় নূতন ফুলে নবীন শোভা ধারণ করেছে। স্বামী সমস্ত দিন মহাজনদের সঙ্গে হিসাব পত্রের বন্দোবস্তে ব্যস্ত। সারাটী দিনে একবার বাড়ীর ভিতরে আসেন নাই। আমার মনটী কেন জানি না তাঁকে কাছে পাবার জন্যে সেদিন বড্ডই বেশীরকম ব্যাকুলা হয়েছিল। কেবলই প্রাণের ভিতর হাহাকার করে উঠছিল। মন ভূষিত চকিত হয়ে তাঁর দর্শন আশায় ক্ষণে ক্ষণে আগমন পথ দেখছিল।

সন্ধ্যার একটু আগে তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত ভাবে এসে আমার মুখখানি আকুল আগ্রহে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লেন 'বিনু, তুমি আজ খুব রাগ করেছ, না? কি করবো ভাই, দেখ হিসাব পত্রের নিকাশ করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, নিজেও সারাদিন সমস্ত কাজের মাঝে একবার করে আমার আঁধার ঘরের রত্নখানিকে দেখবার জন্যে অধীর হয়েছি, পারি নি লক্ষ্মি, রাগ কোরোনা। যাক, মহাজনেরা আজ রাত্রে কোথায় যাবেন, তাই তাঁদেরকে বলেছি এইখানেই খেতে, তুমি একটু জোগাড় করে দেবে কি?"

আমি অভিমান ভরে মুখ ফিরিয়ে বললুম, "আমি কিছু করতে পারবো না।"

অমনি স্বামী আমাকে আরও আদরে ভরিয়ে দিয়ে বললেন "তবে থাক্ তোমার শরীরও ভালো করে সুস্থ হয়নি, আমি হরিনাথকে দিয়ে ঠিক্ করিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু গিন্নী ঠাকরুণ যদি একটু দয়া কর্ত্তেন তাহ'লে বেচারারা পেট ভরে খেতে পার্ত্ত।" আমি রান্নার বন্দোবস্ত কর্‌তে রান্নাঘরে গেলুম।

চার

তার পর আর কি বল্‌বো। রাত্রে মহাজনদের খাইয়ে বিদায় করে এসে বল্‌লেন "আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে, আমি কিছু খাব না, তুমি খেয়ে নেও, আমি শুয়ে পড়ি, তাহ'লেই সেরে যাবে।" দিদিগো, আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখি যে অমন সুন্দর মুখখানি রক্ত জবার মত লাল টুকটুকে হ'য়ে গেছে, দু'নয়ন দিয়ে যেন রক্ত ঝরে পড়ছে। মুখের উপর যন্ত্রণার কাতরতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমিও দেখেই কেন-জানি-না অজানিত অমঙ্গল আশঙ্কায় শিউরে উঠলাম। তিনি আমার হাত খানি টেনে নিয়ে বললেন 'ছিঃ আমার একটু মাথা ধরেছে, এতেই তুমি এমন উতলা হ'লে কেন? যাও খেয়ে এসো গে।" আমি কাতর হয়ে বললুম, "আমার খিদে নেই, তুমি চুপ করে ঘুমোও, আমি পায় গরম তেল মালিশ করে দিই।" দেখলুম তাঁর যেন কথা কইবার শক্তি লুপ্ত হয়ে আসছে, আর কিছু না বলে শুয়ে পড়লেন। আমি হরিচরণ ও তার স্ত্রী সমস্ত রাত্রি ঘরময় উদ্বেগের ঝড় নিয়ে তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসে রইলুম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেন যন্ত্রণা বাড়তেই লাগল। নিকটে কোন ডাক্তারও নাই যে দেখাব। কেবল সাম্বনে সর্ব্বদুঃখহারী ভগবানকে ডাকা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। তারপর বল্‌তে আজও বুক ভেঙ্গে যায়, হৃদয় চূর্ণ হয়ে যায়, যখন উষার বাতাস ধীর ধীর করে বয়ে সুপ্ত ধরণীকে শীতল স্নিগ্ধ করে দিল, পাখীরা নিজ নিজ রাত্রিবাসের নীড় থেকে সবে ডানা ঝাড়া দিয়ে উড়তে আরম্ভ কর্‌ল, আধো আলো আধো আঁধারে পৃথিবী যখন আবৃতা, সেই সময়ে প্রিয়তম রক্ত কোকনদের ন্যায় চোক দুটী উন্মিলীত করে বল্‌লেন 'বিনু আমি বুঝি তোমায় এই অকূল সমুদ্রে একা ভাসিয়ে চললুম, কি করব বিধাতার বিধান। উঃ প্রাণ যে যায়! এই কথাগুলি বলতেই তাঁর জিহ্বা যেন জড়িয়ে আস্‌তে লাগল, আমি আকুল হয়ে কেঁদে তাঁর পায়ের উপর আছড়ে পড়লুম, পুনরায় তিনি অতি কষ্টে বললেন, আমার মাকে এনে দাও আমার কাছে।" আমি বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে বল্‌লেন "বুঝলে না? স-র-লা।" হরিচরণ অন্য ঘর থেকে সরলাকে এনে দিলে; তাকে বহু কষ্টে বিপুল আগ্রহে বুকের উপর টেনে নিতেই জীবন দীপ নিভে গেল। আমার সিঁথীর সিঁদুর আমার জীবনের সম্বল, আমার একমাত্র আশা ভরসা সুখ স্বচ্ছন্দ—আমায় চিরদুঃখ সাগরে অসহায় ফেলে চলে গেলেন। আমার সব ফুরোইল। আমি হতচেতন হয়ে তাঁর বুকের উপর আছড়ে পড়্‌লেম। হায় উনিশ বছর বয়সে আমার সব সুখের শেষ হ'ল। আজ আমি পৃথিবীতে একা। আমার মত দুঃখিনী নাই, আমার দুঃখের কেউ ভাগী নাই।

পাঁচ

যখন জ্ঞান হ'ল দেখি হরিবৌ সরলাকে কোলে নিয়ে আমার জ্ঞান সঞ্চারের চেষ্টা কর্‌ছে। হরি আমার কাছে এসে বল্‌লে "বৌ ঠাকরুণ, এ সময় আপনি যদি এমন ব্যাকুল হবেন, তাহ'লে চল্‌বে না, আপনাকে বুঝতে হবে এই বিদেশে আপনি একা, আপনার অদৃষ্টে যা হবার হয়েছে, সমস্ত জীবন পড়ে আছে শোক কর্‌বার। এখন বুকে পাথর বেঁধে কর্ত্তব্য সমাপন করতে হবে। সহরে বাবুর মামা আছেন, তাঁকে সংবাদ দিই, যদি বলেন আমি যাই, আপনি থাকতে পারবেন একা? মাথা নেড়ে বললুম "যাও, আমার কোন ভয় নেই। ভয়? হায়, তখন আমি তাঁর অসাড় দেহটীকে বাহু বেষ্টনে বুকে চেপে ধরে নিজের হৃদয়ের অসহ্য জ্বালা কিঞ্চিৎ শান্ত করতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু তাকি হয়? বুকের ভিতর আমার জ্বলে যাচ্ছিল।

এই দূর বিদেশে মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন ছাড়া একাকী জীবনের সব চেয়ে বড় বিপদ সব চেয়ে বড় দুঃখ যাতনা সহ্য করা আমার অসম্ভব হয়ে উঠল। কিন্তু তবুও আমাকে সইতে হবে, বুক ভেঙ্গে চুরমার হলে, হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হলেও, সব সয়ে নিজের এখনকার কর্ত্তব্য শেষ করতে হবে।

বেলা প্রায় দশটার সময়, মামাশ্বশুর এলেন, আমার পাগলিনী অবস্থা ও তাঁর সেই বিশাল সুন্দর সুপুষ্ট দেহ অসাড়বৎ পতিত দেখে হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন। তারপর? তারপর আমার হৃদয়ের তার, আমার বুকের হৃৎপিণ্ড, আমার জীবনের সুখ, সংসারের শান্তি, দুঃখের সান্ত্বনা, শিরের শিরোমণি, পিপাসার বারি, আঘাতের প্রলেপ, একমাত্র সর্ব্বস্বধনকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে গেল।

সরলা তার জীবনাধিক পিতাকে নিয়ে যাচ্ছে দেখে তাকে ছেড়ে কাঁদতে লাগল। তাকে শান্ত করতে আমার প্রাণ হ'তে হ'ল। সেই সুদূর আসামে আমার কোন আত্মীয় বন্ধু নাই। মামা শ্বশুর আমায় তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তিনিও পরিবার নিয়ে সেখানেই থাকতেন। দেশে বড় দাদা ও ভাসুরের কাছে এই নিদারুণ মর্ম্মঘাতী সংবাদ - টেলিগ্রাম করে' দেওয়া গেল।

তিন দিন পরে ভাসুর এলেন। তিন চার দিন থেকে আমাকে ও তাঁর ভাইঝিকে নিয়ে দেশে চলে এলেন। তিন বছরের সহস্র মধুর স্মৃতিমাখা সুদূর আসামের শ্মশান ঘাটে জীবনাধিক প্রিয় স্বামীকে চিরতরে রেখে দিয়ে এলুম। ভাসুর সেখানকার স্বামীর পরিত্যক্ত সমস্ত জিনিষ পত্রের বিলি বন্দোবস্ত করে যার কাছে যা পাওনা ছিল সব বুঝে সুঝে নিয়ে আমাদেরও ভার নিলেন। মা, দাদা আমার এই হীনা বিধবার বিষাদমূর্ত্তি দেখে হাহাকার করতে লাগলেন। আমি যার কাছে থাকতে চাইলুম, যাও রাখতে চাইলেন। কিন্তু ভাসুর দিলেন না। বললেন, "সরলার বাবার যা কিছু টাকা পয়সা ছিল সব যখন হিসাব পত্র করে বুঝিয়ে দেব, তখন বৌমা যাবেন, সে পর্য্যন্ত আমার কাছেই থাক।" বাড়ীতে এক দাদা রোজগার করেন, তাঁরও অনেকগুলি ছেলে মেয়ে, কাজেই মা ও আর জোর করলেন না। আমি ভাসুরের বাড়ীতে নিজের যথেষ্ট সংস্থান সত্ত্বেও অনুগৃহিতা পরগ্রহ হয়ে রইলুম।

ছয়

তার পর দুই বৎসর কেটে গেছে। নিয়তির বিধানে আমার স্নেহময়ী একমাত্র জননীকেও হারিয়েছি। দাদা ছেলে মেয়ে সংসার নিয়ে ব্যস্ত। আমার ন্যায় বিধবা অনাথা ভগিনীর জন্যে মাথা ঘামাবার তাঁর অবসর খুব কম। কাজে কাজেই ভাসুরের নিকট হতে আমাদের পাওনা যেনা আর বুঝে নেওয়া হ'ল না। আর আমি ও সরলা ত দু' বৎসর খেলায় পরলায় সুতরাং পাওনা আবার কি?

আমি কাজে কাজেই বড় জা ঠাকুরাণীর ও ছোট জা'য়ের সংসারে একটী অনাবশ্যক পরগ্রহ একান্ত কাঙ্গালিনী দাসী বই আর কিছু নই। বড় জা পুত্র কন্যা নিয়ে পেরে ওঠেন না, ছোট জা কাঁড়া পোয়াতী, ছোট ছেলে, সর্ব্বদাই নিজেও অসুস্থ থাকেন, আর আমি একটী অনুগৃহিতা নেহাত অকেজো লোক যখন আছি, তখন রান্না, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি ছোট ছোট গৃহ কর্ম্মগুলি আমারই করা একান্ত কর্ত্তব্য বোধে সেগুলির একচেটে অধিকারিণী আমি হলুম।

সরলা যদি কখনও একটু ছোলে চঞ্চলতে কাজের সময় জিদ ধরেছে, অমনি জায়েরা মুখ বাঁকিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বলেছেন 'হতভাগী বাপখেগো মেয়ের আবার এত জিদ, এমন পোড়া কপাল নিয়ে জন্মে আবার জিদ্ করা কেন বাপু!" হায় তখন ইচ্ছে হত এই ঘৃণিত অভিশপ্ত জীবন টেনে শেষ করে ফেলি। গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ কক্ষে পিতৃহীনা শিশুকে বুকে চেপে অজস্র ধারে কেঁদে উপাধান সিক্ত করেছি, আশা, যদি তাতে আমার হৃদয়ের পর্ব্বত সমান যাতনা কিছু উপশম হয়। প্রিয়-তমের উদ্দেশে বুকের ভিতর থেকে আর্ত্তনাদ বেরিয়েছে "ওগো একটীবার কি তুমি আমায় দেখা দিতে পারো না? কোন্ সে দেশ যেখানে এমন করে লুকিয়ে আছ? একটীবার এসে দেখে যাও তোমার বিমুর, তোমার বড় সোহাগের সরলার কি দুর্দ্দশা!" কত বিনিদ্র রজনী আকাশের দিকে, মনোহর চন্দ্র তারকার সমুজ্জ্বল প্রভার দিকে চেয়ে চেয়ে কাটিয়েছি, তারাও বুঝি আমার করুণ চাহনিতে ব্যথা পরবশ হয়ে, ম্লান হয়ে গেছে, কতবার মিনতি করে আকাশের পানে চেয়েছি, চেয়েছি, যদি দেখা পাই, কিন্তু তখনি মনে হয়েছে, সব ভুল। আমার এ আশা, এ আকাঙ্ক্ষা মিথ্যা। আমি যদি দুঃখ করে

প্রাণ ছেড়ে দিই, তাহলেও তিনি ফিরে আসবেন না। সে দেশ বহু দূরে। সে দেশে স্নেহ মায়ার আকর্ষণ নাই। আমারও পৃথিবীতে কষ্ট দূর করবার কেউ নাই, কিছু নাই।

যদি কখনও পরনের বসন ময়লা পরার অযোগ্য হয়েছে, বলেছি "দিদি ধোপা এলে আমার কাপড় খানি কাচতে দিব, আমাকে একখানি কাপড় আনিয়ে দিও, এখানি আর পরতে পারি না—" আমাকে সংক্ষিপ্ত একটী আজ্ঞা বলে পরোক্ষে ছোট বৌকে বলেছেন "বিধবার আবার এত ঠাট কেন গো? এত আসে কোথা থেকে? কেউ কি রোজগার করে রেখে গেছে?"

পৌষমাস। দুর্জ্জয় শীত, আকাশ কয়দিন ধরেই মেঘাচ্ছন্ন। সমস্ত ক্ষণই সন্ সন্ শব্দে বাতাস বহিতেছে। একটু একটু টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিও সেই সঙ্গে আছে। দিনের মধ্যে সূর্য্যদেবের বড় মুখ কেহ দেখেন নাই। দিন থাকতেই নিশারাণী সমাগত বলে বোধ হচ্ছে। বালক বালিকা যুবা বৃদ্ধ কেউ গায়ের শীতবস্ত্র খুলতে পারছে না। এমনই এক দিনে পাতলা কাপড় পরে রাখার ফলেই অত্যধিক ঠাণ্ডা লেগে আমার নিঃসম্বল জীবনের সম্বল সংসারের শান্তি প্রস্রবণ একমাত্র বন্ধন স্নেহ মুকুল সরলার বিষম জ্বর হইল। খোকার প্রতিমা সরলা আমার চার বছরের। ছোট ছোট হাত পা নেড়ে কচি মুখে কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। তার প্রাণ মাতান মন ভুলানো 'মা' ডাকে আমার হতভাগ্য জীবনেরও দশ দিক আনন্দের জোয়ারে ভরে ওঠে। সেই আমার সুখ শান্তি তৃপ্তি হাসি সব।

জ্বর ক্রমেই বাড়তে লাগল। পাঁচ দিন হতে এক সেকেণ্ডের জন্যেও জ্বর বিচ্ছেদ হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে বিষম সর্দ্দি জ্বর বুকে বসে গেছে। আমার সোনার পুতুল মুদিত নেত্রে অনবরত কাতর শব্দ করছে। তার সেই হৃদয়ভেদকারী শব্দে আমার বুকের একখানি করে পাঁজরা যেন খসে পড়তে লাগল। হৃদয় বিদীর্ণ করে অজস্র অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বয়তে লাগল। বড় মা কি মনে করে বোধ হয় বালিকার কাতরানী দেখে শ্বশুরকে বল্লেন—একবার ডাক্তার এনে দেখাতে।

ডাক্তারবাবু এসে যন্ত্র দ্বারা, হাত দ্বারা নানা প্রকারে পরীক্ষা করে মুখ বাঁকিয়ে বল্লেন, "রোগ অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত অসময়ে আনা হয়েছে।" আমার প্রাণ ভেদে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেল। অন্তরের ব্যথা অন্তরে চেপে দিনের পর রাত্রি তার শিয়রে বসে কাটাতে লাগলুম। ক্রমেই বাছা আমার ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে পড়তে লাগল। যে সোনার চাঁদ আমার, আমাকে কাছে পেলে কত আনন্দিতা হয়েছে, কচি কচি ঠোঁট দিয়ে কত সোহাগের বাণী শুনিয়ে আমার জলন্ত অঙ্গারবৎ হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দিয়েছে, সেই ধন আমার ব্যাকুল প্রাণের ঘন ঘন কাতর আহ্বানে বহু কষ্টে একবার ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় নাড়ে, নয়ত রক্তবর্ণ মুদিত নয়ন দু'টী খুলে শুধু মুহূর্ত্তক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়েই আবার বন্ধ করে নেয়। দিদিগো, মিনিটে মিনিটে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যেতে লাগল। শেষ পরিণামটুকু যেন আর ভাবতে পারছিলুম না। আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে কে যেন ডেকে বল্‌ছিল 'আর কয়কাল পরেই তোর অঞ্চলের নিধি তোকে চিরজনমের তরে ছেড়ে পালাবে আর পারি না।' রুদ্ধ নিশ্বাসে তাকে আরও জোরে বুকে আকড়ে ধরলাম। কিন্তু হায়, অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাতে পারে? দেখতে দেখতে সেই পবিত্রতা মাখা স্বর্গের লোভাতুর কোমল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওষ্ঠ দু'খানি দুই

নব বসন্তে
প্রিয়জনকে উপহার দিতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে আমাদের আইভিক্রাফ্ট স্নীসেনিজম এবং মেসিন প্রস্তুত—চন্দন, রজনী, বকুল, যাস্ন ও জেরেনেট সাবান ব্যবহার করুন।
ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী
৬৪।১এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪৯৬

ভিনবার ঈষৎ নেড়েই স্থির হ'য়ে গেল। আমার জীবন সর্ব্বস্ব আমাকে দুরন্ত শোকসাগরে নিমজ্জিত করে কোন অনন্ত শান্তিময় অমৃত দেশে পিতার বক্ষে চলে গেল। আমারও সব সুখ সব সাধ ফুরাল। আর কি আছে আমার, যার বন্ধনে মৃত্যুলিপ্তা হ'য়ে শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইব? ক্রমে আমার শোক মন্দীভূত হ'ল। কিন্তু সাসের অত্যাচার লাঞ্ছনা মন্দীভূত হ'ল না। সরলা বেঁচে থাকলে বুঝি তার জন্য সব সইতুম। আশা ছিল বড় হ'লে কোন রকমে দুঃখে কষ্টে তার বাপের সম্মানরক্ষাকারী বিয়ে দিয়ে সুখী করব, নিজেও সুখী হব। কিন্তু যখন সে আমায় মুক্তি দিয়ে চ'লে গেল, তখন কি আমার কার ভালবাসায় এত যাতনা সইব? এই সব মনে ক'রে সকল সঙ্কোচ কাটিয়ে গ্রামেরই বিধুর মা নামীয় রমণীকে বল্লুম "মাগী, আমায় কোন বাবুদের বাড়ী কি ঝিগীরি নিয়ে যাও না।" বেচারী সহৃদয়া বিধুর মা কয়েক দিন পরে আমায় একদিন নিভৃতে বলিল, ওপাড়ায়—জমিদার বাড়ী খুব ভালো ঘর, ব্যাটা ছেলে কেউ নাই, আর গিন্নীমা যেন একখানি দয়ার প্রতিমা।" সেই দিনই আমি কাকেও কিছু না বলে জন্মের মত কুলবধূর ভদ্রঘরের স্নেহের সকল চিহ্ন ত্যাগ করে শ্বশুর ভিটা হ'তে বিদায় নিয়ে তোমাদের বাড়ী এলুম। তুমি তখন এতটুকুটী ছিলে। তোমার মাতাঠাকুরাণী সত্যই যেন দয়ার স্নেহের জীবন্ত মূর্ত্তি।" দিদিমণি, দু'হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরে ধরে বল্লেন—তারপর?

দিদিমণি! আর তারপর কিছু নেই। হয়ত একদিন 'তারপর' হবে যেদিন সরলা আর তাঁর সঙ্গে মিলতে পারব। তার আগে আর কিছু নেই।

বাসন্তী প্রকৃতি

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ, কবিরঞ্জনাকর]

একি শিহরণ ধরণীর,
একি আলাপন বিহগের,
একি লালে লাল তরুশির,
একি আবেশ সোহাগের।

একি প্রাণে প্রাণে তড়িতের
স্পন্দন হয় সতত,
একি হুড়াহুড়ি হরিতের—
একি শ্যামলতা বিতত।

একি সোমরস দেবতার
কি যে সঞ্জীবতা বরষে—
একি মহাদান বিধাতার,
তনু মন প্রাণ পরশে।

আজ কত কোলাকুলি গন্ধে,
আজ কত খোলাখুলি ছন্দে,
আজ কত ঢলাঢলি বর্ণে,
আজ কত গলাগলি পর্ণে
কি যে সরলতা বিরিষে—

আর বন্ধনা ক'রে ওঠে চারিধার,
কে যেন করিছে বরণ কাহার
সকল শোভার আশীষে!

আজ কোন্ যাদুকর কি মায়ায়,
কোন্ সে পটুয়া তুলিকায়
দিয়া আলিপন—ধরার আসন
রাখিয়াছে ওগো সাজায়ে।
ঐ দাঁড়ায়েছে তায় খুইয়া চরণ
কোন্ নিখিলের রাজা এ?

স্মৃতিমন্দির

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

একদিন দুঃসময়ে অন্তরের প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও আপনাকে দুঃখান্তের কোন উপকারেই নিয়োজিত করিতে না পারিয়া কামনার মনটি এমনই ক্ষোভতিক্ত বিরস হইয়াছিল যে 'তার' পাঠাইয়া বাড়ী আসিয়া আমাটি খুলিয়া ফেলিয়া সে যখন একটা জ্যোৎস্নারঞ্জীন জানালার সামনে বসিয়া পড়িল, তখন তার মনের পাতাটি বাহিরের জ্যোৎস্নার স্বপ্নময় রঙে রাঙাইয়া উঠিয়া অনেক দিনের পর তাহাকে এক অনির্বচনীয় সুখের সুখী করিয়া দিল। সারাদিনের বিদ্রোহ বিক্ষুব্ধতা, মনের মলিনতা সব দূর হইয়া গিয়া শান্তির স্নিগ্ধ সুবাতাসে মনটি যেন মুক্তাকাশে বিহঙ্গমের মত পত্ পত্ শব্দে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

ভৃত্য কক্ষমধ্যেই আহার্য্যের স্থান করিয়া দিল, আহার্য্য সাজাইয়া দিদিমণিকে ডাকিতেছে, সিঁড়িতে অত্যন্ত দ্রুত পদশব্দ শ্রুত হইল। কামনা সে শব্দ শুনিয়া চকিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া আগন্তুকের প্রবেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পরক্ষণেই কামনার মাতুল মিঃ সেন ঘরে ঢুকিয়া অত্যন্ত পরুষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—এ সব কি যাচ্ছে-তাই কাণ্ড, কামনা?

যাচ্ছেতাই! অত্যধিক বিস্ময়ে কামনা কথাটা উচ্চারণ করিয়াই মাথা নত করিয়া ফেলিল। তখনি আবার মুখ তুলিয়া ধীর স্বরে কহিল—বসুন মামা!

মিঃ সেন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তীর্য্যক দৃষ্টিতে কামনার আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—বসবার দরকার নেই। এসব কি কাণ্ড তুমি সুরু করলে?

কামনা নম্র কণ্ঠে কহিল—কিছুই করি নি মামা।

নাঃ, কিছুই করনি! তোমার স্বামী মিথ্যে বল্‌লেন?

তিনি কি বলেছেন, আমি কি করে জানব মামা?

মিঃ সেন হতাশভাবে বলিয়া উঠিলেন—সব বল্‌তেই বা সময় পেলেন কৈ? যে কাণ্ডটি তুমি করে এসেছ তাইতেই যেমন বাড়ীটিতে ঢোকা অমনি মাথাটি ধরে একেবারে শয্যাশায়ী!

কামনা ব্যস্ত হইয়া বলিল—মাথার অসুখ?

তা ছাড়া আর কি বল! সমস্তক্ষণ সেখানে দুশ্চিন্তা ভোগ করেছেন, মুখ তুলে কারু সঙ্গে একটা কথা বল্‌তে পারেন নি, না খাওয়া, না কিছু, সেখান থেকেই...

মিঃ সেন এই জ্ঞাননির্ব্বুদ্ধিতায় জ্বলিয়া উঠিয়া সক্রোধে কহিলেন—হ্যাংগো হ্যাঁ, সেখান থেকেই। ভদ্রলোকের বাড়ী পার্টিতে গিয়ে যে অভদ্র ব্যবহারটি তুমি—

কামনা নতমুখে দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, পার্টি টার্টি আমার ভাল লাগে না মামা!

ভালো লাগে না? বেশ কথা, না হয় না-ই লাগল তোমার ভালো! তাই বলে ভদ্র লোকের একটা সম্মান, তাঁদের একটা মর্য্যাদা রাখতে ভালো না লাগা নিশ্চয়ই ভদ্রতা সঙ্গত নয়।—মিঃ সেন এই পর্য্যন্ত বলিয়া এক মুহূর্ত্তকাল নিরবে কামনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আবার বলিলেন—সেই যে দুটি ছোক্‌রা—সাহিড়ী না হয় ঘরের ছেলেই হ'ল, কিন্তু জোসেফ্ চৌধুরী—বিলাত ফেরত, শিক্ষিত—

কামনার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সে দৃঢ়স্বরে বাধা দিয়া বলিল—মামা, ও সম্বন্ধে কোন কথা আমি বলতে পারব না!

এই কথা ও স্বরের যে অর্থ তাহা মিঃ সেন বেশ বুঝিতে পারিলেন। হঠাৎ এই বিদ্রোহ ভাবে বিস্ময়াধিত হইয়া বলিলেন—কি বল্‌তে পারবে না?

আমি কোন কথাই আর বলতে পারব না মামা।

মিঃ সেন তাহার দৃঢ়তায় কিঞ্চিৎ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইতেছিলেন না, ঢুঁক গিলিয়া বলিলেন—সে কথা যাক্—এখন চল।

কামনা উত্তর দিল না এবং এমন ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল যেন মাতুলের এই প্রস্তাব তাহার কাণেই পশে নাই।

মিঃ সেন তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া কক্ষের পানে চাহিতেই, দেখিলেন—টেবিলের উপর আহার্য্য সজ্জিত রহিয়াছে। বলিলেন—ও কি, তুমি খাবে না কি কামনা? তোমার খাবার?

কামনা কোন কথা না বলিয়া একবার লজ্জিত থালার দিকে দৃষ্টি ফেলিয়াই চক্ষু নামাইয়া লইল।

মিঃ সেন গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—এর মানে কি কামনা?

বার দুই একই প্রশ্নে কামনাকে জাগাইয়া তুলিতে হইল। সে যে কি ভাবিতেছিল কে জানে, মিঃ সেন বৃথাই আরক্তদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলিতেছিলেন, কামনার কিন্তু কিছুতেই ধ্যান ভাঙ্গিল না। তখন মিঃ সেন চকল ভাবে এধারে ওধারে একটু নড়িয়া চড়িয়া বলিলেন—কি ব্যাপারটা কি, খুলেই বল, কামনা!

কামনা এবার মাথাটা অল্প উচ্চ করিয়া কহিল—আমি এখানেই থাকব!

বিস্ময়ের প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে মিঃ সেন ব্যঙ্গের স্বরে কহিলেন—এখানেই থাকবে? কার ভরসায়?

কামনা কথা কহিল না।

মিঃ সেন চেয়ারটার গায়ে লাঠিটা ঠেসাইয়া রাখিয়া মাথার ঘাম কমালে মুছিতে মুছিতে হাসিমুখে বলিলেন—খাবারটা হয়েছে খেয়ে নাও, নিয়ে চল। যে অবস্থা আবার তাঁর রেখে এসেছি, দেরি হলে কি যে হয়ে বসে তার ঠিক কি! নাও খেয়ে নাও। বলিয়া তিনি বাকী অল্প সময়টুকু কাটাইবার জন্যই কৌচের উপর বসিয়া পড়িলেন।

কামনা বলিল—মামীমার অসুখ, আপনি দেরি করবেন না মামা।

তুমি পরে যাবে?—তা কথাটা নেহাৎ মন্দ বল নি কামনা! যে ভয় ভড়াসে মানুষ, তারওপর বলাটা যে একেবারে অলবজ্জে, একটা কিছু হলেও যে সামলাবে...

আপনি যান মামা!

মিঃ সেন ছড়িটি আবার হাতে লইয়া ঠুকিতে ঠুকিতে বলিলেন—তাহলে তুমি দেরী কর না, খেয়েই চলে এস। আমি মোটর রেখে যাব, না...

আমি এখানেই থাকব মামা!

মিঃ সেনের বিরক্ততা ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া আসিতেছিল, এই কথায় তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, দপদপে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—কামনা, আমার মন যথেষ্টই খারাপ হয়ে আছে, তার ওপর এ সময়ে...

কামনা কোমল মিনতির কণ্ঠে কহিলেন—আমাকে মাপ করুন মামা!

মিঃ সেন জিজ্ঞাসিলেন—এখানে থাকা তোমার হতে পারে না।

কামনা নিরব, নিশ্চল।

মিঃ সেন বলিলেন—তোমার বাবা আমাকে বিশেষ করে...

তখন আমি এবাড়ীতে থাকতে চাই নি, মামা; থাকতে চাইলে বাবা কখনই অমত করতেন না।

করতেন না?

না।

আচ্ছা থাকো!...বলিয়া তিনি সশব্দ পদক্ষেপে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, কামনা কয়েক পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—মামীমাকে বলবেন মামা, তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন।

মিঃ সেন একথার কোন উত্তর দিলেন না, কোনদিকে না চাহিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কামনা কয় মুহূর্ত্ত সেখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর যেন কিছুই হয় নাই—এমনি ভাবে একবার উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে বাহিরের অনন্ত নীলিমার দিকে চাহিয়া জ্যোৎস্নার মধুতে হৃদয় ভরাইয়া লইয়া সে যখন আহার করিবার মানসে সেইদিকেই চলিতেছিল, সদানন্দ হাসিমুখে ঘরে ঢুকিল; কামনা হাসিমুখে বলিয়া উঠিল—কেমন হয়েছে—এই ত?

সদানন্দ হাসিল।

কামনা একটা তরকারীর সঙ্গে আধখানা লুচি গলাধঃকরণ করিয়া তার তার গলায় বলিল—চমৎকার হয়েছে,সদানন্দ!

সদানন্দ বিনয় নম্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, কামনা মধুর হাস্যের সহিত বলিল—সত্যি বলছি সদানন্দ! চমৎকার হয়েছে! তুমি যে এমন সুন্দর রাঁধতে পার তা ত আগে বল-নি সদানন্দ।

সদানন্দ অত্যধিক বিনয়ী, কহিল—দিদিমণির দেখিয়াই সে শিখিয়াছে।

তেড়ী কল্পদ্রুম

(ভূমিকা)

আমাদের বিনয় বাবু (শ্রীযুক্ত বিনয় কৃষ্ণ বসু) লোকটি খাঁচা বটে, কিন্তু তাঁহার হাত দু'টি বেশ পাকা। অনেকে তাঁহাকে অকাল-পক্ক ইঁচড়ে পক্ক বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। অন্ততঃ আমরা ত এই অষ্টাদশবর্ষীয় বিনয়বাবুকে সে কথা প্রায়ই বলিয়া থাকি। বিনয় বাবুর পাকা হাতের খেলা "বাসন্তীর" পাঠক পাঠিকাদের অজ্ঞাত নাই। সম্প্রতি তিনি একটু বিশেষ রকম আত্মীয়তার সহিত পরিচয় করিতে আসিয়াছেন একখানি প্রকাণ্ড মুকুর হাতে লইয়া! বিনয় বাবুর ধারণা, এই মুকুরে বাঙ্গলা দেশের তেড়ীবান (ধনবান, রূপবান—এই হিসাবে তেড়ীবান) ব্যক্তিই তাঁহাদের স্ব স্ব মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। আমাদেরও কতকটা সেই বিশ্বাস। এই দর্পণটির পিছনে অমন টাট্‌কা জমাট পারা মাখান আছে যে সকল মূর্ত্তিই নিখুঁত ও স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিবে; আমাদের সুন্দরী পাঠিকাগণও কতকটা "নিজস্ব" জিনিষ দেখিতে পাইয়া নিশ্চয় প্রীতি লাভ করিবেন।

বিনয় বাবু বলিতেছিলেন, দর্পণ খানি গড়িবার কালে তাঁহাকে এই কাঠ কাটা রৌদ্রে সহরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল, এমন কি, সেই সময়ে তাহার কোন এক আত্মীয় তাঁহার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়া বহরমপুরের টুরাণ্ড, ট্রেণের সময় ও ভাড়ার হিসাব চাহিতে গিয়াছিলেন। অনেক তেড়ী সম্পদে সম্পন্ন যুবক এই অদ্ভুত ব্যক্তিকে মাথার দিকে নির্নিমেষ চিত্তে দৃষ্টি দিতে দেখিয়া, ঝুকুর লেলাইয়া দিতেও কসুর করে নাই। কোন এক নামজাদা মহাপ্রভু উকীলের চিঠি দিবারও ভয় দেখাইয়াছেন, শুনিলাম, একজন না কি ওও লাগাইবে বলিয়াছে! বিনয় বাবু অসমসাহসী (তিনি আবার নন-কো অপারেটিয়ার কিনা), "বাসন্তীর" বন্ধুগনের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলিলেন! দেখা যাক্, তাঁর অদৃষ্টে কি ঘটে?

সম্পাদক, বাসন্তী।

কৃষি বিভাগ, লাঙ্গল তেড়ী

তেড়ার শিঙ তেড়ী

ঘেরাটোপ তেড়ী

আধট পাতা তেড়ী
(লুচি ভিলেই হয়।)

গঙ্গাসাগর তেড়ী
(বে-অফ্ বেঙ্গল)

বোধারী তলোয়ার তেড়ী
(দেবতার দান)

হায় হায় পরী উড়ে যায় তেড়ী

পিঠে বেঁধেছি চুলো
আর কাণে দিয়েছি চুলো-তেড়ী

থিয়েটারের সখী ভূলান
মনমোহিনী তেড়ী

চুলে ফুলের বাগান তেড়ী

বাঙ্কেলো-অর্থাৎ মহিষমর্দ্দন তেড়ী

রাবণ রাজার স্বর্গের সিড়ি তেড়ী

হাওড়া আমালা এক্সপ্রেস তেড়ী

অল্প-ন (বাড় নয়) তেড়ী

গোবেচারী তেড়ী

আহা বাছারে তেড়ী

সুরেন ক্যানেল তেড়ী

খাইবার পাস্ বোলান পাস্ তেড়ী

খেক শেয়ালী তেড়ী

বুঝি মন মজে যায় যে তেড়ী

সেন তেড়ী

করোগেটেড্ তেড়ী

(জল বসে না, রোদ লাগে না—
all প্রুফ্)

চিত্রকর তেড়ী
(ওরিয়্যাণ্টাল ও মডার্ণ—
অর্থাৎ কিনা পূর্ব্ব এবং পশ্চিম
মিলিবার আশায় চাই)

অদল-বদল তেড়া
(একদিন শয়ায় শয়ন কালে
অন্তরূপ ছিল, পরদিন
প্রাতে দেখিলেন.....)

বিন্ধ্য-গিরি তেড়ী

ডাইনে-ডুগি তেড়ী

আর্টস্ এণ্ড ক্রাফ্টস্ কম্বিনেসন তেড়ী

ওদের মুকি তেড়ী

অরাজক ও ধর্ম্মঘট তেড়ী

গিন্তিরঙ্কে—তেজস্কীয় তেড়ী

অশ্রু নিবেদন

দরিদ্রের স্বামীর প্রতি শোকার্ত্তা রমণীদের অশ্রু-নিবেদন। একদিকে পুরোহিতগণ সমাধির আয়োজন করিতেছেন অন্যদিকে রমণীরা সাশ্রুনয়নে বেশ ও কেশ ছিন্ন করিয়া মৃতের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছে।

মমীকৃত রমণীর শবাধারে শায়িত অবস্থায়

নারী-বিদ্রোহ

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

কাগজে পড়ি, বাঙ্গালী সমাজে নারী-বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছে। কিছুদিন হইল নারীর অভাব, অভিযোগ পীড়ন ও বন্ধনের কথা কয়েকজন মহিলা লেখিকা প্রবন্ধে ও সমর্থে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাকে যিনি যাহাই বলুন না কেন,—বিদ্রোহ বলা চলে না। দুই একজন লেখিকার লেখায় যে তীব্র ঝঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়, এবং বাঙ্গালী সমাজের অনুপযোগী পুঁথিগত 'সমস্যা'র বিশ্লেষণ ও সমাধান লক্ষ্য করা যায় —তাহা বিদ্রোহ নহে, অভিমান, অভিযোগ! এক কথায় দেশের নারী-শক্তির পঙ্গুত্ব ঘুচাইবার জন্য, পুরুষ-শক্তির সহানুভূতি, অনুকম্পা ও ঔদার্য্য ভিক্ষা করা। কেননা পুরুষ-শক্তির সম্মতি ও সাহায্য ব্যতীত নারী-জীবনের কোন সমস্যার মীমাংসা হয় না। পক্ষান্তরে একথাও সত্য যে, পুরুষও নারীর সাহায্য ও শক্তি ব্যতীত তাহাদের সমস্যাগুলিও মীমাংসা করিয়া লইতে পারে না।

সাহিত্যের ভাষায়, পুরুষ ও নারী অর্দ্ধাঙ্গীভাব সম্বন্ধে আবদ্ধ। নারী—সুহৃদা, জায়া, মাতা; পুরুষ—পুত্র, পিতা, স্বামী। অতএব নারীর সুখ দুঃখ সম্বন্ধে কোনক্রমেই পুরুষ উদাসীন হইতে পারে না। অতএব যদি সত্যই মহিলাগণ নিজেদের অসহায় অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে চান, তাহা হইলে তাহা পুরুষকে বাধ দিয়া বা অগ্রাহ্য করিয়া কেমন করিয়া সম্ভব, তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত।

বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজে নারীর বর্ত্তমান অবস্থার জন্য কেবল পুরুষই দায়ী নহে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বৈদেশিক শাসনের প্রবল পীড়ন হিন্দুসমাজকে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ও পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই সমাজকে বর্ত্তমানে আমরা যে আকারে পাইয়াছি, তাহার সমস্ত ত্রুটী, ভুল সংশোধন করিবার দায়িত্ব যে পুরুষ শক্তির হস্তে,—তাহারা কি পরিমাণ অক্ষম ও উদ্যমহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিলেই বেশ বোঝা যায়। পুরুষ যেখানে পৌরুষ হারাইয়া কাপুরুষ হইয়াছে, সেখানে নারী কখনই সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে না। কাজেই অধঃপতনের পঙ্ক-শয্যায় পুরুষ একা নহে, নারীকে লইয়াই আছে। এবং উঠিতে হইলে উভয়কেই উঠিয়া আসিতে হইবে। পুরুষ ও নারীর উত্থান ও পতন, সুখ ও দুঃখ, জীবন ও মরণ পরস্পরের সহিত জড়িত—বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন নহে—ইহা সৃষ্টির অলঙ্ঘনীয় বিধান। এই মূলসূত্রকে মানিয়া লইয়া দেখিতে হইবে, আমাদের সমাজে কোথায় কি ভাবে এবং কেন পুরুষ ও নারীর ভাব-সম্বন্ধের মধ্যে ব্যভিচার ও বিকৃতি আসিয়াছে এবং তাহা দূর করিবার উপায় কি?

তাহা না করিয়া ইব্‌সেন মেটারলিঙ্ক অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথের সার্থক সৃষ্টি 'ঘরে বাইরের' সমস্যাপূরণে যদি কেহ অগ্রসর হন, তবে যে তিনি কেবল ব্যর্থ হইবেন তাহা নহে, জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক অস্বাভাবিক ব্যভিচার করিবেন। ঐ সমস্ত ঔপন্যাসিক সমস্যা যে আমাদের সমাজে দেখা দেয় নাই, ইহা সত্য কথা। এবং বাহিরের আগত তার অনির্দ্দেশ দম্ভরাশি উন্মুক্ত করিয়া বঞ্চিতা নারীকে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য ডাক দিতেছে, আর আমাদের মুদ্রাজনারা উহা পাইবার জন্য মর্ম্মান্তিক ব্যাকুলতায় অধীরা হইয়া উঠিয়াছেন, কেবল পুরুষেরা দরজা খুলিয়া দিতেছে না—ফলে ঘরে বাহিরে একটা বিদ্রোহ সূচনা হইয়া গিয়াছে,—এমনতর কল্পনা বিলাস বাঙ্গালীর উপন্যাসে থাকিলেও, বাঙ্গালীর সমাজে নাই। বন্ধনের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার শক্তি বাঙ্গালীর বর্ত্তমানে নাই। পুরুষেরও নাই, স্ত্রীলোকেরও নাই। সেই জন্য উভয়েই দলিত, লাঞ্ছিত, পদাহত,—এবং মনুষ্যত্বের অধিকার বঞ্চিত। অস্বীকার করিয়া, বিদ্রোহ করিয়া, শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া নির্য্যাতন সহিয়া,—সমাজের ভবিষ্যৎ দু-পায়ে দলিয়া যাহারা মাথা তুলিতে সক্ষম,—তাঁহাদের সংখ্যা

বাঙ্গালী-সমাজে খুব অল্প বলিলেই হয়। এই অল্প-সংখ্যক পুরুষ ও নারী যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একযোগে মিলিত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেন, তবে কথঞ্চিৎ কল্যাণ হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার কোন আভাষ পাওয়া যাইতেছে না। ফলে ব্যক্তির মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত হইতে সমষ্টি কোন প্রেরণা ও বললাভ করিতে পারিতেছে না। যাহা ব্যষ্টি দায় ও কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেছে, যতদিন না সমষ্টি তাহা পূরণ করিবার ভার লয়, ততদিন সমস্যা—সমস্যাই থাকে, সমাধান হয় না।

যে তীব্র অপমানবোধ বা অভাবের কথা, কাগজে পাঠ করি, জীবনে তো তাহার বিশেষ কোন সংবিৎ আছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালীর নারী-সমাজে বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য কোন আগ্রহ ঐকান্তিক হইয়া দেখা দেয় নাই। অবশ্য আমি একথা বলিনা যে বর্ত্তমান জঘন্য অবস্থার পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা প্রতি নারী-হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া তুলিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই প্রয়োজনের দায়িত্ব কেবল নারীর নহে, পুরুষেরও। যাঁহারা বলেন, পুরুষ তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতেছে না, তাহার উত্তরে বলা যায়, নারীও পুরুষের কর্ত্তব্যবোধকে জাগ্রত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন না।

জীবদেহ রুগ্ন হইলে যেমন প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ এই রুগ্ন-সমাজের পুরুষও নারী দুইই দুর্ব্বলতায় হইয়া পড়িয়াছে। অতএব পুরুষ ও নারীর চিরন্তন সম্বন্ধের যে কদর্য্য বিকৃতি সমাজের সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র নারীই কেন যে বিদ্রোহ করিবেন এবং করিলেও পুরুষ কেন যে বাধা দিবে—ইহা সম্যক বুঝিয়া উঠিতে অপারগ হইলাম।

বাঙ্গলার পুরুষ স্ত্রীস্বাধীনতা বা স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ না দেখাইলেও বিরোধী নহে। এ কথায় দু'চার-জনের কথা ছাড়িয়া দিলে, অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রাত্যহিক জীবনে ইহার কোন অভাব বোধ করে না, কাজেই চিন্তাও করে না। যে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই কোন নিশ্চিত মত বা বিশ্বাস নাই সেখানে প্রতিকূলতা আশঙ্কা করা অবিধেয়। তথাপি যাহারা পুরুষকে একান্ত পরি-পন্থী স্থির নিশ্চয় করিয়া পুরুষের পক্ষ হইতে কতকগুলি কল্পনা করিয়া—নিজের কল্পনাকে নিজেই তীব্রভাবে আক্রমণ করেন, তখন সে অনাবশ্যক উল্লাস দেখিয়া কেহ হাস্য করিলে, তাহাকে নারী-বিরোধী মনে করা ভুল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় অধিকাংশ লেখিকাই এই মারাত্মক ভ্রমের উপর দাঁড়াইয়া লক্ষ্যহীন শরনিক্ষেপ করিতেছেন। তাহাতে যুক্তি প্রয়োগ কৌশল দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু যুক্তির কোন কিনারা হইতেছে না।

সমাজে যদি নারী ক্রীতদাসী হইয়া থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে পুরুষও ক্রীতদাস হইয়া উঠিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই দাসত্ব, কুসংস্কার, শক্তিহীনতা—দুই দিকেই সমান। অতএব একপক্ষকে প্রবল ও অপর পক্ষকে দুর্ব্বল কিম্বা পুরুষ নারীকে নির্য্যাতন করিতেছে, আর নারী তাহা সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছে;—এরূপ মনে করিলে অপক্ষপাত বিচার অসম্ভব।

যেখানে সমাজের বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শান্ত অনুদ্বিগ্ন অথচ দৃঢ় ও অনৈকলক্ষ্য হইয়া প্রকাশ পায়, যেখানে পুরুষ নারীকে ছাড়িয়া, নারী পুরুষকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে জীবন-সমস্যা মীমাংসা করিতে চায় —সেখানে সন্ন্যাসের চরম ত্যাগের আদর্শ ছাড়া আর কিছুই টিকিতে পারে না। সেটা সমাজ জীবনের আদর্শ নহে।

পুনরায় বলিতেছি, নারীর নারীত্বটাই চরম বা শেষ কথা নয়—সমাজ-জীবনে নারী—কন্যা, জায়া এবং মাতা। এবং ঐ সম্বন্ধগুলির সহিত পুরুষের অপরিহার্য্য সংযোগ রহিয়াছে, কাজেই উভয় পক্ষের জাগ্রত-হৃদয়গুলির মিলিত চেষ্টা ব্যতীত সামাজিক দুর্নীতিগুলি কেবল করিয়া দূর হইবে বুঝি না।

পুরুষের সহিত নারীর সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও পরস্পরের উন্নতির সুনিশ্চিত সোপানরূপে গড়িয়া তুলিবার কার্য্যে আজ যে নারীরা অগ্রসর হইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে কালপুরুষের কল্যাণ-নির্দ্দেশ যে অনুভব করিতেছে না, সে নিতান্ত সঙ্কীর্ণচেতা কৃপমণ্ডূক সন্দেহ নাই। নারীর অভাব অভিযোগের কথা নারী নিশ্চয়ই

বলিবে এবং প্রতীকারের চেষ্টাও তাঁহাদের পক্ষে অন্যায় বা অনধিকার চর্চ্চা নহে, কিন্তু পুরুষকে বাদ দিয়া নহে, পুরুষকে অগ্রাহ্য করিয়া নহে, পুরুষকে 'বিদেষী' মনে করিয়াও নহে। জাগ্রত মহিলাগণ একথা দয়া করিয়া সর্ব্বদা মনে রাখিবেন, অধিকাংশ বঙ্গ-নারী যেমন মূঢ়, আত্ম-চেতনাহীন, প্রতিকারের শক্তি ও ইচ্ছাহীন,—অধিকাংশ পুরুষও তদ্রূপ। এই কাপুরুষের দেশেও যে মুষ্টিমেয় জাগ্রত পুরুষ রহিয়াছেন,—তাঁহাদের দিকে চাহিয়াই আজ মুষ্টিমেয় জাগ্রত নারীকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁহারা নিশ্চিন্তে হাত গুটাইয়া বসিয়া নাই,—একান্তে উপায় চিন্তা করিতেছেন, মহিলাগণ সংবাদপত্রে যে আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতেছেন তাহা নিপুণভাবে গ্রহণের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহারা জানেন, বিধি-নিষেধ বা বেশাচার যে স্থলে উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামী ও অনীতিক হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে যে কেবল নারীই নিগৃহীতা হয় তাহা নহে, পুরুষও সমপরিমাণ নিগ্রহ ভোগ করিতেছে। সমাজের জড়ত্ব, পুরুষ ও নারীকে সমভাবে পীড়া দিতেছে।

সমস্যা এক হইলেও পুরুষ ও নারীর সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, অধিকার ও কর্ত্তব্য মর্ম্মান্তিকরূপে পৃথক্। কাজেই কেবল পুরুষ কিম্বা কেবল স্ত্রীলোক এই সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিবে না। কেহ কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিয়া, নারী-জীবনের স্বাতন্ত্র্য পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিয়া এই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। ইহার জন্য নারী, পুরুষ হইবে না, পুরুষও নারী হইবে না। পুরুষ যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা অবাধে করিবার সুবিধা পাইলেই নারীর অভাব ঘুচিবে না, অথবা নারী পুরুষের সহিত সমানস্তরে উঠিয়া আসিবে না। পুরুষ ও নারীর কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অপূর্ব্ব সহানুভূতি।

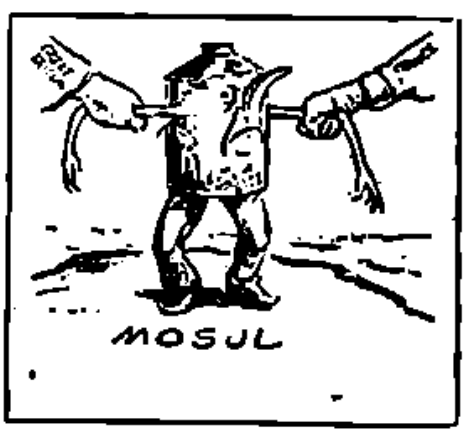

"আহা, গরীব বেচারাদের বাঁচাতে হবে বৈ-কি!"

—James in the St. Louis STAR.

ছেড়ে দে-মা কেঁদে বাঁচি।

"বাছে চাল ছাড় চাঁদ! তোমাদের বৈঠকও শেষ হবে না, পৃথিবীতে বুভুক্ষও থাম্‌বে না।"

—Mc Cutcheon in the Chicago "*Tribune*."

৪৷৷ বিনামূল্যে লকেটসহিত ফটো
ফটো এনলার্জিং ১৫×১০
ফটো সম্বন্ধীয় সিকি মূল্য পর্য্যন্ত
ক্যামিরা, লেন্স ও রেজিষ্টার্ড ক্যামেরা
৬৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

হোরেসিও বটমলি

(শ্রীভবতোষ রায়, বি, এল,)

বিলাতের 'জনবুল' সম্পাদক হোরেসিও বটমলির নাম কতকগুলি চরিত্রগত বিশেষত্বের জন্য কেবল ইংলণ্ডে নহে, ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ জগতের সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। ইহার অদ্ভুৎ কার্য্যকলাপের প্রতি অনেকেরই নজর বরাবর ছিল। কিন্তু এর নাম খুব বেশী বিখ্যাত হ'য়ে ওঠে অল্প কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন কৌজদারী মোকর্দ্দমায় একে আসামী শ্রেণীভুক্ত করা হয়। যুদ্ধের সাহায্য কল্পে বহু ক্লাব প্রতিষ্ঠায় বটমলি একজন অগ্রণী ছিলেন। প্রথম প্রথম এই সব ক্লাব সমূহের যে সব অর্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত থাকত তার সুদ থেকে বৎসরে দুটি করে পুরস্কার দেবার নিয়ম করা হয়। বটমলি প্রথমতঃ একেবারে মূলধন আত্মসাৎ করার মৎলব করেছিলেন কিনা জানা না থাকলেও বিচারালয়ে তাকে এই সব ক্লাবের অংশীদার-গণের অহরীল চুরী এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অভিযুক্ত করা হয় এবং অনেক প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এত বেশী গুরুতর বলিয়া সপ্রমাণিত হয় যে অবশেষে তিনি দোষাত্তরিত হন। বটমলি 'জনবুল' কাগজের সম্পাদক ছিলেন, 'সাণ্ডে পিক্টোরিয়াল' এবং আরও কোন কোন কাগজের প্রবন্ধ লেখক ছিলেন এবং পার্লামেণ্টের সভ্য ছিলেন। কোন কোন শ্রেণীর ভিতর তার একটু বেশ প্রতিষ্ঠাও ছিল। কিন্তু মানুষের মৎলব বুঝে ওঠা বড় কঠিন।

বটমলি চরিত্রের এই সব বিশেষত্বের ভিতর অনেক জানবার বিষয় আছে। এর ভিতর এক দিকে জাল, জুয়াচুরী, চুরী প্রভৃতি অত্যন্ত নীচ প্রবৃত্তির বীজগুলি অঙ্কুরিত হ'য়ে শাখা প্রশাখা বিস্তার করছিল, তেমনি আবার কেহ কেহ বলেন যে উদারতা এবং পরোপকারীতাও তাহাতে বিলক্ষণ বিদ্যমান ছিল। যাহা হউক, জন-সাধারণকে মাতিয়ে তুলে তাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করার জন্য কতকগুলি গুণের প্রয়োজন হয়। সম্প্রতি মিঃ হাউটন নামক বটমলির ভূতপূর্ব্ব একজন সেক্রেটারী "প্রকৃত হোরেসিও বটমলি" (The Real Horatio Bottomly Hurst & Blacekit, 4s. 6d). নামক একখানি গ্রন্থে বটমলি কর্ত্তৃক প্রতারিত জনসঙ্ঘের মনস্তত্ত্ব এবং এই নাম-ধারী জুয়াচোর সম্পাদক সম্বন্ধে অনেক নূতন খবর প্রকাশিত করেছেন। বটমলি ঘটিত অনেক ব্যাপারের এমন সব খবর এই পুস্তকে বেরিয়েছে যা সাধারণের জানবার বিশেষ সুবিধা কোন দিন অন্য প্রকারে হত কিনা সন্দেহ।

মানব চরিত্রের কোথায় কোন অংশটুকু কি ভাবে কাজ করে তা অনেক সময়েই জটিলতার আবরণে ঢাকা থাকে। বটমলি চরিত্রে মুক্তহস্তে দানশীলতা, উদারতা এবং মহানুভবতা ইত্যাদি গুণ যে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল তা মিঃ হাউটনের জীবনীতে বেশ দেখান হ'য়েছে। কিন্তু এ সব যেন তার সমগ্র চরিত্রের একটা নিম্নতম অংশ বলে বোধ হয়। এক দিকে যেমন দুঃস্থজনের প্রতি বটমলির আন্তরিক সহানুভূতি বেশ প্রকট দেখা যায়, অপর দিকে আবার তেমনি অতি জঘন্য হীনচেতার ন্যায় কাজও তাতে আরোপ করা হয়েছে। সাময়িক উত্তেজনা বশেই হোক অথবা কোন মৎলব করেই হোক একদিকে যেমন বটমলি কোনও কোনও বিপদগ্রস্থ দরিদ্রের প্রতি দয়াপরবশ হ'য়ে তার উপকার ক'রত, তেমনি আবার যখন ঠকিয়ে তাদের রাস্তায় বসাবার উপক্রম ক'রত তখন তাদের হৃদয়ভেদী বিলাপ ক্রন্দনও তার কর্ণে প্রবেশ ক'রত না। যে সকল অর্থদ্বারা তিনি দরিদ্রের উপকার করতেন সে সব ওদের নিকট হতেই নানা অজুহাতে সংগৃহীত। পার্লামেণ্টে নির্ব্বাচনের জন্য অনেক সময় তিনি টাকা দিয়ে ভোট সংগ্রহ করতেন, কিন্তু সে সবই আবার ঐ সব গরীব ভোটারদেরই অর্থ। ব্যক্তিগত জীবনে বটমলির ব্যয় বাহুল্যতা এবং নানা ভাবের ব্যয়বহুল ইত্যর জনোচিত চালচলনে অসীম অর্থ ব্যয়িত হত। এ সকলের সঙ্গে তুলনায় তার দান ধ্যান সমুদ্রে বারিবিন্দুর মত বলে বোধ হয়।

মিঃ হাউটনের চেষ্টায় বটমলির আর্থিক, রাজনৈতিক এবং খবরের কাগজের সম্পাদকত্ব এবং লেখক বিষয়ে অনেক নূতন খবর প্রকাশ হয়েছে। এমন কতকগুলি ক্ষমতা তার ভিতর বেশ উজ্জ্বলভাবে বর্ত্তমান ছিল যার প্রভাবে সে জন সাধারণকে যাদুকরের ন্যায় হাত করে নিতে পারত। সাধারণ জনসভাতে দাঁড়িয়ে রীতিমত নটোচিত হাবভাব সহকারে বক্তৃতা করবার ক্ষমতাও তাতে বেশ ছিল। অনেক সময়ই জনসমূহের নীচ এবং পশুবৃত্তিগুলিকে নিয়ে সে খেলা করত এবং সভাসমিতি এবং কাগজ হ'তে সাধারণের উপর তার যে প্রভাব জন্মেছিল সেটা অনেক ক্ষেত্রেই খুব নীচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হত। অনেকের মনে মহাযুদ্ধ আরম্ভের পর হ'তে একটা বিশ্বাস হয়েছিল যে সম্ভবতঃ বটমলির অনিশ্চিত জীবন স্রোত একটা নূতন ধারায় প্রবাহিত হল। বাস্তবিকই যখন এক নূতনভাবে অনুপ্রাণিত তার এই সময়কার লেখা এবং বক্তৃতাগুলি লোকে দেখতে লাগল তখন ধীরে ধীরে অনেকেরই পূর্ব্বকার মত একেবারে বদলে গেল। অনেক সময় সে এমন ধর্ম্মভাবের ভাণ করতে লাগল যে অনেক লোক তাতে প্রকৃতই বিশ্বাস স্থাপন করল। একদিকে দেশ প্রেম অপরদিকে ধর্ম্মপ্রাণ ভাব দুটিই সে এমন উৎকৃষ্ট ভাবে অভিনয় করত যে অনেক নিম্ন শ্রেণীর লোক তাকে বেশ ভক্তিভাবে দেখতে লাগল।

মিঃ হাউটন অবশ্য এই প্রভাবকে বেশ ভাল ভাবেই জান্‌তেন এবং তার মতে এই সব ধার্ম্মিকতা এবং দেশ-প্রাণতা বটমলির লোক ঠকান বিদ্যাবলীর ভিতর অন্যতম একটি। জীবনী লেখকের মতে তার স্বদেশ প্রেমিকতার ভিতর কতকটা পরিমাণ আন্তরিকতা যে একেবারে না ছিল তা নয়। কিন্তু এ সবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থোপার্জ্জন। যুদ্ধের সময় আমাদের দেশে যেমন সৈন্য সংগ্রহের জন্য সভাসমিতি হয়েছে এবং বক্তৃতা অনেক হয়েছে—বিলাতে তার চাইতে অনেক বেশী সভা সমিতি হ'য়েছে এবং বক্তা বটমলি এই শ্রেণীর অনেক সভাতে বক্তৃতা দিয়ে ঘুরেছেন। অনেক বার তিনি ব্যক্ত করেছেন যে এই মহান কার্য্যের জন্য তিনি কখনও এক পয়সাও পরিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। হতে পারে যে তিনি এ জন্য একেবারেই হয়ত কিছু গ্রহণ করেন নাই, অথবা অতি সামান্যই গ্রহণ করেছেন, 'জনবুল' কাগজের মালিকরা কিন্তু প্রচুর অর্থ এ জন্য খরচ খরচা হিসাবে তার হাতে দিতেন। মিঃ হাউটন একরকম ঠিক করেই বলছেন যে একদিকে যেমন কুড়িটি সৈন্য সংগ্রহ সভার বাবদ তিনি কিছু নেন নি, অপর দিকে আবার ৩৪০টি 'স্বদেশপ্রেম' বক্তৃতার জন্য ২১,০০০ পাউণ্ড তিনি অম্লান-বদনে গ্রহণ করেছেন। বক্তৃতাগুলিও আবার বেশ তৈরি করা থাকত এবং সংখ্যার নির্দ্দিষ্ট ছিল। তার বেশী বক্তৃতা সে করতো না—এবং যে গুলি বেশ ভাল ভাবে লেখা ছিল, সেগুলি খুব বেশী অর্থ যেখানে আশা করা যেত সেই সব সভার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকত।

অর্থোপায়ের জন্য কতকগুলি কাজ তার ছিল। প্রথমতঃ "জনবুল" সম্পাদক হিসাবে তার আয় যথেষ্ট ছিল এই আয় অনেক সময় খুব বেশী হ'ত কারণ দাও মেরে টাকা আদায় করার কৌশলটি বটমলির মত খুব কম লোকেরই জানা ছিল। 'সাণ্ডে পিক্টোরিয়ালের', প্রবন্ধ-লেখকরূপে তিনি বাৎসরিক ৭,৫০০ পাউণ্ড পেতেন। এসব প্রবন্ধ বটমলি রচিত বলে চলে যেত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি লিখবার জন্য মাইনে করা লোক ছিল। একবারের একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। "সাণ্ডে পিক্টোরিয়াল" এবং "জনবুল" দুখানি কাগজে বটমলির নামে দুটি প্রবন্ধ একই সময় জর্ম্মন বন্দীগণের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়। সম্ভবত সময়াভাবে অথবা শৈথিল্য বশতঃ বটমলি প্রবন্ধ দুটি ঠিক দেখে দিতে পারেন নি। ফলতঃ ঠিক বিপরীত মত একই বিষয়ে একই লোকের লেখা বলে দুটি কাগজে যুগপৎ বেরিয়ে গেল। বটমলির লেখার কৌশল এই ঘটনার পর হতেই অনেকের নিকট পরিচিত হয়ে যায়। একবার যুদ্ধস্থলে যান বটমলি, সঙ্গে ছিলেন এই জীবনী লেখক মিঃ হাউটন,—কাগজ-ওয়ালা-দের কাছ থেকে সৈন্যদের জন্য খরচ করতে হবে বলে অনেক টাকা নিয়ে যান কিন্তু খরচ নাম মাত্রই করে বক্সী টাকা আত্মসাৎ করেন। এই ভাবে তার আয়ের অনেক পথ ছিল।

অনেকের মনে একটা ধারণা ছিল যে, যাই কেন হউক না ব্যবসা বুদ্ধি এবং অর্থকড়ির হিসাব ইত্যাদি সম্বন্ধে বটমলি বেশ ওস্তাদ ছিলেন! মিঃ হাউটন অনেক ঘটনা উল্লেখ করে এ মতটা একেবারেই ব্যর্থ করেছেন। একেত তিনি সোজাসুজি কোন কাজ কখনও করতে জান্‌তেনই না কিন্তু একটা কারবার গড়ে তুলতে এবং চালাতে যে পরিমাণ বিষয় বুদ্ধি এবং কর্মকুশলতার প্রয়োজন তাও বটমলির ছিল না। ক্রুরবুদ্ধি অবশ্য তার বেশ ছিল, কিন্তু অনেক আগে জুয়াচুরীর হাত যদিও এড়িয়ে গিয়ে ছিলেন, অবশেষে তার নিজের জালেই নিজেকে জড়িয়ে পড়তে হল। মিঃ হাউটন এখনা মোটেই বিশ্বাস করেন না যে প্রথম থেকেই বটমলির জুয়াচুরীর মতলব ছিল কিন্তু বড় রাবের মূলধন নিয়ে একেবারে হজম করতে গিয়েই তার এই বিড়ম্বনা হয়।

সব দিক দিয়ে দেখলেই এটা বেশ বুঝা যায় যে লোকটি অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু নৈতিক চরিত্রবলের অভাবেই তার সব কাজ বিফল হয়ে যায় এবং অবশেষে অতি হীনভাবে তাকে জন সমাজের সম্মুখ হতে বিচারাদেশে দেশ হতে বহিষ্কৃত হতে হয়। বিলেতী সবই বিচিত্র।

চলতি চালতি

এতদিন পরে মহামহিম মোহান্ত মহারাজগণ মোহ অন্ধে জাগ্রত হইয়া উঠিলেন দেখি! সম্প্রতি তাঁহারা গয়ায় এক অধিবেশন করিয়া স্থির করিয়াছেন, অতঃপর একতা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবেন, চেলাগণকে দীক্ষা (ধর্মশিক্ষা) দিবেন। যাক, একটা দুর্ভাবনা ঘুচিয়া গেল! চেলাদের ভাবনাতেই যেন আমাদের ঘুম হইতেছিল না! হায়রে বরাত।

• • • •

ভারি এক মজার কিস্তির বাহির হইয়াছে চুরীর। কোন একজন লোক সহরের আফিসের বড় সাহেবদের ঘরে ঢুকিয়া, কাজ কর্মের সন্ধান করিয়া বেড়াইত! যেখানে যাইত সেখানেই বড় সাহেবদের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় কিছু সময় কাটাইয়া দিয়া অন্তর্ধান করিত। শুনা যাইতেছে, যতগুলি বড় সাহেবের সহিত সে মুলাকাৎ করিয়াছে সকলেরই সিগারেট কেস্ অপহৃত! কোনটি রূপার, কোনটি সোনার। সাহেবরা প্রায়ই টেবিলের বাঁ দিকে কেস্ রাখিয়া কাজ কর্ম করেন ও আগন্তুক আসিলে বাঁ দিকে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহার রীতি। ইহা দেখিবার সৌভাগ্য আমাদেরও এক আধদিন হইয়াছে।

• • • •

লর্ড কারমাইকেল সাহেব যিনি টুটান খামানের (!) সমাধি আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন, সেদিন জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। শুনি তিনি যখন সমাধি খোঁড়াইয়াছিলেন, একটা কি পোকা তাঁহাকে দংশন করে, বেচারার ভবলীলা তাহাতেই সাঙ্গ। সত্য মিথ্যা চোখে দেখি নাই, শুনিয়াছি কবরের উপরে না কি লেখা ছিল আমার সমাধি খুড়িয়া আমার সুপ্ত আত্মাকে জাগাইও না, ভাল হইবে না! লর্ড কারমাইকেল সাহেব লোক, মিশরীর মড়ার এ অনুরোধ তাঁহার শ্বেত কাণে ঢুকিবে কেন, আর চোকেই যদি তাঁহারা এ সব মানিবেন কেন? খুড়িয়া ফেলিলেন। এখন ভাল হইল কি মন্দ হইল সে উত্তর তাঁহার নিকট হইতে পাইবার আশা না থাকিলেও যাঁহারা তাঁহার উপদেষ্টা তাঁহারা যদি বলেন, শুনিয়া শ্রবণ চরিতার্থ করি। তবে যদি বলেন আঁতুড় ঘরে বিধাতা আটদিনের দিন বেচারা লর্ড কারমাইকেলের ভ্রূণ কপালে এই মৃত্যুই লিখিয়াছিলেন তাহা হইলে অদৃষ্টবাদী আমরা, চুপ!

• • • •

যুক্তপ্রদেশে যান-বাহনের উপর ট্যাক্স বসিয়াছে। এতদিন গাড়োয়ানদের দেলায় ও খিচিমিচিতে আই চাই করিয়াও তবু লোকে যাওয়াটা আসাটা করিতেছিল, শ্রীল শ্রীযুত সরকার বাহাদুরের যখন শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে, এবার প্রাণান্ত না হইয়া আর যায় না।

• • • •

অনেকে হয়ত খবর শুনিয়াছেন, কলিকাতা সহরের

পুলিশ কমিশনার মহোদয় জাতীয় দলের স্বেচ্ছাসেবকদের লাঠি হাতে করিয়া পথে বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছেন। অনেকের ধারণা পুলিশ ভয় পাইয়া এরূপ করিয়াছে, আমাদের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। আমরা জানি পুলিশ লাঠিতে ভয় পায় না, লাঠি ঘুরিলে তাহার নিকটস্থ হওয়া পুলিশ কাপুরুষতা মনে করে, কাজেই লাঠিকে তাহারা ভয় করে না। পুলিশ কমিশনার বাঙলার বংশ-চাষের হীনাবস্থা দেখিয়াই এই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। তবু যদি কোন অর্ব্বাচীন প্রশ্ন করে বাঁশের চাষে কি হইবে? সে অশ্লীল প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমরা লেখনী কলঙ্কিত করিতে পারিব না, তাহাই হইবে। সে কথা থাক্, আমরা যাহা বলিতেছি তাহা এই, পুলিশ কমিশনার মহোদয় মন্ত্রীবর বাঁড়ুয্যে সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া লাঠির টাক্স বসাইয়া দিলেন না কেন? কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইত না কি? বাঁড়ুয্যে সাহেব কি বলেন?

দৈনিক "বন্দেমাতরম্" আলোচনায় লিখিতেছেন,... সরকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশা ঘোচাইবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।" এই কমিটিতে...যে দুইজন সভ্য থাকিবেন তাঁহাদের নাম ও "বন্দেমাতরম্" দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন কমিটিতে দুর্দ্দশা কিরূপ ঘোচে তাহা আমাদের জানা আছে।" ঠিক কথা, আমাদেরও জানা আছে। তবে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রোয়ারে সভা করিলে দুঃশ দুর্দ্দশা ঘুচিতে পারে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। "বন্দেমাতরম্" সভা আহূত করিবার ভার নিশ্চয়ই হাসিমুখে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

৪র্থ নম্বরিকের বিধবাটির বয়স প্রায় ৬০। ৭০ বছরের 'যুবতী' স্বর্গীয় স্বামীর এক বন্ধুকে আবার বিবাহ করিয়াছেন। ৪র্থ নম্বরিকের সঙ্গে ইনি ৩৪ বছর ঘর করিয়াছিলেন, ঘর করার সাধ এতদিনেও মিটে নাই! কি জাত রে—বাপ!

বন্ধুর বাড়ীতে পাণ খেয়ে

(সুর—"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম")

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

ভাই, কেবা বানাইল এই পাণ?
হাবের মাকার দিয়া নাড়িতে ঠেকিল গো,
চুণেতে পুড়িল মোর জান!
না-জানি কতই চুণ পাণে মাখা আছে গো,
বদন ভরিছে হাহাকারে!
চিবুতে চিবুতে পাণ বেহঁস করিল গো,—
কি ক'রে খাবার আলাচারে।

(ব'লে দে—
ভাই রে আমার, ব'লে দে—
পাণ-সাজুনীকে—উঃ!—ব'লে দে—
বাড়ীর ভেতর ছুটে গিয়ে ভাই,
তাড়াতাড়ি তাঁকে ব'লে দে—)
স্বামীর সাথাত তাঁর দু-কাণ মলেচে গো,
আরো পাণ খেতে নাহি চান!

জীবন রাখতে হলে
জীবন-রসায়ন
ইহা শরীরের রক্ত মাংস ও ধাতুর ক্ষতিপূরণ কর্ত্তে পারে অথচ উত্তেজক নয়।
—তথ্য লউন—শ্যামাদাস ঔষধালয়—৬৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ বিদেশ

আইন অমান্যের প্রস্তাব।

শ্রীমতী হেমপ্রভার পত্র।

আইন অমান্যের প্রস্তাব সম্বন্ধে শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ও সভ্যগণের নিকট দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশ করা হইল :—

(১) শ্রীযুক্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের গৃহীত আইন অমান্য বিষয়ক ও অন্যান্য প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে বিহিত বিবেচনার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর এক অধিবেশন শীঘ্রই হওয়া সঙ্গত মনে করি। অতএব যে জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক সভা আহ্বান করিবার নিমিত্ত আপনাকে অনুরোধ করিতেছি। ঐ সভার তারিখে হইলে সুবিধা হয়।

আইন অমান্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সভায় বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।

প্রস্তাব

যেহেতু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দিবস দিন বৃদ্ধি ও নানা বিষয়ের প্রতিকারের জন্য আইন অমান্যই একমাত্র উপায় বলিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন এবং সেইজন্য ঐ সভা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে অনুরোধ করার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

অতএব এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে,

(ক) আইন অমান্যের কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বিগত ১৯২১ সনের ৪ঠা ও ৫ই নবেম্বর তারিখের এবং তাহার পূর্ব্বের ও পরের সকল, অসহযোগ ও অন্যান্য বিষয়ের গৃহীত প্রস্তাবগুলি অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তন বা নিখিল করার ক্ষমতা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সমিতিকে দেওয়ার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর নিকট প্রার্থনা করা হউক।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভ্য

অনুরাগবশে সমীপেষু—

অনুরাগবশে,

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত, প্রস্তাবসমূহ বিশেষতঃ আইন অমান্য প্রস্তাব যাহাতে অবিলম্বিতে কার্য্যে পরিণত হয় তাহার উপায় নির্দ্ধারণ জন্য সভা আহ্বান হেতু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক মহাশয়কে উক্ত পত্রখানি লিখিয়াছি। অতএব যাঁহারা আমার এই কার্য্যের অনুমোদন করেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বিতে আমার এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া B, P, C, Co সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিবেন। এবং নির্দ্দিষ্ট তারিখে B, P, C, Co সভায় যোগদান করিয়া যাহাতে তাঁহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় তাহার প্রতিবিধান করিবেন।

৮মা অগ্রহায়ণ আমাদের যার যার সুযোগ বিশ্রামের এবং এবারও আবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। সুযোগ একবার উপেক্ষা করিলে বা আর সুযোগ যেন না অতএব আশা করি সুযোগ হেলায় হারাইবেন না। ইতি—

বিনীতিকা—শ্রীহরপ্রভা মজুমদার।

শ্রীযুক্ত রাজাজি, শ্রীযুক্ত প্যাটেল এবং শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু ব্রহ্মদেশের নানা স্থানে কংগ্রেস-বার্ত্তা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। গত তিন দিবস তাঁহারা রেঙ্গুন-প্রবাসী ভারতীয় বণিকগণের নিকট হইতে তিলক-স্বরাজ-তহবিলের জন্য একলক্ষ টাকা আদায় করিয়াছেন। গত ৬ই এপ্রিল ব্রহ্ম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির জন্য ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

গত হরতালের দিন যে সমস্ত খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবক কারারুদ্ধ হন, তাহাদের মধ্যে ৪জন সম্প্রতি হুগলী জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। তাহারা বলিয়াছে যে, জেলে যে খাদ্য দেওয়া হইত, তাহা অনেক সময় পচা, কদর্য্য ও কীটপূর্ণ থাকিত; এই জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ অনেক দিনই অনাহারে দিন কাটাইয়া দিত। এই বিষয় উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট অভিযোগ করিলে তাহারা বলে যে,—"জেল হোটেল নহে"।

বেঙ্গলী প্রাণ ভাগবদ্ধন "সোণার বাংলা" সাপ্তাহিক বাহির করিয়াছেন। এই অসার বাংলাকে সোণার বাংলায় পরিণত করিতে পারিলে তাঁহার চেষ্টা সফল হইবে, আমরাও সুখী হইব।

এতদ্ব্যতীত গত সপ্তাহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে কয়েকটী সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ায় অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্র "বাঙ্গালার কথা" বন্ধ করিয়াছিলেন। তিনি শীঘ্রই একখানি ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র বাহির করিবেন।

আগত জনবর যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ আগামী জুন মাস হইতে একখানি ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র বাহির করিবেন। বাবু প্রিয়নাথ শুহ নাকি উক্ত সংবাদপত্রের চিফ্ এডিটার হইবেন। এই সুখবর এ সম্বন্ধে পরিবর্দ্ধন করার জন্য "সার্ভেণ্ট" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভাবানন্দ চক্রবর্ত্তী ভারাকদুরে তার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

লর্ড কারমাইকেলের মৃত্যু উপলক্ষে বিলাতের এক শ্রেণীর লোক বলিতেছেন, যদি মানুষের কবর খোঁড়ার ফল প্রেতাত্মার অভিশাপে লর্ড কারমাইকেলের অকালমৃত্যু হইল। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস রচয়িত্রী মিস্ মেরী করেলীরও এরূপ মত। আমার অনেকে এই মন্তব্য হাসির উড়াইয়া দিতেছেন। মোটের উপর কবর খোঁড়ার কাজ বন্ধ হইবে না—বেশ চলিতেছে চলিবে।

তোদের জন্যে নয়।

"কেন বাবা ওখানে যে লেখা রয়েছে—স্বাগতঃ"

"নি——কা——লো!"

চিত্রাধিকারী—শ্রীযুক্ত অবিনাশ সরকার বি-এ।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা।

১ম বর্ষ] ৮ই বৈশাখ শনিবার ১৩৩০, ইং ২১শে এপ্রিল। [৩৮শ সংখ্যা

আলোচনা

বর্ষ আসে বর্ষ যায়। তেমনি ভাবে দেশের উপর দিয়া ১৩২৯ সাল চলিয়া গিয়াছে—১৩৩০ সাল আসিয়াছে। এক একটা বর্ষ যাইতেছে,—আর আমাদের চির বাঁচিয়া থাকিবার দুর্ভাবনায় আরও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। অভাব অনাটন আশাহীনতা আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। ক্রমেই যেন তাহার বাঁধন চাপ আরও বেশী অনুভূত হইতেছে। অথচ এ সমস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আমরা নব বর্ষের আনন্দ যে কি করিয়া লাভ করিব তাহাও জানি না। আশা আনন্দের কোন কিছু আমাদের সম্মুখে আসিলেও আমাদের দুর্ভাগ্য দেখিয়া তাহারা উপহাস করিয়া দূরে চলিয়া যায়। ইহারই মধ্য দিয়া আমরা পুরাতনকে বিদায় দিয়া কালবশে নূতনকে বরণ করিলাম।

ভারত ভারতীয়দিগের জন্যই। উচ্চ নীচ, ছোট বড়, সকল ভারতবাসীকেই ভারতবাসীরা যদি ভাই বলিয়া গ্রহণ না করে যদি তাহারা নিজের নিজের মধ্যেই আত্ম কলহ করিয়া বড় বনিতে যায় তবে তাহাদের বড় হওয়া তো দূরের কথা বাঁচিয়া থাকাও সম্ভব হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা; এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?.....তুমিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি, মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই।' হে বীর সাহস অবলম্বন কর,—সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল,—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া

বল,—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ .....আর বল দিন রাত হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর—আমায় আবার মানুষ কর।' আজ মানুষ হইবার সাধনাই ভারতবাসীর সব চেয়ে বড় সাধনা হওয়া উচিত। মহাত্মা গান্ধীও এই কথা বলিয়াছেন। অথচ আমরা আজ একই মায়ের সন্তান হিন্দু মুসলমানে, উচ্চ নীচে, অনাবশ্যক ভেদাভেদ সৃষ্টি করিয়া অনর্থক গণ্ডগোল কেন করি!

• • • •

একদিকে আবিসিনিয়ার বাদের অসহ্য অপমানের স্মৃতি ভারতবাসীর অন্তরে ভীষণভাবে জ্বলিতেছে—অপর দিকে সম অপমান ভোগী ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবাদের ঝঞ্ঝার এই সপ্তাহেই আরো বিশেষ ভাবে ফুট হইয়া উঠিয়াছে। লজ্জা, গ্লানি ও হীনতার দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভারতীয় হিন্দু মুসলমান সমাজ একযোগে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এ চেষ্টার মধ্যেও আজ বিক্ষোভ আরম্ভ হইয়াছে। মহাত্মা বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই—একযোগে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে জানিনা তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা। এ কথা যে অতি সত্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতীয় হিন্দু মুসলমানে, হিন্দুতে হিন্দুতে ও মুসলমানে মুসলমানে সদ্ভাব নাই বলিয়াই ভারতীয়দিগের উপর অপরাপর বিদেশীরেরা আসিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়া নির্ব্বিবাদে প্রভুত্ব করিতেছে। মত ধারণ করিয়া ভারতীয়দিগের মত মুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছে। যুগ যুগের এই সাধনা, অপমানে আমরা নিজেদের উন্নত করিবার শিক্ষা তো পাইলামই না—বরঞ্চ আরও ঘৃণিত ও অপমানিত লাঞ্ছিত হইবার শিক্ষা পাইয়াছি—আমাদের কার্য্যে অন্ততঃ তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। আবিসিনিয়ার বাদ, কাফের ভায়ার,ও ভায়ারের হাতিক লজ্জার অপযশ যদি ভারতীয়ের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় দুর্ব্বিসহ বেদনরূপ বাজিতে থাকে তবে ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের এ সময়ে এই অসদ্ভাব, দাঙ্গা হাঙ্গামা আমাদের হৃদয়ে ও বিশ্ববাসীর হৃদয়ে কি ভাবে বাজিতে পারে? নিজেদের দৌর্ব্বল্য, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা প্রকাশ করিয়া পদে পদে আমরা নিজেদের অযোগ্যতা ও নীচতারই পরিচয় দিতেছি। দেশের সন্তানদের নিজেদের মধ্যে এই বিক্ষোভ দেখিয়া শত্রু হাসিতেছে ও এই সুযোগে নিজেদের সুবিধা করিয়া লইতেছে—আর আমরা ভারতীয় হিন্দু মুসলমানেরা তুচ্ছ কণিক ক্ষুদ্র স্বার্থে মুগ্ধ হইয়া কাকের মাংস কাকে খাইয়া আনন্দে নাচিতেছি! জাতির জীবন ও দেশের জীবন আর কতদূর অধঃপতনের পঙ্ক সীমায় নামিবে! শেষ কি ইহার নাই!

• • • •

হিন্দু পরজাতিকে বা জাতিচ্যুতকে কোন দিন নিজ সমাজে আশ্রয় দেয় নাই। এই সুযোগ লইয়া মুসলমান বহু হিন্দুকে এতাবৎকাল মুসলমান করিয়াছে—খৃষ্টানেরাও বহু হিন্দু ও মুসলমানকে খৃষ্টান করিয়া লইয়াছে। এ ভাবে মুসলমানের সংখ্যা ও খৃষ্টানের সংখ্যা যে দিনে দিনে দেশে কত বাড়িতেছে তাহার সংখ্যা নাই। আজ যদি হিন্দু সেই জাতিচ্যুত হিন্দুদের হিন্দু সমাজে লইতে চাহে এবং হিন্দু সমাজ হইতে পতিত জাতিরাও যদি তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আবার হিন্দু সমাজভুক্ত হইতে চাহে তবে কি সে বড় দোষের কথা হইবে! মুসলমানদেরই বা ইহাতে রাগ করিবার কি কারণ থাকিতে পারে! অন্তরের মিল না থাকিলেই এ সব তুচ্ছ বিবাদ বিসম্বাদের আশ্রয় লইয়া সময় কাটাইতে হয়। জাতির সংগ্রামের প্রবৃত্তি যখন উচ্চ কোনরূপ কার্য্যে নিয়োজিত করিবার পথ রুদ্ধ হইয়া যায় তখনি তাহারা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিয়া সেই প্রবৃত্তি বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। এই ভাবেই ভারতীয় হিন্দু মুসলমানেরা নিজেরা দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া মাথা কাটাকাটি করিয়া নিজেদের শক্তি হারাইতেছে। আর তাহাদের বিবাদ মিটাইবার জন্য ইংরেজেরাই কামান বন্দুক লইয়া তাহাদের মধ্যে পড়িয়া শান্তি স্থাপন করিতেছে। অথচ ভারতীয় হিন্দু মুসলমান উভয়েই স্বরাজ চাহিতেছে—উভয়েই প্রাণের মিলন চাহিতেছে। কিন্তু আমরা ভারতেরই সন্তান হিন্দু মুসলমান কি ভাবে নিজেদের প্রচেষ্টাকে যে ব্যর্থ করিতেছি তাহা বুঝিতেছি

না। বোধ শক্তি আমাদের লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মানুষ আর আমরা নাই।

• • • •

মহাত্মা গান্ধীজীর হৃদয় ও মস্তিষ্কের সহিত তিনি মিলাইয়া লইয়াছিলেন, মৌলানা মহম্মদ আলী মৌকত আলীর সাহস, বাহুবল। ইসলাম মোহাম্মদী দিয়াছিলেন তাহাতে শ্রদ্ধার প্রীতি বারি। হিন্দু মুসলমান মিলনে, প্রাণের বন্ধনে একটা বিশাল ভারতীয় জাতির অভ্যুদয় হইতেছিল। আজ দেশের জন্য—দেশের সন্তান হিন্দু মুসলমানদের মুখ চাহিয়া তাঁহারা কারাগারে পচিতেছেন —আর আমরা হিন্দু মুসলমান ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করিয়া সেই সব পুণ্যাত্মাদের আরব্ধ কার্য্য সমাপন করিতেছি!

• • • •

ভারতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে 'প্রবাসী' লিখিতেছেন—ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ১·৩ অর্থাৎ হাজারে সাড়ে দশজন, দশহাজারে ১০৫ জন লিখিতে পড়িতে পারে; পুরুষদের মধ্যে হাজারে ১০৫·৬ এবং অমৃতে ১০৫৬ জন লিখিতে পড়িতে পারে। কোম্পানীর আমলে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ এ দেশে সরকারী ব্যয়ে শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই; তার পর সামান্য ভাবে করেন—প্রথমতঃ তিনটি উদ্দেশ্য, (১) কর্ম্মচারী পাইবার জন্য, (২) বিলাতী রুচি জন্মাইয়া বিলাতী জিনিষের কাটতি বাড়াইবার জন্য, (৩) খৃষ্টানের সংখ্যা বাড়াইয়া রাজত্বের ও বাণিজ্যের ভিত্তি বিস্তৃত ও দৃঢ় করিবার নিমিত্ত।...কোম্পানীর আমল হইতে এখন পর্য্যন্ত ইংরেজদের বরাবরই ভয় আছে, যে, ভাল ও বেশী শিক্ষা পাইলে ভারতীয়দের চোখ খুলিতে পারে এবং তাহারা পরাধীনতায় অসন্তুষ্ট হইয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে পারে। শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে কৈজো ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিলে ইংলণ্ডের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষতি হইতে পারে, এই ভয় ও আছে। এই সব কারণে ভারতবর্ষে শিক্ষার সুবিস্তৃত ও উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত এ পর্য্যন্ত হয় নাই।' অন্যান্য দেশের শিক্ষা ব্যয়ের সঙ্গে বঙ্গের শিক্ষা ব্যয়ের তুলনায় প্রবাসী বলিতেছেন 'জাপানের শিক্ষার ব্যয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষার ব্যয়ের তুলনা করিবার পূর্ব্বে বিলাতের খরচের সঙ্গে বঙ্গের খরচের তুলনা করা যাক্। বঙ্গের সহিত তুলনা করিবার কারণ এই, যে, বাঙ্গলার লোক সংখ্যা ৪৫৪৮০৭৭ এবং গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের লোক সংখ্যা ৪৬১০০০০০—প্রায় সমান। বাংলা দেশে ১৯২৩-২৪ সালে দেশী লোকের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট এক কোটী টাকার কিছু বেশী খরচ করিবেন। বিলাতে গবর্ণমেণ্ট তিরাশী কোটী টাকার উপর বরাদ্দ করেন। এই তুলনায় কথা উঠিবে, যে, বিলাত পাশ্চাত্য ধনী দেশ তাহার সঙ্গে বাংলার তুলনা করা অন্যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিলাত ধনী হইল কেমন করিয়া? পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব বলিয়াছিলেন, যে, মুর্শিদাবাদ লণ্ডনের চেয়ে ধনশালী সহর। কেমন করিয়া বাংলায় ধন বিপর্য্যয় ঘটিল; সকলে ভাবিয়া দেখুন ও প্রতিকারের চেষ্টা করুন।'

• • • •

বিশ্ব বিদ্যালয়ের ব্যয় প্রতিবাদ প্রসঙ্গে প্রবাসী আরও অনেক কথার মধ্যে বলিয়াছেন 'ভাইস্-চ্যান্সেলারের কাজ সম্মানের পদ, এবং আশুবাবু নিজের বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম ও কৌশল দ্বারা এই পদকে বহুলোকের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তারের উপায়ে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা চাকরী নহে, ইহা অবৈতনিক কাজ; ইহাতে অনেক শক্তি ও সময় ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে বলিতেই হইবে, যে, গবর্ণমেণ্ট আশুবাবুকে এই পদ দিয়া ততটা বাধিত করেন নাই; আশুবাবু এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরিশ্রম করিয়া যতটা বাধিত করিয়াছেন।...আশুবাবু ও তাঁহার দলের অনেকে যে বিশ্ব বিদ্যালয়ের সমালোচকদের এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও রথীন্দ্রনাথ বসুর বিলম্বের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির কুব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা সত্য কথা।...আশুবাবু যখনে প্রবন্ধ লিখিয়া কোন কাগজে প্রকাশার্থ পাঠান নাই, তিনি যখনে কোন কাগজের সম্পাদক সহকারী সম্পাদক বা লেখককে চিঠি লিখিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন ও গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা করিতে অনুরোধ করেন নাই, একথা বিশ্বাসের অযোগ্য নহে।

কিন্তু ইহাও খাঁটি সত্য কথা, যে, তাঁহার মনের মত কথা, এবং তাঁহার পক্ষের তথ্য ভাব ভঙ্গী ও যুক্তিতে পূর্ণ অনেক লেখা তাঁহার সহচর ও অনুচরেরা অনেকে বাংলা ও ইংরেজী কাগজে ছাপাইয়াছেন।...আশুবাবু তাঁহার জবাবে অনেক স্পষ্ট কথা সাহসের সহিত বলিয়া ভালই করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আত্ম শ্লাঘা না থাকিলে ভাল হইত। এবং সেই আত্ম শ্লাঘার মাত্রাটাও বেশী।... ছেলে ছোকরারা সার্টিফিকেট উদ্ধৃত করে। বিজ্ঞাপনেও তাহা চলে। কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলারের পক্ষে ইহা অশোভন।...স্যার আশুতোষ 'পক্ষপাত শূন্য সর্ব্ব-সাধারণের রায়' 'The judgement of an impartial public' আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিতে রাজী আছেন বলিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এরূপ সর্ব্বসাধারণ এযেশে নাই। বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে; এবং তাহার কারণও কতকটা তিনি ও তাঁহার সহচর অনুচরেরা।'

• • • •

স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জোর গলায় বক্তৃতা দিয়াছেন এ সম্বন্ধে প্রবাসী বলিতেছেন,—'সর্ব্বসাধারণের মনে (স্যার আশুতোষ) এই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে তিনি বরাবর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ও নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, কখনো গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুবর্ত্তিতা করেন নাই, এবং এই হেতু লিটন তাঁহাকে তাহা করিতে বলায় তাঁহার ক্রোধ হইয়াছে। অতএব জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, লর্ড কার্জনের বিশ্ব-বিদ্যালয় আইন সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা কিরূপ করিয়াছিলেন এবং ভোট কিরূপ দিয়াছিলেন। একই রকম কি? রিজলী সাহেব যখন লাটী হন, তখন তিনি উহা প্রয়োগ করিয়া গবর্ণ-মেণ্টের হুকানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন কিনা?

• • • •

স্যার আশুতোষের চিঠিগুলি কিরূপ সাহসের পরিচায়ক তাহার মাত্রা নিরূপণ করিতে গিয়া প্রবাসী বলেন 'অনেকের মনে এমন ভয়ও আছে যে, লাট-সাহেবকে কেন, যে কোন একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীকে কিছু স্পষ্ট বা কড়া কথা বলিলেই, তাহা সিডিশন, রাজদ্রোহ বা এইরূপ একটা কিছু বে-আইনী দণ্ডনীয় কাজ হইবে। আইনজ্ঞ আশুবাবু জানেন, বিশ্ব-বিদ্যালয় ঘটিত কোন ব্যাপার লইয়া চ্যান্সেলার-রূপী লাট সাহেবকে তিনি ভাইস চ্যান্সেলার রূপে কিছু কড়া কথা শুনাইলেও তাহা পেন্যালকোডের কোন ধারার মধ্যে আসিবে না; সুতরাং তিনি এই অমূলক ভয়ে ভীত হন নাই। ইহার জন্য তারিফ তাঁহার প্রাপ্য পাওনা। তবে যে অত্যুক্তি পরায়ণ লোকেরা বলিতেছেন, ভারতে এমন সাহসের চিঠি আর কেহ কখনো লেখেন নাই, সেটা ভুল বা তাঁহাদের বিস্মৃতির ফল, কিম্বা আর কোন কারণে ঘটিয়াছে।...কোন কোন খবরের কাগজে এমন কথাও লিখিত হইয়াছে যাহাতে মনে হয়, যে, শুধু চিঠি নয়, ভারতে বা বাংলা দেশে কেহ কখন অন্যপ্রকার এমন কোন লেখাও প্রকাশ করেন নাই, যাহাতে আশুবাবুর মত সাহস দেখা গিয়াছে। ইহা ভুল।...কোন কোন কাগজে এমন কথাও বাহির হইয়াছে, যাহাতে এই বুঝায় যে, সাহস দেখাইয়া 'ভীরু' বাঙ্গালী জাতিকে আশুবাবু গৌরবান্বিত করিয়াছেন যেন ইতিপূর্ব্বে আর কেহ কখন কোন রকম সাহস দেখায় নাই। ইহা ভুল।' যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রবাসী এই ভুলগুলি দেখাইয়া দিয়াছেন।

• • • •

প্রবাসীর বিশ্ববিদ্যালয় বিক্ষোভ সম্বন্ধীয় আলোচনা আমরা অনেকটা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কারণ এই সাময়িক বিক্ষোভ সম্বন্ধীয় এতটা কার্য্যকরী মূলগত আলোচনা কোন ইংরেজী বা বাংলা কাগজে ইতিমধ্যে হয় নাই। শুধু অর্থহীন বাহবা রীতিই চলিয়াছে। কোন একটা বিষয় মোটেই তলাইয়া না বুঝিয়া উপর চপকা গাহিয়া সাময়িক উত্তেজনায় ইন্ধন জোগান যায় কিন্তু সে উপর চপকায় কোন কার্য্যকরী ফল হয় না। জনসাধারণকেও এই সব ব্যাপারে সম্যক সত্যাসত্য নিরূপণের সুযোগ দেওয়া হয় না। আমাদের মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষীয় দু'দলের এই সংঘর্ষ সময়ে যদি দেশের সংবাদপত্র ও জনসাধারণ বিষয়টি লইয়া তলাইয়া আলোচনা করেন তবে দেশের শিক্ষা

নীতি অনেকটা যেমোপযোগীরূপে পরিবর্তিত হইতে পারে। তবুও ছাড়া আমাদের দেশের লোকেও দেশের লোককে কি কোন প্রতিষ্ঠানকে এ পর্য্যন্ত বিশ্বাসের চোখে দেখিতে শেখে নাই। তাই পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এ পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু এখন তবুও যাহা রহিয়াছে ও দেশের অর্থেই যাহা অনেকাংশে পুষ্ট হইতেছে তাহা অন্ততঃ কতকটা যদি দেশ কালোপযোগী করিয়া দেওয়া যায়, তাহাতে বাধা কি? অবশ্য ইহা আশা মাত্র, কোন দিন সম্ভব হইবে কি না জানি না। কারণ ভারত শাসন ব্যাপার এখন অনেকাংশে এই শিক্ষা ও আইনের উপর দিয়াই চলিতেছে। দেশের জনসাধারণ ইহার কুফলে যত ভুগিতেছে, আমার দেশের ব্যক্তিগত স্বার্থ ইহার সঙ্গে সেই পরিমাণেই জড়িত রহিয়াছে। তাই ইহার প্রভাব হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিতেছি না। তাই আজ দেশবাসী হয় ইহার সংস্কার নয় ইহা হইতে মুক্তি চাহিবেই।

• • • •

দেশের শিক্ষা-নীতি ও পদ্ধতির দোষের কথা বলিলেই যে তাঁহাকে পাশ্চাত্য ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি ঘৃণা করিতে হইবে ইহা মনে করা একান্ত ভুল। যুগ যুগান্তের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও চিন্তা রাশির সহিত আমরা পরিচিত হইতে পারি শিক্ষার মধ্য দিয়াই। শিক্ষায় মানুষকে মনুষ্যত্ব দেয়, তাহাকে কর্ম্মক্ষম হইয়া সংসারে চলিবার যোগ্যতা দেয়। জ্ঞান অজ্ঞার বিচার বুদ্ধি দেয়। আর শিক্ষার নামে যদি কোথাও মানুষকে অমানুষ ও অকর্ম্মা করিবারই কিছু দেখান হয় তবে সেই প্রথার বিদ্বেষী জনকে শিক্ষা বিদ্বেষী মনে করাও একটা মস্ত বড় ভুল।

সবাই বলে ছাড় ছাড়—ছাড়তে কিন্তু পারা যায়?

—Halladay in the Providence *Journal*.

ত্রাণ-তুর্য্য।

—Morris for the George Matthew Adams Service.

ছবি

[শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

পটের রঙীন ছবি ভুবেছে কালের কোলে,
খুঁজে তারে পাবে না ধরায়;—
প্রাণের পিয়াসা দিয়ে এঁকেছি হৃদয়ে যে ছবি—
কেমনে ভুলিব বল তায়?

পটের সে ছবিখানি হাতের আঁকা যে শুধু,
প্রেম বিনে প্রাণহীন হায়,
অমর প্রেমের তুলি এঁকেছে হৃদে যে ছবি—
হরিতে পারে না কাল তায়।

বিদেশের স্মৃতি।

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল]

Govt Agricultural Institute ছাড়াইয়া চলিলাম। গোদাবরী উপত্যকায় আসিয়াছি, তাই পাহাড় নাই। তাল গাছ বনের মত হইয়া উঠিয়াছে। মাথায় তালের পাতার ঝুড়িতে বোঝা লইয়া মেয়েরা যাইতেছে। আধ হাত চওড়া লাল ছোপান পাড় শাড়ী, কাল চেহারার উপর মানাইয়াছে মন্দ নয়।

Bicca rol ষ্টেশনে আর একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। আমাদের খানা আসিবামাত্র বহু লোক ছুটিয়া আসিল। মেয়েদের কালো রংএর মধ্যে সাদা সাদা দাঁত গুলি বিদ্যুতের মত চমকাইতেছে।

Rajmahendry প্রকাণ্ড ষ্টেশন। নামিয়া কয়েকটি "আবটি পাণ্ডু" (কলা) কিনিলাম। ফিরিয়াদেখি একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক উঠিয়া বসিয়াছেন। আমাকে উঠিতে দেখিয়া তিনি একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, আমি হাত দিয়া বসিতে সঙ্কেত করাতে "yes sir" বলিয়া বসিলেন। ষ্টেশ ছাড়িয়া দিলে কোন প্রকারে আগন্তুকের সহিত বাক্যালাপ চলিল। ইনি ব্রাহ্মণ, ২।৪টী ইংরাজী কথা জানেন। War News জানিতে চাহিলেন এবং বলিলেন যে বাঙ্গালিরা নাকি অতি বুদ্ধিমান ও ধনবান। ইনি Reform সম্বন্ধে কোন খবরই রাখেন না। বলিলেন যে, কয়েক দিন হইল Non-Brahminগণ একটী সভা করিয়াছেন কিন্তু কেন সভা হইয়াছে তাহা তিনি জানেন না। লোকটি বেশ সরল, আমার ভাষাজ্ঞান থাকিলে অনেক বিষয় জানিতে পারিতাম। তিনি তবুও ২।৪টী ইংরাজী শব্দ জানেন, আমার তো তেলেগুর সম্বল ঐ "কচরি কাম্বা" ও "পাণ্ডু"। কাযে কাযেই "ইবি" দিয়া নিরস্ত হইলাম।

এখনই গোদাবরীর বিশাল সেতু দেখিতে পাইব আশা করিতেছি। আসানি হইল না। রাত্রে Bezwada পৌঁছিব। সে পর্য্যন্ত আনাহার দুই-ই মুলতবী থাকিল। Godavari ষ্টেশনে মাদ্রাজী ভদ্রলোকটী নামিয়া গেলেন। এ একটী সহর, একটী কলেজ ও অনেকগুলি Rice mills আছে। একটী ভদ্রলোক উঠিলেন, সঙ্গে একটী পাতার ঝুড়ি বোঝাই লঙ্কা!

এখান হইতেই সহরে যাওয়া সুবিধা। রঙ্গিল শাড়ী পরিয়া কাজল চোখে কয়েকটী মেয়ে পাশ দিয়া চলিয়া গেল। সৌখিনী না হইলেও বেশ লাবণ্যবতী। একটী বৃদ্ধা পাশের কামরায় কয়েকটী "চন্দ্রমল্লিকা" ফুল ও এক রকম শাকের মত কি যেন বেচিয়া গেল। ইহা কোন্ কাজে লাগিবে ভাবিয়া পাইলাম না।

প্রায়ই ফার্ণ ছাড়াইয়াই bridge আরম্ভ। বিশাল নদীর নীল জল দিয়ে। নৌকাগুলি পাল খাটাইয়া চলিতেছে। মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চড়া। দূরে পাহাড় দেখা যাইতেছে। ট্রেণ বেগে চলিতেছে, তথাপি নদী পার হইতে ৭½ মিনিট লাগিল। এত বড় সেতু বোধ হয় 'সোনব্রিজ' ব্যতীত ভারতবর্ষে আর নাই।

অন্যমনস্ক ভাবে নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি। বেলা প্রায় ৪টা, সমস্ত দিন আনাহার হয় নাই বলিলেই হয়।

Ellore Stationএ এক কাপ চা পান করিয়া ক্লান্ত শরীরে শুইয়া পড়িলাম। নিদ্রাভঙ্গে দেখি ট্রেণের গতি কমিয়া গিয়াছে। খুব নিকটে পাহাড় দেখা যাইতেছে। একটু পরেই এক প্রকাণ্ড ষ্টেশনে গাড়ী থামিল, Bezwadaতে আসিয়াছে। বেজোয়াড়া বিজয় গড়ের অপভ্রংশ। একাণ্ড Railway Yard-এখান হইতে Nizam's Guaran teed Railway হায়দ্রাবাদে গিয়াছে। মুটের মাথায় মাল দিয়া সকলে একত্রে একটী ছত্রম্ এ যাওয়া গেল। ছত্রটী প্রকাণ্ড কিন্তু ন স্থানং তিল ধারণং। - অগত্যা বারান্দায় মাল পত্র নামাইয়া মেয়েদের বসাইয়া ম্যানেজার বা রক্ষীদের সন্ধানে গেলাম। আহারের কোন জিনিষই মিলিল না, তখন উদরে চন্দ্রালোকে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। এখানকার দৃশ্যাবলী অতি সুন্দর, তিন দিকেই নাতি উচ্চ শৈল মালা। একেবারে পাহাড়ের কোলেই সহর। রাস্তা হইতেই পাহাড় সোজা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। বাড়ীগুলি শ্রেণীবদ্ধ ও রাস্তা বেশ প্রশস্ত।

বাসায় ফিরিয়া দেখি যে গৃহ রক্ষক আমাদের বড়ো আরবী বিবেচনা করিয়া একটী ঘর খালি করিয়া আমাদের মাল পত্র তাহাতে উঠাইতেছে। দরজার পাশে যাহারা শুইয়াছিল, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে! দারবান আসিয়া আজ্ঞা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। দুধ আনিতে দিলাম। কিন্তু গরম দুধ বিধবারা খাইবেন না সুতরাং আমরা উভয়ে আবার বাহির হইলাম এবং চেষ্টা করিয়া ৵০ দুধ জোটাইলাম। বাসায় ফিরিয়া দেখি ভাত, ঘি, ডাল, আলু কাঁচকলা সিদ্ধ ও দুধ প্রস্তুত। সমস্ত দিন অনাহারের পরও এই হিন্দু রমণীগণ অম্লান বদনে আমাদের জন্য খাটিতেছেন, জগতের আর কোথাও বোধ হয় এই দৃষ্টান্ত মিলিবে না। তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম।

১১—১২ কুলি আসিয়া উপস্থিত। মাল পত্র লইয়া

ষ্টেশনে আসিলাম। আমি মেলে যাইয়া স্থান স্থির করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে অপেক্ষা করিব তখন ইঁহারা যাইয়া উপস্থিত হইবেন এইরূপ স্থির ছিল। ষ্টেশনে আসিয়া দেখি মেল এক ঘণ্টার উপর লেট্। বিছানার উপর বসিয়া রহিলাম। বড়ই ঘুম পাইতে লাগিল।

অবশেষে ট্রেণ আসিয়া পড়িল। আজ সাহেবী ঘুচিয়াছে। কোনরূপে একটী কামরায় ঢুকিয়া মাল পত্রও তুলিলাম। বসাইবারও স্থান নাই দুইটী মেমও মেলে ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াও আর Chivalry দেখাইবার ইচ্ছা হইল না—চাচা আপন "বাঁচা"। তাঁহারা অবশেষে বাধ্য হইয়া নামিয়া গেলেন। সমস্তের সুবিধার জন্য punkaa তিনটী খাড়া করা আছে। ব্যায়াম চর্চ্চার অভ্যাস ছিল সুতরাং আমি কোন প্রকারে তেতলায় উঠিয়া চৌদ্দ পোয়া না হউক অন্তত বার পোয়া হইলাম।

প্রভাতে উঠিয়া আর একটী বাঙ্গালীকে কামরায় দেখিলাম। তিনি তাঁহার বিধবা খুল্লতাত পত্নীকে লইয়া ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে যাইতেছেন। ভদ্র লোকটীকে ছেলে মানুষ বলিলেই হয়। তিনি মাদ্রাজে কোথায় উঠিবেন তাহাও জানেন না। তাঁহাকে ভরসা দিয়া বলিলাম যে একটা উপায় করাই যাইবে। একটী ছোট নদী পার হইয়া ট্রেণ 'মেলোর' ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। চা পাওয়া গেল না, কফি আছে। কামরায় একটী মুসলমান ছিলেন তিনি অতিশয় ভদ্র। তিনি এই অসহায় যুবকটীকে বিশেষ সাহায্য করিয়া সঙ্গে আনিতেছিলেন। দূরে পাহাড় দেখা যাইতেছে। আর সেই একই বৃক্ষ।

৮ই ডিসেম্বর—মুসলমান ভদ্র লোকটী বিশেষ শিক্ষিত নন, কিন্তু তিনি সরল হিন্দিতে আত্মিতেহ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সমস্ত গভীর কথা বলিলেন তাহা বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে শতকরা ৯০ জন বোধ হয় জানেন না।

অল্প সময়ের মধ্যেই যাত্রীদের সহিত আলাপ হইয়া গেল। আমি একজন বড়দরের ভ্রমণকারি বলিয়া সকলেই আমাকে খাতির করিতে লাগিলেন। ট্রেণ বালিকট হ্রদের পাশ দিয়া চলিতেছে। এ দ্বিতীয় চিল্কা—শুধু পাহাড়ের অভাব। নারিকেল গাছ ও ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়া 'বেসিনব্রিজ' ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ থামিল। এটী মাদ্রাজের 'শিলদা'। একটী লোক আসিয়া টিকেটগুলি লইয়া গেল। ট্রেণ পুনরায় ছাড়িয়া দিয়া একেবারে মাদ্রাজ সেণ্ট্রালে আসিয়া থামিল। আমাকে Egmore station হইতে আবার উঠিতে হইবে সুতরাং যে বাঙ্গালী যুবকটীর সহিত ট্রেণে আলাপ হইয়াছিল তাহাকে সঙ্গে রাখিলাম। কুলীর দৌরাত্ম্য দেখিয়া গাড়োয়ানেরও দৌরাত্ম্য হইবে বুঝিয়া কি একটী কোম্পানী হইতে ১৷০ নগদ দিয়া একখানা টিকেট কিনিলাম। অমনি একখানা ব্রহাম গাড়ীতে আমাদের মাল পত্র উঠিল এবং আর বাক্যব্যয় না করিয়া আমরা সেই গাড়ীতে উঠিয়া ষ্টেশনের অনতি দূরবর্ত্তী একটী বড় হুদে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম ঘর খালি নাই। অবশেষে ম্যানেজারকে ধমকাইয়া দুখানা ছোট ঘর পাইলাম। দেখি একটী বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা বসিয়া আছেন। পরিচয় হইলে জানিলাম তাঁহার কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্ দর্শন করিয়া ফিরিতেছেন। আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহারা আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। একজন আসিয়া বলিলেন "বাবা তুমি বামুনের ছেলে তুমি না খেলে আমার ছেলে খাবে না" বলিতে বলিতেই ছেলে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত এ যে আমার বন্ধু ——'ক' বাবু। মালাপাধির পর স্নান করিয়া বেশ তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করিলাম। দৈব না মানিয়া আর উপায় নাই। কে জানিত যে এখানে এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে ভোজনের ব্যবস্থা হইবে।

আহারান্তে পূর্ব্বোক্ত যুবক—'ক' বাবুর সহিত Egmore station এ যাইয়া শুনিলাম যে রামেশ্বরম্ অথবা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে যাইবার নিমিত্ত Ceylone Boat Mail এ কাল অথবা পরশ্বও ক্লাসের কোন টিকিট আজ অথবা কাল মিলিবে না। কাল থার্ড ক্লাসের টিকিট মিলিলেও মিলিতে পারে। এখানকার নাকি নিয়ম এই যে ট্রেণে যে পরিমাণ যাত্রী লইতে পারে তাহার অতিরিক্ত টিকিট বিক্রয় হয় না। সুতরাং কাল সকাল বেলা ৮টার সময় আসিয়া টিকিট কিনিতে হইবে। 'ক'—বাবু টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহার ভগিনীপতিকে জানাইলেন যে এক দিন পরে রওনা হইবেন। জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম যে টেলিগ্রাম অফিস প্রায় ½ মাইল কিন্তু হাঁটিয়া দেখিলাম ১ মাইলের উপর। ইহাদের দূরত্বের জ্ঞান এইরূপই। কদাচিৎ ২।১ জন ইংরাজী জানা লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা না পাইলে কি যে 'এত, দেও' বলে তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। প্রখর রৌদ্রে আর হাঁটিতে পারিতেছিলাম না। সেণ্ট্রাল ষ্টেশন ১ মাইলের কম কিন্তু rickshaw ১৲ ভাড়া চাহিল! যাওয়া হইল না। অবশেষে একখানা ট্রাম গাড়ী ষ্টেশন যাইতেছে শুনিয়া তাহাতেই উঠিয়া বসিলাম। ভাড়া ।১০ মাত্র। এখানে দূরত্ব হিসাবে ।১০ /০ /১০ ৵০ ও ৵১০ ভাড়া দিতে হয়। একটী কম্পার্টমেণ্ট reserved for ladies আছে।

অর্দ্ধেন্দু-নাট্য-পাঠাগার

(১৫এ বিডন ষ্ট্রীটে স্থাপিত)

(পরিদর্শক-মন্তব্য-লিপি হইতে)

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

আমরা সখের থিয়েটার দেখি, দেখে আসের পাই, কিন্তু অতটা বন্ধুবান্ধব-মহলে প্রকাশ্যে তার আলোচনাও করে থাকি ; তখন মনে হয় কোন কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীর উপর সহানুভূতি আমরা অন্যায় করি। থিয়েটারে অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের যে "সাহায্য রজনী" হয় তাতে আমরা অভিনয় দেখতে গিয়ে তাঁদের "সাহায্য" করে আসি, তাদের মুখে প্রশংসা বা সম্মান দেখাই। আসলে, কিন্তু তা হয় না, খুব বড় অভিনেতার "সাহায্য রজনীতে" প্রোগ্রামে যদি খুব জোর না থাকে, তা হ'লে সম্মান বা প্রশংসা কোথাও না দিয়েই আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। ঠিক এই অবস্থা আমাদের বলেই একজন এবং একজন অভিনেতা, একটুখানি চুড়ান্ত পূর্ত্তি মন্দির স্থাপিত হ'লেও বাড়ল না, পুরে পাওয়া শিশুর মত পাওনা ভাগ্যে হয়ে গেল।

সাধারণ রেস্তোরাঁয় এই, সেখানে খুচরোয় অভিনেতা বা অভিনেত্রীরা অথবা রঙ্গমঞ্চ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণও যে কিছু করে উঠতে পারেননি, যা করেননি তা দেখে আমি আশ্চর্য্য হইনি। ঠিক এমনিই আশা করেছিলাম, দেখলাম, ঠিক তাই। যাঁরা থিয়েটার চালিয়ে জীবিকা অর্জ্জন করছেন, রঙ্গমঞ্চের রাজপথে সাড়ী ছোটাচ্ছেন, তাঁরা থিয়েটারের এমন একজন সম্রাটের পুরুষের মূর্ত্তি মন্দির স্থাপন করে কেমন করে যে নিজের বিবেককেও ঠকিয়ে চলেছেন, তা বুঝিনে। রঙ্গমঞ্চ আজ তাঁদের সৌভাগ্যের আসর হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু সে সৌভাগ্যের সূচনা করে দিয়েছিল আর। যদি কোন অঘটন ঘটে অমরেন্দ্র এ তাঁদের মাঝখানে আকাশ থেকে খসে পড়ে যেত, তা হ'লে নিশ্চয় ভুল করতেন। গড়েছিলেন কটি লোক,—অর্দ্ধেন্দু তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুদিনের খুব বাঙ্গালা দেশের থিয়েটার অস্তমিত না হোক, কি যে হলয় ভেঙে পড়েছিল। একজন অন্ততঃ সেই অভাগা অভিনেতার যথোচিত সম্মান দিয়েছেন, নিজে নিজেও বড় হয়েছেন, পাঠাগারকেও বড় করেছেন, —তাঁর কীর্ত্তি অক্ষয় হউক।

অর্দ্ধেন্দুশেখর সাধে জীবন ধারণ জোর করে গেছেন, মহাজনের ঋণ যে বিষে অবধি তাঁর ছিল, সাধারণের এত বড় অভিনেতা শেষ-বিদায় মাত্র, ধন দিয়ে সেই ঋণ, কিন্তু হাতেই রাখিয়ে গেছেন। রঙ্গমঞ্চ ছিল তাঁর প্রাণ, গড়বার মূলে তিনি ততটুকু মূলধন, প্রাণটা ঢেলে করতে, ধরবার ততটুকু জোর। আর্থিক উন্নতি কোনদিনই তাঁর জীবনে আসে নি, তাঁর মনের পাঠাগারটিরও সেদি ঠিক সেই অবস্থা। গিরিশবাবু যে ঋণে গিয়েছিলেন চার পয়সার কড়ি সম্বল ছিল অর্দ্ধেন্দুর, এই পাঠাগারটির সম্বলও প্রায় সেই রকম।

পাঠাগারটির আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর বর্ত্তমান উন্নতির ওপরেও ! অর্দ্ধেন্দু নাট্যশালার জন্য আমরণ যা খেটে যা পারে খেটে গেছেন, তাঁর মৃত্যু-দিনের উদ্যোক্তা যিনি, তিনি আজ বরাবরই বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীদের জন্য যা খেটে যা পারে খেটে যাচ্ছেন ! এই পাঠাগারটি সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীদের সম্পত্তীর খাটুনির সঙ্গে তাঁর ঘাড়ে পড়েছে। খাটুনের তিনি, কারণ খাটাই তাঁর কাজ ! তাঁর জীবন কোন দিনই ভোগের নয়, হবেও না, খেটে খেটেই তাঁকে যেতে হবে। তবে দুঃখ এই, এত খাটুনিরও কিছু হ'বে কি না এই সন্দেহ ! নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মাঝে আমায় বলেন, আর যাই করুন বাঙ্গালা দেশের দ্বারা ধরলতে পারবেন না। আর যদি পারেন ত দুঃখ, তিনি 'অন্ধে' জন্মেছিলেন, 'অন্ধে' খেটেছিলেন, 'অন্ধে' সকল হয়েছেন।

আমি এখানে এসেছিলাম একখানা ছবি তোলাতে। এসে এখানে ঘুরে ঘুরে, ছবিগুলি দেখে। যাঁরা থিয়েটারকে এ দেশের মাটিতে বড় করেছেন, তাঁদের মূর্ত্তিগুলি—যে সব মূর্ত্তি সাধারণতঃ দেখতে পাইনে তাই এখানে রাখা হয়েছে। তাদের বাহির কথা ! সাধারণ যে কেমন হয়েছে তা এই কথা বলতেই বুঝে হবে বোধহয় যে সেই ১২৮৪ সালের রাখা হয়েছে যেন প্রস্তুত কোন থিয়েটার নাটকটি পর্য্যন্ত সংগৃহীত, তবে কোথায় থিয়েটার বলে সাধারণের কালী আসর রাখা হয়ে বেরিয়েছিল,তাও লিখিত হয়েছে। বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের জীবনী, তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার যাহা সম্ভবপর যত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি সংগৃহীত হয়েছে। যা বাঙ্গালা দেশের খুব বড় বড় লাইব্রেরীতেও নেই, এমন যত এই ছোট পাঁচ ফুটের ঘরে এসে জুটেছে।

উদ্যোক্তাদের উৎসাহের অভাবে এর কৃশ অবস্থা ঘুচেছে যা যে তা নয়, ঘুচেছে যা আমাদের। মত সাধারণের কৃপাদৃষ্টির অভাবটা খুব বেশী বলেই। আমার নিজের কথা যদি বলতে হয়, আমি বলতে যে এই মূর্ত্তিমন্দিরটির জন্যে আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যা কুলোয় তাও করতে পারলে আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করবো। আর আমার বিশ্বাস, যাঁরা শক্তিশালী লোক আমাদের দেশে আছেন,তাঁরাও তা করবেনই। অমিনী পণ্ডিত যাঁরা সেই আশাতেই বুক বেঁধে আছেন। তাঁর পরেও যদি কখনো ভোটের ওরে যে বিভিন্ন পঞ্জের ছোটার অভাব দাঁড়ায় করেই।

একটা কথা, এই পাঠাগারটি থেকে যাকুলে মটরেশ্বর অর্দ্ধেন্দু শেখরের মূর্ত্তি বিভিন্ন দেবেন উদ্যম থাকবে, যাঙ্গালা দেশের আর একজন নাট্যানুরাগী জীবন কর্ম্মীর নামও তেমনি অক্ষয় হয়ে থাকবে। দেখে নাটক, নাট্যশালার স্মরণিয়ের মূর্ত্ত ইতিহাস রাখবার চেষ্টা তিনিই প্রথম করেছেন।

বাসন্তী—

পল্লীদৃশ্য।

Lakshmibilas Press, Calcutta.

কয়লা-কুঠির কেলেঙ্কারী

[শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়]

(ক)

শীতকালের রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। উন্মুক্ত পল্লী প্রান্তরের উপর বিরাট অন্ধকার ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। তদুপরি নিদারুণ নদীর জলের হুল্‌হুলানি, আর পাকা ধানের ক্ষেতের এক প্রান্ত হইতে একটা কয়লাকুঠির ইঞ্জিনের শাঁই শাঁই শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

নীল বনের ঘন-বিন্যস্ত পাছপালার মধ্য দিয়া, রাঙা মাটির পাকা রাস্তা ধরিয়া ল্যাখ্‌রা মাঝি হন্ হন্ করিয়া চলিতেছিল। তাহার হাতে একটা পাকা বাঁশের লাঠি, মাথায় বাব্‌রি চুলের উপর একটা গামছা জড়ানো। শীতের কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস মাঝে মাঝে হুহু করিয়া বহিয়া আসিয়া গাছের পাতায় পাতায় শিহরণ জাগাইতেছিল……ল্যাখ্‌রা মাঝি ভাঁড়িতে সাওতাল, তার উপর উগ্র মদিরা সেবনে সমস্ত শরীর গরম হইয়া আছে, তাই শীতের বাতাসটা তাহার খালি গায়ে বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতেছিল বলিয়া বোধ হয় না। পিঠের শিরদাঁড়াটা এক একবার চন্ চন্ করিয়া যখন তাহাকে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল, তখন হাতের লাঠিটা বজ্র মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া সে আরও জোরে রাস্তা হাঁটিতে লাগিল।…

গ্রামে পৌঁছিয়া ল্যাখ্‌রা একেবারে জমিদার বাড়ীর সদর ফটকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিক নিঝুম্। হাঁকিল, বাবু, অ বড়বাবু, ঘরে আছিস্?

অনেক ডাকের পর দরোয়ান বাহির হইয়া আসিল, বলিল,—কোন্ হায়?

—আমি রে আমি। কুঠির ল্যাখ্‌রা মাঝি।

—এত রেতে কি বল্‌ছিস্ মাঝি?

ল্যাখ্‌রা দরোয়ানের নিকট এত সব জবাবদিহি করিতে তো আসে নাই। বলিল—তোর অত সব শুনে কাজ নাই, সে। বাবুকে একবার ডাক্ দেখে। বল্, জোড়-জানকী থেকে ল্যাখ্‌রা সর্দার এসেছে।

এতরাত্রে সর্দার কুঠি হইতে কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছে জানিবার জন্য বাবুকে উঠিতে হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, খাদের ভিতর হয়তো কোন কুলি খুন হইয়াছে, তাই তাড়াতাড়ি গায়ে গরম কাপড় জড়াইয়া বাবু নামিয়া আসিলেন। ল্যাখ্‌রা হাতের লাঠিটা মাটিতে নামাইয়া ফটকের একপাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, বাবুর পায়ের শব্দ পাইয়া সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর না দিয়াই বলিয়া উঠিল,—চল্ বাবু, তোকে একবার এখনি কুঠি যেতে হবেক্।

—কেন বল্ দেখি ল্যাখ্‌রা?…খুন্ টুন্ কিছু—

—না বাবু, খুন্ জখম্ কিছু নয়। সে ভয় করিস্ না, তবু যেতে হবেক্—চল্।

খুন্ জখম্ কিছু হয় নাই শুনিয়া বাবু হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন বটে, কিন্তু এ না-ছোড়-বান্দা সাওতাল যখন যখন ধরিয়া বসিয়াছে, তখন সে তাহাকে লইয়া যাইবেই জানিয়া, তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিয়া বলিলেন, তবে কি জন্যে যেতে হবে বল্?—কা'ল গেলে হবে না?

ল্যাখ্‌রা মিনতির সুরে বলিল, না বাবু, তোর পায়ে ধরছি, চল্। কেনে যেতে হবেক্ বল্‌লে হয়ত' যাবি নাই। তুই ঘাওয়াগাড়ীতে উঠ্, তবে বলব।

এই সাওতাল গোঁয়াগুলিকে রাখিবার জন্য সময় সময় এরূপ বহু অত্যাচার, কয়লাকুঠির মালিকদিগকে সহ্য করিতে হয়, তাই অনন্যোপায় হইয়া বাবু সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন। দরোয়ান লণ্ঠন হাতে নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল,বলিলেন,—ড্রাইভারকে মোটর বের করতে বল,আমি আসি।…তুই ততক্ষণ এইখানে বসে' থাক্ ল্যাখ্‌রা।

ল্যাখ্‌রা একটা তৃপ্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একবার বাবুর মুখের পানে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাইল এবং পরক্ষণেই ফটকের পাশে জড়সড় হইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, হঁ বাবু, তুই যাস—আমি বসে'-রইলম্।

বাবু মোটরে উঠিয়া ল্যাথ্‌রাকে ড্রাইভারের পাশে বসিতে হুকুম করিলেন। সে অতি সঙ্কুচিত ভাবে ধীরে-ধীরে আসনের নীচে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। মোটরে চড়িবার সৌভাগ্য জীবনে তাহার কোনদিনই হয় নাই; আর সেই আশাতীত সৌভাগ্যলাভ করিয়াও সে বেশী কিছু বলিতে পারিল না; মনে-মনেই বলিল,—তোর ঢের্ পয়্‌মাই হোক্ বাবু, তোর দৌলতে জন্মের সাধ হাওয়াগাড়ীতে চাপ্‌লম্।

সেই জমাট অন্ধকারের বুকের ভিতর দুইটা জলন্ত চক্ষু বিস্তারিত করিয়া মোটরগাড়ীখানা অনেকদূর চলিয়া আসিল। এতক্ষণে প্রবল বাতাসের বেগ ল্যাথ্‌রার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইয়া তুলিতেছিল তাই সে মাথার গামছাখানা খুলিয়া গায়ে জড়াইয়া লইল।

বৃষ্টির প্রায় কাছাকাছি আসিয়া বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার বল্ দেখি ল্যাথ্‌রা, কি হয়েছে?

ল্যাথ্‌রা বলিল,—ঠিকাদার জোয়ান্ সিংকে বুঝি থেকে' তেড়ে' দিবি চল্, তা না হ'লে আমরা কেউ তোর কুঠিতে কাজ কর্‌ব নাই। নিজের চোখে সব ভাখ্‌গা কেনে। আমি বল্‌তে লারছি বাবু, আমাকে আর শুধোস্ না।

আম বাগানের পাশে সাওতাল কুলিদের থাকিবার এক নম্বর খাওড়ার নিকট গাড়ীখানা আসিয়া পৌঁছতেই ল্যাথ্‌রা ড্রাইভারকে বলিল, আমাদের খাওড়ার কাছে দাঁড়াবি বাবু।

মোটরখানা ঘচ্ ঘচ্ করিয়া দাঁড়াইবার তালে তালে সে বলিল,—এঁ্যা, এ্যা,—ই, এ—এ—এইখানে।

ল্যাথ্‌রা গাড়ী হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, বাবুকে বলিল,—আয় দেখ্‌লে, আয় বাবু, আমার সব্বনাশ দেখ্‌বি আয়।... ...রাগে ও দুঃখে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

বাবু দেখিলেন, তাহাদের খড়ো ঘরগুলার পাশে যে অপরিসর উঠানটুকু আছে, তাহারই একধারে কতকগুলা কয়লা জ্বালাইয়া, আগুনের চারিপাশে কয়েকজন মাল্‌কাটা সাওতাল কুলি চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে এবং অদূরে পাশাপাশি দুইটা আম গাছের গুঁড়িতে দুইটা লোককে বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বন্ধনাবস্থায় যাহারা নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল, বাবু তাহাদিগকে দেখিবামাত্র চিনিলেন। একজন তাঁহারই খাদের ঠিকাদার জোয়ান সিং এবং অপর একজন ল্যাথ্‌রা সর্দ্দারের যুবতী কন্যা—রেবী। ব্যাপারটা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না।

(৭)

বাবু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। একজন মাতব্বর গোছের সাওতাল বলিয়া উঠিল, পচিশ নম্বর কাঁথি থেকে উয়াদিকে ধর্‌রে' এনেছি বাবু। কি মত কর্‌ছস্ কর্ উয়াদের। না হয়, বলিস্ ত' এই রেতের র‍্যাত্ গাড়ীতে আমরা জোয়ান্ সিংকে চাপাই দিয়ে আসি,—উ ঘর যাক্।

বাবু বলিলেন,—না রে মাঝি, আমি ওর দশটাকা জরিমানা কর্‌লুম। হলো ত?.....হে ওদিকে খুলে দে।

দশটা টাকা তাহাদের বিবেচনায় কম নয়। আচ্ছা, জরিমানা না হয় ঠিকই হইয়াছে, কিন্তু—

তৎক্ষণাৎ আর একজন সাওতাল বলিয়া উঠিল,—আর রেবী? আমরা ত' উয়াকে আর ঘর চুক্‌তে দিব নাই। জোয়ান্ সিং বলুক্—উয়াকে বিয়ে করে' ঘরে রাখ্‌বেক্।

বাবু জোয়ান্ সিংএর দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি বোলছ জোয়ান্?

সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল এবং ইহাও বলিল যে, সে আজই রেবীকে নিজের ঘরে লইয়া যাইতে রাজি আছে।

জোয়ান্ সিংকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্যই ল্যাথ্‌রা মাঝি এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। রেবীকে যে তাহার হাতে চিরতরে সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে, এবং সে কাজটা যে তাহার পক্ষে কত কঠোর, সে-কথা তো সে একটিবারের জন্য ভুলিয়াও ভাবে নাই! না—না, তার চেয়ে সে নিজেও বরং সমাজ পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে তবু তার একমাত্র কন্যাকে শত্রুর হাতে তুলিয়া দিতে পারিবে না!

রেবী অধোমুখে লজ্জায় জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রেবী! জোয়ান্ সিংএর ঘরে যাবি?

রেবী নিরুত্তর।

পুনরায় প্রশ্ন হইল, বল্ না কি বল্‌ছিস্!

উত্তরের অপেক্ষা করিয়া আসামী যেমনভাবে বিচারকের মুখের পানে তাকায়, ল্যাখ্‌রা মাঝি তেম্‌নি উদ্‌গ্রীব হইয়া কন্যার মুখের পানে তাকাইল।

রেবী অস্ফুট কণ্ঠে কহিল,—হঁ, যাব।

উত্তরটা সকর্ণে শুনিয়াও ল্যাখ্‌রার মনে হইল, ভুল শুনিয়াছে। আগ্রহাতিশয্যে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল,—এ্যা, এ্যা, কি বল্লেক্ বাবু?...উ কি বল্লেক্?

বাবু বলিলেন, ওই তো, রেবীও যেতে চায়।

প্রস্তর মূর্ত্তির মত নিশ্চলভাবে ল্যাখ্‌রা মাথায় হাত দিয়া পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিল।.....এতক্ষণ পরে হিমে তাহার সর্ব্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, হাটু দুইটা অদ্ভুত রকম কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করিয়া বাবু কহিলেন, ওদের বাঁধন খুলে দে মাঝি! যা, তোরা চলে' যা।

ল্যাখ্‌রা অতি কষ্টে মৃদু অথচ কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—বাবু, তুই এবারে ঘর যা।

জোয়ান্ সিং রেবীকে লইয়া চলিয়া গেলে, অন্যান্য যাহারা উপস্থিত ছিল, সকলেই আপন আপন যাওয়ায় ফিরিয়া গেল। ল্যাখ্‌রা কিন্তু সে স্থান হইতে নড়িল না।

অনেকেই বলিল,—চল্ মাঝি ঘরে চল্, ভেবে কি হবেক?

সে মৃদুস্বরে কহিল, যাই। কিন্তু উঠিতে পারিল না। মনে হইল, তাহার সমস্ত শরীর যেন অবসন্ন অসাড় হইয়া গেছে। এ কি হইল তার? মুহূর্ত্তের মধ্যে যে এমন করিয়া সব ওলট্‌পালট্ হইয়া যাইবে তাহা তো সে জানিত না!.....রেবী! মাঝি আমার! এত নিষ্ঠুরতা তুই কখন শিখিয়াছিস্? সে যে অনেকদিনের কথা মা, আমি তো এখনও ভুলি নাই। তোর মা যে তোকে আমার কাছে সেই কত ছোটটি রাখিয়া মরিয়া গেছে। আমি তোকে কোলে পিঠে করিয়া এত বড়টি করিয়া তুলিয়াছি, আর আজ কিনা তোর এই বুড়ো বাপের পাঁজরা ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া গেলি!

ল্যাখ্‌রার মনে পড়িতেছিল,—সে কোন সুদূর জঙ্গলের ধারে, লাউ আর কুমড়ো লতায় ঘেরা তাহাদের বহুকালের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরখানি! রাঙা-ফুলে ভরা শিমুলগাছের তলায় রেবীকে মাটিতে শোয়াইয়া দিয়া, রেবীর মা বনে বনে বরা পাতা কুড়াইয়া বেড়াইত আর নিজে তীর ধনুক লইয়া মনের আনন্দে মহুয়া বনের ধারে ধারে পাখী শিকার করিত। যদি কোনদিন পাখীর পিছু ছুটিতে ছুটিতে ল্যাখ্‌রা নদীর কিনারে কিনারে বহুদূর গিয়া পড়িত, তাহা হইলে রেবীর মায়ের চিন্তার অন্ত থাকিত না। সে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া ডাকিত,—মাঝি, ফিরে' আয়! ফিরে' আয়! সে আহ্বান কোন দিন বা গহন বনের পাতার ভিড় ঠেলিয়া তাহার নিকটে পৌঁছিতে পারিত না, আবার কোন কোনদিন নদীতট প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রিয়তমের ডাক কাণে আসিয়া বাজিলেই সে শিকার ফেলিয়া ছুটিয়া আসিত। দেখিত, মাথা ভরা কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে রক্তরাঙা শিমুল ফুল গুঁজিয়া রেবীকে কোলে তুলিয়া সে গাছের নীচে দাঁড়াইয়া হো হো করিয়া হাসিতেছে,—কেমন মাঝি! ফিরে এলি তো!

ল্যাখ্‌রা, মাতা কন্যার গণ্ডে চুম্বন দিয়া বাড়ী ফিরিত।

সে আনন্দের খেলা বেশীদিন চলিল না। একদা এক অন্ধকার রজনীর শেষ প্রহরে, তার বড় আদরের কন্যা রেবীকে তাহারই কোলে ফেলিয়া দিয়া, তাহার মা মরণ-ঘুম ঘুমাইল। রেবীর মুখে তখন আধ-আধ কথা। সবেমাত্র চলি-চলি পা পা সুরু করিয়াছে!

প্রিয়াহীন শূন্য কুটীরে ল্যাখ্‌রার মন টিকিল না। রেবীকে লইয়া সে কয়লা কুঠিতে কাজ করিতে আসিল। আজ উনিশটি বছর তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিবার পর আজ এ কি হইল! হায় রে কপাল! বুড়া বাপের উপর কি তোর এতটুকু দরদ হইল না মা! তোদের জাতটাই কি এম্‌নি নিমক্-হারাম!

সে জাতিটার মনের কথা আজ পর্য্যন্ত কেহই টের

পায় নাই, ল্যাখরা তাহাই বুঝিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া মনের দুঃখে সেখান হইতে উঠিয়া তাহার অন্ধকার ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে আজ আলোটি পর্য্যন্ত জ্বলে নাই। কে-ই বা জ্বালিবে? পিতার স্নেহার্দ্র মন আবার রেবীর তরে হাহাকার করিয়া উঠিল। বুকের উপর এ কি নিদারুণ অপমানের গুরুভার চাপাইয়া গেলি মা! কাল সে লোকের কাছে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া?

ছেঁড়া কাঁথাখানা সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া ল্যাখ্‌রা অন্ধকার ঘরের মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। ঘুম হইল না। দুরে গাছপালাগুলা ঘন কুয়াসার মত ধোঁয়ায় ভরিয়া গেছে। প্রভাত হইতে বিলম্ব নাই। এতক্ষণে তাহার মনে হইল, কলা সমস্তদিন খাদের নীচে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর রাত্রে কিছুই খাইতে পায় নাই। ক্ষুধায় তখন তাহার পেটের নাড়ী কয়টা পাক্ দিয়া উঠিতেছিল।.....দুর্ ছাই! এ পেটের জ্বালা তো দুমুঠো শুক্‌নো চা'ল চিবাইলেই নিভিতে পারে, কিন্তু তাহার মনের দুঃসহ বেদনার জ্বালা নিভাইবার তরে যাহাকে সে এতদিন একান্ত আগ্রহে বুকে টানিয়া রাখিয়াছিল,—সেই রেবীই যে আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেছে!

(৭)

—ঘুটঘুটে আঁধার রাত কবে বল্‌তে পারিস্ বাবু?

...মাসখানেক পরের কথা। অওাল ষ্টেশনে তাড়ার টাকা জমা দিতে গিয়া ফিরিতে একটু রাত্রি হইয়াছিল বলিয়া জামবাবু বাগান ধাওড়ার পাশ দিয়া অন্ধকারেই যথাসম্ভব দ্রুতপদক্ষিপে কুঠি ফিরিতেছিল। কথাটা কাণে যাইতেই থমকিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে প্রশ্নকর্ত্তাকে ভাল চিনিতে পারা যাইতেছিল না; বলিল,—কে রে? কি বল্‌ছিস্?

—আমি গ! তুকেই ল্যাখ্‌রা মাঝি! এই শুধোছিলম্ যে আমাবস্যার রাত কবে?

—ও, ল্যাখ্‌রা! জামবাবু একটু ভাবিয়া বলিল, আজ ত্রয়োদশী, তাহ'লে পরশু অমাবস্যা।...কেন রে? অমাবস্যার রাত নিয়ে কি হবে তোর?...রেবী কোথা রে?—ঠিকাদারের বাসায়?

কথাটা কুঠির সকলেই জানিত।

—হ বাবু, যা তুই। বলিয়া ল্যাখ্‌রা ধীরে ধীরে অন্ধকারে পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে ল্যাখ্‌রা কাজে গেল না। বহুদিন পূর্ব্বের প্রায় অব্যবহার্য্য অবস্থাতেই তাহার ঘরে একটা তীর-ধনুক পড়িয়া ছিল। সেইটা নূতন করিয়া কাজে লাগাইবার জন্য সমস্তটা দিন বাঁশের ছিলা কাটিয়া এবং নীলবনের জঙ্গলে নানারকম গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়াই কাটাইয়া দিল।

কি সব গাছের পাতার রস মাখাইয়া লৌহ নির্ম্মিত তীরের ফলা বিষাক্ত করিবার প্রণালী ল্যাখ্‌রা শিখিয়াছিল। সে কোন্ সুদূর যৌবনের গতদিনে এই সব বিষ কলা দিয়া বাঘ পর্য্যন্ত শিকার করিয়াছে। সেদিনও তাই হঠাৎ কি একটা কথা মনে হইতেই সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কয়েকটী বিষ-বাণ ও একটা ধনুক নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিল।

পরদিন বৈকালে একটা কুকুরের গায়ে বিষ-বাণ পরীক্ষা করিতে গিয়া ল্যাখ্‌রা দেখিল, কুকুরটা কিছুক্ষণ আর্ত্তনাদ করিয়া পেটে তীর লইয়াই মরিয়া গেল।

কুকুরের পেট হইতে তীরটা বাহির করিয়া ল্যাখ্‌রা ভাবিল, হ্যাঁ, ঠিক। এম্‌নি কুকুরের মতই কাল রাত্রে একটা মানুষের বুকের উপর এই তীর বিঁধিতে হইবে! তীর-ধনুকটা সযত্নে ঘরের একপাশে নামাইয়া রাখিতেই দুঃখে অনুশোচনায় ল্যাখ্‌রার মুখে একটা ক্ষীণ মলিন হাসি ফুটিয়া উঠিল।.....সাওতালের বাচ্ছা সে! এ জীবন জোড়া অপমান সহিবার ক্ষমতা তাহার নাই! জোয়ান্ সিংএর জান্ লইবে।.....

দুই হাতের শিথিল মুষ্টি একবার প্রাণপণ চেষ্টায় শক্ত করিয়া লইয়া নিজের বুকের উপরেই ঠাই ঠাই করিয়া দুইটা ঘুসি বসাইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যেই উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল,—রেবী!

বুকের দুই চোখ বহিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া আসিল।

সেদিন গভীর দ্বিপ্রহর রজনীতে কোলের মানুষ চেনা যায় না—এত অন্ধকার!

ল্যাথ্‌রা মাঝি সন্ধ্যা হইতে মদ খাইতেছিল, কিন্তু কোন প্রকারেই জমকালো রকমের নেশা জমিতেছিল না। অবশেষে মাটির পানপাত্রটা দূরে ছুড়িয়া দিয়া তীর ধনুক লইয়া জোয়ান্ সিংএর ঘরের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। আজ তাহার বহুদিনের শিক্ষা সফল হইবে! যে শত্রু তাহার বুকে অতৃপ্তির বহ্নি জ্বালাইয়াছে, এই বিষবাণে তাহাকে বিনাশ করিয়াই আজ তাহার তৃপ্তি!

রেবী যতদিন জোয়ান্ সিংএর বাড়ীতে গিয়াছে, ততদিন ল্যাথ্‌রা দুলিয়াও একবার সে-পথ দিয়া হাটে নাই, তাই আজ এই একটি মাসের মধ্যেই তার বহুকালের চেনা পথটা একটু অপরিচিত বলিয়াই মনে হইতেছিল।

ট্রাম লাইনের একটু দূরেই অড়হর ক্ষেতের পাশে জোয়ান্ সিংএর খড়ো ঘর দেখা যাইতেছিল। অন্ধকারের মধ্যে পথ চলিতে চলিতে কখনও বা কাঁটাগাছের বনে ল্যাথ্‌রার পা ছড়িয়া যায়, কখনও বা শুকনো অড়হরের ডালে হোঁচট খাইয়া পুনরায় নিজেকে সাম্‌লাইয়া লয়। এম্‌নি করিয়া অতি সন্তর্পণে সে জোয়ান্ সিংএর ঘরের জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, ঘরের মধ্যে একটা হারিকেন্ লণ্ঠন জ্বলিতেছে এবং সে আলোকের ছটা জানালার বাহিরেও আসিয়া পড়িয়াছে। পাশের অন্ধকারে একটু সরিয়া গিয়া ভাবিল, ঠিক্, জানলার ফাঁকে তীর ছুড়িলেই চলিবে। বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে ধনুকের বোঁটাটা বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া লইল। চারিদিকের প্রান্তরের উপর ঝিল্লীর ঝিঁ ঝিঁ এবং অদূরে চৌধুরির কুঠির জল-মারা পাম্পের ঘচ্ ঘচ্ শব্দ শোনা যাইতেছিল। এ শব্দটাও তাহার ভাল লাগিতেছিল না। মনে হইতেছিল, দৌড়িয়া গিয়া 'পম্পে'র ইঞ্জিনটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসে।

চোরের মত ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়া জানালার নিকটে তীর লক্ষ্য করিয়া, ঘরের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাইতেই দেখিল, অদূরে একটা খাটের উপর জোয়ান্ সিং ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার বুকের মাঝে লক্ষ্য করিয়া তীর টানিয়া ছাড়িতে যাইবে এমন সময় দেখিল, একি! তাহার বুকের পাশে আর একখানা এ কার মুখ! আজ উনিশটি বছর ধরিয়া যে মুখখানি সে দিবারাত্রি চোখে চোখে রাখিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে নাই,—যাহার একবিন্দু অদর্শনে সে অধীর হইয়া ছুটিয়া বেড়াইত, এ যে তার সেই বড় আদরের রেবী মায়ির ঘুমন্ত মুখখানি!..... মাগো! তোকে যে আজ একটি মাস দেখি নাই মা!

ল্যাথ্‌রার চওড়া বুকের উপর অলক্ষিতে কে যেন সজোরে এক গদাঘাত বসাইয়া দিল। তাহার হস্ত শিথিল হইয়া আসিল। হাতের বিষাক্ত তীরখানা দূরে অড়হর ক্ষেতের মধ্যে ছুড়িয়া দিয়া, তার একবার কন্যার মুখখানা দেখিয়া লইল! কলঙ্কের চিহ্ন তো সেখানে কোথাও নেই। আঃ!.....ঘুমো, মা, ঘুমো! আমি চলুম।...

ল্যাথ্‌রা জোর করিয়া নিজের চোখ দুইটা ফিরাইয়া লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।.....

(৬)

ঘটনার দিন চার পরে, একদিন সন্ধ্যায় রেবী নিজের মনকে আর কোন প্রকারেই বুঝাইতে পারিতেছিল না।

জীবন রাখ্‌তে হলে
জীবন-রক্ষাঞ্জন
ইহা শরীরের রক্ত মাংস ও স্নায়ুর ক্ষতিপূরণ কর্ত্তে পারে অথচ উত্তেজক নয়।
—তথ্য লউন—শ্যামাদাস ঔষধালয়—৬৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পিতাকে জাতিচ্যুত হইবার কলঙ্ক হইতে বাঁচাইয়া সে যতটুকু শান্তি পাইবার আশা করিয়াছিল তাহা তো সে পায় নাই! জোয়ান্ সিংএর বাড়ীতে আসিয়া সে ভাবিয়াছিল, পিতার সহিত বাস করিবার আনন্দটুকু হইতে বঞ্চিত হইলেও তাহার সহিত দেখা করিবার সুযোগ তাহার প্রত্যহই মিলিবে। কিন্তু জোয়ান্ সিং তাহাকে দিবারাত্রি এমনি কড়া পাহারায় ঘিরিয়া রাখিয়াছিল যে, সে একদণ্ডের জন্য বাড়ীর বাহির হইতে পাইত না।

জোয়ান্ সিংএর নিষেধ আজা উপেক্ষা করিয়াই সেদিন সন্ধ্যায় ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। বাগান-বাওড়ায় পৌঁছিয়া তাহাদের বহুকালের পরিচিত কুঁড়ে ঘরখানির দুয়ারে আসিয়া ডাকিল,—বাবা!

ভিতর হইতে কোন সাড়া শব্দ আসিল না।

আর একটু অগ্রসর হইয়া সিয়া আবার ডাকিল,—বাবা!

কোথাও কোন শব্দ নাই।

দরজার নিকট আসিয়া দেখিল, বাহির হইতে শিকল বন্ধ। রেবীর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিতেই একটা সোঁদা মাটির ভ্যাপ্‌সা গন্ধ তাহার নাকে আসিয়া লাগিল।

সেই অন্ধকার শূন্য কুটীরের নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়াইয়া রেবীর বুকের স্পন্দন যেন ক্রমশঃ ভয় ও ভাবনায় দ্রুত হইয়া আসিতেছিল। বুকখানা মুর্ত্ত বেদনায় মোচড় খাইয়া খাইয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া আসিল।

উত্তর পাইবে না জানিয়াও রেবী তাড়া তাড়া ঘরে আর একবার ডাকিল,—বাবাগো!

বাহিরে বহুধনা ক্ষেতের মধ্য হইতে একটা টিট্‌টিটি সাড়া দিল,—টিক্, টিক্, টিক্!!!

নববর্ষের প্রণতি

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ, কবিগুণাকর]

আজ, নব বর্ষের প্রথম প্রভাতে
সঁপিনু আমার প্রাণ—
নাথ, তোমারি চরণে, তোমারি স্বর্গে,—
গাহিয়া তোমারি গান।
আলোকে আঁধারে আদর্শ হ'তে
পিছাইয়া নাহি পড়ি
বিত্তের মোহে চিত্ত আমার
নহে মুখরিত নাহি করি।
কষ্ট হইয়ে কভু তাহার
কারে' নাহি পাড়ি গালি,
যেন বন্ধ আমার আর্ত্ত-সেবায়
সাজাইয়া রাখে ডালি!
স্বার্থ আমার পরার্থে, প্রিয়
ধীরে ধীরে হয় লীন,
মানুষের মত মানুষ হইয়ে
বেঁচে থাকি ক'টা দিন।
দেশের কার্য্যে দশের কার্য্যে
করি এ জীবন পাত,
আজ, নূতন বরষে যা যা প্রভু
এ দীনের প্রণিপাত।

তোড়া

[শ্রীধীরেন্দ্রকুমার গুই ঠাকুরতা বি, এ]

জাপানী—জাপানীরা যে আজ কালকার সভ্য জাতিদের মধ্যে তাহাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে তাহা বোধ হয় অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহারা ক্রমেই দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। শিল্প কলা শিক্ষা বা ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আসিয়া স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়া বিদেশকেই দেশ করিয়া লইতেছে। কোন্ জায়গায় জাপানীরা কতজন বসবাস করিতেছে তাহার মোটামুটি একটা হিসাব Dr. Hatoyama গত প্রেগ কনফারেন্সে দাখিল করিয়াছেন।

১৯২০ সনের অক্টোবর মাসে যে আদম সুমারী হয় তাহাতে জানা যায় যে মোট ৯,৪৮,৯১৫ জন জাপানী বিদেশে ঘর সংসার পাতিয়া বসিয়াছে। তার মধ্যে এসিয়ায় ৩৪২৭৫১; উত্তর আমেরিকায় ১৩,৫,৩২৫, অষ্ট্রেলেসিয়ায় ১২০৮০৪, দক্ষিণ আমেরিকায় ৪৬৯৪৭; ইয়োরোপে ২৯২৫; আফ্রিকায় ১৩ জন। (ব্রিটিশ ভারতে ৮১০ পুরুষ, স্ত্রী ৫৮৮।)

১৯২০ জুন মাসে, ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ ও কানাডাতে জাপানীরা কি কি কি কাজ করে তাহারও একটা বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে।

	হাওয়াই	ইউনাইটেড্ ষ্টেটস	কানাডা
বেকার	৬৫৫৩৫	৪৮১৪৭	৭৮৫৮
কৃষিজীবি মূলী	২২৯৩	১৬৮০৮	৩৭৯৫
কৃষক	৩৪৮৫	১৫১৯৪	৭১০
জেলে	৯১৮	১৩৯৭	১৮২৭
মূলী মজুর	৫৭০১	১৫৭৩৭	৩৪৮৭
ব্যবসায়ী	৬৬০	৪০৮	
কেরানী ইত্যাদি	৩৫১৩	৩০৩৯	
ডাক্তার ও হাকিম		১৫৪৯	
ধোপা		১১৬৩	
অন্যান্য	১১১৮১	১২৯২৩	৩৪২১

লণ্ডনে বিদেশী লোক—১৯২১ সনে একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, লণ্ডনে বিদেশী লোক আগেকার বৎসর অপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। ১৯২১ সনে বিদেশী লোক ছিল মাত্র ১,৩৮,০০০ জন। তন্মধ্যে রাশিয়ান ৩৪০০০, পোল্যাণ্ডবাসী ৩০,০০০ ফরাসী ১৩০০০, ইতালিয়ান ১১,০০০; জারম্যান ৯০০০। বাদ বাকি আমেরিকান ও অন্যান্য নানা দেশের।

অদ্ভুত জলযান—এক রকম নতুন জলযান বাহির হইয়াছে, যার জলের উপরে চলিবার শক্তি ঘণ্টায় ৪০ মাইল। লোকজন লইয়া প্রায় ৩০।৪০ মন ওজন বহিতে পারে। যখন আস্তে আস্তে চলে তখন জল ছুইয়া চলে ১৮ ইঞ্চি কিন্তু একটু জোরে চলিতে আরম্ভ করিলেই দুই ইঞ্চি জল কাটিয়া যায়। দাঁড় বা চাকার কোন প্রয়োজন হয় না শুধু এরোপ্লেনের পাখার মত দুটী পাখা দিয়া বাতাস ঠেলিয়া চলে। শুধু হালটা পিছন দিকে জলের ভিতরে থাকে। ১০০ মাইল চলিতে খরচ হয় ৫০ গ্যালন পেট্রোল আর ৬ গ্যালন লুব্রিকেটিং তেল। যে সব নদী বা খালে খুব অল্প জল সে সব খালেও অতি সহজে ইহা চলিতে ফিরিতে পারে। জিনিষটা লম্বায় ২৫ ফিট আর চওড়া মাত্র ১৫ ফিট। সৌখীন শিকারী, সি, আই, ডির লোক ইত্যাদির ইহা খুব কাজে আসিবে। তবে আমাদের দেশে বড় বড় রাজামহারাজ ছাড়া সাধারণ লোকের কিনিবার মত সস্তা এখনও হয় নাই।

রেডিওর সেন্সা—এত দিন তারের সাহায্যে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় কথাবার্ত্তা চালান যাইত। এখন এই বেতার রেডিও যন্ত্র আবিষ্কারের পর দূর দেশের সহিত ও কথাবার্ত্তা বলা সহজ হইয়া উঠিয়াছে। লণ্ডনে ও নিউইয়র্কে বসিয়া এই যন্ত্রের সাহায্যে দুই জন যেন পাশাপাশি বসিয়া কথা বলিতেছে এমি ভাবে কথা বলা চলে।

এই রেডিওর সাহায্যে অন্যান্য দেশের সুখ সুবিধা

বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা সঠিক বলা না গেলেও আমেরিকা যে ইহাকে চাকরের মত খাটাইয়া লইতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। আহারে বিহারে, গল্পে গুজবে সব সময়ই আজকাল রেডিওর প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলিয়াছে। রেডিওর নেশায় আমেরিকানরা পাগল হইয়া উঠিয়াছে। খবরের কাগজগুলি রেডিওর খবরে ভরা। কখন কোন দিক হইতে রেডিওর সাহায্যে শ্রেষ্ঠ গায়ক গায়িকার নাচ গান, বক্তৃতা বা গল্প কি অন্যান্য খবর বিনা তারে শূন্যে পাঠান হইবে আর কোন্ সময়ে কোনদিক হইতে তাহা শোনা যাইবে এসব খবরে খবরের কাগজ ভর্ত্তি। রেডিও আবিষ্কার করিয়া ইহারা নিজেদের কথাবার্ত্তা বলা বা খবরাখবরের সব অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কৃতকার্য্যও হইতেছে বেশ। একটা পুলিশ বিপদে পড়িয়াছে, তার হাতে আছে এক গাছা লাঠি আর সেই লাঠির মাথার ছোট্ট একটু রেডিওর কল বসানো। লাঠি খানা মাথার উপরে তুলিয়া ঘুরাইলেই ঘাঁটির লোকেরা টের পাইয়া তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেল। ঘরে বসিয়া মন খারাপ লাগিতেছে, পত্রিকা খুলিয়া দেখা গেল ভাল একটি অপেরা গায়িকার গান অমুক ষ্টেশন হইতে চালান হইতেছে, রেডিওর চোঙ কানে লাগাইয়া শুনা গেল মিষ্টি যেন কানের কাছে আসিয়া তার সুর পৌঁছিতেছে। ছেলেমেয়েরা খাইয়া দাইয়া কোথায় ঘুমাইবে, হয়ত দুষ্টামী করিয়া রাত্রি জাগিতেছে মা আসিয়া কাগজ দেখিয়া ঘড়ী ঠিকঠাক করিয়া ছেলেমেয়েদের সামনে রাখিয়া গেলেন; আর ছেলেমেয়েরা সহরের এক বৃদ্ধা ঠান্দির "ঠাকুরমার ঝুলি" কাড়িয়া গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল। এর কত কি।

একটি আমেরিকান ছেলে এই রেডিও শুনিবার কলের এক অতি নতুন রকমের বন্দোবস্ত করিয়া খুব সস্তাদরে বিক্রী করিতেছে। আমেরিকা ধনীর দেশ, গড়ে প্রত্যেক বারজনে একখানা মোটরকার, ঘরে ঘরে রেডিও। রেডিওর প্রথম যাত্র ছিল অনেক, তার পর ৫০ ডলার। পরে ২৫, এখন ৫ ডলার অর্থাৎ আমাদের প্রায় ১৫।১৬ টাকার সমান। রেডিও যন্ত্র নানারকম বাহির হইয়াছে, কোনটা বা আংটীর মধ্যে, কোনটা ছুরীর গায়, কোনটা বা ছাতির ডণ্ডায়, অর্থাৎ যাতে যখন তখন এর সাহায্য পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বেতার টেলিফোনের সঙ্গে আবার আজকাল ফটো পাঠানোও চলিতেছে। কত রকম যে আরও বাহির হইবে তাহা কে জানে। আমরা ভারতবাসী উচ্ছিষ্ট-ভোজী। সবদেশে পুরানো না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের বৈজ্ঞানিক কোন সুখ সুবিধা লাভেরই আশা নেই। চীন দেশেও সম্প্রতি রেডিওর খুব প্রচলন হইয়াছে, ভারত সরকারের মনে কি আছে ভগবানই জানেন।

সম্প্রতি মাস ৩৪ হয় বিলাত হইতে মার্কনী কোম্পানীর কয়েকজন লোক এদেশে রেডিওর প্রচার চলিতে পারে কিনা তার খোঁজ নিতে কলিকাতা ওল্ডপোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে "টেম্পল চেম্বার্সে" এক ঘর ভাড়া নিয়াছেন। একটি ছোট খাট সমিতিও গঠন করিয়াছেন। সেখান হইতে ভবানীপুরে অল ইণ্ডিয়া একজিবিসনে গত ৯ই ফেব্রুয়ারী প্রথম বেতারে গান পাঠান হয়। একজিবিসনে বসিয়া সে গান প্রায় স্পষ্টই শোনা গিয়াছে। তার পরে খড়্গপুরের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা চালান হয়। তাতেও বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে, তবে কোর্ট উইলিয়মের বেতার টেলিগ্রাফের পোষ্ট থাকায় একটু অসুবিধা হইয়াছিল। কারণ একই সময়ে দুটী বার্ত্তা আসিতেছিল, পথিমধ্যে একটু ঠোকাঠুকিও হইয়াছিল। অবশ্য তাতে খুব বেশী ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। আশা করা যায় শীঘ্রই এদেশে রেডিওর চলন হইতে পারে। তবে এই কোম্পানীর সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের এখনও কোন পাকাপাকি বন্দোবস্ত হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই।

৪৷৷০ পিনাসুলে লেকোসাইড ফটো
ফটো এনলার্জ ১৫×১০
ফটো সহ অগ্রিম সিকি মূল্য পাঠান
কার্ড ফটো, লেটার ও রবারষ্টাম্প সেকার
৩৬নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

জ্যান্ত

কামনা স্নান কক্ষে ঢুকিতে যাইবে, সদানন্দ বলিল, শান্তবাবু এসেছেন দিদিমণি!

কামনার সারাদেহে যেন পুলকের বান ডাকিয়া গেল, আসিবে নিশ্চিত জানিয়াও সমস্ত সকালটা সে এক অজানা আশঙ্কার মধ্যে ছাটু-পাটু করিতেছিল, তাই এত বেলাতেও সে স্নানাহারের সময় করিতে পারে নাই, এখনই সদানন্দ অসুখ-বিসুখ, বড়বাজারের মহামারী ইত্যাদির ভয় দেখাইয়া স্নান ঘরে পাঠাইয়াছিল, এখনি তাহারই মুখে সংবাদ শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিল —তাঁকে ডেকে নিয়ে আয় সদানন্দ!

সে আমি বাইরের ঘরে বসিয়ে এসেছি। তুমি চান করে নাও...

না, না—সে কি হয় সদানন্দ! তিনি এলেন কতদূর থেকে, আমার এখনি দেখা না করা ভাল দেখায় না।

সদানন্দ চলিয়া গেল।

কামনা স্নান কক্ষের দ্বারের কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, শান্ত আসিতে দু'হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—বাসায় গেছলেন না কি শান্ত বাবু?

গেছলুম। তুমি আমার বাসায় গেছলে কামনা?

কামনা বলিল—সেখান থেকেই ত আপনার ঠিকানা আনলুম। আপনি ত কোন খবর দিয়ে যান্ নি! আচ্ছা শান্তবাবু, এ আপনার কি বলুন ত?

শান্ত সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেই, কামনা বলিল—সেই যে সেদিন মামার ওখানে গেলেন, ক'দিন পরে আবার যাবার কথা, তা ত গেলেন-ই না দেশে চলে গেলেন, তা'ও একটা খবর দিয়ে গেলেন না! কি ব্যাপার বলুন ত?

শান্ত সে কথার উত্তর না দিয়াই বলিল—তুমি এ বাড়ীতে কবে এলে কামনা?

বাল। এসেই আপনাকে.....

তোমার বাবা কি আজ কালের মধ্যেই আসছেন?

সে রকম খবর আজ পর্য্যন্ত ত কিছু নেই, পরে কি করবেন, কি জানি! সে কথা হ'বে এখন, আপনি স্নান করবেন ত?

শান্ত হাসিয়া বলিল—স্নান করতে হবে বৈ-কি! হ্যাঁ যা বলছিলুম, তুমি ওখান থেকে চলে এলে যে!

ভাল লাগল না।

বলিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিয়া ডাকিল, সদানন্দ, অ, সদানন্দ, শান্তবাবু স্নান করবেন, তাঁর জন্যে জল, কাপড় সব ঠিক করে দাও।

শান্ত বলিল—আমি বাসায় গিয়ে স্নান করব।

না, না, তা হবে না শান্ত বাবু! এখানেই আপনাকে থাকতে হবে। সেই জন্যেই আমি আরো কোথায় আপনাকে 'তার' করলুম।

শান্ত সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

কামনা বলিতে লাগিল—একলা এখানে আমি থাকতে পারব কেন বলুন?

ইহাতে শান্তর বিস্ময় ঘুচিল না, সে কিছুই না বলিতে পারিয়া যেমন ছিল তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল।

কামনা মিনতি ভরা সুরে বলিল—যখন এখানে এসে থাকতেই হল, তখন সব প্রথম আপনার কথা মনে হল, আপনাকে তার করে দিলুম। যদিও জানি আপনি আসবেন তবু সারাক্ষণ.....

কিন্তু আমি ত কলকাতায় থাকতে পারব না কামনা; আবার আমাকে দেশে যেতে হবে।

কামনা কথা কয়টিতে কেমন যেন একটু বিমনা হইয়া

পড়িয়াছিল, এক মুহূর্ত্ত পরেই আশ্বস্ত হইয়া হাসি হাসি মুখে বলিল—যেতে হয় যাবেন, তার আর কি! বাবা আসুন, তারপর.....

অতদিন ত থাকতে পারব না; হয় ত কালই চলে যাব।

কামনার বড় অভিমান হইল। সে একলা আছে, সেই জন্যই বিশেষ করিয়া তাহাকে আনাইল, শান্ত সব জানিয়া শুনিয়াও যখন এই কথা বলিতে পারিল, তখন কামনার বড় দুঃখ হইল। দুঃখের বাষ্পে গলার স্বর লোপ পাইয়া আসিল, কামনা কথা কহিতে পারিল না, নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুশান্ত বলিল—তা হলে এখন যাই কামনা, খাওয়া খাওয়ার পর আবার আসব!

কামনা নতমুখেই বলিল—আপনি এখানেই খাবেন, শান্ত বাবু!

এ প্রস্তাব ইতি-পূর্ব্বেই আর একবার হইয়া গিয়াছিল, শান্ত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, আবার সেই প্রস্তাব আসিতেই শান্ত বলিল—আমি যে বাসায় বলে এসেছি কামনা!

এই আপনার আপত্য, শান্ত বাবু?

তারা খাবার করবে।

আর আমাকেও কি সারা সকাল···কামনা আর বলিতে পারিল না, এক ঝলক অশ্রু তাহার গলার মধ্যে জমিয়া উঠিতেই সে নীরব হইয়া গেল।

শান্ত বলিল—তুমি রেঁধেছ কামনা?

কামনা উত্তর দিল না, দিবার বোধ করি ক্ষমতাও তাহার ছিল না। কাপড়ের মধ্যে দুই হাত সজোরে চাপিয়া শুদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শান্ত বলিল—তা হলে এখানেই স্নান করে ফেলি। কি বল?

কামনা তবুও নীরব। ইহাতেও সে আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। এত বৈকিয়ৎ দিয়া, এত অনিচ্ছার বাধা কাটাইয়া শান্তকেও খাওয়াইবার আগ্রহ তাহার ততটা ছিল না।

শান্ত বলিল—তাই করে ফেলি—কি বল?

বারবার একই প্রশ্নে কামনা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। বলিল—আপনার দয়া!

শান্ত হাসিল, বলিল—রাগ করলে নাকি?

না—রাগ কেন?

কিন্তু তোমার মুখ দেখে ত তাই মনে হচ্ছে কামনা!

হঠাৎ যেন কামনার মনে হইল সত্যই তাহার মুখ তাহার অজ্ঞাতে অত্যন্ত ম্লান হইয়া গিয়াছে, ইহা দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ বুঝিয়া চেষ্টাকৃত মৃদু হাসিতে মুখটি ভরাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—না, রাগ কেন করব! আর রাগ করবার কারণই বা কি আছে!

শান্ত আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমিও ত তাই বলি কামনা, রাগ করবার কারণই বা কি আছে। সেখানে খাবার—যদিও সেটা ভাত ডাল ছাড়া আর কিছুই না—তারও ত একটা খরচ আছে কি না, সেটা নষ্ট হবে, সেই ভেবেই বলছিলুম।

শান্ত বাবু, আপনি বড্ড বেশী বিনয়ী। নিন, আর দাঁড়াবেন না, স্নান করে খেয়ে দেয়ে যত পারেন দুঃখের গাথা গাইবেন—চলুন।

শান্ত কি বলিতে যাইতেছিল, কামনা তৎপূর্ব্বেই কহিল—থাক্ এখন আর কোন কথা না, চলুন।

নিজে সঙ্গে করিয়া বারান্দায় লইয়া গিয়া সযত্নে জিম্মা করিয়া দিয়া, সে নিজেও স্নান করিতে গেল।

নব বসন্তে
প্রিয়জনকে উপহার দিতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে আমাদের অ্যাইভিক্সাল ক্রীমেলিন্সিন এবং মেসিন প্রভৃতি—চন্দন, বরেল, বকুল, মায়া ও অরেলেট সাবান ব্যবহার করুন।
ইণ্ডিক্সাল সোপ কোম্পানী
৬৪।১এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪২৬

নারীর অধিকার ও কর্ত্তব্য

[শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার]

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি এই কথাটাই বলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, আমাদের দেশে পুরুষ ও নারীর স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য সম্বন্ধ এবং মিলনের মধ্যে কালবশে যে কদর্য্য-বিকৃতি আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা পুরুষগণের স্বেচ্ছাকৃত নহে, এবং তাহা দূর করিতে যে পুরুষ-শক্তি অনিচ্ছুক তাহাও নহে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পরাধীনতা ও পরমুখাপেক্ষীতাই সমাজ-জীবনকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। জাতিগত গৌরববোধ ও আত্ম-চেতনার অভাবেই, বাঙ্গলার পুরুষ-শক্তির অপৌরুষ, আজ নারী-জীবনকে এত সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছে। জীবনসমস্যার সমাধানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে অধিকার ও কর্ত্তব্যের যে সুনির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক সীমারেখা থাকা উচিত, তাহা সমাজ-জীবনে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কাজেই এত বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য! এবস্তাবস্থায় পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী অগ্রগামী নরনারীগণকে সমস্তপ্রকার উত্তেজনা ও অথথা অসন্তোষ প্রকাশ হইতে বিরত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে সমাজ-জীবনের প্রণষ্ট বা বিলুপ্ত আদর্শকে উদ্ধার করিতে হইবে,—এবং তাহা জাতীয়-জীবনের সাধনধারা ও ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র ও অভিনব হইলে চলিবে না। বলাবাহুল্য বর্ত্তমান আলোচনায় আমি হিন্দু-সমাজকেই মুখ্যভাবে লক্ষ্য করিতেছি। সেইজন্যই আমাদিগকে ইউ-রোপীয় সমাজের ধারকরা সমস্যাগুলির দ্বারা অনাবশ্যক রূপে চঞ্চল হইলে চলিবে না।। খৃষ্টানধর্ম্ম এবং বিশিষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়া গঠিত নারী-জীবনে যে আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছে, বিশ্বা উন্মত্তা মহিলা-সমাজ যে সমস্ত অধিকারের দাবী উপস্থিত করিতেছেন, তাঁহাদের স্বাধীনতা যে ভাবে ব্যবহার করিতেছেন,—আমাদের দেশের 'মহিলা-আবরণ' বলিয়া নারীবিদ্রোহ, তাহারই জন্য দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়া উচিত নহে, ইহা আমাদের দেশের বিগত শতাব্দীর ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের ইতিহাসের সহিত যাহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারাই নিঃসন্দেহে স্বীকার করিবেন। পাশ্চাত্য নারীদিগের অবস্থার সহিত তুলনামূলক বিচার দ্বারা যদি আমরা আমাদের নারী-জীবনের অধিকার ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে চাই,—তাহা হইলে আমরা যে কেবলমাত্র ভুল করিব তাহা নহে, অন্যায়ও করিব।

উনবিংশ শতাব্দীতে, অধিকারবাদের মোহ, ফরাসী-বিপ্লব ও তাহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য ঘটনায় সমগ্র ইউ-রোপকে অকস্মাৎ অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। এবং এই রাষ্ট্রীয় অধিকারবাদের সহিত ব্যক্তির অপ্রতিহত ভোগাধিকারও একাত্ম হইয়া দেখা দিয়াছিল। পার্থিব যত প্রকার সুখ আছে, তাহা উপভোগ করিবার অধিকার নরনারী সকলেরই আছে, এই আজ আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত সমাজে, আলোকপ্রাপ্তা ইউরোপীয় মহিলাগণ জীবন-সমস্যা সমাধান করিতে পারিয়াছেন কি? ইউ-রোপীয় নর-নারীর সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, একথা উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সকলকার্য্যে পুরুষের সমান অধিকার নারী পাইলেই যে সকল সমস্যার সমাধান হয়, একথা সত্য নহে। বরং অধিকারবাদের আদর্শে গঠিত স্বাধীনতা নরনারীর দুঃখ ও অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই করিতেছে। একদিকে নারীর অধিকার, অপর দিকে পুরুষের অধিকার—এই কাড়াকাড়ি বর্ত্তমান ইউরোপে এত নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম হইয়া দেখা দিয়াছে যে, পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে উচ্ছৃঙ্খল ও উপার্গগামী নরনারীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তজ্জন্য মনীষীগণ ইহার প্রতিষেধক উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না। অনুকূল রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং নর-নারীর অবাধ স্বাধীনতার মধ্যেও যখন এত বিরোধ ও পঙ্কিল আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে—তখন এই পরাধীন পঙ্কিল জাতির পক্ষে, এতদ্দেশে সেই ব্যর্থ

অধিকারবাদের আদর্শ আমদানী করিয়া যে কি লাভ হইবে, তাহা সম্যক বুঝিয়া উঠা কঠিন।

মনুষ্য-জীবনে 'অধিকারের' স্থান আছে, কিন্তু অধিকারই জীবনের চরম বা শেষ সত্য নহে। নিজের অধিকার কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়া সুখান্বেষণই যদি মানব-জীবনের চরম আদর্শ হয়, তাহা হইলে যেখানে একের অধিকারের সহিত অপরের অধিকারের বিরোধ উপস্থিত হইবে, সেখানে মীমাংসা কি? বাঁচিয়া থাকিয়া সুখান্বেষণ ও আত্মোন্নতিসাধন যদি প্রত্যেক নরনারীর প্রধান অধিকার হয়, তাহা হইলে পরের কল্যাণের জন্য সেই অধিকার ত্যাগের যে স্বাভাবিক ও সুমহতী প্রেরণা মনুষ্য-জীবনে অনুভূত হয়, তাহার কোন অর্থ থাকে না। অধিকারবাদের আদর্শে আত্মত্যাগমূলক মনুষ্য-জীবনের উচ্চতম বৃত্তিগুলির কোন স্থান নাই বলিয়াই, ভারতবর্ষে বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে ব্যক্তির অধিকার অপেক্ষা কর্ত্তব্য বা স্বধর্ম্মপালনকেই উর্দ্ধে স্থাপন করা হইয়াছে। ব্যষ্টি-জীবন, সমাজের নিকট হইতে তাহার অধিকার বুঝিয়া লইবার ভাব পরিহার করিয়া তাহার কর্ত্তব্যপালন করিবে। স্বধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য পালনই অধিকার। সমাজের, ব্যষ্টির প্রতি যাহা কর্ত্তব্য, ব্যষ্টির সমাজের নিকট তাহাই অধিকার —এইরূপে পুরুষের নারীর প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহাই নারীর পুরুষের উপর অধিকার, এবং নারীর পুরুষের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য,তাহাই পুরুষের নারীর উপর অধিকার। এই অধিকার ও কর্ত্তব্যের মধ্যে—স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারের কোন স্থান নাই। অতএব নারী-সমাজের পক্ষ হইতে বিশেষভাবে যদি কিছু বলিতে হয়,-তবে নারীর-কর্ত্তব্যের কথাই কহিতে হইবে। পুরুষ তাহার কর্ত্তব্য পালন করে না, অতএব আমরাই একধারে উভয় কর্ত্তব্য পালন করিব, এইরূপ অসঙ্গত সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে, নারী-সমস্যাকে অধিকতর জটিল করা হইবে মাত্র, সমাধান করা হইবে না। যে দেশের বিরাট জন-সমষ্টি মনুষ্যত্বের সমস্ত অধিকার পরের হাতে তুলিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় ক্রীতদাস সাজিয়াছে, যেখানে জীবনসংগ্রাম কেবল কায়ক্লেশে বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইয়াছে—যেখানে উন্নতির প্রত্যেকটী সোপান আত্মত্যাগীর হৃদয়শোণিতে অনুরঞ্জিত, যেখানে দেশ ও জাতির কল্যানকল্পে আত্মোৎসর্গ, জনসাধারণের প্রশংসা বা উৎসাহ লাভ করেনা,—যেখানে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব ও আধিপত্য অপ্রতিহত প্রতাপ অত্যুত্থানের প্রত্যেকটী চেষ্টাকে রক্তনেত্রে শাসন করিতেছে, হৃদয়হীন নিষ্ঠুর অবজ্ঞা দ্বারা উপেক্ষা করিতেছে, সেই কঠিন কঠোর কর্ম্মভূমিতে দাঁড়াইয়া. ব্যষ্টি-জীবনের বিকাশের পথের বাধাগুলি সরাইয়া দেওয়া সহজকার্য্য নহে।

একদিকে শিক্ষিত সম্প্রদায় নানা অভাবের তাড়নায় বিশৃঙ্খল, অপরদিকে বিশাল জনসঙ্ঘ অজ্ঞান-অন্ধকারে জড়বৎ আড়ষ্ট; একদিকে নিয়ম সংযমের বাঁধনহীন উচ্ছৃঙ্খল পরানুকরণ ও পরানুবাদ, অপরদিকে বিচারশূন্য প্রথা ও দেশাচারের দাসত্ব—এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়াইয়া দেশের জাগ্রত নরনারীগণকে বর্ত্তমান সমাজদেহ হইতে পুঞ্জীভূত ভুলের জঞ্জাল দূর করিবার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

বিংশ-শতাব্দীর প্রথম প্রভাতেই এই ব্রতের সাধনায়, একদল দুঃখব্রতী সত্য-সাধক দেখা দিয়াছেন; ইহাদের প্রাণপাত চেষ্টা ব্যর্থ হইবার নহে। ব্যষ্টি জীবনের সাধনা সঙ্ঘবদ্ধ সমষ্টি-জীবনের অভাবে আশানুরূপ ফলপ্রসূ হইতেছে না সত্য, কিন্তু তাহা যে একেবারে ব্যর্থ হইতেছে, একথাও বলা যায় না। আজ সমাজের সর্ব্বস্তরে যে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়াছে, এমন কি যে সাধনার অংশ গ্রহণ করিবার আহ্বান শুনিয়াই পুরবাসিনী মহিলাগণকে পর্য্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে,—তাহা বাঙ্গালী সমাজকে অদূর ভবিষ্যতে জাগিয়া গড়িবে, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান অধঃপতনের গহ্বর হইতে উঠিয়া আসিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যাপকভাবে সমাজের সর্ব্বস্তরে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। আমার মনে হয়, যদি শক্তিমান একসহস্র নরনারী এ কার্য্যে অগ্রসর হন, তাহা হইলে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী-সমাজ এক নবরূপান্তরে নবীন আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে।

এই নবযুগের সন্ধিক্ষণে নারীর কর্ত্তব্যবোধ, নারীদেহেই জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে; এবং কালপুরুষের ইঙ্গিতে আজ যে সমস্ত মহিলা নারীর কর্ত্তব্য পালনের পথের

বাধাবিঘ্নগুলি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—তাঁহারা ত সমাজে অনাদৃতা বা উপেক্ষিতা হইতেছেন না। মাসিক ও সাপ্তাহিকের পুরুষ সম্পাদকগণ ত যথেষ্ট সৌজন্যের সহিত তাঁহাদিগকে আলোচনা করিবার সর্ব্বসুযোগ দিতেছেন; এবং অনেক পুরুষ পাঠক তাঁহাদের বলিবার কথাগুলি শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিতেছেন ও চিন্তা করিতেছেন। এমন কি কোন কোন মহিলা লেখিকার অসংযত লেখনীও পুরুষ সম্পাদকগণের নিকট আশাতীত প্রশ্রয় পাইতেছে। এই সমস্ত মহিলাগণ যেদিন কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য আরম্ভ করিবেন, সেদিনও দেশের জাগ্রত পুরুষ-শক্তি তাঁহাদিগকে সাহায্যই করিবেন, ইহা তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন।

তাঁহারা অযথা উৎকণ্ঠায় নিজেদের কল্পনাসৃষ্ট বিভীষিকার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া সর্ব্বদা মনে রাখিবেন, মনুষ্যত্বের সমান উত্তরাধিকারসূত্রে পুরুষের সহিত, নারী-জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই একই কর্ম্মক্ষেত্রে সমানভাবে নারীর কর্ত্তব্যপালন করিবার অধিকার দান করিবার জন্য দেশের জাগ্রত-পুরুষ-শক্তি উপায় চিন্তা করিতেছেন। তাঁহারা জানেন, নারী ক্রীতদাসী নহেন, বিলাসের ক্রীড়নক নহেন, পুরুষের খেয়ালের খোরাক যোগাইবার জন্য, বিনা বিচারে নারী সমস্ত অন্যায় নতশিরে সহ্য করিবে, এরূপ উদ্ভট মত তাঁহারা সমর্থন করেন না। তাহারা বলেন, নারীকে—নারীই থাকিতে হইবে। নারীর শক্তি, পুরুষের উচ্চতম প্রবৃত্তিগুলিকে জাগ্রত করিবে, সৎকার্য্যে প্রেরণা দিবে। নারী পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও নহেন, নিকৃষ্টও নহেন। বুদ্ধি, চরিত্র ও শক্তির তারতম্যানুসারে মানুষের মধ্যে যে ভাবে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বিচার করা হয়, পুরুষ নারীর মধ্যেও সেইভাবেই শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বিচার করিতে হইবে।

যদি বিবিধ পতঙ্গের ন্যায় পাশ্চাত্য-আদর্শের আলেয়ার আলোকে বিভ্রান্ত না হইয়া, আমাদিগকে জাতির অতীত ইতিহাসের ধারার সহিত সংযোগ ও ঐক্য রাখিয়াই পুরুষ ও নারীর কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে। এই কর্ত্তব্য বা সদর্শপালনের ভাব, জাতীয় শিক্ষাদ্বারা নরনারীর চরিত্রে স্বাভাবিক সংস্কারে পরিণত করিতে হইবে। এই জাতীয়শিক্ষার উপরই বর্ত্তমান জাগরণের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

জাতীয় শিক্ষার মধ্য দিয়া নরনারীর চরিত্রে স্বধর্ম্মপালনের ভাব স্বাভাবিক ও সুদৃঢ়রূপে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষাই বর্ত্তমানে দেশের সম্মুখে প্রথম ও প্রধান সমস্যা। আমি বারান্তরে যথাসাধ্য ইহা আলোচনার প্রয়াস পাইব, বক্ষমান প্রবন্ধে নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মোটামুটী কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক।

কন্যারূপে এবং পত্নীরূপে নারীকে পুরুষের আশ্রয়ে ও অধীনে থাকিতে হইবে, পক্ষান্তরে,—নারী যেখানে মাতৃরূপে অবস্থিতা,—সেখানে পুরুষকে নারীর আদেশ অবনত শিরে পালন করিতে হইবে—হিন্দুর সামাজিক-জীবনে, নরনারীর সম্বন্ধের ইহা হইল মূল কথা। দুরূহ কর্ত্তব্যপালনের মধ্যদিয়া নারী জননী হইবেন—ইহাই নারী-জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ।

কন্যারূপে নারী আদর্শ জননী হইবার শিক্ষালাভ করিবেন, পত্নীরূপে শিক্ষালব্ধ ভাবসম্পদ সহায়ে মাতৃত্বের সাধনা করিবেন।

সুস্থ-সবল, চরিত্রবান পৌরুষ-কঠিন; নির্ভীকবীর্য্য এক মহিয়সীকে যদি দেশের বুকে গড়িয়া তুলিতে হয় তবে আদর্শ-জননী সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

বিবাহিত জীবন বলিতে নারী ইহাই বুঝিবেন,—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—ইহা কঠোর সত্য। পুরুষ পুত্রের জন্যই বিবাহ করিবেন, কামসেবার জন্য নহে। নারীও যোগ্যপুত্রের জননী হইবার জন্য বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিবেন—নতুবা বিবাহিত জীবনের কোন সার্থকতা থাকে না।

পুরুষ জীবন-সংগ্রামে সহস্র কর্ম্মে লিপ্ত হইবে, নারী মাতা রূপে পুরুষকে জীবন-সংগ্রামের যোগ্য করিয়া গড়িবেন। পত্নীরূপে পুরুষের পরিচর্য্যা করিয়া শ্রমক্লান্তি দূর করিবেন, আশা দিবেন, ভরসা দিবেন এবং একান্ত আপদকালে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সকলকার্য্যে উৎসাহ ও সৎপরামর্শ দিবেন।

'আমি বিজয়ী হইব', 'আমি সিদ্ধ-কাম হইব'—এই সঙ্কল্পের মধ্যেই পুরুষের আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা।

আমার 'স্বামী' 'পুত্র' নিষ্কাম হউক, 'মানুষ হউক'—এই কামনার মধ্যেই নারী জীবনের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পর্য্যবসিত।

এইখানেই নারী ও পুরুষের পার্থক্য অতি স্পষ্ট। এবং এই পার্থক্য, গুণগত নহে, শক্তিগত নহে—প্রকৃতি গত। অতএব কর্ত্তব্য বা স্বধর্ম্ম পালন অর্থ ই প্রকৃতির অনুসরণ করা।

কুশিক্ষা বা শিক্ষার অভাবেই কিংবা পাশ্চাত্য নারীত্ব-হীন নারীগণের অনুকরণে পুরুষের সকল কর্ম্মে নারীরও সমান অধিকার আছে, বা থাকা উচিত, এরূপ কথা দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যাহার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।

বর্ত্তমান বাঙ্গালী-সমাজে নারীরা সত্যই নিগৃহীতা হইতেছেন, কিন্তু পুরুষ নিগ্রহ বা সমাজ-নিগ্রহ করিলেই নারী-নিগ্রহের অবসান হইবে না। অপরকে আঘাত করিতে গেলে নিজেও আহত হইতে হয়। বাঙ্গলার পুরুষ-শক্তি তাহার কর্ত্তব্য অবহেলা করে বলিয়াই, নারীর কর্ত্তব্য পালনের পথেও বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছে। এই কর্ত্তব্যপালনের অধিকার নারীকে লাভ করিতে হইবে এবং পুরুষকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নারীর কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। আমাদের সমাজে নারী-নিগ্রহ করিতে গিয়া, পুরুষও নিগৃহীত হইতেছে। নারী-নিগ্রহ কেবল নারীকেই পিষ্ট করিতেছে না, পুরুষকেও পিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালী-সমাজের বর্ত্তমান বিবাহ-প্রথাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিবাহে পুরুষের স্ত্রী নির্ব্বাচনের অধিকার আছে, নারীর স্বামী-নির্ব্বাচনের অধিকার নাই—ফলে নারীকে যেমন ইচ্ছা অনিচ্ছার অতীত নির্ব্বিকার চিত্তে যাহাকে তাহাকে তাহার পতিত্বে বরণ করিতে হয়। অপরদিকে কন্যার জন্য সেই পতি ক্রয় করিতে পুরুষকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। এই পণপ্রথার কোন প্রতীকার কি পুরুষ করিতে পারিতেছে? এইরূপে যে ক্ষেত্রে পুরুষ নারীকে নির্য্যাতন করিতেছে সেই ক্ষেত্রেই নিজেও নির্য্যাতিত হইতেছে—পরবর্ত্তী প্রবন্ধে 'নারী-নিগ্রহ' বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

গুরু

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর]

গুরুদেবকে তোরা জীব জ্ঞানে নাই,
জীব তো আপন বুদ্ধি ঠাঁই নাই।
গুরুদেব তো জীবকে কাড়ি ভবসিন্ধুতে
দেয় নাই দুখরে সিন্ধু আনে।
বলে করো সৃষ্টিকে কের অমর করে
ঘটকা পাট গুরুদেব খোলে
কহত কবীর তু দেখ সংসার মেঁ
গুরুদেব সমান কোই নহিঁ দোসরে।

গুরুর রহস্য কেবা জানে?
আপন বুদ্ধিরে সবে বড় মানে।
ভবসিন্ধু মাঝে ভেসে আনন্দ সাগরে শেষে
কেলি করি তাঁর স্নেহ করুণায় টানে।
বাঁধিয়া সীমার ডোর কবি চর্ম্মচক্ষু মোর
উন্মীলিয়া যেন তিনি অসীমের পানে।
গুরুর মহিমা কেবা জানে?
গুরুর তুলনা বিশ্বে আছে কোন্‌খানে?

কবীর

"চিত্র প্রদর্শনী"

বৈশাখের "ভারতবর্ষে" সম্পাদক মহাশয় একটি নির্জ্জলা খোসামুদে নিবন্ধ ছাপাইয়াছেন; উদ্দেশ্য কি জানি না, তবে দেখিতেছি—শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী লিখিত "চিত্র-প্রদর্শনী" নামে একটা রাবিস্ ছাপাইয়া দেশ ও দশকে উপহার দিয়াছেন। এই বৎসরে কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে "সোসাইটী অব ফাইন আর্ট" নামে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল উক্ত লেখক তাহারই সমালোচনা করিয়াছেন। আমরাও উক্ত চিত্র-প্রদর্শনী দেখিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় প্রবন্ধে একটীও উল্লেখযোগ্য চিত্রের চিহ্নও দেখিলাম না, শুধু আছে দেখি—লেখকের পরিচিত একদল শিল্পীর অযোগ্য তারিফের মাত্রাধিক্য। সমালোচনার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার—শিল্পী হেমেন্দ্রনাথের ফাল্গুনের বসুমতীতে প্রকাশিত "বর্ষসে কমল" চিত্রের অপূর্ব্ব সমালোচনা; সমালোচক লিখিয়াছেন, শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ "চিত্রের মধ্যে কি কি দিতে হইবে তা জানেন বটে কিন্তু কি কি দিতে হইবে না তাহা আদবেই জানেন না। এবং তাহার রসজ্ঞান আদবেই নাই" ইত্যাদি। এ সব চিত্র সমালোচনা দেখিলে মনে হয়, রসিক লেখকের সঙ্গে শিল্পীর জমা জমি সংক্রান্ত মামলা ১০ বৎসর যাবত চলিতেছে। সমালোচক যে চিত্রের নিন্দা করিয়াছেন তাহা যেন শিল্পীর এবারকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র এবং তাহা এই বৎসরের বোম্বাই প্রদর্শনীতে মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছে। হায় রে বিদ্যে! আমরা জানিতাম বিশ্বপতি চৌধুরী লেখনী ধারিতেন কবে হতে আবার 'জাঁকনী' ধরিতে শিখিয়াছেন? শুনিলাম তিনি নাকি হেমেন্দ্রনাথের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন; আরও শুনি অযোগ্যতায় হেমেন্দ্রনাথ নাকি তাহাকে গ্রহণ করেন নাই। এ দেখা যদি ঐ কারণে হয় তবে উপযুক্তই হইয়াছে। তরুণ বয়সের অজ্ঞতায় বা "রসাধিক্যে" না হয় বিশ্বপতি বাবু একটা জ্যেষ্ঠতাতত্বের পরিচয় দিয়াছেন, "ভারতবর্ষ" সম্পাদককে আরও বেশী করিয়া বাহবা দিতেছি—প্রবন্ধমধ্যে যেটুকু রাখিয়া লেখটুকু ছাপিয়া বসিয়াছেন—'সাময়িকী'র মধ্যে! বলিহারী রকমারি! অতঃকিং বালভাষিতং—জলধরের হিমালয়-সম আসনও টলাইয়াছিল না-কি? অথবা আমাদেরই সন্দেহ করা ভুল, স্বয়ং দেবতা যাহাতে সন্তুষ্ট নন্, জলধর না হইবেন কেন? কিন্তু বাপু, বিশ্বপতি, তোমাকেও বলি "ওরে খোকা, কচি বাঁশে বাঁশী হয়—লাঠি হয় না।"

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে প্রবীন সম্পাদক মহাশয় সমস্ত দেশের চিত্রশিল্পীগণের চেষ্টা ও শ্রমের ফল প্রদর্শনীর এমন একটা হাস্যকর পরিচয় ছাপাইয়া হাস্যাস্পদ হইতে গেলেন কেন? তিনি নিজে হয়ত প্রদর্শনী দেখিতে যাইবার অবসর পান নাই, কিন্তু তাঁহার পরিচিত অপরিচিত কোন লোকের নিকট হইতে কি একটা মোটামুটি পরিচয়ও তিনি পান নাই? শুধু কি তাই, কোন্ এক শিল্পীর চায়ের টোলে আঁকা গ ছবিখানি ভালই হইয়াছে, আমরা দেখিয়াছি। সঃ বাঃ এক বীরপুরুষের পরিচয় দিতেই যে লেখকের দুই কলমের উপর দখল যায়, সম্পাদক মহাশয়ের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া সে যে একচোট "আসল" বিদ্যার অনেক বুড়ো সেকেলে রায় বাহাদুর (রায় সাহেব) কেও হার মানাইয়া দিয়াছে—এটাও কি ভারতবর্ষ সম্পাদক মহাশয় ধরিতে পারিলেন না! বিশ্ববিদ্যালয়ে শুনি তাঁর আশুতোষের প্রভাব এখনো বজায় আছে, লেখক খাঁটী ফুলেলার কলমরূপ খোসাটা আর-টা পাইলে বৃদ্ধ সম্পাদক রায় বাহাদুরের কিঞ্চিৎ লাভের সম্ভাবনা আছে কি? ধন্য প্রবৃত্তি এই শ্রেণীর শিক্ষিত ভাবক লেখকদের! ধন্য ইহাদের শিক্ষা দীক্ষা! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুকাল ধরিয়া এই সবই প্রসব করিয়াছে! তবে সম্পাদক মহাশয়ের মত চিরনির্ব্বিবাদী লোকও তাহাদের ফুঁহকে ফুলিয়া এমন গোল পাকাইলেন,—এইটাতেই তাহাদের আরও বেশী বাহাদুরী প্রকাশ পাইয়াছে।

গত বর্ষের "নূতন খাতা" সম্বন্ধে উৎসবে আমরা অনেক সজ্জন ব্যবসায়ী বন্ধুর নাম নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। সকল স্থানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে না পারিলেও আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা তাঁহাদের নিকটে পৌঁছিয়াছে, তাহা স্থির জানি।

২রা বৈশাখ রবিবার বরাহনগরে কয়েকটি অন্তরঙ্গ সুহৃদের আহারে সম্মেলনকল্পে আমরা কোন এক পল্লীতে গিয়াছিলাম। ট্রেণে চড়িয়া অনেক দূরে যাইতে হইয়াছিল। বিস্কা, কোন্নগর প্রভৃতি ষ্টেশনে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। এই পয়লা বৈশাখের মধ্যাহ্নে ক্ষুধাতুর আত্মীয়স্বজনকে অন্নপাত্র হস্তে এদিক ওদিক করিতেছে। সকলের মুখ শুষ্ক, মুখ-চোখ রৌদ্রতাপে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, অন্নপাত্রের দিকে লক্ষ্যও নাই। দেখিয়া মনে হইল আহারান্ত স্কুলের ছাত্র। বহু এই কার্যে তাহাদের স্কুলের পড়ার কিছু ক্ষতি হইতেছে, কিন্তু সে-টুকুর বিনিময়ে যে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতেছে, তাহাতে তাহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করা নিঃসঙ্কোচে চলিতে পারে।

২য় বর্ষ উপলক্ষে বরাহনগর ষ্টিটের ব্যাঙ্কসমূহ বণিকের বণিকাল কোম্পানি তাঁহাদিগের চিরাগত প্রথানুসারে বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীদিগের একটি সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বহু গ্রন্থকার, মাসিক সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রের সম্পাদক ও লেখকগণ সভায় উপস্থিত হইয়া অনুষ্ঠাতৃগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সম্মিলনের সভাপতি হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি সদ্যোজাত সন্তানের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকায় সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এজন্য সমবেত সভ্যবৃন্দের ইচ্ছানুসারে রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বণিকাল কোম্পানির ভূতপূর্ব অধিকারী শ্রীযুক্ত ধরিণীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে যথারীতি অভ্যর্থনাপূর্বক একটি অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালারসিক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন মোবাখী মহাশয় তাঁহার সর্বজনপ্রিয় কৌতুকাভিনয়ে সকলের চিত্ত রঞ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ধরিণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর আপ্যায়নে সমাগত ব্যক্তিগণ যেমন প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহাদের ভূরিভোজনে তাঁহারা তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

গত চৈত্র সংক্রান্তির সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরীর বালিগঞ্জ বাস ভবনে সুধাবস্ত্র দেবীদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। কলিকাতার অধিকাংশ সংবাদপত্র সেবী সম্মিলনে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত চৌধুরী আশা করেন এই বিষয়ের ফল অত্যন্ত শুভ হইবে। মুখ্য কারণে বিভেদের মধ্যে সমবোধ ও অন্তরঙ্গতাকে প্রকাশ না দিলে একযোগে সকলেই দেশের মঙ্গলকে আদর্শ রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে চলা ভিন্ন আমাদের আর অন্য গতি নাই। অবশ্য সকলেই সমবায়—এ সত্য নিহিত শক্তি ভিন্ন বাঁচিবার আর কি উপায় আছে! বাস্তব আলোচনায় ও বিরাট কর্ম, ভোজপেষ, আহারের আয়োজনে এ দিবস সার্থক হইয়াছিল। আহারাদি সম্পূর্ণ ভারতীয় ধরণে হইয়াছিল, এমন কি সরষে ছাড়া চায়ের ব্যবহারটুকু পর্যন্ত হয় নাই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বিলাত ফেরত এবং অন্যান্য জাতীয় সকলেই এক সঙ্গে একাসনে বসিয়া লুচি, পোলাও, বালে পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র রায় ও অতুল সেনের কৌতুকাভিনয়ে সন্ধ্যাসভার অন্ধকারময় আনন্দ হইয়াছিল। চৌধুরী মহাশয় ইচ্ছা করিয়াছেন মাসে মাসে এইরূপ শুভ সম্মিলন ঘটাইবেন। তাঁহার এই কৃতি।

বেঙ্গলী সম্পাদক মিঃ সুধিন্দ্র রায় ষ্টেটস্‌ম্যানের পি, এস, চিন (শ্রীযুক্ত শিবনাথ শুভ) নামে মানহানির মালিশ করিয়াছেন। আজিও নালিশ রুজু হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শুভ নামক পত্রে মিঃ রায়কে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপারাদি লইয়া প্রকাশ্যে অশ্লীল ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন—এ মানহানির দাবী সেই জন্যই। বিদেশের যেরূপ কথা এদেশে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে ও বিচারালয়ে প্রকাশ করা যে কিরূপ রীতি অনুমোদিত তাহা আমরা বুঝি না। দু'একটি দু'একটা সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট মানী থাকি। ইহাদেরই রুচি যদি এমন হয় তবে। দেশবরেণ্য সকলে কি করিবে?

"বঙ্গের নারী সাহিত্য" সম্বন্ধে যিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন কালিঘাট ইনিষ্টিটিউটের সাহিত্য শাখা হইতে তাঁহাকে ঈশ্বরচন্দ্র বৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধ সকলেই লিখিতে পারিবেন, এবং ১৩৩০ সালের ১লা আষাঢ়ের মধ্যে ১২নং সাহানবাগান রোডে কালিঘাট ইন্সিটিটিউটের সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেন বাহাদুরের নামে প্রেরণ পাঠাইতে হইবে।

এলাহাবাদের সংবাদে প্রকাশ, চৌরিচৌরা মামলার শেষ বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। বিচারপতি মহাশয় অত্যন্ত যে যথোপযুক্ত ভাবে বিবেচনা করিয়া আসামীদিগের প্রতি দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং আইনানুসারে যতদূর সম্ভব পরিবর্তনীয় দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে। সম্ভবতঃ একদল কালের জন্যই মামলার রায় বাহির হইবে।

আলমোরা পাহাড়ীদলের যেসকল ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের নাম প্রকাশ করা হয় নাই। তবে অনুসন্ধানে পুলিসবিভাগকে নানাপ্রকারে বাধা দিতেছে, বিশেষ ডিফেন্স অব্ ইণ্ডিয়া আইন জারি করিয়া দেশপথের কণ্টকগুলি উচ্ছেদ করিয়াছে। আশোয়ার মুক্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আশা করা যায় যে মুক্তাদা আবাসের দলই নির্দ্ধারিত হইবেন।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল আতাবের ১ বৎসর কারাদণ্ড ও ১০০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছিল। ১ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার মোট্টা বিক্রয় করিয়া জরিমানা আদায় করা হইয়াছে কাজেই মজলবার প্রাতে তিনি জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, দেবদাস গান্ধী, পদ্মরাজ রাও, জেপপাতে প্রভৃতি তাঁহার কারামুক্তির সময় জেলের দরজায় উপস্থিত ছিলেন।

মমতা

[স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের চিত্র-শালা হইতে]

শিল্পী—গুরু

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা।

১ম বর্ষ] ১৫ই বৈশাখ শনিবার ১৩৩০, ইং ২৮শে এপ্রিল। [৩৯শ সংখ্যা

ওওা-বিল পাশ—ও ফাঁস্

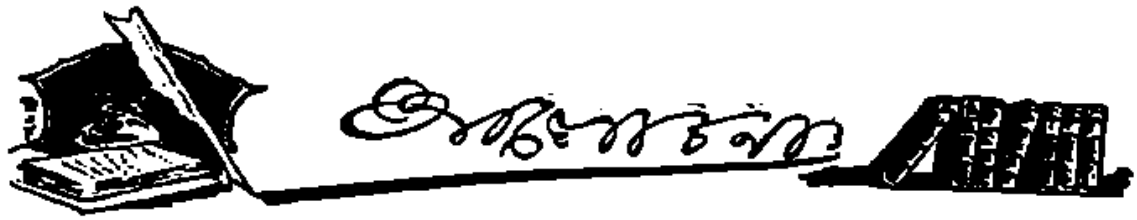

আমরা জীবনকে উপভোগ করিতে চাহি। জীবনে সম্পদ চাহি, বিলাস চাহি, আনন্দ চাহি। মানুষ মাত্রেই ইহা চাহে—অপরাপর প্রাণীরাও চাহে। জীবন্ত প্রাণীর ইহাই স্বভাব ধর্ম্ম। সম্পদ বিলাস ও আনন্দ বঞ্চিত হইয়া নিরবধি দুঃখের বোঝা বহিয়া কোন মানুষ বাঁচিতে পারে না—কোন জাতি বাঁচিতে পারে না। আনন্দ জীবনের লক্ষণ, আনন্দহীন জীবন অতি অলক্ষণা। সে জীবন লইয়াও প্রাণী বিশ্বে পশুভাবে চলিতে ফিরিতে পারে বটে—কিন্তু সে জীবন সত্য জীবন নহে,—তাহা হয় ঘুমন্ত নয় মৃত জীবন। মানুষের জীবনের সার্থকতা ভোগ স্পৃহায়—প্রবৃত্তির চূড়ান্ত পরিপূর্ণ ভোগের পর যদি নিবৃত্তি আসে—সে নিবৃত্তিতে মানুষের জীবনের পূর্ণ সার্থকতা। কিন্তু ভোগ মোটেই করিতে না পারিয়া—জীবনকে আদৌ উপভোগ করিতে সমর্থ না হইয়া যদি অভাবে মনে অসহ্য জ্বালা বেদনা লইয়াও প্রবৃত্তির কোন খেয়ালই চরিতার্থ করিতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া নিবৃত্তির পথে চলিতে হয় তবে সে জীবন অনন্ত দুঃখের জীবনই হইয়া উঠে। এমন জীবন মানুষ চাহে না, চাহিতে পারে না। প্রবৃত্তির খেয়ালে জীবনকে বন্ধনহীন মুক্ত গতিতে চলিতে দেওয়াতেই জীবন দেহের নিগড় বেদন কাটাইয়া উচ্চতরে উঠিবার অধিকারী হয়। আনন্দ সে পায়—আনন্দ তেমন জীবনই পাইতে পারে ও দিতে পারে। জীবনের এই আনন্দিত অবস্থা পাইবার জন্য যুগে যুগে মনুষ্য সমাজ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে—দুঃখের ভীতি বেদনা হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে লড়িয়াছে। কত নির্য্যাতন, অত্যাচার, হত্যাকাণ্ড, সংগ্রাম এই সুখ সাধনার জন্য সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে জগতে আজ পর্য্যন্তও চলিয়া আসিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। দুঃখের হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য—আরও সুখ লাভ করিবার জন্য মানুষ ক্ষেপা হইয়া যাইতেছে—তবু এ সুখ সাধনার বিরাম নাই। সুখ মানুষ চিরদিন চাহিতেছে, বিশ্ব যত দিন থাকিবে দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি মানুষ চাহিবেই। শুধু অসুরত্ব অনন্ত দুঃখের বোঝা বহিয়া বহিয়া মানুষ অবসন্ন, শ্রান্ত ক্লান্ত। তাই সুখ, বিলাস সম্পদহারা মানুষ যদি হারাণ সম্পদ ফিরিয়া পাইতে চাহে তবে সে মানুষের ন্যায্য অধিকার লাভের চেষ্টাই করিতেছে বলিতে হইবে। আর তাহা না করিয়া যদি সুখ হারা মানুষ তেমনি নিশ্চেষ্ট নিরবলম্ব হইয়া—পড়িয়া পড়িয়া ধুঁকিতে থাকে ও নিরাশ জীবনের পানে চাহিয়া জীবনকে ধিক্কার দিতে থাকে—তবে তাহা প্রবৃত্তিমার্গ হইতে দূরে বহুৎ নিবৃত্তির পথে হইলেও সে নিবৃত্তি অতি হীন অতি অমাঙ্গলিক। এমন নিবৃত্তিপ্রাপ্ত জাতির অতীত থাকিলেও তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মানুষের উপযুক্ত নহে। কোনও জীবন্ত প্রাণীর উপযুক্তও বোধ হয় নহে। তাই মানুষ হইতে হইলে এমন নিরানন্দ নীরস জীবন হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দের সন্ধান, ভোগের সন্ধান, জীবনের বিলাসিতার সন্ধান লইতে হইবে। এ গুলি অর্জ্জন করিবার যোগ্য হইতে হইবে।

• • • •

জগতে যোগ্য যে তারই স্থান আছে—অযোগ্যের স্থান নাই। তাই বিশ্ববাসী যোগ্য হইবার সাধনা করিতেছে। মরিয়া থাকা যে জীবন সে অযোগ্যের জীবন। আনন্দ, সম্পদ, বিলাসিতা বর্জ্জিত যে জীবন সে অযোগ্যের জীবন—অমানুষের জীবন। তৃপ্তি শান্তিহীন এই জীবন হইতে মানুষ পরিত্রাণ চাহিতেছে। মানুষের এই প্রচেষ্টার সাক্ষ্য পুরাণ ইতিহাস দিবে। আধুনিক জগতের অধিকারবাদ ও নব সৃষ্ট সর্ব্বপ্রাণী বলশেভিজমও সে সাক্ষ্য দিবে। আমাদের দেশ-জীবনে ও জাতীয় জীবনের এই বিক্ষোভ ও স্বরাজ প্রচেষ্টাও সেই সাক্ষ্যই বর্ত্তমানে দিতেছে। বিশ্বের ব্যথিত, নির্য্যাতিত—শত অভাব গ্লানি মুক্ত জীবনগুলি আজ মুক্তি চাহিতেছে নিবৃত্তির জন্য নয়—জীবনের ভোগ তৃপ্তির জন্যই।

• • • •

আনন্দ বঞ্চিত জন ও জাতির আনন্দলাভের সাধনাও দেশকাল সমর ভেদে বিভিন্ন রকম। মহাভারতীয় যুগে পাণ্ডবদের লাঞ্ছনা নির্য্যাতন ও অত্যাচার অবিচারের হাত হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দ সাধনা করিতে হইয়াছিল দীর্ঘ তের বৎসর বনবাস ও অজ্ঞাতবাস করিয়া। রাণা প্রতাপ নিজ রাজ্য শ্মশান করিয়া—লক্ষ্মী-ছাড়া করিয়া লক্ষ্মীর সাধনা করিয়াছিলেন। আধুনিক জগতের ধনী জার্ম্মেণ জাতি সোনার স্বর্গ অকালকে শ্মশান করিয়া রাখিয়া এই আনন্দেরই সাধনা করিতেছে। জীবনে আনন্দ, সম্পদ অব্যাহত রাখিতে হইলে ক্ষণিক তুচ্ছ আনন্দ লোভ মোহের মায়া ছাড়িতে হয়। পূর্ণকে পাইবার জন্য অপূর্ণের

মায়া কাটাইতে হয়। যাহারা তাহা পারে—তাহারাই পূর্ণ আনন্দের সন্ধান পায়, যাহারা তাহা পারে না ক্ষণিকের মোহে মজিয়া তাহারা ক্রমে আরও অধঃপতনের পথে যায়—সব-হারা হয়।

• • • •

মহাত্মার প্রিয়তম শিষ্য শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার কারামুক্ত হইয়া মহাত্মার সঙ্গ সুখ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। মহাত্মার সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবনের প্রথম অধ্যায়ের বাণী তাঁহার শিষ্যের মুখে ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা কারাগারের অনন্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যেও ভারতের মুক্তির জন্য নিরুপদ্রবতা রক্ষণ, ঘরে ঘরে চরকার প্রচার হিন্দু মুসলমানের একতা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কামনা করিতেছেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই নীতিগুলি পালন করিয়া স্বরাজ লাভের প্রচেষ্টা যতটা সহজ ও স্বাভাবিক অপর কোন নীতিই তত সরল ও স্বাভাবিক নহে। মহাত্মা গান্ধী আজ কারা প্রাচীরে আবদ্ধ না থাকিয়া দেশের ও জাতির মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে বিরাজ করিলে এ নীতির সাফল্য ও সার্থকতা আমরা এত দিন অনেক বুঝিতে পারিতাম। দেশের অবস্থা জাতীয় জীবনের অবস্থাও যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত। কিন্তু শাপগ্রস্ত দেশ ও জাতির মোহঘোরের অবসান হইতে এখনও বিলম্ব আছে। এখনও আমাদের আত্ম-বোধ নিজের ভাল মন্দ জ্ঞান জন্মে নাই। তাই এ গুলি আমরা পালন করিতে পারিতেছি না। যাহা লাভের জন্য জগতের অন্যান্য দেশ ও জাতিরা হেলায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে, দুঃখ কষ্ট নির্য্যাতন সঙ্গ-সাথী করিয়া লইয়া ভীরুতা পরিহার করিয়া বীরত্ব বরণ করিয়াছে, বিজয়লক্ষ্মীকে সকলের উচ্চ সম্মান দিয়া রাখিয়াছে—আমরা জীবনে সেই চির কাম্য বস্তুর জন্য এতটুকু ক্ষুদ্র স্বার্থের মায়াও পরিহার করিতে পারিতেছি না। আজ আমাদের দেশ ও জাতির অবস্থা দেখিয়া একথা মনেও হয় না যে এই জাতিই কোন দিন সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা —আত্মগৌরব ও দেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য বুক ফুলাইয়া উন্নত মস্তকে বিজয় লক্ষ্মীর সাধনা করিয়াছিল। তবে কি দেশের অতীত ইতিহাস—কাব্য পুরাণ, সব মিথ্যা! অতীত কি তবে একটা জলন্ত প্রহেলিকা—তাহা কি শুধু ব্যঙ্গ করিবার জন্যই আমাদের স্মরণ পথে আসে? শুধু সে কি আসে অবসাদ ও লজ্জার ভারে মস্তক ও হৃদয় আরও নোয়াইয়া দিতে?

• • • •

হিন্দুর শুদ্ধি কার্য্য চলিতেছে। ইহা লইয়া আমাদের নিজেদের মধ্যে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও একটা বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য আনিয়াছে। কিন্তু এ চাঞ্চল্য সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। এই শুদ্ধিকার্য্যে আজ মুসলমানেরা যতটা উত্তেজনা ও বৈরভাব দেখাইতেছেন পরে মূল ব্যাপারটি বুঝিয়া যদি হিন্দুসমাজ ইহার চেয়েও বেশী উত্তেজনা ও বৈরভাব না দেখান তবেই এ শুদ্ধিকার্য্য সার্থক হইবে। এই শুদ্ধিকার্য্য সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইলে ইহা হইতে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা অনেকটা দূর হইয়া যাইবে। মূলে উদারতা, শুভ ইচ্ছা ও দেশপ্রীতি থাকিলে ভারতে জাতি-বিরোধ,—কথায় কথায় হিন্দু মুসলমান বিরোধ হয়তো ক্রমে একেবারেই লোপ পাইবে। এই শুদ্ধিকার্য্য হইতেই পরে ভারতীয় একটা বিশাল জাতীয় সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারে।

• • • •

All World Moustache Exhibition.
নিখিল-বিশ্ব গুম্ফ প্রদর্শনী
[সচিত্র—আগামী সংখ্যায়]

হিন্দুরা যাহারা ঘোর জাতি-ভেদ আকাঙ্ক্ষী, অস্পৃশ্যতা বজায় রাখিবার প্রয়াসী, অন্ত-র্জ্জাতিক বিবাহে হিন্দুর হিন্দুত্ব সমূলে বিনষ্টতি হইবে আশঙ্কা করেন—এই শুদ্ধিপ্রথা যদি সত্য প্রাণের উৎস লইয়াই জন্মিয়া থাকে তবে তাঁহাদের এ আকাঙ্ক্ষা যে আরও সমূলক হইয়াই উঠিবে। যে মনুষ্যত্বহীন প্রথায়, ও বিচারশূন্য আচারের খোলসে ধোঁকা দিয়া তাহারা এতকাল অপর সকলকে কুকুর বিড়ালেরও হেয় জ্ঞান করিয়া নিজ প্রভুত্ব ও গৌরব সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা যে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। পণ্ডিতদের অর্থহীন শাস্ত্রবচন উদ্ধারেও, যে আর এ স্রোতে বাধা দিতে পারিবে না। তাঁহাদের মতে ম্লেচ্ছ—অথচ মনুষ্যত্বের দাবী ও আচারেই যে ভারত ছাইয়া ফেলিবে। তবে কি এ শুদ্ধিকার্য্য ভারতের দ্বারাণ মনুষ্যত্ব উদ্বোধনেরই সূচনা—এ প্রয়াস তবে কি বিশাল ভারতীয় নানা বর্ণ ও জাতির এক মন এক প্রাণ হইবারই প্রয়াস—উত্তম! যদি তাই হয়—যদি জাতীয় স্বপ্ন সফল হয়—হে ভগবান জাতির ও দেশের এ প্রচেষ্টা মনুষ্যত্বের এই বিকাশ সার্থক হইতে দাও।

• • • •

ফরাসীর অতি লোভ ও জার্মেন নিষ্পীড়ণ চেষ্টা হইতে হয়তো আবার সমগ্র ইউরোপ ব্যাপী অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। রুহ্রদেশ—জার্মেণীর শস্য সম্পদ ও খনিজ সম্পদে পূর্ণ সোনার মুলুকে ফরাসীরা ঘাঁটিয়া

বসিয়াছে। অথচ এমন সোণার দেশ অধিকার করিয়াও যে ফরাসীরা সে স্থান হইতে সম্পদ আহরণ করিতে পারিতেছে না। অনেকটা নিজ্জিয় নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি চালাইয়া জার্মেনরা ফরাসীর এই অতিলোভ প্রতিহত—ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। মোগল সম্রাট আকবরের সোণার দেবার জয়ের পরিণাম রাণা প্রতাপের চেষ্টায় যে ভাবে পরিণত হইয়াছিল ফরাসীর রুঢ় বিজয়ের সঙ্গে ভারত ইতিহাসের অতীতের সেই অধ্যায়েরও অনেকটা সাদৃশ্য আছে। রুঢ়ের সমস্যা আজ সমগ্র ইউরোপের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জার্মেন জাতি প্রাণ ও মানের জন্য সম্মুখেও যেমন দক্ষ আবার নিরুপদ্রব যুদ্ধে জাতির মান সম্মান রক্ষণেও তেমনি দক্ষ ইহা প্রমাণ করিতেছে।

• • • •

রুঢ় সমস্যা সম্বন্ধে সহযোগী আনন্দবাজার লিখিতেছেন 'রুঢ় দখল করিয়া ফরাসী কি পাইল? টাকা পাইল না, কয়লা পাইল না, পাইল অখ্যাতি! অত্যাচারী ও পররাষ্ট্র লুণ্ঠনকারী, পরস্বাপহারী বলিয়া আজ ফরাসীর অপবাদে সমগ্র জগত ভরিয়া উঠিয়াছে। বিপুল সৈন্যবল ও অস্ত্রবল সহায় জাতির নিকট হইতে ন্যায়সঙ্গত অধিকার কোন নিরস্ত্র জাতির পক্ষে নিরুপদ্রবে প্রতিরোধ করিয়া আদায় করা অসম্ভব বলিয়া যে সমস্ত বিজ্ঞজন মাথা নাড়িয়া তর্ক করিয়াছেন···তাঁহারা জার্মেনীর নিরুপদ্রব প্রতিরোধের সাফল্য সম্পর্কে নীরব কেন? আড়াই লক্ষ উদ্যত সঙ্গীনের সম্মুখেও নিরস্ত্র জার্মেনজাতির এক অংশ, সমগ্রের সহানুভূতির বলে কেমন অটল রহিয়াছে! জার্মেন শ্রমজীবীরা ফরাসীর সাহায্যে বিমুখ হইয়া কর্মত্যাগ করিয়াছে, ফরাসীর নির্মম শাসন ও কঠিন অত্যাচারেও রেলপথগুলিতে গাড়ী চলিতেছে না। কেবল রাষ্ট্রক্ষেত্র নহে, বাণিজ্যক্ষেত্রেও জার্মেনীরা ফরাসীকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছে। এই শক্তিশালী রহস্যটে ফরাসী বিব্রত, অধিকৃত প্রদেশেও তাহারা শান্তিতে বাস করিতে পারিতেছে না। ফরাসী সৈন্যবল সভ্য ও নাগরিকজীবনের সমস্ত সুখ, সুবিধা হইতে বঞ্চিত। বালক, স্ত্রীলোক কেহ তাহাদের সহিত কথা বলে না।'

• • • •

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা-পদ্ধতির উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের অর্থ শিক্ষিত হওয়া নহে—ইহার সোজা সরল অর্থ সোদাসী বিদ্যার পরিপক্কতা অর্জ্জন করা। এই আশা ও মোহে মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালী কাঙ্গাল হইয়াছে, মরিতে বসিয়াছে। তবু এই স্রোতের গতি ফিরাইবার জন্য ন্যায় ও সত্যের মুখ চাহিয়া, জাতিকে বাঁচাইবার জন্য এই শিক্ষাপ্রথার বিরুদ্ধে তেমন ভাবে কেহ কিছু বলেন নাই—বা এই শিক্ষাপ্রথা দূর করিবার চেষ্টা করেন নাই। আমরা বরাবর ইহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিয়াছি। দেশের এই আশা উদ্যম বিনাশকারী, পঙ্গু, অমানুষ তৈরী করিবার যন্ত্র মন্দিরের আমূল সংস্কার বা ধ্বংস চাহিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের মোহে অন্ধ আমরা—অনেকে এই শিক্ষারই গৌরবে অন্ধ। আর চলিত কোন কিছুর বিরুদ্ধে কিছু বলিবার সাহস ও বুকের পাটা আমাদের নাই। গতানুগতিকতায় আমরা সব হারাইয়াছি—তবু ইহা ছাড়াইতে পারি নাই। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন কর্ণধার ভূপেন্দ্র বাবুর মুখে তাই এই গোলাম তৈরী-পদ্ধতি শিক্ষার মূলে এমন ভাবে শীতল জল নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত। ভূপেন্দ্রনাথের চেষ্টায় এ ধ্বংসোন্মুখ স্রোতের গতি যদি ফেরে তবে জাতি অশেষ কল্যাণ পাইবে।

• • • •

দেশে আজ চুরী ডাকাতী, গুণ্ডামীর অন্ত নাই। বাংলার রাজধানী কলিকাতা নগরের উপর প্রকাশ দিবালোকে কিম্বা গ্যাসালোক উদ্ভাসিত রাত্রিতে যেভাবে রাহাজানী চলিতেছে—যে ভাবে লোকের ধনপ্রাণ যাইতেছে—ইহা আমরা নিত্য দেখিতেছি, ভোগ করিতেছি। কিন্তু ইহার প্রতিকার করিবার শক্তি বা সামর্থ্য আমাদের নাই। বাংলা দেশ তিন দশীতে ছাইয়া ফেলিয়াছে—দেশ বাঙ্গালীর অথচ গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত, অপহৃত ও প্রাণে মরে তাহারাই। কলিকাতার অতি প্রকাশ্য পথেও রাত্রিকালে কেহ সঙ্গে অর্থ, আংটি বা ঘড়ি চেন প্রভৃতি লইয়া চলিতে শঙ্কিত হয়। সহরের দোকানে বা অন্য কোন দোকানে রাত্রি আটটার সময় পিস্তলধারী দুটা লোক আসিয়াই সব জোর করিয়া অপহরণ করিয়া মোটারে চম্পট দেয়। আশেপাশের লোক, পথচারী লোক সব অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে। অসংখ্য বাঙ্গালী—অথচ দুটো অস্ত্রধারী লোককে বাধা দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। গুণ্ডার আক্রমণ করিলে চীৎকার করিয়া মরিলেও কেহ তবে সাহায্যের জন্য আসিবে না। সহরের অবস্থা এই—পল্লীর অবস্থা আরও ভীষণ। বাংলার অনেক পল্লীতেই দেখা যায় রাত্রিতে গৃহস্থেরা শান্তিতে ঘুমাইতে পারে না—চোরে তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, অস্ত্রধারী ডাকাত তাহাদের ধন নেয়, প্রাণ নেয়—নারীর লাঞ্ছনা চোখের উপর করিয়া যায়। বাধা দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। সবল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস ও মনের বল আমাদের নাই। বাংলার রাজধানী, সহর ও পল্লীগুলির এই যে ভীষণ অবস্থা ইহা

দিনে দিনে ক্রমেই আরও বেশী হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও আমাদের বাধা দিবার সামর্থ্য ছিল—লাঠি হাতে, না, তলোয়ার হাতে বাঙ্গালী দাঁড়াইতে পারিত কিন্তু আজ তাহার কিছু নাই। রক্ষকের হাতে রক্ষার ভার নিশ্চিন্তে সঁপিয়া আমরা ধরণের মুখে ইজ্জত আরও পা আগাইয়া দিতেছি। উপায় কি—মুক্তভোগী অসংখ্য বাঙ্গালী প্রতিকারের কি উপায় করিতেছে?

• • •

ভারতে লবণ কর বিগুণ হইয়াছে। গরীব ভারত-বাসীর দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নাই। তবু বড়র খেয়াল—মরিয়াও ভারতীয়দিগের এ খেয়ালের তৃপ্তি বিধান করিতেই হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই স্থানে স্থানে এই লবণ তৈরী লইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা, পুলিশ বিভ্রাট চলিয়াছে। ভারতের সাগর জল হইতে ও আরও নানা উপায়ে লবণ তৈরী হইতে পারে অথচ ইহা তৈরী করিবার অধিকার ভারতীয়ের নাই। আমরা পূর্ব্বেই আশঙ্কা করিয়াছিলাম এইরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিবে—সরকারের আকাঙ্ক্ষিত নিশ্চিত কোটী কোটী অর্থ ইহাতেই উবিয়া যাইতে পারে। আমাদের আশঙ্কা আজ সত্যই সত্যে পরিণত হইতে চলিল। আর না হইয়াই বা করিবে কি—বড় আজ অর্থ শোষণে ব্যস্ত, ভারতীয় প্রজা সাধারণের মুখপাত্র বড়র ভয়ে নির্ব্বাক নিস্পন্দ—ভারতীয়েরা জীবন্তে মৃত! এ অবস্থায় এখন দু একটা দাঙ্গা—বা গণবদ্ধ দাঙ্গা যদি হয় তবে আশ্চর্য্য আমরা বিন্দুমাত্রও হইব না।

• • •

বিলেতে—আমাদের রাজার দেশে অনেক নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর ট্যাক্স কমাইয়াও রাজস্বের অনেক কোটী টাকা বাড়তি হইয়াছে—আর আমাদের নানা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর অন্যায় ভাবে অপরিমিত ট্যাক্স বাড়াইয়াও রাজস্বের কোটী কোটী টাকা ঘাটতিই পড়িয়া যাইতেছে। তুলনায় দুই দেশের বিচার করা অন্যায়—তাহা করা চলেও না। তবে আমাদের দেশে যে সব জিনিসের উপর কর ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে রাজার দেশে সেই সব জিনিসের উপর কর ক্রমশঃ কমিতেছে এ কথা বলা চলে। লবণ চিনি, ট্যাক্স ইত্যাদি অনেক জিনিসের উপর অপরিমিত কর বসান লইয়া বহু কথা হইয়াছে। দেশে মদ, গাঁজা প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের উপর করও যথেষ্ট বসিয়াছে—এ কর আমাদের দেশে দিনে দিনে ক্রমশঃ বাড়িতেছে। অথচ বিলেতে বিয়ার প্রভৃতি নাকি শ্রমীকদের অতি আবশ্যকীয়—তাই সে সব মাদক দ্রব্যের কর সে দেশে ক্রমে কমিতেছে। আমাদের দেশে কোন কোন মাদক দ্রব্যও শ্রমীকদের অতি আবশ্যকীয় নহে কি? অথচ যে মাদকদ্রব্য আমাদের দেশের তাহার উপরেও অপরিমিত কর চাপিতেছে। দুর্জ্জয় করে তাহার কাটতি কমিতেছে না—ক্রমে বাড়িতেছেই। এ করগুলি কি কমিতে পারে না?

• • • •

আমরা দেশীয় হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানী সম্বন্ধে নানা অভিযোগ ও অব্যবস্থার কথা শুনিতেছি। হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্সের নামে কয়েকটি মামলাও চলিতেছে। দেশীয় লিমিটেড কোম্পানীগুলির অনেকের অবস্থাই ভাল নহে। তাহার উপর পরের অর্থ ও ন্যস্ত বিশ্বাসের সদ্ব্যবহারও আমরা বড় করিতে পারি না। লিমিটেড কোম্পানীগুলির সহিত দেশের জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ স্বার্থ বর্ত্তমান। তাই এ গুলির সম্বন্ধে অব্যবস্থা ও গ্লানি জনক কথা শুনিলে আমরা ভীত হই। অনেকের অর্থ ও স্বার্থ যদি দু' চার জনের খেয়ালে মারা যায় বা মারা যাইতে বসে তবে সে বড় দুঃখের কথা। আমরা এ সম্বন্ধে কোম্পানীর পক্ষ হইতে কোন কথা না শোনা পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বা ব্যক্তিগত আক্রমণ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু জন সাধারণের হিতের জন্য কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণের তাহাদের পক্ষ হইতে এই সব অভিযোগ সম্বন্ধে কি বলিবার আছে তাহা জানান সঙ্গত। নতুবা এই কোম্পানীর উপর জন সাধারণের এখনও যে বিশ্বাসটুকু আছে তাহাও ভবিষ্যতে আর থাকিবে না।

"বাৎসরিক"

দেশ-গৌরবের বক্তৃতা।

[ভারত-উন্নতি-বিধায়ক সভার বিশেষ সভা হইতে "বাসন্তী"র নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত বিবরণ]

মাননীয় ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ!

অসহযোগ আন্দোলন, ষ্ট্রাট্ ডেভিল অব্ এ ষ্ট্যাটানিক নন্-কো-অপারেশন আন্দোলন দেশের কি ক্ষতি করিয়াছে আপনারাই ভাবিয়া দেখুন! বঙ্গভঙ্গের সময় আমরাও আন্দোলন করিয়াছিলাম, কিন্তু হে মাননীয় মহিলা ও মহোদয়গণ তখনকার আন্দোলনে দেশের কোন ক্ষতি হয় নাই, বরং দেশের দশের যথেষ্টই উপকার হইয়াছিল, কিন্তু এখন বিবেচনা, বিবেচনা...

(চশমা নিরীক্ষণ)

এই সভায় আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত কলিকাতা বাড়ীভাড়ার হাঙ্গামা অবগত আছেন। এই যে জলের মত বাড়ীভাড়া কমাইবার চীৎকার করিয়া লোকে পেটের নাড়ী ফুলাইতেছে, বাড়ীওয়ালার সঙ্গে এই যে বিরোধ মশক-সদৃশ ভাড়াটিয়ারা করিয়া মরিতেছে, বলুন, অসহযোগ-বিষই ইহার মূলমন্ত্র কি না! যাহারই শিল তাহারই নোড়া, তাহারই ভাঙ্গিব দাঁতের গোড়া—তাহারই গৃহে বাস করিব আর তাহারই কি দুর্ভাগ্য,কি দুর্ভাগ্য! অহো, কি দুর্ভাগ্য!

এই যে দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া, মহামারী, মহাব্যাধি, প্লেগ, কলেরা বসন্ত—এ সবই কি ঐ অমঙ্গলকর অসহযোগ আন্দোলনের ফল নহে? বলুন, বলুন, নহে কি? আমি ত বহু চেষ্টা করিতেছি কিন্তু রোগগুলা আমাদের ব মানিতেছে না, তাহারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া অসহযোগই আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। দেশের লোক যদি সহযোগ করিত, উহারাও নিশ্চয়ই করিত কিন্তু ঐ সব দুর্বৃত্ত, খদ্দর পরিহিত—ওঃ

দেখুন! ইহারা এমন গোঁয়ার গোবিন্দ যে যুক্তি বোঝে না, তর্ক বোঝে না, আপনার গোঁ ধরিয়াই চলিতে চায়! গবর্ণমেণ্টের টাকা নাই, তা ইহারা বুঝিবেন না, সভার কাগজ পাইয়া কেবল সব খস্ খস্ করিয়া আঁচড় কাটিবেন আর মাঠে ঘাটে সভা করিয়া গলা সাধিবেন, বুঝিবেন না যে গবর্ণমেণ্টের কত খরচ হইয়াছে, তবে তাঁহারা নুনে হাত দিয়াছেন! হয়ত একদিন

তারপর, উত্তরবঙ্গের বন্যা! ইহার কারণ কি? বলুন, আপনারা—বলুন! এই যে অর্দ্ধবঙ্গ ভাসিয়া গেল—লক্ষ লক্ষ নরনারী ভাসিয়া বসিয়া খোয়া হইয়া গেল, ইহার কারণ কি ঐ পদ্মার সঙ্গে অসহযোগই নয়! ভাবিয়া উত্তর দিন। ভাবুন সেই কথা, শুনুন সেই গগনভেদী হাহাকার,কাণ পাতিয়া শুনুন সেই মরণ আর্ত্তনাদ আর না, আর না, আর আমি বলিতে পারি না—ওঃ। (চক্ষু অ ছ করিলেন)।

ভাতেও হাত দিবেন, কি করিবেন, যাহাদের রক্ষার ভার হাতে লইয়াছেন, রক্ষা না করিলে তাঁহাদের কি দুর্নাম হইবে না? তাঁহাদের দুনামে কলঙ্ক···

আরও দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিবার প্রমাণ গ্রহণ করুন। এই সদাশয় গবর্ণমেণ্ট, যিনি আমাদের পোষক, রক্ষক, তক্ষক, ভক্ষক, তাঁহার সঙ্গে অসহযোগ করিবেন আবার—আবার—তাঁহাদের হাসপাতালে গিয়া অম্লানমুখে রোগ দেখাইবেন, ঔষধ লইবেন। দেখিলেন —স্পর্দ্ধা! না মহাশয়, আপনারা যাহাই বলুন, এ আমি সহিতে পারিব না—কিছুতেই না! সে অনুরোধ আপনারা করিবেন না, অনিয়ম সহিতে—আমিই জগতে শেষ মনুষ্য!

আরও বলি শুনুন! ইহারা বলে হিন্দু মুসলমানে সম্প্রতী আনিতে হইবে। কিন্তু কি উপায়ে জানেন? একেবারে গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিতে চান? মুসলমানগণ একটু আধটু গরু খান, খাইয়া প্রাণধারণ করেন, ইহারা তাহা বন্ধ করিয়া দিতে চান। শুধু কি তাই? আমাদের রাজার জাত, যাঁহারা দেশের মায়া, আত্মীয়স্বজনের মায়া কাটাইয়া সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আসিয়া আমাদের জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রধান খাদ্য—এই গরু! তাহাই বন্ধ না করিলে ইহাদের পেটের ভাত চাল হইতেছে, ইহাদের নাক ডাকাইয়া ঘুমের ব্যাঘাত হইতেছে। দেখুন একবার, কাণ্ডটা দেখুন! কিন্তু মহোদয়া আর মহোদয়গণ, আমি ইহাও শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমার ধড়ে প্রাণ থাকিতে তাহা কখনই হইতে দিব না, দিব না, দিব না! আমার কথা ভীষ্ম-বাক্য-তুল্য! আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, দেখিবেন তাহার নড়চড় হইবে না! আপনাদের বঙ্গভঙ্গের সময়ের কথা মনে আছে, কেডারেশন হলের কথা মনে আছে—এবারেও দেখিবেন, দেখিবেন—

মহোদয়গণ আরও দেখুন! এই অসহযোগ আন্দোলন আরও কত সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। আমাদের দোষে দেশে মহামারী, মহাদুর্ভিক্ষ, মহা—মহা—মহাকাল ও আনিয়াছেই, তাহা ছাড়াও সুদূর ইংলণ্ড প্রভৃতি হীরা-মুক্তা মণি-মাণিক্যের দেশেও কি ক্ষতি করিয়াছে! ম্যাঞ্চেষ্টারের লোক কাপড় বুনিয়া খাইত, সে ব্যবসা তাহাদের বন্ধ হইয়া গিয়াছে; ল্যাঙ্কেসায়ারের লোক লজ্জানিবারণ করিয়া ভারতবাসীকে মানুষ করিয়া তুলিতেছিল—এই পৈশাচিক আন্দোলনের মেসিন-গান-স্বরূপ চরকা তাহাদেরও প্রাণে মারিবার চেষ্টায় আছে? সাধে কি আমি এই নৃশংস আন্দোলনে যোগ দিই নাই? মুখে যতই ইহারা অহিংস অহিংস চেঁচান, ইহাদের ভয়ানক হিংসা মহাশয়, ব্যাঘ্র ভল্লুকের চেয়েও বেশী হিংসা। কিন্তু হতভাগারা ভাবে না যে একালে হিংসা করিয়া না হয় কোন গতিকে কাটাইল কিন্তু পরকালে গিয়া ঐ—ঐখানে গিয়া—কি কৈফিয়ৎ তাহারা দিবে?

হতভাগ্যদের কি দশা হইবে ভাবিতেও আমার অঙ্গ অবশ, স্নায়ু শীতল, প্রাণ পিঞ্জরছাড়া হইয়া যাইতেছে। ওহো—ওহ্ (নয়ন সজল)

[সভার কাণিশে একটা টিয়া বসিয়াছিল, বলিয়া উঠিল—আমরা নিমতলায় লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছি।

দোটানা

(গল্প)

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা হইতে উনিশ মাইল দূরে এক ইরিগেশন-ক্যানালের ঠিক পার্শ্বে নাতিবৃহৎ বাঙ্‌লোগৃহের উন্মুক্ত চত্বরে সান্ধ্য-সম্মেলন জমিয়া উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড সতরঞ্চের উপর সাদা জাজিম পাতা, গোটা কয়েক মোটা মোটা তাকিয়া এ-ধারে ও-ধারে পড়িয়া আছে, কয়েকটি যুবক ও প্রৌঢ় বসিয়া সঙ্গীতালাপ করিতেছিলেন। মধ্যস্থলে একখানি প্রকাণ্ড সিল্‌ভার ট্রের উপর দুইটা হোয়াইট লেব্‌লের বোতল, একটা কাক-চক্ষু, গোটা চারেক 'সোডা-ওয়াটার', দুইটা কাঁচের গ্লাস রক্ষিত। আর একটি ছোট রেকাবের উপর কয়েকটি সিগারেট ও একটি দেশলাই বাক্স পড়িয়া। সমবেত সকলের হাতেই একটি করিয়া বাদ্য-যন্ত্র, কেবল গৃহস্বামী সতীশচন্দ্র একধারে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন।

সতীশচন্দ্র কলিকাতার ছেলে, বহুকাল কলিকাতায় কাটাইয়া সম্প্রতি কিছুদিন হইল খালের ধারে এই সুন্দর বাঙ্‌লোটি নির্মাণ করাইয়া অজ্ঞাতবাস করিতে আসিয়াছিলেন। তাহার কারণও ছিল।

সতীশ চিত্রকর। যে-সময়ে সাধারণ ছেলেরা স্কুল কলেজের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া বিসর্জন ও বাহ্যাক্ষর করিতে থাকে, সেই বয়সেই সতীশের যশঃ খ্যাতি প্রতিপত্তিতে সারা বাঙ্‌লা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সতীশ বোম্বাই প্রদেশের কোন এক অনাবিষ্কৃত গুহার প্রতিলিপি বাহির করিয়া প্রথম সাধারণ্যে পরিচিত হয়, তাহার পর সতীশ যখন সেই বহু পুরাতন কালের ভারতীয় রীতিনীতিকে আধুনিক বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া চারু চিত্রকলার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল, তখন সারা দেশের লোক এই নবীন চিত্রকরের তুলিকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল।

ছবি আঁকিয়া অর্থ উপার্জন করার দরকার সতীশের ছিল না, সখের মাথায় ছবি আঁকা শিখিয়া, সতীশ যৌবনের উদ্দাম স্রোতে ভাসিয়া বোম্বাই গিয়া সেই গুহার সন্ধান পায়। তখন আর সখ ছিল না, শিল্পীর সাধনা সতীশকে তখন পাইয়া বসিয়াছিল। তারপর যখন সে কলিকাতায় ফিরিল তখন সাহিত্য সঙ্ঘ প্রথম তাহাকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া লইল; ইংরেজী বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকের অভিনন্দন পত্রে সতীশের দেরাজ ভর্ত্তি হইয়া উঠিতে লাগিল; নিত্য নূতন বন্ধুলাভ হইতে লাগিল,—সতীশের চিত্ত তখন পুষ্পোদ্যানের মধুপের মত মত্ত, মুগ্ধ। সেই সময়েই বিলাতের একটি বণিক কোম্পানী এ-দেশে পশম-রেশম বস্ত্রের ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সতীশের কাছে বিজ্ঞাপনের কয়েকখানা ছবি আঁকাইয়া লইতে আসে, সতীশ অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত "অর্ডারটা" গ্রহণ করিয়াছিল, শিল্পীর চিরাচরিত নিয়মানুসারে কয়েক দিন হাঁটাহাঁটি করাইয়া ছবি ক'খানি সাহেবকে দিয়া দিল, সাহেব দশ মিনিট ধরিয়া ছবিগুলি দেখিল, তারপর গম্ভীরভাবে একটা ধন্যবাদ উচ্চারণ করিয়া উঠিয়া গেল, সতীশও কিছু বলিল না, সাহেবও আর কিছু বলিল না। দিন আষ্টেক পরে রেজেষ্ট্রীডাকে একখানি হাজার টাকার চেক পাইয়া শিল্পী সন্তুষ্টও যেমন হইল, বিস্মিতও তেমনি অল্প হইল না। আবার কিছুদিন পরে তাহারা আর কয়েকখানি ছবির অর্ডার পাঠাইয়া দিল, অর্ডার সংযুক্ত পত্রে লিখিল, আপনার গতবারের পারিশ্রমিক ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা যথেষ্ট দিতে পারি নাই, সে বিষয়ে আমাদিগকে বিলাতের আফিসের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। এখন বিলাতের আফিস আপনার অঙ্কিত চিত্রগুলিতে সন্তুষ্ট হইয়া এই নূতন অর্ডার পাঠাইতেছেন। আপনার সম্মতি পত্র পাইলেই আমরা বিলাত আফিস হইতে এই কয়খানির উপযুক্ত পারিশ্রমিক মঞ্জুর করাইয়া রাখিব।" পত্র পাইয়া সতীশের দেহ মন একদিকে

যেমন ভরিয়া উঠিল, অন্য দিকে তেমনি সাধনার পুরস্কার পাইয়া আনন্দও হইল। কিন্তু কলিকাতায় থাকিয়া কাজ-কর্ম চালানো তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুর্ঘট ছিল। এত-দিকে এত রকমের আকর্ষণ তাহার ছিল যে কোনটাকেই সে অবহেলা করিয়া উঠিতে পারিত না, তাই কয়েকদিন দিবারাত্রি ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এক মাতুলের নির্দেশমত শিমুড়ে এই বাঙলোটি প্রস্তুত করায়; শূন্য গৃহ পূর্ণ করিতে আরতিকে বিবাহ করিয়া সতীশ নির্জন আবাসে আসিয়া বাস করিতেছিল।

হঠাৎ একদিন অপরাহ্নে পাঁচ সাতটি বন্ধু আসিয়া সতীশের অজ্ঞাত আবাসের দ্বারে অতিথি হইল। বহু দিন পরে প্রিয়জন সমাগমে সতীশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখনি শ্রীরামপুরে লোক ছুটিল, আমোদ-প্রমোদের সমস্ত উপকরণ আহরিত হইল, সন্ধ্যার পর গান-বাজনা আরম্ভ হইল। সতীশ নিজে পান করিত না, স্বহস্তে ঢালিয়া বন্ধুদের তৃপ্তি বিধান করিতেছিল।

রাত্রি ৮টার গাড়ী চলিয়া গেল, ভিতর হইতে আরতি ভৃত্য দ্বারা সতীশকে ডাকিয়া বলিল—বন্ধুদের খাওয়া দাওয়া হবে কখন?

সতীশ রসিকতা করিয়া বলিল—যখন মাপাবে।

আরতি চিনটি খাইয়া পাটকেল ছুড়িল, বলিল—আমিত ভাল জিনিষ মাপাবার ব্যবস্থা করছি, তুমি যে বিষ মাপাচ্ছ।

সতীশ হাসিয়া বলিল—দেখলে না-কি?

আরতি বলিল—হাঁ, একবার ছাদে উঠেছিলুম, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল।

বলে ওরা।

তা বেশ করেছ। কিন্তু খাইয়ে দাইয়ে দাও তাড়া-তাড়ি। যে রকম লাফালাফি চল্‌ছে, দেখে খাওয়া জুটুলে হয়। ছোট কাকার কাণ্ড আমারাও ত ছেলে বেলা থেকে দেখেছি। উঃ—মনে হলে এখনও গা শিড়শিড় করে!

সতীশের শ্বশুরের বিধান বাবু সহরের একজন খ্যাত-নামা মদ্যপ। সতীশ বিবাহের রাত্রেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছিল। আরতির কথা শুনিয়া সে হাসিয়া বলিল—না, না, এদের ভেতর কেউ তেমন নেই। ঐ-যে একটি বুড়ো গোছের লোক আছে—দেখছ—উনি, বাঁধন বাবুই যা একটু বে-সামাল হ'ন, নইলে আর—কাউকেই কোন ভয় নেই।

না থাকলেই হল, কিন্তু তুমি খাইয়ে দাও, আর সবই যখন হয়ে গেছে!

দেখি—বলিয়া সতীশ অন্তঃপুর ছাড়িয়া গেল। বাহিরে আসিতেই দেখিল, বারান্দার শেষ প্রান্তে দুইখানি বেতের —একজন অপরিচিত লোক বসিয়া, তাহার পার্শ্বে একটি সাহেবও উপবিষ্ট! সতীশ আসিতেই বাঙ্গালী ভদ্র-লোকটি দাঁড়াইয়া দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—আপনারই নাম...

সতীশ বাকীটা না শুনিয়াই বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। কোত্থেকে আসছেন?

ভদ্রলোক সে কথার কোন উত্তর করিয়া উপবিষ্ট সাহেবটির দিকে ফিরিয়া কি ইঙ্গিত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই সাহেব মাথার টুপি খুলিয়া সতীশের দিকে দক্ষিণ কর বাড়াইয়া দিলেন। সাহেব পকেট হইতে একখানি ভিজিটিং কার্ড বাহির করিয়া দিতে, সতীশ তাহা পাঠ করিয়া বলিল—ইয়েস্?

সাহেব বলিলেন—আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করিয়াছি, ক্ষমা করিবেন। একটা বিশেষ কাজে আসিতে হইয়াছে, যদি একটু নির্জনে···

সতীশ বলিল—আসুন।

কয়েক মিনিট পরেই তিনজনে বাহির হইয়া আসি-লেন। বিদায় সম্ভাষণ করিয়া আগন্তুকদ্বয় বিদায় হইতেই, সতীশ ফরাসে বসিয়া পড়িয়া গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া লইল; বারকতক টানিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া কলিকা বদলাইতে আদেশ দিল।

প্রকাশ বাবু বেহালার কর্ণ মর্দন করিতেছিলেন, বলিলেন—লাল মুখ, সতে, ব্যাপার কি?

সতীশ—না—বলিয়া কলিকাহীন গুড়গুড়িতেই টান দিল। তাহার মুখভাব অত্যন্ত গম্ভীর।

প্রকাশ পুনশ্চ কহিলেন—কি হয়েছে বলই না বাপু!

সতীশ বলিল—একটা মোটা টাকার কাজ পওয়া গেল বটে, কিন্তু...

প্রকাশ তাহার নৈরাশ্যপূর্ণ স্বর ও ভঙ্গিমা অনুকরণ করিয়া কহিল বটে! আসল কথাটা তবু বলবি না?

সতীশ বলিল—সাহেবটা কে জানিস?

না বল্লে জান্‌তে পারব এমন দৈবিক বিদ্যে ত জানা নেই রে!

ও হচ্ছে—রয়াল থিয়েটার্‌এর এসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার।

কি চায়—ছবি?

ছবি বটে—তবে...

আবার 'তবে'?

না রে! বড় মুস্কিলে ফেলেছে! ওদের বিলেতের কোম্পানী সেখানে একখানা কি নাটক প্লে করবে, তাতে এক সাহেব বাঙ্গালী মেজাজ মস্ত হয়ে সর্বস্ব খুইয়েছে, এই দেখাতে হ'বে, তা ওরা আমার কাছে এসেছে, একটা ছবি—মেজাজ একখানা ছবি এঁকে দিতে হবে।

অন্যান্য বন্ধুগণ যাঁহারা এযাবৎ এদিকে কর্ণপাত করেন নাই, এক্ষণে এই পরম স্বাদু ও রুচিকর প্রসঙ্গে একাগ্রচিত্ত হইয়া পড়িলেন; সকলেই সমস্বরে—কি কি—করিয়া এইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

সব কথা শুনিয়া নন্দন বাবু কহিলেন—এ আর বেশী কথা কি! একটা এঁকে দাও!

দুলাল বলিলেন—আমি মডেল দেব সতীশ, একেবারে খেয়াও!

বাদল বাবু বলিলেন—ফটো তুলে নিলেই ত হয় বাবা!

প্রকাশ বলিলেন—আমিও তাই বলি!

সতীশ বলিল—তা হয় না। ওরা যে জিনিষ চায়, ফটোয় তা পাওয়া যাবে না, ফটো যে দেবে সে প্রস্তুত হয়েই দেবে, স্বাভাবিকতা থাকবে না, ওদের যা উদ্দেশ্য তা সিদ্ধ হবে না। সেই জন্যে ছবি চায়।

তার আর কি রে! আমি হেমেনের কাছ থেকে একখানা ছবি এনে দেব তোকে। তাই থেকে...

তা যে হয় না, তা-নয় প্রকাশ। কিন্তু সে রকম আমি করব না। ব্যাটা একটা যা কথা বলেছে—সব দিক দিয়ে আমাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।

সকলেই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন, সতীশ বলিল—ব্যাটা বল্লে কি জানিস্! বল্লে—আপনার কাছে এসেছি তাই থেকেই বুঝতে পারছেন বোধ হয়,আমাদের কি রকম ছবি চাই! ব্যাটা একেবারে মর্মে ঘা দিয়ে গেছে... সতীশ এক মিনিট থামিয়া বলিল—কাজটা না নিলেই ভাল হত! তবে অনেক টাকা আর বিলেতের সঙ্গে একটা চাচ্‌ (যোগ) এর লোভও বড় কম নয় ত!

প্রকাশ বলিল—আমার সঙ্গে যাস্, আমি একটা ভাল জিনিষ দেখাব, এঁকে নিতে পারবি।

সতীশ চিন্তামগ্ন।

প্রকাশ বলিলেন—তুই যেমনটি চাস, ঠিক তেমনি। দিন দু'তিন দেখ্‌লেই হবে ত!

তা হবে।

চল—কলকাতায়।

অনেকেই সুরাবিজড়িত কণ্ঠে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল—সেই বেশ! সেই বেশ।

সতীশ মাথা নাড়িয়া, নলে টান দিল; বার দুই কাসিয়া নলটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল—সত্যি প্রকাশ দা?

সত্যি!

ভৃত্য আহারের সংবাদ দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাহারা আরতিকে একটু বেশী মাত্রায় 'আদুরে, আবদারে' বলিয়া অনাকাঙ্ক্ষিত নিন্দা করিত, তাহারা একটু বেশী মাত্রায় অবিবেচক। বালো পিতৃমাতৃহীনা আরতী স্বামীকে একটু বেশী ভালবাসিত বলিয়াই আদর আবদারের মাত্রাটা কখনই সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিত না। আর থাকিবেই বা কেন বাপু? একলা ঘরের একলা গিন্নী, সুন্দরী শিক্ষিতা, হাস্যময়ী প্রফুল্লমুখী স্ত্রী আদুরে আবদেরে হইবে না ত কি তুমি হইবে? কক্ষাকী ঘোমটা মুখী, কাক্ষিবদোষা হইয়াও যদি তুমি স্বামী সোহাগিনী হইবার স্পর্দ্ধা রাখিতে পার তাহা হইলে আরতিরই বা দোষটা কিসের?

আরতি স্বামীর মুখে যেই শুনিল, কার্যব্যপদেশে তাহাকে কিছু দিনের জন্য শহরে বাস করিতে হইবে,

অমনি কোন্ কোন্ বাক্স তোরঙ্গ সঙ্গে যাইবে, ক'টি বিছানার বাণ্ডিল হইবে, আরতির কোন্ কোন্ কাপড় কাচা-বাড়ী আছে—তাহারই তালিকা করিতে বসিয়া গেল। নিধিরামকে লইয়া যাইতেই হইবে, সে ছাড়া সহরে বাজারের কাজেকর্ম সুচারুরূপে করিতে পারে এমন চাকর একটিও নাই, অথচ রামচন্দ্র যে হাঁদারাম তাহাকে এ বাড়ীতে রাখিয়া যাওয়াও যা, বাড়ী অরক্ষিত ফেলিয়া রাখাও তাই—আরতি বড়ই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল।

সতীশ এতক্ষণ আরতির মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া বসিয়াছিল, আরতি যখন ভাবনায় মগ্ন হইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া পরামর্শ প্রার্থনা করিবে, সতীশ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। আরতি বিস্ময়মুগ্ধভাবে বলিয়া উঠিল—হাস্‌লে যে?

সতীশ বলিল—তোমার কাণ্ড দেখে!

আরতি বলিল—বুঝেছি, তুমি বুঝি নিধিরামকে এখানে রেখে হাঁদাগঙ্গারামকে নিয়ে যেতে চাও! তা বেশ ত, নিয়ে চল-না, সেখানে গিয়ে মজা টের পাবে'খন। তখন কিন্তু আমায় দুষতে পারবে না। আর দুষলেই বা হচ্ছে কি! আমি ত কলকাতায় গিয়েই দিনকত বাবুকে নিয়ে খুব বায়স্কোপ দেখে বেড়াব, তোমার হাঁদারাম হারিয়েই যাক্ আর চুরিই যাক্—আমি ত কিছু বল্‌ব না।

সতীশ হাসিয়া বলিল—কিছু বল্‌তেও হবে না।

তার মানে?

সতীশ হাসিয়া বলিল—মানে, তুমি এখানেই থাক্‌বে!

আরতি হাসিয়া, দুই হাতে সতীশকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—ইস্নি!

সতীশ বলিল—ইস্নি নয়, সত্যি! আমি কাজে যাচ্ছি।

আরতি মুখখানা গোমড়া করিয়া বলিল—আমি যাব না, কক্‌খনো যাব না, কিছুতে যাব না, কোথাও যাব না, এই তিন সত্যি করলুম।" বলিয়া সে ওদিকে ফিরিয়া, খুব আড়ষ্ট শক্ত হইয়া শুইয়া রহিল।

সতীশ দুইটা চিমটি কাটিল, আরতি তবুও নড়িল না, সতীশ তখন কবরীর কাঁটা ধরিয়া টানিল, আরতি ঝঙ্কার দিয়া কহিল—ছেড়ে দাও, ভাল লাগে না!—একটা প্রবল নিঃশ্বাস শব্দে চমকিত হইয়া সতীশ বলিল—আর রাগ করতে হবে না, শোন, শোন!

আরতি মনে মনে হাসিয়া, যেমন শুইয়া ছিল, তেমনি রহিল।

সতীশ তাহাকে বুকের কাছে টানিতে টানিতে বলিল —আচ্ছা তুমি যে যেতে চাইছ, আমি কাজে কর্মে ঘুরে বেড়াব, তুমি একলা বাড়ীতে থাক্‌তে পারবে? ভয় করবে না? ভূতের ভয়...

হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাও, ভারি আমার ভূতের ভয় কি-না! আর একলাই বা থাক্‌ব কেন, আমি ত গিয়েই হাবুকে আনিয়ে নোব।

পরদিন প্রত্যূষে প্রকাশ বাবু কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সতীশের হাতিবাগানের বাড়ীখানা ছয় মাস হইতে খালিই পড়িয়াছিল, প্রকাশ বাবু সকালে পৌঁছিয়া ঘর-দ্বার সাফ করাইয়া সন্ধ্যায় হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিবেন, এইরূপ স্থির ছিল।

অপরাহ্ণে আরতির আদেশমত রামচন্দ্রকেই এ বাড়ীর রক্ষক বহাল রাখিয়া সতীশ আরতিকে লইয়া যাত্রা করিল; বন্ধুবান্ধবগণ ইতিপূর্বেই সব ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছিলেন।

বাড়ী পৌঁছিয়া, প্রকাশ সতীশকে বলিল—কি রে সতে, আজই যাবি?

সতীশ বলিল—আজ আর নড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না, বড় ক্লান্ত।

প্রকাশ বলিলেন—বেশ, কালই যাওয়া যাবে—কি বলিস্? কাল সন্ধ্যেবেলাই যাত্রা হওয়া যাবে।

আরতি হাবুকে আনাইয়া লইল। হাবু—তাহার ছোট কাকার একমাত্র পুত্র—আরতির বড়ই অনুগত। আরতি তার সঙ্গে বেলা পাঁচটা বাজিতেই কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটকে বায়স্কোপ দেখিতে চলিয়া গেল।

প্রকাশ বলিলেন—চ।

সতীশ বলিল—তুমি আর আমি! না প্রকাশ, নন্দনদেরও খবর দাও।

সে সব ঠিক আছে—তারা এতক্ষণ পৌঁছে গেছে। চ', চ।

চল—বলিয়া সতীশ উপরে উঠিল। আরতি বাড়ী নাই সতীশ জানিত, স্বচক্ষে দেখিয়াছে তাহাকে গাড়ী চড়িতে, তবু নিজের ঘরে ঢুকিয়া খাটের উপর বসিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল, নিবিরোম যখন আসিয়া জানাইল নিচে বাবুটি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ডাকাডাকি করিতেছেন, সতীশ চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া ধীরে ধীরে কক্ষত্যাগ করিল।

মেয়েটির নাম কল্পিনী। নিখুঁত চেহারাটি, রং উজ্জ্বল গৌর, মুখাবয়ব অতি রমণীয়, গড়ন—পরিপাটি! তাহার হাতে, মধুর কণ্ঠের সঙ্গীতে, নৃত্যে, আলাপে পাঁচ ছয় ঘণ্টা যে কি করিয়া কাটিয়া গিয়াছিল, সতীশ তাহা জানিতে পারে নাই। চং করিয়া ঘড়িতে একটা ঘা পড়িতেই চাহিয়া দেখিল, কাঁটায় কাঁটায় একটা!

সতীশ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রকাশকে বলিল—আমি চল্লুম।—প্রথমাবধি গৃহাধিকারিণীর সহিত সে একটা কথাও বলে নাই, এখনও বলিল না। সে-দিকে চাহিলও না, বাহির হইয়া গেল।

আরতি ছটফট করিতেছিল। একবার ঘর, একবার বাহির করিয়া আপনার মনে এত রাত্রি হইবার যত রকম স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কারণ ভাবিতে পারে, ভাবিতেছিল, দুয়ারে ট্যাক্সি দাঁড়াতেই আরতির চোখ দুইটার কোণ ছুঁড়িয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

সতীশ ঘরে ঢুকিতেই ছল-ছল নেত্রে তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল—এত রাত হল কেন?

সতীশ বলিল—কাজ ছিল, বলেছিলুম ত!

আরতি স্বামীর রুক্ষ অবিন্যস্ত কেশের দিকে চাহিয়া, তাঁহার শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া অন্তরে বড়ই পীড়া অনুভব করিতেছিল, বলিল—কি কাজ, হ্যাগা?

সতীশ জামা ছাড়িতে ছাড়িতে, আরতিকে নিকটে টানিয়া বলিল—ছিল একটা!

আরতি বুঝিল, যে কাজই হৌক, স্বামী বলিতে ইচ্ছুক নহেন, যদিও ইহাতে তাহার অভিমান ক্ষুব্ধ হৃদয়ে আঘাতই বাজিল, সে তাহা প্রকাশ না করিয়া জামাটি আলনায় ঝুলাইয়া দিয়া বলিল—আর যাবে না ত?

আরও ক'দিন যেতে হ'বে বৈ-কি!

শুনিয়া আরতি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল—রাত্রে যাবে? কেন, কি এমন কাজ যে দিনে হয় না?

আছে একটু—বলিয়া পত্নীকে বাহুবেষ্টনে টানিয়া সতীশ বিছানায় প্রবেশ করিল এবং শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহ মন অতি শীঘ্রই তাহাকে নিদ্রাভিভূত করিয়া দিল। কিন্তু আরতির চোখে নিদ্রা ছিল না। কি কাজ, কেমন কাজ ভাবিতে ভাবিতে, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বেই প্রত্যুষালোকে শয্যাত্যাগ করিয়া যাইতে হইল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

টাকা

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর]

(প্যারডি—সজল জলদাঞ্জনিভ···)

অমল ধবলায় মুখোলায় টাকা ধরাতলে,
হেরিলে যারো প্রাণমন বকভালে আঁখিজলে
এমন কবিরাজ ভোজে বসিলে ভদ্রামণ্ডলে,
তোমারি কৃপা লাগি দ্বিজরাজ ভবে চঞ্চলে
সবে উচ্চকুলে তুচ্ছ করি পুচ্ছ তুলে শিঙ তুলে
তুচ্ছ করে ধর্ম জাতি ঘুরিছে বন জঙ্গলে,
কবিশেখর ভণে এ জীবনে নেইক টাকা এ কপালে,
কাটিতে পারো মারিতে পারো কিনিতে পার
টাকা দিলে!

জাগরণ

[শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত]

সে ছিল এক যুগ—আমানিশার গাঢ় তমিস্রা ভেদ করিয়া তখনও অরুণোদয় হয় নাই, জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতার আলোকপাতে মানব শিশুর হৃদয়ের কালিমা বিদূরিত হয় নাই, তাহার নয়ন সম্মুখ হইতে কুহেলীর ঘন যবনিকা তখনও অপসারিত হয় নাই। উত্তর প্রদেশের শুভ্র তুষারাবৃত অজ্ঞাত ভূমি হইতে আর্য্যদের বিজয় দুন্দুভি ধ্বনিত হইয়া তখনও ধরণীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নাই, মরু-প্রান্তরে প্রস্ফুটিত কুসুমের মত কবি-কল্পনার সুখ-স্বপ্নের মত মর্ম্মর প্রাসাদ সমাকীর্ণ জনবহুল নগর নগরী সুজল-সুফল-শ্যাম আর্য্যাবর্ত্তের বক্ষে ফুটিয়া উঠে নাই! এ সেই যুগের কথা, যখন মানুষের মনুষ্যত্ব ছিল না, নাম ছিল না, পশুর সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য ছিল না, যখন অশন বসন শয়ন ভিন্ন আর কিছু জানিত না।

হিমালয়ের পাদমূলে দূর-নীলিমা প্রান্ত-চুম্বি লবণাম্বুর নীল সলিলরাশি ভীমবেগে আসিয়া প্রহত হইতেছিল, পার্শ্বে কিয়দ্দূরে আচক্রবাল বিস্তৃতা ধূসর বেলা ভূমি, সূর্য্য কিরণ সম্পাতে হীরক খচিতবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল, তথায় নানা জাতীয় পশুপক্ষী আনন্দে ক্রীড়া করিতেছিল। বেলার উত্তরে "তমালতালীবনরাজিনীলা" তটভূমি। তাহার স্নেহ-শীতল বক্ষ হইতে এক মানব দম্পতি বাহির হইয়া আসিয়া বেলাভূমির উপর দাঁড়াইল এবং পুলক-বিস্ফারিত নয়নে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে করতালি দিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। সেদিন নব-বসন্তের নবীন আম্রমুকুল তপ্তাধরস্থীর মুখে স্নিগ্ধ প্রলেপের মত পুরাইয়া গিয়াছিল, বনৌষধির মধুর গন্ধের সহিত মিলিত মৃগমদের তীব্র ঘ্রাণে দক্ষিণানিল পাগল হইয়া ফিরিতেছিল, কোকিল পাপিয়ার আকুল কণ্ঠের সহিত শিখীগণের উচ্চরব মিলিত হইয়া এক নূতন ঐক্যতান আকাশে বাতাসে মথিয়া ছড়াইতেছিল।

তাহারা সমুদ্র বিহারে আসিয়াছে। প্রতিবৎসর এমনি দিনে তাহারা আসে। এ যেন তাহাদের জীবনের একটা অঙ্গ। ঠিক সময় হইলে সাগরের জল কল্লোল বহুযোজনদূর হইতেও তাহাদের হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারে গিয়া আঘাত করে। সে আহ্বান প্রতিরোধ করিবার শক্তি তাহাদের নাই,—তাহারা ছুটিয়া আসে। এবারে ও তেমনি আসিয়াছে।

তাহারা আনন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল। সেই রৌদ্রদীপ্ত বেলাভূমিতে তাহারা শিশুর মত ছুটাছুটী করিতে লাগিল! কখনও বা এ উহাকে ধরিতে যায়, কখনও বা নিজে ছায়ার মতকে পদাঘাত করিতে যায়, আবার কখনও বা সাগর জলে ঝম্প প্রদান করিয়া সন্তরণ করে,—এইরূপে তাহারা দিন কাটাইতে লাগিল।

সুখের দিন শীঘ্র ফুরাইয়া যায়। ক্রমে বর্ষাকাল সমাগত হইল, ঘনঘটায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, গুরুগম্ভীর মেঘগর্জ্জনে, ভেকের চিৎকারে অবিশ্রান্ত ঝিল্লিরবে ধরণী মুখরিত হইয়া উঠিল, সাগরের কল্লোল ভীষণ হইতে ভীষণতর হইল। জলের বেগ অতি প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে শোকসন্তপ্তা ডাকিনীর মত সর্ব্বনাশিনী বাটিকা হু-হু শব্দে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। তাহারা আর সাগরকূলে বাস করিতে পারে না—ঘরে ফিরিয়া চলিল।

ঘর তাহাদের কোথায়? তাহাদের জাতির কেহ বা বৃক্ষকোটরে কেহবা পর্ব্বত গহ্বরে, কেহবা ভূমিতলে গর্ত্ত খনন করিয়া বাস করে। তাহারাও এক পর্ব্বত গহ্বরে বাস করে। সাগর বিহারে শুধু তাহারাই আসে নাই, তাহাদের ন্যায় বহু দম্পতি আসিয়াছিল, অথচ সকলেই পৃথক্ পৃথক্—কাহারও সঙ্গে কাহারও সদ্ভাব নাই। সকলেই ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে কেহ বা ফিরিয়া চলিয়াছে। তাহারা পথ চলিতেছে। অগ্রে পুরুষ—বলবীর্য্য-পৌরুষের প্রতিমূর্ত্তি, হস্তে তাহার দীর্ঘ যষ্টি, পশ্চাতে নারী যৌবনের তাড়িতা বল্লরীর মত লীলাময়ী, লাজসঙ্কোচ বিহীনা, স্কন্ধে

তাহার কতকগুলি লতাপাতা যাহার রসপানে তাহারা চলিয়াছে,—কখনও বা পরস্পরে কথোপকথন করিতেছে, কখনও বা আপন মনে গুন্ গুন্ করিতেছে। সহসা নারী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—পুরুষ বান-বিদ্ধের মত ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল তাহার সঙ্গিনী একটু পিছনে পড়িয়াছে, আর সেই সুযোগে কোথা হইতে অপর এক পুরুষ আসিয়া তাহার নিকট হইতে তাহাদের আনন্দোৎসবের শেষ চিহ্ন সেই লতাপত্রের ভার এবং সেই কচ্ছপটী ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, নারী নখাঘাতে দন্তাঘাতে প্রাণপণে আততায়ীকে নিবারণ করিতেছে। পুরুষ ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত হুঙ্কার করিয়া দুই বিরাট লম্ফে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইল এবং হস্তের যষ্টি তুলিয়া আততায়ীকে ভীমবেগে প্রহার করিল। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, সে আঘাত লাগিল গিয়া নারীকে। একে অবলা এতক্ষণ এক বলিষ্ঠ পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার বল টুটিয়া আসিয়াছিল, সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া শিলাখণ্ডের উপর পড়িয়া চেতনা হারাইল। তাহার সঙ্গী পুরুষ ভ্রূক্ষেপও করিল না, অবিলম্বে শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বলবীর্য্যে রণকৌশলে উভয়েই প্রায় সমান, কেহ কাহাকেও হটাইতে পারিতেছে না অথচ উভয়েই উভয়ের প্রহারে জর্জ্জরিত। সহসা আততায়ী উদরের তলদেশ এক প্রচণ্ড পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভূতল শায়ী হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। এ পুরুষ উন্মত্তরূপে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বির বিবর্ণ মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বেশ ধীরে সুস্থে একখণ্ড প্রস্তর তুলিয়া এক আঘাতে শত্রুর মস্তক চূর্ণ করিল। তারপর বেশ করিয়া দেখিল, বুঝিল কার্য্য শেষ হইয়াছে,—তখন স্বস্তির এক গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে সেই লতা পত্রের ভার এবং কচ্ছপটী ভূতল হইতে কুড়াইয়া লইয়া আপন মনে শিশ্ দিতে দিতে সঙ্গিনীর নিকট ফিরিয়া গেল। দেখিতে পাইল সেই গত চেতনা নারী কঠিন প্রস্তরের উপর পড়িয়া আছে, এক তীক্ষ্ণধার শিলাখণ্ডের আঘাতে তাহার পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সেই ক্ষতমুখে অবিশ্রান্ত রুধির নির্গত হইতেছে। এতকাল সে নারীকে পুরুষের সম্পত্তি বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছে—অতি প্রয়োজনীয় সম্পত্তি, কাজেই অতি মূল্যবান তাই যথাসাধ্য যত্নে তাহাকে রক্ষাও করিয়াছে কিন্তু তার জন্য কোন ব্যথা কখন ও অনুভব করে নাই। আজ সহসা কি জানি কেন সে এক অননুভূতপূর্ব্ব মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিল। যেন কেহ তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা কিম্বা তপ্তলৌহ শলাকা দ্বারা তাহার হৃৎপিণ্ড ভেদ করিল। তাড়াতাড়ি সে তাহার সঙ্গিনীকে কোলে তুলিয়া নিকটস্থ ঝর্ণার ধারে লইয়া গেল এবং অতি যত্নে শীতল জল দিয়া তাহার আহত স্থান ধৌত করিয়া দিল ও ললাটে চক্ষে মুখে জল সিঞ্চন করিতে লাগিল। ক্ষণপরে বহুক্ষণ মুহূর্ত্তের জন্য চেতনা প্রাপ্ত হইয়া তাহার সেই বৃহৎ কৃষ্ণতার চক্ষু দুটী তুলিয়া বড়ই করুণ কোমল দৃষ্টিতে তাহার সঙ্গীর মুখপানে চাহিল। কি জানি তাহার বুকের ভিতর কি ঝড় বহিয়া গেল,—অশ্রুজলে তাহার চক্ষু প্লাবিত হইয়া গেল, সে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং অতিকষ্টে কোন প্রকারে তাহার শক্তির শেষ বিন্দু টুকু ব্যয় করিয়া পুরুষের কণ্ঠলগ্ন হইল। পুরুষ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল—উভয়ের ওষ্ঠ মিলিত হইল। মুহূর্ত্তপরে সেই অভাগিনীর মস্তক পুরুষের কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল, চক্ষু নিমীলিত হইল, দেহ অসাড় হইয়া গেল। পুরুষ বিহ্বলের মত নির্ব্বাক্ হইয়া সেই মুখ খানির পানে

জীবন রাখতে হলে
জীবন-রসায়ন
ইহা শরীরের রক্ত মাংস ও স্নায়ুর ক্ষতিপূরণ কর্ত্তে পারে অথচ উত্তেজক নয়।
—তথ্য লউন—শ্যামাদাস ঔষধালয়—৬৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চাহিয়া রহিল—কোথা হইতে কি ঘটিয়া গেল—চক্ষে তাহার অশ্রুর উৎস উথলিয়া উঠিল, বক্ষের স্পন্দন দ্রুত-তর হইল—সে শিশুর মত কাঁদিয়া ফেলিল! কাঁদিতে কাঁদিতে সঙ্গিনীর গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল—ক্রমে বুঝিতে পারিল সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন হাহাকার করিতে করিতে সেই মৃত দেহ বক্ষে তুলিয়া উন্মত্তের মত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহাদের সেই বড় সাধের লতাপাতা ফল মূল কুঞ্জ কোথায় পড়িয়া রহিল, সে কথা আর তাহার মনেও রহিল না।

• • •

কাল অপরাহ্ণ। আকাশ ক্ষণকালের জন্য পরিষ্কার হইয়াছে, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিম রাগে প্রকৃতির অপরূপ সাধিত হইতেছে, চারিদিকে শৈলরাজি নিস্তব্ধ যেন ধ্যানমগ্ন, এমন সময় এক শিখরের উপর দাঁড়াইয়া সেই পুরুষ, বক্ষে তাহার সেই গত প্রাণা সঙ্গিনীর স্পন্দ-হীন দেহ। ধীরে ধীরে সে সেই দেহ খানি প্রস্তরের উপর শায়িত করিয়া দিয়া মাথাটী কোলে করিয়া বসিল। সায়াহ্নের রক্তিম আলোকে রঞ্জিত সেই মুখ খানি তাহার চক্ষে যেন আজ নূতন শোভা ধারণ করিল। মরি মরি একি রূপ! এত শোভা, একাধারে এত সৌন্দর্য্য সে তো কখনও দেখে নাই। এত দিন তবে কি সে অন্ধ ছিল? হায়, কেন দেখে নাই, কেন বুঝে নাই, কেন যত্নে নাই, কেন ভালবাসে নাই? কোথাদিয়া তাহার দিন গুলি কাটিয়া গিয়াছে, একটা জীবন তাহার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, আর আজ যখন সে প্রথম দেখিতে শিখিল তখন সব শেষ—সব ফুরাইয়া গিয়াছে। আজ সে প্রথম অনুভব করিল সে একা—বড় একা, আজ তাহার কেহ নাই—যে ছিল সে চলিয়া গিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে তাহার সব সুখ ও সব আশা ফুরাইয়া গিয়াছে। সে ভগ্ন কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল ওগো 'ফিরে এসো' ফিরে এসো 'ফিরে এসো,'—দূরে শিখরে শিখরে বাজিয়া উঠিল তাহারই প্রতিধ্বনি—'ফিরে এসো' 'ফিরে এস' 'ফিরে এসো'।

• • •

রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দে মেদিনী পূর্ণ হইল। অস্তজলে মলামাটী ধুইয়া গিয়া প্রেমের স্বর্ণকান্তি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল,—সে কিন্তু বুঝিল না, আজ তাহার কি শুভ দিন—আজ তাহার জাগরণ।

শেষ চিহ্ন

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী]

(১)

তুমি ছিলে একটি তারকা—
আমার এ হৃদয় গগনে,
উঠেছিলে আপনি জ্বলিয়া,
কত যেন হরষিত মনে।
তারপর বুঝি গগনের—
আকর্ষণ ছিল না তেমন,
তাই তুমি পড়িয়াছ খসি,
ধরাতলে মলিন বরণ।
তবু তুমি নিয়েছ কি সব?
—রহিয়াছে আলোটুকু তব।

(২)

তুমি ছিলে একটী কুসুম—
আমার এ হৃদয় উদ্যানে।
উঠেছিলে আপনি ফুটিয়া,
কত যেন হরষিত প্রাণে।
তারপর বুঝি বাগানের—
মধু রস ছিল না তেমন,
তাই তুমি প'ড়েছ শুকায়ে,
ধরাতলে মলিন বরণ।
তবু তুমি নিয়েছ কি সব?
—রহিয়াছে সুরভি যে তব।

সামনে বসিয়া সযত্নে আহার করাইয়া কামনা শান্তকে বাবার ঘরে বিশ্রাম করিতে বলিয়া, ভোজন ঘরে ফিরিয়া আসিতেই দৃষ্টি পড়িল নূতন করিয়া সেই থালাখানার দিকে, এই কয়মুহূর্ত্ত আগে যেখানার সামনে বসিয়া এক ঘণ্টে চাহিয়া আধ ঘণ্টা কাল কাটাইয়া দিয়াছে। শান্ত থালার কোণে ফুলাবশিষ্ট কয়েকটি তণ্ডুল কণা ছাড়া আর কিছুই রাখে নাই—ইহা ত রাখা তাহার স্বভাব নয়, রাখিতে যে-হয়, সে সম্বন্ধেও যে কোন একটা বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহাই হয় ত সে জানে না,—প্রশংসমান কণ্ঠে কথা কহিতে কহিতে সমস্তই নিঃশেষ করিয়াছে, একটিবার অনুরোধও করিতে হয় নাই। কামনা সেই দিকে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া সেই ক'টি কথাই ভাবিতে লাগিল, কি সুন্দর অনাড়ম্বর স্বভাবটি! ভদ্রতার রীতি রক্ষা নাই, মৌখিক অসামান্য বিনয় বাহুল্য নাই, কেমন সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে খাইয়া উঠিয়া গেল সে।

ভাবিতে ভাবিতে একটা অননুভূতপূর্ব্ব অনির্বচনীয় পুলকাতিশয্যে তাহার সমস্ত মনটি ভরিয়া গেল। তাহাকে যে এখুনি আহার করিতে হইবে, বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে, এখনি সদানন্দ তাড়া দিতে আসিবে—ভাবিয়া সেও একখানা আসনে বসিয়া পড়িয়া সদানন্দকে ডাকিল।

সদানন্দ আসিয়া বলিল—আনি দিদি মণি!

আহার্য্য আনিয়া হাসি-হাসি মুখে সদানন্দ বলিল—শান্তবাবু রান্না খেয়ে কি বল্লেন দিদিমনি?

কামনা হাসিয়া বলিল—পায়েসের ভারি সুখ্যাতি করেছেন।

পরমান্ন-টি সদানন্দ রাঁধিয়াছিল, একথা শুনিয়া সদানন্দ আদৌ সন্তুষ্ট হইল না। বলিল—আর সব?

কিছু বলেন নি!

সদানন্দ বিস্মিত হইলেও কিছু বলিল না।

কামনা হাসিয়া বলিল—কোনটার কথাই তিনি কিছু বলেন নি সদানন্দ, তবে তাঁর যে ভাল লেগেছে তাতে সন্দেহ নেই। যেখছো থালা?

সদানন্দ একবার শূন্য থালাটার চাহিয়া বাহির হইয়া গেল।

কামনা আহার শেষ করিয়া নিজের ঘরের দ্বারটি বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। কাল সারারাত্রির জাগরণ ক্লান্ত চক্ষু দু'টি নিদ্রায় ঢুলিয়া আসিতেছিল, কামনা এখনি উঠিয়া পড়িবে' স্থির করিয়া যেমন চক্ষু মুদিল, সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল জানে না, যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিল, সদানন্দর ডাক তাহার কাণে পৌঁছিল। সে ডাক শুনিয়া প্রথমেই মনে হইল, শান্ত ডাকিতে পাঠাইয়াছে। এখনি ডাকিয়া বিদায় চাহিবে! মনে হইতেই মনটা কেমন যেন ছ্যাঁত করিয়া উঠিল।

সদানন্দ ডাকিতেছিল—দিদিমণি...

কামনা বলিল, কি সদানন্দ?

শান্ত বাবু ডাকছেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

কামনার মনে হইল, যা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই! উত্তর দিবার শক্তি টুকুও আর রহিল না। কামনা একটা শায়িত পাষাণ মূর্ত্তির মত বিছানায় পড়িয়া রহিল। প্রতিমুহূর্ত্তেই আকাঙ্ক্ষা হইতেছিল, আবার বুঝি সদানন্দ ডাকিতে আসিতেছে। বার বার কি বলিয়াই বা তাহাকে ফিরাইবে আর তাহাকে যদি বা ফিরাইতে পারিল যে লোক তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া অধীর ভাবে

যায়াবার বেড়াইতেছে, তাহাকে নিরস্ত করিবে—কি উপায়ে?

সদানন্দ আবার ডাকিল—দিদিমণি?

কামনা আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া বসিয়া বলিল, আমি যাচ্ছি সদানন্দ!

কিন্তু তবুও সে ঘরের বাহির হইতে পারিল না। দুরন্ত অভিমান ব্যথা বুকের মধ্যে গর্জাইয়া উঠিয়া পা দুটাকে অচল করিয়া দিল। সেখানে অভিমানের কোন মূল্য নাই, তাহার ব্যথা সে বুঝিবে না জানিয়াও কেন যে দুরন্ত অভিমানের উচ্ছ্বাসে বক্ষ ভরিয়া অশ্রু করিয়া পড়িতে লাগিল, ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুর উৎসে মুখখানি ভাসিয়া গেল।

ঠিক সেই সময়ে শান্ত বন্ধ দুয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—কামনা তোমার সঙ্গে দেখা না করে আমি যেতে পারছি না!

সেই একই কথা! মুহূর্তের জন্ত একটা ভীষণ ঝড়োচ্ছ্বাস আসিয়া শিলাস্তূপটিকে দুইয়া দিয়া আবার নামিয়া গেল। অশ্রুসিক্ত মুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কামনা অর্গল খুলিয়া ফেলিল। মনে হইল, না চোখের জল সেখান হইবে না। কামনা বস্ত্রাঞ্চল তুলিয়া নয়ন মার্জনা করিয়া লইয়া আস্তে আস্তে দ্বার খুলিয়া দিল।

শান্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল—এত অবেলা পর্য্যন্ত ঘুমুচ্ছিলে কামনা?

কামনা কথা কহিল না, ইহার পরে যে কথা শুনিতে হইবে তাহারই জন্ত আপনাকে প্রস্তুত করিতে লাগিল।

শান্ত বলিল—সন্ধ্যে হল প্রায়, আমি বাসায় যাচ্ছি, ভোরের গাড়ীতেই আমাকে দেশে যেতে হবে।

কামনা কথা কহিল না।

শান্ত গাঢ় স্বরে কহিল—তোমার বাবা বোধ হয় এর মধ্যেই এসে পড়বেন, আমার প্রণাম জানিও কামনা।... তা হলে এখন আসি কামনা। যদি পারি আর একবার আসব শীগ্‌গির!

তবুও কামনাকে নীরব দেখিয়া শান্তর কেমন সন্দেহ হইল, বুঝি সে কোন কথাই শুনিতেছে, তাহার নতমুখের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিল তাহাতে শান্তর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কামনার দুটি চক্ষু হইতে অবিরল ধারে অশ্রু নামিয়া ধীরে ধীরে তাহার দুটি বন্ধ হাতের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। এক মিনিট কাল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া শান্ত একটু সরিয়া আসিয়া বলিল—তুমি কাঁদছ কামনা!

এই কথায় কামনা অস্ফুট স্বরে কাঁদিয়া উঠিল, অশ্রু গদগদ কণ্ঠে কহিল—না না, শান্ত বাবু আপনি যান! আপনাকে আটকাব না, আপনি যান।

শান্তর হৃদয়-মাঝেও একটা সংগ্রাম চলিতেছিল, কামনার অকরুণ তার করা, সকালের সেই কথা গুলা সমস্ত তাহার মনের মধ্যে উত্তপ্ত তৈল-কটাহে জলের ছিটার মত ছিটকাইয়া উঠিতেছিল, তাহার কণ্ঠেও অশ্রু উদ্বেল হইয়া উঠিল, কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—কি করব কামনা, আমারও বড় বিপদ! নইলে তোমার কথা কি আমি রাখতুম না কামনা!

বিপদের নাম শুনিয়াই কামনা অশ্রু ভরা আঁখি তুলিয়া শান্তর মুখের পরে স্থাপিত করিল।

শান্ত বলিল—কামনা, এমন এক হাঙ্গামার মধ্যে হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে পড়তে হ'য়েছে যে একদিন কোথাও দেরী করতে আমার সাহস হচ্ছে না। তার উপর আমার জীবনের সুখ দুঃখ আশা ভরসা সব নির্ভর করছে। কামনা তেমন বিপদে আমি কোন দিন পড়ি নি।

কি বিপদ জানিয়া লইবার জন্ত কামনার হৃদয় আকুলি বিকুলি করিতেছিল কিন্তু মুখ ফুটিয়া অশুভবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে শুধু পলকহীন অশ্রু-সজল-নয়নে শান্তর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শান্ত বলিতেছিল—সে-যে কত বড় বিপদ কামনা, তুমি এই থেকে বুঝতে পারবে যে তোমাকে একা রেখেও আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। কামনা তুমি কি মনে কর আমি স্বেচ্ছায় যাচ্ছি? যেতে আমার এক বিন্দুও আগ্রহ আছে?

কামনা আর্ত্তস্বরে বলিল—কি হয়েছে শান্ত বাবু?

শান্ত এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, তারপর বলিল—মা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছেন কিন্তু...

কামনা তৎপূর্ব্বেই কহিল—কোথায়?

দেশেই।

কামনা আর কিছু বলিল না। সদানন্দ সেই দিকেই আসিতেছিল, তাহারই উদ্দেশে কহিল—আলো জ্বাল নি কেন সদানন্দ? বলিয়াই আর কোন দিকে না চাহিয়া, কোন কথা না বলিয়াই ধীরে ধীরে আপন কক্ষে প্রবেশ করিল।

শান্ত মিনিট দুই সেখানে অপেক্ষা করিয়া একবার একটা ব্যাকুল দৃষ্টিতে অন্ধকার ঘরের দিকে চাহিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

বিদেশের স্মৃতি

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম্-এ, বি-এল]

দু'খানা সেকেণ্ড ক্লাস টিকেট কিনিয়া Perumbur রওনা হইলাম। গাড়ীতে একটী সাহেব বসিয়াছিলেন তিনি আমার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। তিনি Bangaloreএ থাকেন। বলিলেন, "Nice place, I shall make my home there" এমন সময় একটী মেম সাহেব আসিয়া জুটিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সাহেব ও মেমে আলাপ ও নানারূপ রসের গল্প চলিতে লাগিল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। মেম সাহেব প্রথমে বলিয়াছিলেন যে তিনি Perambureএ নামিবেন কিন্তু আলাপ ঘনীভূত হওয়াতে সেখানে নামিলেন না। আমরা Perumbureএ নামিয়া যাওয়াতে উভয়েই যেন বিশেষ সন্তুষ্ট। সাহেব নিজে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। Perumbur মাদ্রাজের একটী উপনগর। সহর হইতে ৪।৫ মাইল দূর। একেবারে পাড়াগাঁ বলিলেই হয়—চারিদিকেই পানাপুকুর। অনেক খুঁজিয়া অতি কষ্টে খোসালিস মুদালী ষ্ট্রীট বাহির করিলাম। রাস্তাটী বেশ। সারি সারি খোলার বাড়ী যেন plan করিয়া প্রস্তুত। একটী কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকৃতি যুবক আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, ইনিই আমার পূর্ব্ব পরিচিত ডমুলিদমের ভ্রাতা, স্কুলে পড়েন। তিনি তাঁহার দাদার বন্ধুজ্ঞানে আমাদিগকে বিশেষ খাতির করিলেন। তাঁহার দাদা মাদ্রাজ গিয়াছেন—পরের ট্রেণে আসিবেন।

আমার আর অপেক্ষা করিবার উপায় ছিল না। কারণ ৭-২৪ মিনিটের passenger trainএ 'ঘি'—বাবু আসিবেন, আমাকে ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে হইবে। যুবক ষ্টেশন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিলেন। অপেক্ষা করিতেছি এমন সময় একখানি ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল। ডমুলিদম সেই ট্রেণেই আসিয়াছিলেন সুতরাং দেখা হইল। নানা বিষয়িনী আলাপাদি করিতে করিতে মাদ্রাজ যাইবার গাড়ী উপস্থিত হইল। কাল সকাল বেলা আহারাদির পর তিনি আমার সহিত দেখা করিয়া উভয়ে সহর পরিদর্শন ও বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে দেখা সাক্ষাৎ ইত্যাদি করিব স্থির করিয়া আমরা ট্রেণে উঠিলাম। ট্রেণে উঠিয়াই 'কা' বাবু বলিলেন যে তাঁহার অসুখ বোধ হইতেছে—সর্দ্দি, কাশি ও জ্বর ভাব। Influenza তো নয়? এখন মেয়েছেলে লইয়া এ দু'দিনের পথ কিরূপে যাইবেন। ভাবিতে ভাবিতে ট্রেণ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে পৌঁছিল। নামিয়া বাহিরে গেলাম। Spencer কোম্পানী হইতে ১ কাপ চা পান করিয়া পুনরায় ৵০ দিয়া প্লাটফর্ম্ম টিকেট করিয়া ভিতরে গেলাম। এখানে দেখি সমস্তই সুশৃঙ্খল। প্লাটফর্ম্ম টিকেট ৲১০ স্থলে ৵০ কিছুক্ষণ পায়চারী করিতেই Bezwada Passenger আসিয়া পড়িল। 'ঘি' বাবু ট্রেণের দরজায় দাঁড়াইয়া উৎসুকভাবে প্লাটফর্ম্মের দিকে চাহিতেছেন। এখন আমি মাদ্রাজের পুরাতন লোক সুতরাং কুলী গাড়ী প্রভৃতি সমস্তই সহজে ঠিক করিয়া দিলাম। তারপর উভয়ে মিউনিসিপাল মার্কেটে কটী মাখন কিনিবার জন্য গেলাম। সবেমাত্র ৭-৩০টা, এখনই সমস্ত দোকান বন্ধ। মাদ্রাজে ৭টার পরই দুপুর রাত—Benighted Provinceই বটে। বাসায় ফিরিয়া কিছুক্ষণ পরেই আহার্য্য প্রস্তুত হইল। আহারাদির পর ২টা ঘর মেয়েদিগকে ছাড়িয়া দিয়া আমরা বারান্দায় শুইয়া আছি। পার্শ্বের ঘরেই একটী পরিবার। তাহাদের মধ্য হইতেই বোধ হয় রবিবর্ম্মার "অশোকে বনে সীতা" শীর্ষক ছবির চেড়ীদের প্রতিমূর্ত্তির আদর্শ লওয়া হইয়াছিল। মানুষের, বিশেষ স্ত্রী জাতির যে এরূপ বীভৎস চেহারা হয় তাহা জানা ছিল না। ওয়াল্‌টেয়ারে যেন কালো কিন্তু কমনীয় চেহারা দেখিয়াছি কিন্তু এখানে যেমন রং তেমনি আকৃতি, শুনিলাম আরও নীচে নাকি আরও ভয়ানক।

৯ই ডিসেম্বর—সকাল বেলা উঠিয়া তিন জনে

এসময়ে ষ্টেশনে Ceylone Boat Mailএর টিকিটের খোঁজ করিতে গেলাম। শুনিলাম ১৫ মিনিট মধ্যে সমস্ত টিকেট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কি ভয়ানক! 'ক' বাবু ও তাঁহার খুড়ীর কি দশা হইবে! ষ্টেশন মাষ্টার প্রভৃতিকে ধরিয়া অবশেষে এই আশ্বাস পাইলাম যে সন্ধ্যা ৭টায় দেখা করিলে তিনি দয়া করিয়া ২।১ খানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট দিতে পারেন। "You come, some body may fall sick, or die; then you may go 2nd class." আমি বলিলাম—That lot may fall upon me. বলিলেন—"No, you have not registered your name; so you are safe." Ceylone Boat Mail দেখিতেছি চিত্রগুপ্তের খাতা। এখানে নাম লিখাই নাই—এই যথেষ্ট।

ফিরিয়া আসিয়া 'ক' বাবুর সহিত বাজারে চলিলাম। আবার সেই দূরত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ। একজন বলিল এই এক furlong! কিন্তু এক মাইল হাঁটিয়াও মিলিল না। বাজারে যাইয়া আর এক বিপদ। নাম ধরিয়া কোন জিনিষ চাহিলে কেহ বলিতে পারে না। কেরোসিন তৈলের বিষয় ১০ জন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন ফল হইল না। পরিশ্রান্ত হইয়া বাসায় ফিরিলাম।

১০টার সময় বন্ধুবর অমূল্যদম্ আসিয়া উপস্থিত। তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া উভয়ে বাহির হইলাম। ৫৸০ এক্কাখানি গাড়ী বেলা ৭টা পর্য্যন্ত ভাড়া করিয়া লইলাম। আফিস হইতে টিকেট কিনিয়া লইলাম আর গাড়োয়ানের সহিত কোন গোলযোগ নাই। ৩।৪ ঘায়গায় কি কর্ম্ম উপলক্ষে যাইতে হইল। George Town এক প্রকাণ্ড ব্যাপার, প্রায় কলিকাতারই মত। Esplanade হইয়া, হাইকোর্ট, মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতি দেখিয়া Triplicaneএ গেলাম। Triplicane সমুদ্রের তীর এবং মাদ্রাজের গৌরবের সামগ্রী। সিনেট হাউস ও প্রেসিডেন্সি কলেজ দেখিবার মত। Beach Roadএর মত এত প্রশস্ত ও সুন্দর রাস্তা বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই। সমুদ্র গর্জ্জন, অনন্ত বিস্তৃত নীলাম্বুরাজী আর এই বিরাট সুপ্রশস্ত ও সুদীর্ঘ রাস্তাটিতে এ স্থানটিকে বড়ই সুন্দর করিয়াছে। সমুদ্রতীরে Aquarium একটী দেখিবার জিনিষ। ইহা কলিকাতায় নাই। কত রকমের তাজা মাছ ও হাঙ্গর ইত্যাদি রহিয়াছে। তাহাদের রাখিবার বন্দোবস্তও সুন্দর। কত রংএর কত মাছ দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

বুধপেট হইয়া বাসায় ফিরিবার পথে বন্ধুর পিতার সহিত দেখা করিলাম। তিনি একটী বড় ধনীর আফিসে কাজ করেন। উভয়ের সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল। উভয়েই Non-Brahmin কিন্তু যেরূপ জ্ঞানগর্ভ কথা বার্ত্তা বলিলেন তাহাতে তাঁহাদের উপর ভক্তি না হইয়া যায় না। তাঁহারা বলিলেন এই ব্রাহ্মণ নন্-ব্রাহ্মণ সোল যোগে নন্-ব্রাহ্মণদিগেরই দোষ অধিক।

অজ্ঞাত

(তুলসীদাস)

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

আপন নাভির বাস,
মৃগ নাহি জানে
মিছে শুধু ঘুরে মরে
ব্যাকুল পরাণে।
মানব অন্তর-দেবে
দেখিতে না পায়
দেবের সেবার লাগি
ঘুরে ধরাগায়।

বিনয়ী লোক

(তুলসীদাস)

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

আপনাকে সদা নীচু ব'লে ধরি,
অপরকে উঁচু দেখাই রীত,
তুলসী তুলায় তৌল করিয়া
দেখেছে বিনয়ী লোকের জিত।

নেতা

(নক্সা)

(শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী)

(খোলা জানালা দিয়া সহরের ধূম্র-মলিন আকাশ এবং তেলের কলের চিম্‌নীগুলি দেখা যাইতেছে। কক্ষের মধ্যে একখানি বড় টেবিল ঘেরিয়া নেতা ও ভক্তবৃন্দ বসিয়া আছেন, টেবিলের উপর কতকগুলি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র ছড়ান। মাথার উপরে পাখা ঘুরিতেছে।)

প্রথম ভক্ত—আপনার কাল্‌কের বক্তৃতাটী ভাবে, ভাষায় এক অপূর্ব্ব জিনিষ !

দ্বিতীয় ভক্ত—এতো বক্তৃতা নয়,—সাধকের উপলব্ধির কথা !

১ম ভক্ত—সত্যি জন-সঙ্ঘের স্মিতমান মুখগুলি কি উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ! যেন তারা অসাড় দেহে এক বৈদ্যুতিক শক্তি অনুভব করছিল—এ শক্তি-সঞ্চার সকলের সাধ্য নয়।

নেতা—(গম্ভীর ভাবে) না, এখনো হয় নি। শুধু জাগরণ দিলেই হবে না, এই চেতনাকে কাজে লাগানো চাই !

প্রথম ভক্ত—যা কিছু হয়েছে, আপনাদেরই চেষ্টায়। আর যা কিছু হবে—তাও আপনাদেরই করতে হবে।

নেতা—সেকি—আজকার কথা ! সেই ছাত্র-জীবনে, যৌবনের প্রথম উষায় কত বিনিদ্র-রজনী দেশ-মাতৃকার ধ্যানে কাটিয়ে দিয়েছি। বিদেশী ইতিহাসে কত রাষ্ট্র বিপ্লব, কত জাতির উত্থান পতনের কাহিনী পড়েছি, আর এই হত ভাগিনী দেশ-মাতৃকার অপরিবর্ত্তনীয় দাসত্বের শৃঙ্খলতায়ের শীতল স্পর্শ ও দুর্ব্বহ ভার এই বুকে অনুভব করেছি। তখন আমরা কয়েকটী বন্ধু মিলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এ জীবন দেশের সেবায় অর্পণ করবো ! সেই সব বন্ধুরা কোথায় চলে গেল, শুধু একা আমিই রইলুম আশায় বুক বেঁধে এই শুভদিনের আশায় !

(নেতা, উঠিয়া পাইচারী করিতে লাগিলেন)

তৃতীয় ভক্ত—দেখুন, দেখুন—ওঁর মুখের দিকে একটীবার চেয়ে দেখুন !

প্রধান ভক্ত—এমন আত্ম-সমাহিত ভাব আমি অনেক বার দেখেছি। দেশের জন্য এই আত্মভোলা সাধনার সিদ্ধিই তো আজ নব-জাগরণ এনেছে !

দ্বিতীয় ভক্ত—কি একাগ্রতা !

চতুর্থ ভক্ত—অপূর্ব্ব স্বদেশ-প্রীতি !

তৃতীয় ভক্ত—অদ্ভুত সাধনা।

নেতা—(টেবিলের উপর হইতে কতকগুলি কাগজ লইয়া) দেখতো এ লেখাটী কেমন হয়েছে।

প্রথম ভক্ত—পাঠ করিলেন ; সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—চমৎকার ! চমৎকার ! !

প্রথম ভক্ত—চমৎকার হয়েছে ! কিন্তু আরও জোরে চাবুক মারা উচিত ছিল। দেশের লোক এখনো দেশের কাজে টাকা দিতে শিখ্‌লে না !

চতুর্থ ভক্ত—জার্ম্মেনীতে হ'লে এতক্ষণ টাকা কে আগে দেবে এই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত !

দ্বিতীয় ভক্ত—এমন সব সর্ব্বত্যাগী নেতা—তবু কি লোকের চৈতন্য হবে না ?

নেতা—আমরা তো ভিক্ষুক। ভিক্ষাতেই তো দেশের কাজ চলবে।

দ্বিতীয় ভক্ত—একখানা বাঙ্গলা কাগজ লিখেছে, আপনি টাকার হিসেব দেননি ?

নেতা—(হাসিয়া) বেহিসাবীর মত এত বড় জীবনটা ব্যয় করে দিলুম, সে হিসাব কেউ করে না ! থাক, ভিক্ষা চাইতে আমি কোন দিন লজ্জাবোধ করিনে !

দ্বিতীয় ভক্ত—আমি যে ভিক্ষা করতে গৌরব বোধ করি !

নেতা—আজই চিঠি লিখে দাও—মফঃস্বলের কেন্দ্রে কেন্দ্রে সভা করে টাকা তুলতে হবে। টাকা হাতে এলেই আমরা বেরিয়ে পড়বো এই বাদলার বুকে—জাগিয়ে তুলতে হবে, মাতিয়ে তুলতে হবে—অনেক টাকার দরকার! এখন কিছু চাই না—চাই স্বার্থত্যাগ, চাই সর্ব্বস্ব দান, চাই এক মন, গভীর বিরাট আন্দোলন!

প্রথম ভক্ত—আপনার মত ভিক্ষুককে টাকা দিতে আবার হিসেব চাওয়া! বুদ্ধ ভিক্ষা করতেন, চৈতন্য ভিক্ষা করতেন—তাঁরা কি হিসেব দিতেন? সেদিনকার বিবেকনন্দও যে হিসেব দেয় নাই!

নেতা—মাঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠায় অনেক টাকা চাই আন্দোলন চালাতে টাকা চাই। কৃপণ হয়ে থাকলে তো চলবে না!

• •

নেতা—তারা সব চলে গেছে?

লীলা—না বাবা! কাল থেকে আমিও ভিক্ষায় বেরুবো মনে করছি। তোমার উপদেশে এঁরা মেতে উঠেছেন। আমরা যদি তোমার কথা না শুনি তবে দেশের লোক শুনবে কেন? আমি আর অজিত কাল থেকে—

নেতা—দেশের লোক আমার কথা শুনবে না? দেখ্‌চিস্‌নে, আমার ইঙ্গিতে কি ভাবের প্রেরণা বয়ে যাচ্ছে? দেখচিস্‌নে, শত শত যুবকের কণ্ঠে আমারই বাণীর প্রতিধ্বনি! আমার শক্তিতে সমস্ত দেশ জেগে উঠেছে!

লীলা—বাবা! সেই শক্তি-মন্ত্র আমাদের দীক্ষা দাও, তোমার পতাকা নিয়ে আমরাও পথে বেরিয়ে পড়ি!

নেতা—ভুল করিস্‌ নে লীলা ····তোদের সে সব করতে হবে না! তোদের কাজ হচ্ছে পথ দেখিয়ে দেওয়া ...ধুলো কাদা পায়ে মেখে পথ চলা নয়·····

লীলা—তা কি হয় বাবা?

নেতা—কেন হবে না?...শক্তিমানের বংশধর তোরা আমারি সন্তান!

(এমন সময় একদল বালক গান করিতে করিতে আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। বারান্দায় নেতাকে দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে গান করিতে লাগিল এবং নেতার নাম লইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল)

নেতা—আঃ কি জ্বালাতন! হীরেন্‌ হীরেন্‌——

(ভক্তগণের প্রবেশ)

নেতা—কি চাস্‌ ওরা?

লীলা—তোমার উপরই তো এদের সব চেয়ে বড় দাবী।

নেতা—সমস্ত জীবনই তো উৎসর্গ করেছি দেশের পায়ে, তবুও রেহাই নেই, আবার টাকাও দিতে হবে! হীরেন—

প্রথম ভক্ত—আজ্ঞে!

(নেতা যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া লীলার চোখ ছল ছল করিতে লাগিল—প্রধান ভক্ত নীচে নামিয়া গেল)

স্বেচ্ছা-সেবক—আমাদের গুরুর কাছে ভিক্ষা পাব না, বলেন কি?

প্রধান ভক্ত—গুরু দেবেন ভিক্ষা? তাঁর আছে কি? নিজের বলতে কি এমন রেখেছেন? এত অকৃতজ্ঞ তোমরা, আর তোমাদের জাত—

স্বে-সেবক—গুঁর দেওয়া একটি পয়সাও যে আমাদের নিকট লাখ্‌ টাকার চেয়েও মূল্যবান!

নব বসন্তে
প্রিয়জনকে উপহার দিতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে আমাদের আইডিয়াল ষ্টীমেলিয়েন্স এবং মেসিন প্রস্তুত—চন্দন, বয়েল, বকুল, মাল্য ও ভায়োলেট সাবান ব্যবহার করুন।
ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী
৬৪।১এ বেচুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪৯৬

প্রধান ভক্ত—তবু বিরক্ত করবে? দেশের কাজে সমস্ত দিন খেটে সন্ধ্যাবেলা একটু বিশ্রাম করছেন, তবু তোমরা বিরক্ত করছো?

স্বে-সেবক—উনি বিরক্ত হবেন না, একবার এসে আমাদের গায়ের ধুলো দিয়ে যান, ওঁকে দেখে আমরা নব-চেতনা লাভ করি।

প্রধান ভক্ত—না, না! উনি খুব বিরক্ত হয়েছেন! ওঁর আদেশ—তোমরা চলে যাও!

লীলা—বাবা! ওরা তোমার দ্বার থেকে শুধু হাতে ফিরে যাবে?

নেতা—(বিরক্তিভরে) কি অবাধ্য! আমার হুকুম মানে না, যার ইঙ্গিতে সারা দেশটা চঞ্চল! যার কথায় লাট-সাহেব পর্য্যন্ত ভয় পায়?

স্বেচ্ছা-সেবক—(লীলার প্রতি চাহিয়া) দিদি, আমরা কি শুধু হাতে ফিরে যাবো? দেশের জন্য এই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করেছি!

লীলা—সহসা তাহার হাতের থালা খুলিয়া ঝুলিতে ফেলিয়া দিল।

নেতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিবারণ করিবারও অবসর পাইলেন না।

ছেলেরা জয়ধ্বনি করিয়া সোল্লাসে সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল)

নেতা—করলি কি মা! একটু ভাবাবেগ সামলাতে পারিস্‌নে? কি সর্ব্বনাশ করলি? এমন আচরণ আমি ছেলে মেয়ের কাছে প্রত্যাশা করিনে—তোরা যদি আমার কথা না শুনে অপমান করবি...

লীলা—অপমান করিনি বাবা! তোমার মুখ রেখেছি?

নেতা—কিন্তু আমার বুকে বড় ব্যথা দিলি মা! দেড়শো টাকার থালা জোড়া—অক্লেশে ফেলে দিলি।—আমার কন্যা হয়ে?

কবে?

[শ্রীমতী অনুপমা দেবী]

আশা ছিল অনেক দিনের পরে
　তুমি যখন আস্‌বে আমার কাছে
পায়ের কাছে উজাড় করে দেবো,
　বুকের ভেতর যা কিছু মোর আছে।
আস্‌বে তুমি আকাশ উজল ক'রে,
　ভোরের বেলা নতুন আলোর সাথে,
ফুলের মত উঠ্‌বো তখন ফুটে,
　প্রথম প্রসাদ পেয়ে তোমার হাতে।
প্রথম হাসি প্রথম ব্যথা মোর
　তোমায় দেখে উঠ্‌বে তখন জাগি,
ছড়িয়ে যাবে কেশের কুসুমগুলি
　তোমার পায়ের স্পর্শ পাবার লাগি।—
আনন্দেতে উঠ্‌বে হৃদয় ভ'রে
　সেদিন আমি চাইব নাকো কিছু,
তব তোমার স্নেহের কোণে শুধু
　একটী পাশে নয়ন করে নীচু।
মন্দস্বরে বাজ্‌বে তোমার বীণা
　অজানা গান গাইবে বনের পাখী,
বক্ষে তোমার পরশ রবে ভরা
　নয়ন রবে সুখের স্বপন মাখি।
কবে ওগো কখন সেদিন হবে
　যেদিন তোমার পায়ের ধ্বনি পেয়ে,
আকাশ ভ'রে বাজ্‌বে ব্যাকুলতা
　বাতাস তোমার ময় যাবে গেয়ে।
চিত্ত আমার চেতনাহীন হবে
　পেয়ে তোমার প্রেমের মদির ধারা,
তোমার মাঝে প্রকাশ হবে মোর,
　তোমার মাঝেই হব আপন হারা।

গ্রন্থ আলোচনা

স্বাধীনতার সপ্তসপ্তী। শ্রীহেমন্তকুমার সরকার বিবৃত। ইণ্ডিয়ান ফ্রেণ্ডস্‌ বুক ডিপো হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। স্বাধীনতাকামী যাঁর যাঁহারা বিশ্ব প্রভায় অধুনা বিশ্বে ভাস্বর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছেন এই গ্রন্থে তাঁহাদেরই জীবন কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যাঁর স্থান হইয়াছে তাঁরা হলেন, কামালপাশা, জগলুলপাশা, লেনিন, ট্রিকিপ, কলিস ও ডি-ভ্যালেরার জীবনী আছে। শত শত বৎসরের আঁধার বিদীর্ণ করিয়া আজ স্বাধীনতার আলোক জগৎময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই আলোকের প্রভাবণ এই সব বীরেরাই। স্বাধীনতা পাইতে হইলে কত বিপ্লবাত্মক, কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, কিরূপ বীর সহিষ্ণুতার সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজ লক্ষ্য পথে চলিতে হয় এই গ্রন্থের বীর নায়কদের উপন্যাসের মত মনোরম অথচ চিত্ত চমৎকার কাহিনীগুলি পাঠ করিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। গ্রন্থে স্বাধীনতার পূর্বাদর্শ পুরুষ সিংহের প্রতিমূর্তি আছে। এ জীবনী পাঠে মানুষের মনুষ্যত্বের বোধকে জাগ্রত করিবে। আশা করি স্বাধীনতাকামী বাঙালী ইহার আদর করিবে।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম মুখপত্রিকা। ৫৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, স্বাস্থ্যসঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত এই স্বাস্থ্য পত্রিকাখানি পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ইহাতে দিন পঞ্জিকা, তিথি নক্ষত্র, গণনার স্থান ছাড়া আর যে বিপুল কলেবর সাধারণতঃ অন্যান্য জিনিস দ্বারা পূর্ণ করা হয় এই পত্রিকার সেই স্থান সমূহ তাহার আনুষঙ্গিক স্বাস্থ্য কথায় পূর্ণ করা হইয়াছে। এ পত্রিকাখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। আশা করি স্বাস্থ্য সুখ বঞ্চিত বাঙালী ইহার সম্যক আদর করিতে পারিবে।

দেশ বিদেশ

মহারাষ্ট্র শিবাজী উৎসব হইয়া গিয়াছে। শিবাজী উৎসবে ভারতের বীরত্বের উৎসবারা বিহিত রহিয়াছে। বাংলাদেশের একদিন এই উৎসবের যোগ চলিয়াছিল। আজ তাহা হইয়া গিয়াছে।

গুলিস্তেছি কাইজারের দ্বিতীয় বিবাহ ভাঙিয়া যাইতেছে। স্বামী স্ত্রী এখন পৃথক ভাবে বাস করেন। এই বিবাহের জন্য তাইজার সন্তানদের বিরক্তিভাজন হইয়াছেন। বৃদ্ধকালের প্রণয় ফলীভূত হয় কিন্তু কাইজারের ভাগ্য দোষেই কি তাহার অন্যথা হইল?

অক্সফোর্ডের বেতার খবরে প্রকাশ যে, মন্ত্রণাসভা বৈকালে লুসের বৈঠক পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্নদলের প্রতিনিধি প্রকাশ্যভাবে বৈঠক করিয়াছিলেন। লাপ্রতিনিধিবিবর্গ আসিয়া পৌঁছেন নাই। ইহার পর আর এক বৈঠক হইবে। তাহাতে তুর্কীরাও উপস্থিত থাকিবেন।

রাজদ্রোহের অপরাধে "যোগলের গর্জন" সম্পাদকের নামে যে মোকদ্দমা চলিতেছে তাহার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। তাঁহার নামে যে অপরাধ দেখান হইয়াছে, তিনি তাহার কারণ লিখিয়া দিবেন। ৩০শে তারিখে মামলার আবার শুনানী হইবে।

কি সর্ব্বনাশ!—মাদ্রাজের পুলিশ কমিশনার নাকি কয়েকজন অসহযোগীকে বন্দুক রিভলভার রাখিবার পাস দিয়াছেন! আর রক্ষা নাই। ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পুলিশ কমিশনারকে গালাগালি করিয়াছে। তাহারা বলিতেছে—অসহযোগীরা ত বিপ্লববাদী, বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী; ইহার উপর তাহাদের হাতে অস্ত্র পড়িলে কি সাংঘাতিক টিকিবে? পুলিশ কমিশনার কি জবাব দিবেন জানি না। আমরা বলি—অসহযোগীদের সকলকে ধরিয়া য.দ্বীপসাগরে ফেলিয়া দাও, সকল গোল মিটিয়া যাউক।

বাঙ্গক

বোম্বাই কর্পোরেশনে ঢিল হইয়াছে ইংরাজী বলিতে কমিশনারেরা ইচ্ছা করিলে কর্পোরেশনের বৈঠক আদিতে বেশী ভাষার কথা বলিতে পারিবেন। বোম্বাই এ বিষয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে দেখি।

এতদিনের পর মিস এলিস ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার আর কোন বিপদের ভয় নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার মুক্তির জন্য টাকা পয়সাও দিতে হয় নাই, তবে তাঁহার পিতামাতার হত্যার জন্য আফ্রিদিদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ হইবে কি না এখনও বলা যায় না। তাঁহার পিতামাতাকে কেন খুন করা হইল এবং তাঁহাকেই বা কেন ধরা হইল এ সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত কথা শোনা যাইতেছে। যে এ কাজ করিয়াছে তাহাকে নাকি পাঠান রমণীরা অকর্মণ্য বলিয়া এমন বিদ্রূপ ও তিরস্কার করিয়াছিল যে সে কোরী মাত্র হইয়াই শপথ করিয়া এই কার্য্যে বাহির হইয়াছিল। পাঠান রমণীরা আর যাহাই হউক খুব কোমল হৃদয়া যে নহে, একথা বলাই বাহুল্য। অত মেয়ের মেয়েরা এমন করিয়া পুরুষকে পৌরুষ প্রকাশ করিতে, উত্তেজিত করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

বাঙ্গক

৪৷৷ বিনামূল্যে লকেটসাইজ ফটো
ফটো এনলার্জমেণ্ট ১৯×১০
ফটো সর্ব্বপ্রকার সিকি মূল্যে পাঠান
কলিকাতা ও, লেন্স ও রবারষ্ট্যাম্প মেকার
৩৬নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বাসন্তী—

কানের দুল।

["শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ" এলবাম হইতে]

নিখিল বিশ্ব গুল্ফ-প্রদর্শনী*

[প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ]

ধান, পাট, রব, পম প্রভৃতির চাষ কম বেশী সকল দেশেই হইয়া থাকে। মূলার চাষ, কদলী (কাঁচা এবং পাকা), কচু, ওল এসব ফসলের চাষ-ও হয়। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি শস্যের চাষ হইয়া থাকে,তন্মধ্যে তেড়ীর ও গোঁফের চাষও রীতিমত প্রচলিত আছে। অনেক দেশে এবং অনেক লোকে হস্তরমত এই কার্য্যে প্রতিযোগিতাও করিতেছেন। আরও সুবিধা এই যে ধান পাট প্রভৃতির চাষে যে পরিমাণ পরিশ্রম, সার, গোময়, খইল, লবণ প্রভৃতির ব্যয় ও প্রয়োজন হয়, তেড়ী বা গোঁফের চাষে তাহার শতাংশের একাংশও ব্যয়িত হয় না। দেশ-বিদেশ হইতে জন-মজুর আনাইতে হয় না, গোময় সার খইল, লাঙ্গল, লবণ ইত্যাদির জন্য মাথা ঘামাইতে হয় না, এক শিশি লক্ষ্মীবিলাস আর একটুকরা কস্‌মেটিক্ মাত্র খরচেই মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। অবশ্য যাঁহারা সাম্প্রাটাকিক উপায়ে বিজ্ঞান সম্মত গুল্ফের চাষ-আবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত যে একদিনে বা এক মাসে কিম্বা এক বৎসরে মনোমত ফসল না পাইলেও পাইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে হতাশ হওয়া নিতান্তই অকর্ত্তব্য। যাঁহারা এই চাষে এপ্রেন্টিসি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এই নিয়মগুলি জানিয়া রাখিতে হইবে যে তাঁহারা কোন প্রসিদ্ধ চিত্রকর দ্বারা (আমাদের বিনয়বাবু তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত) একটি পরিকল্পনা (design) করাইয়া লইবেন। একখানি দশ আনা মূল্যের জাপানী আর্শি, মূল্য ১৲, একশিশি লক্ষ্মীবিলাস তৈল, মূল্য ৸৵০ এক স্টিক্ কস্‌মেটিক্ (স্বদেশী না হইলেই ভাল হয়) নয় আনা মূল্যে সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য—সন্ধান করিয়া ক্রয় করিবেন। প্রাতে এক ঘণ্টা, মধ্যাহ্নে স্নানের পর দুই, ও রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে ঘণ্টা খানেক নিজ পরিকল্পনা মত চাষের ব্যবস্থা করিবেন। স্মরণ রাখিবেন, স্থান নির্জ্জন হইলেই ভাল হয়। বিবাহের পরে গোঁফের চাষ নিরাপদে চলা প্রায়ই অসম্ভব হইয়া উঠে, তাই আমাদের গোপন অনুরোধ তাঁহারা প্রথম যেদিন বাড়ীর আর্শিতে দেখিবেন, রেখা দেখা দিয়াছে, সেইদিন হইতেই তাঁহারা চাষে মনোনিবেশ করিবেন। বিবাহের পর—সাবধান! রাত্রে গোঁফে একটে ক্যাপ বা টুপি পরাইয়া রাখিবেন, কারণ স্ত্রীরা এই জিনিষটার বড়ই নারাজ, এরূপ একটা অপবাদ বহুকাল ধরিয়া বর্ত্তমান!

বিনয়বাবু একটি প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, তাহাতে বহু দেশের, বহু গবেষণার, বহু শ্রমের, বহু সাধনার ফলগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা তাহারই একটা প্রতিচিত্র নিয়ে দিলাম।

* Please note—Not for Sale.
(বিক্রয়ার্থ নহে, কেহ অনুরোধ করিবেন না।)

"এই গোঁফ জোড়াটায় দিলে চাড়া
তোমার মত অনেক পাব।"

কি খাবার খেতে, কিচু—খেতে বাধে না, মস্ত সুবিধা।

লোকে বলে—লাগাম কসলেই হয়

মিউনিসিপ্যালিটি শাসন দিয়াছেন!

ভোন্টু কেয়ার

পার্টিশান!

রাবণ স্বশুর যম, ইত্যাদি

বেচারার ঘর ভেঙ্গে গেছে!

অসম্ভব !

এঁর স্ত্রীর মত দুর্ভাগিনী বিশ্বে আর আছে কি ?

"শ্যাম্পু শোভন"

গেঁটে বাত

যারা বাতব্যাধির মানুষ

অন্ধ-ন (সাঁড় নয়)

মেরী স্নান !

"এমন গোঁফের উপর ঢেউ খেলে যায়—"

মাথার অভাব পুরিয়াছে।

কাইজার বিজয়ী

কথিত আছে, কাইজার ইহাকে দেখিয়া
নতমুখ হইয়া গিয়াছিলেন।

মেঘ দর্শনে শিখীর মত...

চাই সিং

"আমরা বেঁচেছি কেশের গুণে"—

লয়েড জর্জ্জিয়ান

এখন ইহার মূল্য অষ্টরম্ভা
সরল রেখা

ইউক্লিডের জ্যামিতি স্মর-ই
বুলডগ্

ঘোঁৎ,—ঘোঁৎ

এক কাণ কাটা

গায়ের বাইরে দিয়ে হাঁটে, তাই
সচরাচর চোখে পড়ে না।

চীনা চর

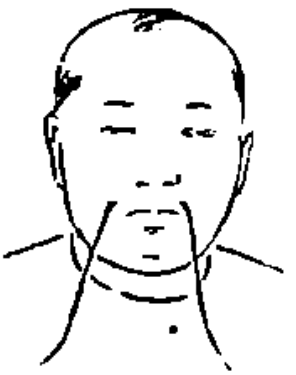

চীনে বাজারে প্রাপ্তব্য

খেকী (মেড়িমুত্তা)

"হাস—আমাদের পাড়ায় যাস্—"

ঘর কাঁট ? না আর কিছু ?

কাটার—বেনকিন্ এণ্ড কোং

"মাঁগুও"

হা-হ্যাঁ তোমার গিয়ে রাগলে
আমার জ্ঞান থাকে না।

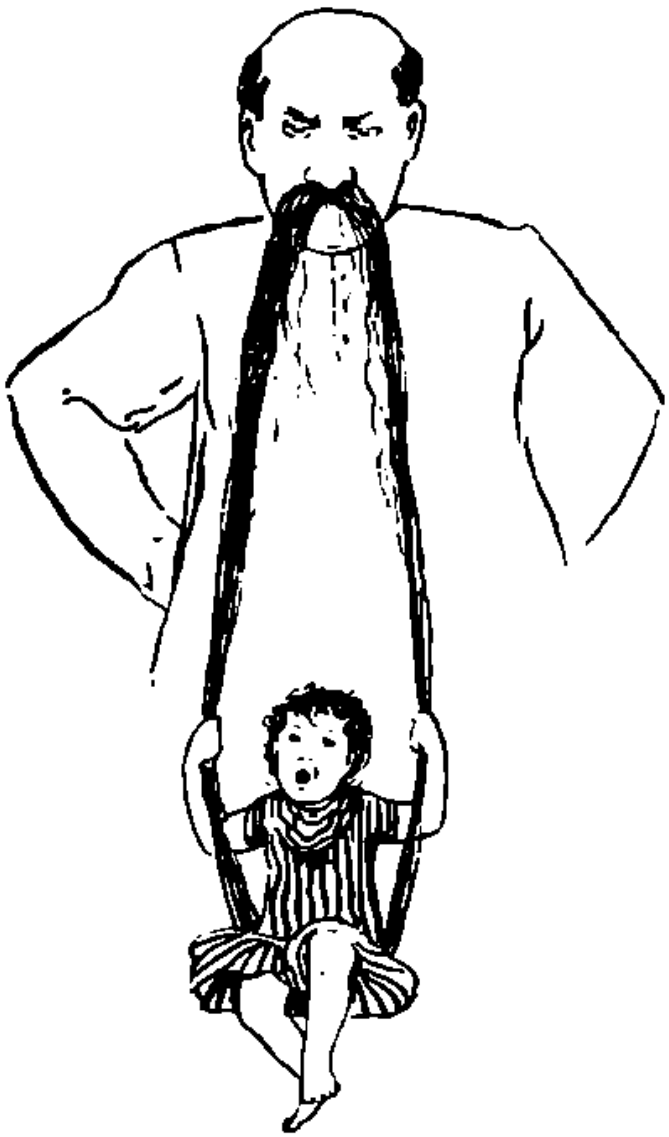

মাষ্টার মশাই, মাষ্টার মশাই করছ তুমি কি ?
এই দেখ-না আমি কেমন দোলনা পেয়েছি !

নির্ভয়ে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে হাটে।

—শুধু স্মৃতিটুকু তার রেখেছি ধরিয়া—

"কামড়ে দোব"

রঙ্গ-চটা তিরিক্ষি-মেজাজ

আই এ জেন্টেলম্যান

"শারদী"র ফাল্গুনীবাবু গোঁপ

বিনয়বাবু তার রাগ-টা ঝেড়ে দিলেন দেখি
এটা নিশ্চয়ই কোন প্রবর্শনীতে তিনি দেখেন নাই!

আফগানিস্থানের মহামান্য আমীর।

চিত্র ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত এস, এম হাসানের সৌজন্যে।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা।

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ২২শে বৈশাখ শনিবার ১৩৩০, ইং ৫ই মে। [৪০শ সংখ্যা

তুর্ক-সূর্য্য মুস্তাফা কেমালপাশা এবং তাঁহার নব বিবাহিতা উনিশ বর্ষ বয়স্কা পত্নী লতিফে হালুম এ্যাঙ্গোরায় তাঁহাদের বাগানে ভ্রমণ করিতেছেন। শ্রীমতী কেমাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা—বীর স্বামীর যোগ্যা সহধর্ম্মিনী।

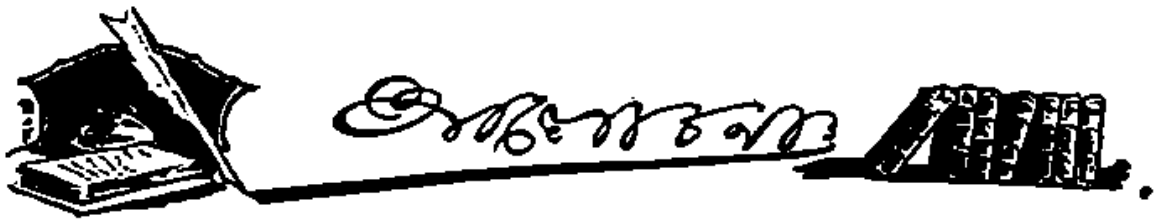

স্বাধীনতা জগতের সকলেরই কাম্য। অতি প্রিয় আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তু। যে একবার ইহার রস আস্বাদ করিয়াছে সে ইহা বজায় রাখিবার জন্য প্রাণ পণ করে। যে না পাইয়াছে সে ইহা লাভ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া নানা পথে চলিয়া ইহাকে লাভ করিতে চায়। জগতের শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতাকামী জন ও জাতি অপরের স্বাধীনতা হরণ করিতে আনন্দ বোধ করে—অপরকে নিজ অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিতে সহজে কিছুতেই চাহে না। স্বাধীনতার সুখ সুবিধা এত আছে—স্বাধীনতা জীবনকে এত আনন্দ ও নব ভাব দিতে পারে যে ইহা পাইবার ও রাখিবার চেষ্টা হইতেই জগতের যত বড় বড় সংগ্রাম, নর শোণিতের প্লাবন ও ভাব বিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে। আনন্দলাভের জন্য দুঃখের সহিত সংগ্রামে, পুরাতন পচা জীবনের খোলস বিসর্জ্জন দিয়া নূতন জীবন লাভের মধ্যে বিপুল সুখ ও আনন্দ আছে। জীবনে সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিতে প্রাণী মাত্রেই চাহে। মানুষ প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া এই সুখ ও আনন্দের বোধ তাহার মধ্যে বেশী জাগ্রত। আনন্দ ও সুখের মূলে রহিয়াছে স্বাধীনতা—মনের স্বাধীনতা, প্রাণের স্বাধীনতা—বলিবার কহিবার, চলিবার ফিরিবার, স্বাধীনতা। এগুলি না থাকিলেই মানুষের জীবন অপূর্ণ থাকে। আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্যম—এ সব দিকটা ফাঁকা থাকিলেই জীবনে সুখের সন্ধান মেলে না। তাই মূলে স্বাধীনতা লাভ করিয়া মানুষ এই সব জিনিসগুলি নিজ আয়ত্বের মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। দেশভেদে, জাতিভেদে এ প্রচেষ্টা-গুলিও ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

• • • •

স্বাধীন বা স্বাধীনতাকামী জনের ও জাতির স্বাধীনতা রক্ষণ ও স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার প্রণালী দেশ কাল ও অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইলেও ইহাদের সকলের মধ্যেই একটা জিনিস খুবই সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দেয়—সে জিনিসটি হইতেছে দাস মনোভাবের একান্ত বর্জ্জন। স্বাধীন জাতির মধ্যে কতকগুলি জিনিস এমন উগ্র ও প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয় যাহা অ-স্বাধীনদিগের মধ্যে তেমন প্রচণ্ড উগ্র হইতে পারে না। দাস মনোভাবের প্রাচুর্য্য থাকিলে উগ্র প্রচণ্ড মানসিক শক্তির বিকাশ কোনদিক হইতেই হওয়া সম্ভব নয়। এই মানসিক শক্তির অনধিকারী জাতিই দাসত্বের বন্ধনে জড়িত হইয়া পড়ে। দাস মনোভাবের প্রাচুর্য্য যে জাতির মধ্যে নাই তাহারা অপর সহস্র প্রকারে বর্ত্তমান সভ্যতার সংজ্ঞায় হেয় ও হীন হইলেও, বর্ব্বর আখ্যা পাইলেও,—পরাধীন অ-স্বাধীন জীবনের দুর্ভোগ বহে না। সব চেয়ে ঘৃণিত, নিকৃষ্ট,—মানুষকে অমানুষ পরিগণিত করিবার যে মনোবৃত্তি সেইটিই হইতেছে দাস মনোবৃত্তি—সুতরাং এই মনোভাব, স্বাধীন জাতির মত স্বাধীনতাকামী জাতিরও একান্ত পরিত্যাজ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

• • • •

দাস মনোভাবের পঙ্কাঘাতে যে জাতি পঙ্গু হয় নাই তাহারা একটি বা দুইশটি কিম্বা ক্রমাগত স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু বলশালী স্বাধীনের নিকট হারিয়া গিয়াও অ-স্বাধীন কোনদিন হয় নাই কেহ তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইয়া তাহার উপর কায়েমী দাসত্বের শৃঙ্খল জড়াইয়া দিতে পারে নাই। পার্ব্বত্য বা দ্বীপ নিবাসী এমন বহু জাতি আছে যাহাদিগকে আমাদিগের সভ্য অভিধান অনুযায়ী আমরা বর্ব্বর সংজ্ঞায় অভিহিত করি—যাহারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করিয়াও সংখ্যায় অল্প হইয়াও নিজের জন্মগত অধিকার ও স্বাধীনতাচ্যুত কোন দিন হয় নাই। এই সকল জাতির মধ্যে এমন একটা উগ্র প্রচণ্ডতা আছে যাহার ভীষণতা দেখিয়া পররাজ্য লোলুপ স্বাধীন জাতি শঙ্কিত হয়!

• • • •

দাস মনোভাব কাহাকে বলিব? অপরের প্রভাবে অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত হইয়া নিজের স্বাভাবিক প্রভা ও জ্যোতিকে যদি তাহাতে মজ্জিত করিয়া দেওয়া যায়—সেই মনোভাবই জাতির পক্ষে দাস মনোভাব। শক্তি ও ক্ষমতাশালী যদি দুর্ব্বলের উপর নিজের এই প্রভাবটি একবার বিস্তার করিতে পারে তবে মানুষমাত্রেরই অতি স্বাভাবিক স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষাকে সে অতি সহজে দমিত করিয়া রাখিতে পারে। ক্ষমতাশালী জাতি নিজ সভ্যতার উজ্জ্বল লোভনীয় ভাগটা দুর্ব্বল জাতির উপর ছড়াইয়া দিয়া সেই জাতির মধ্যে এই দাস মনোভাবের বীজ ছড়ায়। এই বীজের বৃক্ষ একবার শিকড় গাড়িয়া বসিলে সে ক্রমে তাহার হতভাগ্য স্বত্ব ভুলিয়া যাইতে থাকিয়া ক্রমেই গভীর হইতে গভীরতর পঙ্কে ডুবিতে থাকে। পরে এই মনোভাব হইতে এমন একটা সময় আসে যে সে জানহারার মত অন্ধকার পথে চলিতে চলিতে এমনই একটা স্থানে আসিয়া চকিতে থামিয়া দেখে সম্মুখে তাহার ধ্বংসরূপ ভীষণ মুখব্যাদন করিয়া আছে। সম্মুখে ধ্বংস—পেছন ফিরাট আঁধার। আর আগাইলে একেবারে ধ্বংসের মুখে। পেছনে ফিরিলে পথ আছে বটে কিন্তু আঁধারে সে পথে চলা যায় না। এমনি অবস্থা কোন দেশ ও জাতির হইলে তাহার উদ্ধার ও পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাওয়া খুব সহজ কথা নয়। কিন্তু মনের ঘুনিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে পথ আপনা হইতেই আবার মুক্ত হইয়া যায়। অন্ধকার পথে আলো হাসিয়া উঠে। ধ্বংস তখন লক্ষ্মীশ্রী হইয়া বিজয়ের পথে লইয়া যায়।

"আইডিয়েলের" আরও খবর
আসছে শনিবারে বাহির হইবে।

• • • •

স্বাধীন সে যে ঘুনিবার শক্তির অধিকারী। আমি স্বাধীন—আমার পেছনে স্বাধীনতার শক্তি রহিয়াছে, সম্মুখে স্বাধীনের অমোঘ অস্ত্র রাখিয়া অসাধারণ মানসিক ক্ষমতায় দেহ মনকে ভীতিশূন্য করিয়া অগ্রসর হইতেছি, নব প্রাণের এই সাহস ও বল লইয়া একে যেভাবে চলিতে পারে—অপরে আমি পরাধীন, স্বাধীন নহি, এ ভাব ও ভীতি সর্ব্বদা মনে রাখিয়া তেমন ভাবে কিছুতেই আগাইতে পারে না। ব্যক্তিগত হিসাবে কোন জাতির মধ্যে দু'দশজন এমন কোন লোক থাকিতে পারে সাহসিকতায় মানসিক ক্ষমতায় যে অতি শ্রেষ্ঠ লোকের মতই সম্মান পাইবার যোগ্য।—কিন্তু ইহা বিচ্ছিন্ন শক্তির খেলা মাত্র—সমগ্রের মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠ-লোক-যোগ্য গুণাবলী আসিলে বা জাগ্রত হইয়া উঠিলে সে জাতি আর তখন অ-স্বাধীন থাকে না। বিচ্ছিন্ন প্রক্ষিপ্ত শক্তির দ্বারা কখনও সমগ্র জাতির বা কোন দেশের বিচার করা চলিতে পারে না। কারণ সঙ্ঘবদ্ধতা ভিন্ন জাতীয়তার বিকাশ হয় না। সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ভিন্ন দেশ ও জাতিকে স্বাধীন করিবার চেষ্টাও বৃথা। দাস মনোভাব বিকশিত হইতে থাকিলে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার শক্তিও জাতি ক্রমে হারাইতে থাকে। অখণ্ড স্বার্থের বোধেই কোন দেশ ও জাতিকে সমগ্রভাবে ধরিয়া লইয়া সেই সমগ্রের গৌরব মান রক্ষার প্রেরণার মূলেই স্বাধীনতার বিকাশ ও স্থিতি। অ-স্বাধীন জাতি সমগ্রের এ গৌরববোধ বিস্মৃত হইয়া যায়। সমগ্রের এ গৌরব বিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে আপন আপন স্বার্থ-পরতা, হীনতা ইত্যাদি নীচ গুণাবলী ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া চলে। সমগ্রের কথা ভাবিবার শক্তি হইতে ক্রমশঃ তাহারা বঞ্চিত হয়।

• • • •

নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা, অপরাপর হীনতা ইহা স্বাধীন দেশেও অ-স্বাধীন দেশের মতই আছে বটে। তুলনায় কোন দেশে কম কোন দেশে বেশী আছে তাহার বিচার বিতর্ক করিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু এই সব হীন গুণাবলী স্বাধীন অ-স্বাধীন দু'রকম দেশ ও জাতির মধ্যে থাকিয়াও একদল স্বাধীনতার গৌরবে গৌরবান্বিত হয় কেন—অপর দল পরাধীনতার অগৌরবে লাঞ্ছিত হয় কেন—ইহা ভাবিবার কথা বটে। ইহার মুখ্য ও গৌণ কারণ আছে। পরাধীনেরা এই হীন

স্বার্থ ও নীচতাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য বলিয়া বিবেচনা করে—কিন্তু স্বাধীন যাহারা তাহাদের মধ্যে এ দোষগুলি গৌণভাবেই বিরাজ করে। মুখ্য ও কাম্য থাকে তাহাদের—দেশ প্রাণতা ও জাতীয়তার গৌরব রক্ষণ। এক সম্মিলিত শক্তির গৌরব বর্দ্ধন। শক্তির মূল উৎস তাহারা নষ্ট করিয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িতে চাহে না। মূলকে বজায় রাখিয়া তাহারা শাখা প্রশাখা লইয়া নাড়াচাড়া করে। কিন্তু অ-স্বাধীন জাতির লক্ষ্যই থাকে কি করিয়া মূলকে তাহারা উৎসন্ন দিয়া শাখা প্রশাখা লইয়া মত্ত থাকিবে। অ-স্বাধীন দাস মনোভাব সম্পন্ন জাতির অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস দেখিলে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ হয়। দেশ শক্তি—মূলশক্তি বজায় রাখিবার চেষ্টা মনে প্রাণে থাকিলে কোন দেশ বা জাতি মোটেই অ-স্বাধীন হইতে পারে না।

• • • •

স্বাধীন দেশেও দল বিরোধ, মত বিরোধ, রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির সংঘর্ষ এ সমস্ত আছে বটে। কিন্তু এসব বিরোধে তাহারা দেশ-শক্তিকে ক্রমশঃ আরও উন্নতই করিতে চাহে। এই বিরোধ দিয়া তাহারা দেশ শক্তিকে মারিয়া ফেলিতে চাহে না। কিন্তু পরাধীন জাতির মধ্যে এই সব বিরোধ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব ও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। আপনাদের এই বিরোধ বিক্ষোভ দ্বারা তাহারা দেশ-শক্তিকেই পিষিয়া মারিতে চাহে।

• • • •

পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া জগত আজ নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতে চাহিতেছে। চির অত্যাচারী রাজশক্তিকে পরাইয়া নির্য্যাতীত প্রজাশক্তি আজ বিপ্লবের মধ্যে নিজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। জনশক্তি আজ পদদলিত হইয়া থাকিতে চাহিতেছে না। সংখ্যায় তাহারা বেশী, সংসার চালাইবার যোগ্য কাজ করে তাহারা বেশী তাই তাহারা কর্ম্মের উপযুক্ত দক্ষিণা ও মান চাহিতেছে। কিন্তু পুরাতন, প্রতিষ্ঠিত যাহা তাহা সহজে নিজ স্থান ছাড়িয়া দিতে রাজী নহে। কে কবে নিজ অধিকার ছাড়িতে চাহে? তাই দেশে দেশে তুমুল বিক্ষোভ—মারামারি, কাটাকাটি অরাজকতা চলিতেছে। পদদলিত লাঞ্ছিত জনসঙ্ঘের মানুষের মত মর্য্যাদা পাইবার এই প্রয়াস ন্যায্য ও সঙ্গত বটে—কিন্তু অধিকারবাদের এই সংঘর্ষও অতি ভীষণ। যদি সে সব দেশের দেশশক্তি সংহত না হইত—যদি এ সকল ব্যাপারের ভীষণতার মধ্যেও মূলে দেশশক্তির উদ্বোধন নীতি বজায় হইয়া না উঠিত তবে সে সব স্বাধীন শক্তিশালী দেশ ও জাতিও এই সংঘর্ষে কবে বিশ্ব হইতে লোপ পাইয়া যাইত—। কিম্বা পররাজ্য লোলুপ অপর কোন স্বাধীন জাতির গ্রাসে কবলিত হইত। কিন্তু জাতির এই ধ্বংসোন্মুখ বিক্ষোভের মধ্যেও ইহাদের দেশ শক্তির প্রচণ্ডতা দেখিয়া স্বাধীন শক্তিশালীরাও দূর হইতেই ইহাদের অজস্র নিন্দাবাদ করিয়াই তৃপ্ত হইতেছে। নিশ্চিন্তির চলে ভিতরে ঢুকিয়া বানরের নবনী বণ্টন ক্রিয়া চালাইতে পারিতেছে না। বিক্ষুব্ধ জাতিও খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়া আপনাদিগের বিবাদ মিটাইয়া ফেলিয়া সর্ব্বস্ব হইতে চাহিতেছে না।

• • • •

স্বাধীন দেশের দেশাত্মবোধ সম্পন্ন জাতি বড় ও ছোটর মধ্যে দ্বন্দ্ব করিয়া উচ্চ নীচের বৈষম্য ঘুচাইয়া বিশে আদর্শ সাম্য রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে পারে। সে চেষ্টা তাহাদের পক্ষে শোভন। কিন্তু অ-স্বাধীন দেশ যদি নিজেদের মধ্যে মারামারি করিয়া দেশের উচ্চ নীচের ভেদাভেদ কিম্বা জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদ মিটাইতে যায় তবে তাহাতে সুধা আদৌ উঠিবার সম্ভাবনা নাই সে সংঘর্ষে শুধু হলাহলই উঠিবে। দেশের জনশক্তি সে আত্মসংঘর্ষে আরও ক্ষীণ দুর্ব্বল হইয়া ক্রমে ধ্বংশে হইয়া যাইবে। উপরকার স্বাধীনজন যে পরাধীনতার মূষল চাপ অ-স্বাধীন জাতির উপর চাপাইয়া রাখিয়াছে তাহারা পরাধীনের এই আত্মদ্বন্দ্বে উল্লসিত হইবে। পরাধীনের ফাঁসের বাঁধন আরও জোরে গলায় পড়িবে।

• • • •

ভারতের এই জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্ব, উচ্চ নীচে দ্বন্দ্ব—স্পৃশ্যে অস্পৃশ্যে দ্বন্দ্ব চারিদিকে যে দ্বন্দ্ব ভেদাভেদ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে ইহার মধ্যে দেশাত্মবোধ কতটুকু আছে। আজ মূলশ-

যানেরা যদি বিষ্ণুকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, শূদ্র যদি অস্পৃশ্যকে চালিয়া মারে—তবে ভারতীয়দিগের এই দ্বন্দ্বে এই সংঘর্ষে কে লাভবান হইবে! ভারত এই আত্মদ্বন্দ্বে উন্নতির পথে কতটা অগ্রসর হইবে?

• • • •

যে দেশ বা জাতি চির পরাধীন থাকিতে চাহে—আত্ম সম্মানের গৌরব যাহার কাছে বিষ তুল্য, অসম্মান যাহারা শিরোভূষণ করিয়া লইতে চাহে তাহাদের কাছে এ আত্মদ্বন্দ্ব ভাল বোধ হইতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতাকামী জন ও জাতি এ দ্বন্দ্বে শিহরিয়া উঠিবে। যে পঞ্চনদের আকাশ বাতাস দু' দিন পূর্ব্বেই পরাধীনের হাহাকারের উপবাসে রক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল সেই পঞ্চনদেই আজ আত্মদ্বন্দ্ব সব চেয়ে তীব্রভাবে প্রকট হইয়াছে। আজ স্বাধীনতা সংগ্রাম তুলিয়া গিয়া দেশ আজ সংগ্রামে লিপ্ত। পরাধীনের দেশে আজ সংগ্রামের উপাদানের অভাব নাই। স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে। ইন্ধন পাইলেই ধূমায়িত হইয়া মুহূর্ত্তে তাহা লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া পরাধীনকে আরও নাগপাশে জড়িত করিতে পারে। ইহার পর আদর্শ সাম্যের ছলে আমরা যদি এই পরাধীনের দেশে উচ্চ নীচের দ্বন্দ্ব, ধনী নির্ধনের দ্বন্দ্ব পাকাইয়া তুলিতে পারি তবে একেবারে সোনায় সোহাগা হইবে। 'আইডিয়াল ডেমোক্রেসী' বা 'বলশেভিজিম্' সেই চাহিতে পারে যে নিজে মনে প্রাণে স্বাধীন—যাহার দেশ স্বাধীন, যে পরাধীন নহে। যাহাদের নিজের দেশ পরাধীন সে আইডিয়াল ডেমোক্রেসী বা বলশেভিজিম্ কি করিয়া পাইতে পারে তাহা বোঝা যায় না। স্বাধীন দেশের জনসঙ্ঘের মধ্যে এ বোধ জাগ্রত হইয়াছে বটে—কিন্তু পুরা দস্তুর স্বাধীন জাতির মধ্যেও ইহা লইয়া এমন দ্বন্দ্ব চলিতেছে, এত পক্ষে বিপক্ষে প্রশ্ন উঠিতেছে যাহাতে তাহাদের দেশেই এ সব উচ্চ আইডিয়ালের পরিণাম কি হইবে তাহা বলা যায় না। মোটেই কোনদিন এ সাম্য আসিবে কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে। এ এক্সপেরিমেণ্ট তাহাদের সাজে বটে—কিন্তু পরাধীন এ এক্সপেরিমেণ্ট করিতে গেলে তাহা বালকের আগুন লইয়া খেলার মতই হইবে না কি? আজ বিরোধের সৃষ্টিই যদি আমরা আইডিয়াল ডেমোক্রেসী বা বলশেভিজিমের মূল তত্ত্ব ধরিয়া লই—তবে আরও এমন ভীষণ পঙ্কে আমরা পড়িব যে ইহার কূল যখন বুঝিব তখন আমাদের কূল সোধরাইবার উপায় আর থাকিবে না।

• • • •

ভারতীয়দিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক খাইতে পায় না। খাদ্যের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দেহের স্ফূর্ত্তি মনের স্ফূর্ত্তি নাই। মরোণোন্মুখ অবস্থা তাহাদের। জীবন চলিয়া যাইতেছে এক রকমে তাহাও একটা বোঝা দুর্ব্বহ ভারের মত। নিত্য নূতন কর ভার ও শোষণে তাহাদের অবস্থা আরও ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। নব প্রতিষ্ঠিত লবণ করে ভারতে রিফর্মের সম্মান বাড়ুক আর কমুক সে কৈফিয়তে দরিদ্র সাধারণ তৃপ্ত নহে। তাহারা শাক ভাত নুন ভাত হইতেও বঞ্চিত হইয়াই বিষম করে পড়িয়া ভাবিতেছে কেন আবার এ দুর্ব্বহ ভার! বোঝার উপর শাকের আঁটি হিসাবে এই করকে তাহারা গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই সামান্য জীবন ধারণোপযোগী লবণ ভারতের নীল লবণাক্ত সলিল হইতে আহরণ করিয়া তাহারা পুলিসের নির্ম্মম গুলির আঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। আধ পয়সার নূনের জন্য প্রাণ দেওয়া কিম্বা বাৎসরিক তিন আনা বার বৃদ্ধির জন্য যে দেশের হতভাগ্য জন সাধারণ প্রাণ দিতে পারে সে দেশে এই করভার কিরূপ শেল সম লোকের প্রাণে বাজিয়াছে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা। জনসাধারণের যুক্তি এখানে শুদ্ধ—যুক্তি হয়তো এইভাবে অস্ত্রধারীর গোলা গুলিতে আসিলেও আসিতে পারে।

• • • •

স্থানান্তরে আমাদের দেশীয় কোন প্রসিদ্ধ জাতীয় পত্র সম্বন্ধে সেই পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কোন প্রসিদ্ধ লেখক কি লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশ করা হইল। সংবাদ পত্রই এ দেশে জাতীয়তার বীজ ছড়ায় আইডিয়াল ডেমোক্রেসীর আইডিয়া দেয়। যে সমস্ত মস্তিষ্কজীবি লোক এই সব আদর্শ প্রচার করিয়া জনসাধারণের হিত করেন তাঁহাদের সত্য অবস্থা যে কি এবং আমাদের দেশের জাতীয়তার সহিত আপন স্বার্থ ও হীনতা যে

•

কতখানি জড়িত তাহা ঐ পত্রে প্রমাণিত হইবে। এ দেশের শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র যত রকম লোক আছে, মনে হয় তাহার মধ্যে মস্তিষ্কজীবির অবস্থা যত শোচনীয় এমন কাহারও নহে। এরূপ মস্তিষ্কজীবি আমরা লেখকদেরই ধরিয়া লইতেছি। অবস্থার প্রকাশ একটি মাত্র হইয়াছে কিন্তু ঘরে ঘরেই এই অবস্থা। প্রতিকার কি!

• • •

এলায়েন্স ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে—লাল বাতী জ্বালিয়াছে। এ ব্যাঙ্কে টাকা যাঁহাদের গচ্ছিত ছিল তাঁহাদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। টাকা বড় ব্যাঙ্কে রাখিলেই তাহা নিরাপদ নহে—ব্যবসায়ে টাকা না খাটাইয়া যাঁহারা ব্যাঙ্কের সুদই নিরাপদ মনে করেন এবার তাঁহাদের কতকটা চৈতন্য হইবে। বিলাতী ব্যাঙ্ক চলে তাঁহাদের ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য,—বিলাতী ব্যাঙ্কে ভারতীয়ের ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা বড় হয় না—তবে টাকা জমা রাখিয়া সুদ ইহা হইতে ভারতীয়েরা পায়। কিন্তু এ ভাবে লাল বাতী জ্বালিলে সুদ আসল সবই সেই সঙ্গে যায়। দেশে ব্যাঙ্কের বহুল প্রচার ভাল—ভাল ব্যাঙ্ক বেশী না থাকিলে ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধিও সম্ভব নহে। তবে ব্যাঙ্ক ফেল হইতে শুধু লালা হরকিষেনলাল পরিচালিত পিপলস্ ব্যাঙ্কই যায় না—বিলেতী এ্যালায়েন্সের মত ব্যাঙ্কও যাইতে পারে।

• • • •

এবার কংগ্রেসের দল নির্দ্ধারিত সময়ে দেশের কার্য্যের জন্য উপযুক্ত অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। স্বরাজ্য দলের এই কার্য্যে যোগ দিবার কথা ছিল—কিন্তু তাহা বোধ হয় তাঁহারা যেন নাই। যে কারণেই হউক কার্য্য বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নাই। কার্য্য অগ্রসর হইলেই মনে আনন্দ আসে—অগ্রসর হইতে না পারিলেই নিরানন্দ অবসাদ আসে। ইহা স্বাভাবিক—কিন্তু নিরানন্দের মধ্য দিয়াই আনন্দের পথে যাইতে হইবে—লক্ষ্য না ভুলিলে আনন্দের সন্ধান মিলিবে।

• • • •

প্রসিদ্ধ কবি কাজী নজরুল ইসলাম হুগলী জেলে প্রায়োপবেশনে আছেন। অনাহারে তরুণ দেশ কবি প্রায় তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। আত্মমর্য্যাদায় তীব্র আঘাত পাইয়াই কবির এ প্রাণান্তকর অনশন ব্রত গ্রহণ। রুদ্র বৈশাখের প্রচণ্ড ভীষণতার মধ্যে অগ্নি বীণার কবি আত্মবোধ ও আত্মমর্য্যাদায় প্রবুদ্ধ হইয়া অনাহারে প্রাণ দিয়া রুদ্রের সাধন করিতেছেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ যদি মানবের প্রাক্তনের বহির্ভূত না হয় তবে তরুণ কবির সাধনা সিদ্ধ হইবে এবং দেশবাসীর হৃদয়কেও আত্মজ্ঞানের সন্ধানে প্রেরণা আনিয়া দিবে।

ভ্রমর মাকড়সা সংবাদ

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

জাল বোনো তুমি জাল বোনো তুমি
কোনো কাজ নাহি আর হে,
আমার উপর মধুর ধরায়
মধু বিলাবার ভার হে।
কমল আমার অন্তরঙ্গ
শুনাই তাহারে গুনগুনরঙ্গ,
ফুলের পাতায় বীণা বাজাইয়া
ফিরি আমি দ্বারে দ্বার হে।

২

সমীরের ঘায় দিন ছিঁড়ে যায়
বুনে যাও যতজাল হে,
আবডালে আর আড়ালে থাকিয়া
শোয়াইলে কত কাল হে।
তুমি যে কুটিল নহত সরল,
মুখ দিয়া শুধু উগারো গরল,
ওত পেতে হেতা বসে আছ শুধু
ভাঙিতে মাছির ঘাড় হে।

৩

ভীতিময় হায় করি বনবীথি
জাল পেতে তুমি যাও হে,
সোজা পথে পাছে চলে যায় কেউ
সেই পথে বাধা দাও হে।
আঁধারের জীব হীনতায় দাস
শুধু লুকাচুরি শুধু ফুলকাস্
তোমার সুতায় বাঁধা যে পড়িল
উদ্ধার নাহি তার হে।

৪

আমি মৌমাছি ফুল নিয়ে আছি
তাই করো নাক ভুল হে,
ছুটাইতে পারি মধুর লহর
ফুটাইতে পারি হুল্‌হে।
পারিনে যেমন বুনিতে হে জাল
মশা মাছিদের করিতে নাকাল
অমর না হই অমর আমি যে
ধারি অমৃতের ধার হে।

অমৃতবাজারের ঘরের কথা

সে দিন বোম্বে ক্রনিকেলে দেখলাম, তাঁদের কলকাতার সংবাদদাতা গত ১০ই এপ্রিল তারিখে পাঠিয়েছেন যে "On account of the anti-Congress propaganda, of some members of the staff of the Amrita Bazar Patrika' the Editor and proprietors remonstrated with them, but they showed fight and then had to be sent away on Friday last. It is understood that the step was precipitated by their ungenerous criticism of the Bengal Provincial Conference at Jessore."—"অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কয়েকজন লোক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন বলে, অমৃতবাজারের সম্পাদক আর অধিকারীদের তাঁদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক হয়; কিন্তু তাঁরা মারমুখী হয়ে উঠেন বলে গত শুক্রবার তাঁদের বিদায় করে দেওয়া হয়। যশোর প্রাদেশিক সম্মিলনী সম্বন্ধে যে অনুদার সমালোচনা তাঁরা প্রকাশ করেন তাতেই ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি নিষ্পন্ন করা হয়েছে বলে হয়।"

বোম্বে ক্রনিকেলে এই অদ্ভুত সংবাদটি প্রকাশ হবার পরই অমৃতবাজার পত্রিকা সেটি সম্পাদকীয় স্তম্ভে উদ্ধৃত করে নিজের অভিপ্রায়ের খোলা বৃদ্ধি করেছেন।

অমৃতবাজারের অন্যতম অধিকারী শীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ বোম্বে ক্রনিকেলের কলকাতার সংবাদদাতা। পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কি হয়েছিল বা না হয়েছিল তা তিনি যেন জানই করেই জানেন। সুতরাং পত্রিকার ঘরের কথাটা বোম্বে ক্রনিকেল থেকে হুবহু নকল করে ছাপা হোলো কেন,—তা জানবার জন্যে অনেকের কৌতূহল হয়েছে।

ক্ষিতিবাবুর জীবদ্দশাতেই মৃণালবাবু সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু ক্ষিতিবাবুর মৃত্যুর পর থেকেই অধিকারীদের সঙ্গে সম্পাদকদের গোলমাল আরম্ভ হয়েছিল। বাইরের কোন লোক যখন পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা শুনা করতে আসতেন বা চিঠি পত্র লিখতেন তখন মৃণাল বাবুরই তাঁরা খোঁজ করতেন; তাঁর নামেই চিঠি পত্র পাঠাতেন। এ ব্যাপারটা যে অধিকারীদের বেশ পছন্দসই হয় নি, তা তাঁদের আচরণ ব্যবহারে অনেক সময় ফুটে বেরিয়ে পড়তো। তাদের বা তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের লেখা সম্পাদকীয় স্তম্ভে ছাপার খাঁটির ব্যবস্থা হ'বণ্ড অনেক সময় হোতো না। সুতরাং তাঁরা স্থির করলেন যে তাঁদের বাড়ীর একজনকে সম্পাদক না করলে আর তাঁদের prestige থাকছে না। যোগানন্দবাবুকে নামে সম্পাদক করা হোলো, কিন্তু তিনি মৃণাল বাবুকে বুঝিয়ে দিলেন যে মৃণাল বাবুর ক্ষমতা পূর্ববৎ বজায় থাকবে। শুধু কাগজের সম্পাদকীয় অন্যান্য ব্যবস্থার জন্যে যোগানন্দ বাবুর নাম সম্পাদক হোলে ছাপা হবে।

এ সর্তটা পুরোপুরি রক্ষা হয়নি। মহাযুদ্ধ বাধলে, মন্বন্তর হলে, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় অমৃতবাজারের অনেক মুরুব্বি আছেন যাঁদের মন যুগিয়ে চলাতেই অমৃতবাজারের অধিকারীদের স্বার্থ বজায় থাকে; কিন্তু পত্রের মন যুগিয়ে চলার অভ্যাস মৃণাল বাবুর নেই।

গয়া কংগ্রেসে যখন বলাবলি হয়, তখন আমরা কোন দলকেই সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারিনি; কিন্তু কংগ্রেসের কার্যপ্রণালীর যে পরিবর্তন দরকার এ কথা আমরা বেশ স্পষ্ট করে বলেছিলাম। এ ব্যাপারে পত্রিকার অধিকারীরা একটু হাপিয়ে উঠেছিলেন। যোগানন্দবাবুর বিরুদ্ধ মতামতের কোন বালাই নেই; তাঁর শুধু জয় পাশে majority র বিরুদ্ধে কোন কথা লিখলে আন্দোলনের আহুতি হয়ে যায়। তিনি আমাদের শুধু এই অনুরোধ করতেন যেন আমরা কংগ্রেসের হাওয়ার দিকে একটু লক্ষ্য রেখে কলম চালাই, আর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন কথা না লিখি। ক্ষিতিবাবুর এক জামাতা (যিনি সৌরীন্দ্র সেন ও অমৃতবাজার পত্রিকার অধিকারী) অমৃতবাজারের অধিকারীদের মধ্যে একজন। অমৃতবাজার যে ঘর তাঁরে, অমৃতবাজারের সেই ঘর বজায় থাকে—এটা তাঁর একান্ত ইচ্ছা; কেননা তা হলে আনন্দবাজারটা দাঁড়িয়ে যায়, আর তাঁরও দু পয়সা লাভ হয়।

ক্ষিতিবাবুর অন্যতম জামাতা শীযুক্ত কান্তি ঘোষ পত্রিকার policy বাতে বেরোবে থাকে সে সম্বন্ধে আমাদের মাঝে মাঝে সদুপদেশ দিতে আসতেন। কিন্তু মৃণাল বাবু সে কথায় কান দিতেন না। ক্ষিতিবাবুর জীবদ্দশায় শীযুক্ত বাবু জামাতার কাছে বড় একটা ঘেঁসতে পারতেন না কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর শীযুক্ত বাবুর কাগজের উপর টানটা হঠাৎ বেড়ে উঠলো। আর তিনি যখন পত্রিকার মস্ত ভাগের একভাগের অধিকারী তখন তাঁর আর তাঁর বন্ধুবর্গের বক্তব্যগুলি পুরো দিলেই যাতে কাগজ বেশ হয় সে সম্বন্ধে তিনি আমাদের আরও অবহিত করেন। কাগজের policy সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এই যে কংগ্রেসের অভ্রান্ত প্রকাশ হবার পূর্বে পত্রিকায় কোন বিষয়ে মতামত দেওয়া উচিত নয়, অন্ত বিষয়ে লোকমত প্রকাশ হবার পরে পত্রিকা যাতে সেই মত সমর্থন করে, সেইটাই শীযুক্ত বাবুর ইচ্ছা, আর যে সমস্ত রাজনীতিক, ধনিকদের বা যোগাযোগের আয় থেকে অনুগ্রহ পাবার সম্ভাবনা, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা পত্রিকার পক্ষে শীযুক্ত বাবুর মতে একেবারেই অবশ্য।

এটা আমরা বেশ বুঝেছিলাম যে এঁদের অধীনে কাজ করা আমাদের বেশী দিন পোষাবে না। তবে যোগানন্দবাবুর মৃত্যু ব্যাপারটা পূর্বে থেকে টের পাই নি। তাঁদের প্রকাশ বক্তৃতা আমরা শুনেছি বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ তিনি ব্রহ্মাণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে—একখানা ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু বলবার ভাষা-

ওয়ালাদেরও যদি তাই করতে হয় তা হলে খপরের কাগজ উঠিয়ে দেওয়াই উচিত। অন্তত: আমার এই ধারণা। তারকেশ্বর বাবুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবার বহু পূর্ব্বেকার। ওঁর বদেশপ্রেম, ওঁর প্রাণের কোমলতা—এ সবের বিষয়ে আমি অনেকবার পেরেছি। কিন্তু তা হলেও সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে তিনি যে ভাবে যশোরের সভাপতিত্বের কাজ চালিয়েছিলেন সেটা অনেকেরই মনঃপুত হয় নি। সেই কথা অপ্রীতিকর হলেও আমার লিখতে হয়েছিল। আমরা অফিসে বা লিখে দিয়ে আসি, সেগুলো রামের গোলাপ বাবু দেখে নেন। ওঁর কোন আপত্তি থাকলে তিনি সেগুলো আমাদের জানান; কিন্তু সে বিষয়ের লেখা সম্বন্ধে সে দিন রাত্রে বা তার পরদিন তিনি কোন কথাই বলেন নি।

প্রবন্ধ বের হবার পর সেবারকার তারকবাবু পত্রিকায় একখানা চিঠি দিয়েছিলেন। সেখার সুরে এমন একটা করুণ আর্ত্তনাদ ফুটে উঠেছিল যা লেখে আমার কান্নাও পেয়েছিল হাসিও পেয়েছিল। দেশের ও দশের তিনি সেবা ওঁর মত অভিমানী হওয়া শোভা পায় না। আমাদের সমালোচনা ওঁর অপ্রিয় হয়েছে বলে তিনি বারবার অবলম্বন করবার সংকল্প করেছেন।—হায় রে পোড়া দেশ!

তারকবাবু রাজনীতির কলহপ্রিয়তার লেজ; সুতরাং তিনি একটুই যোগে কংগ্রেসের কর্ত্তা কর্ত্তী ও বিধাতারাও ক্ষেপে যাবেন—আর সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার কাটতিও কমে যাবে—এই ভয়ে পত্রিকার কর্ত্তারা ক্ষেপে উঠলেন। সেই কল্পাবিত-কলেবর স্বদেশসেবকবৃন্দের সেবা হলেন পীযূষকান্তি ঘোষ। তারকবাবুর দুঃখ অভিমান শান্ত করবার জন্য পীযূষ বাবু তাঁর পরদিন প্রকাণ্ড একটা যাত্র কিছু সম্পাদন দিয়ে তারকবাবুর বাড়ী ছেড়ে দিতে গেলেন; আর সেইদিন রাত্রে special reporter হয়ে এক পত্র লিখে পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে পূর্ব্বে যা লেখা হয়েছিল তার প্রতিবাদ করলেন। রাত্রে যিনি সম্পাদক সেই গোলাপ বাবু কোন দিকে হাওয়া বইছে বুঝতে না পেরে একবার এদিকে একবার ওদিকে ঘাড় নেড়ে সন্ত্রস্ত হয়ে যাত পা ছুঁড়িয়ে বসে পড়লেন।

এ রকম সম্পাদকের অধীনে কাজ করা কঠকারি; সুতরাং সেইদিন সন্ধ্যার সময় আফিসে ফিরে আমি গোলাপ বাবুকে ডেকে বলি যে আমার আর ওঁদের সঙ্গে কাজ করা পোষাবে না। গোলাপবাবু আমায় পনের দিন সময় দিতে বলেন।

ইতিমধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল যা বলে রাখা দরকার। তারকেশ্বরের মোহান্ত সম্বন্ধে আমাদের সহকর্ম্মী বিশেষাই বাবু একটা প্যারাগ্রাফ লেখেন। সেটা বার হবার পরদিন পীযূষ বাবু আফিসে এসে বলেন যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে—মোহান্ত মহারাজ ওঁদের বিশেষ বন্ধু! তারকেশ্বরের মোহান্তের সঙ্গে পীযূষ বাবুর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কি করে হোলো, আর সে রকম সম্বন্ধ থাকলেই কেনই বা পত্রিকার মোহান্ত মহারাজের গুণগ্রাম কীর্ত্তন করতে হবে, তা বুদ্ধিমান বিশেষাই বাবুর অনেক বেশ দেখে নিতে হয়েছিল। শেষে পীযূষ বাবু বলে ফেললেন—"আমাদের বিপদের সময় মোহান্ত আমাদের ৫০০৲ টাকা পাঠিয়েছিল—আর গত বৎসরও ঠিক এমনিতরো আর পাঠিয়েছিল।"

যুক্তিটা অবশ্য অকাট্য; কিন্তু যুক্তিটা শুনে মৃণাল বাবু (মৃণাল কান্তি বসু) হেসে উঠেছিলেন। হাসিটা পীযূষ বাবুর প্রাণে বোধ হয় অত্যন্ত হয়ে বেজেছিল; কেননা তিনি তখনই ক্রুদ্ধ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তার পর পীযূষ বাবু তারকেশ্বরের মোহান্ত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে কথা বলেছিলেন তা চাপা দিয়ে, তাঁকে কিছু না বলে মোহান্তের erudition ও charity সম্বন্ধে প্রকাণ্ড একটা লাইব্রেরিকেট দিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখে ছাপিয়ে দেন।

যশোরের কলকারেন্স আর এই মোহান্তের ব্যাপার নিয়ে অধ্যক্ষ-কার্য্যালয়ের সঙ্গে আমাদের মতভেদটা লেগে ওঠে।

আমি পদত্যাগ করবার কথা গোলাপ বাবুকে জানাবার পর মোহান্তের ব্যাপার নিয়ে অন্যতম সহকারী সম্পাদক বিশেষাই বাবুর সঙ্গে গোলাপ বাবুর খানিকটা তর্ক বিতর্ক হয়। গোলাপ বাবু স্বীকার করেন যে মোহান্ত সম্বন্ধে পীযূষ বাবু তারকে যা লিখেছেন তা তিনি ছাপবার আগে গোলাপ বাবুকে দেখান নি। আর সে রকম করা অন্যায় হয়েছে। ভবিষ্যতে তা হবে না। তর্ক বিতর্ক শুনে পীযূষ বাবুকে সমর্থন করবার জন্য আরও দুই একজন অধ্যক্ষিকারী সেখানে উপস্থিত হলেন। তাদের যশোরের কথা উঠলো। অধ্যক্ষিকারীদের একজন প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলেন যে কংগ্রেস বা কনফারেন্সের দোষ ত্রুটি আমরা যাই দেখিয়ে দেব, সেগুলো লেখা আমাদের উচিত নয়। অসহযোগের দোষগুলো ঢেকে রাখা সম্বন্ধে যারা লেখনী ধারণের কাগজ ওয়ালাদের কর্ত্তব্য। নিজের এই রকম ভীরু কর্ত্তব্য জ্ঞান সমর্থন করে তাঁর এক পুত্র ও অন্য দুই একজন অধ্যক্ষিকারী সম্পাদকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। বক্তৃতায় তাদেরও বেশ অনুরাগ দেখা যায় নি। গোলাপ বাবু ওঁদের সান্ত্বনা করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু না পেরে সেখান থেকে উঠে গেলেন। আমরাও সেখান থেকে চলে এসে তার পরদিন কাজে ইস্তফা দিয়ে এক চিঠি দিই। তারপর আমাদের পদত্যাগ গ্রহণ করে অদ্যকার পত্রিকা কোম্পানীর সম্পাদক আমাদের চিঠি দিয়েছেন।

এই ত ঘটনা। এটা জানবার জন্য পত্রিকার সম্বাধিকারীদের এত মুণ্ডা চেষ্টা কেন?

(আগামী)

দোটানা

(পূর্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কথা ছিল, সতীশ যথাসময়ে আসিবে, বন্ধুগণ সন্ধ্যা হইতেই রুক্মিণীর ঘরে আসিয়া বসিয়াছিলেন। একটা হোয়াইট লেয়ব্‌লের বোতলের প্রায় তিন ভাগ খালি হইয়া গিয়াছে, রুক্মিণী তাকিয়া বালিসের উপর একখানি ছিটোজা রঙের সিল্কের শাড়ী পরিয়া মধ্যস্থলে বসিয়া সিগারেট টানিতেছিল, প্রকাশ বলিল—তুই একটা আস্ত পাঁড়ল, রুকু! চার চারটে দিন এল, পাঁচ সাত ঘণ্টা আড্ডা মারলে, তা না কইলি একটা কথা, না পারলি ঘমাতে, দুর্‌ভোর ভাল হোক্!

রুক্মিণী অর্ধদগ্ধ সিগারেটটিকে ছাই পাত্রের উপর ফেলিয়া দিয়া মুখ চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিল—যাও যাও! ওসব মেনিমুখো লোক আমি চু'চক্ষে দেখতে পারি না।

প্রকাশ ব্যস্ত হইয়া বলিল—তা বল্লে কি চলে চাঁদ? একটা হাতের পাঁচটা আঙুলই যখন সমান নয়, মানুষ যে সবাই একরকম হবে তার ঠিক কি। করে' নেওয়াই ত বাহাদুরী, রুকু। যাক্, একটু চেষ্টা করিস্, বুঝ্‌লি?... প্রকাশ নয়নযুগে এমন এক অব্যক্ত ভাষা প্রকাশ করিল যাহা রমণী বা কক্ষস্থিত কোন পুরুষেরই বুঝিতে বাকী রহিল না। প্রকাশের বুদ্ধির তারিফ করিয়া তাহারাও রমণীকে নীরব ভাষায় প্রোৎসাহিত করিল।

সিঁড়িতে পদশব্দ শ্রুত হইল, বন্ধুগণের নয়নে-নয়নে আর এক ভাষার বিনিময় হইয়া গেল, রুক্মিণী দাঁড়াইয়া উঠিল, বোতল, এ্যাস-ট্রে, সোডা-ওয়াটারপূর্ণ গ্লাস ও তাকিয়াটি সরাইয়া রাখিয়া, দ্বার সম্মুখে আসিয়া সহাস্য-মুখে সতীশকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। হাসিমুখে বলিল—আজ যে এত দেরী!...বলিয়াই সতীশের হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া টানিতে টানিতে বলিল—এস!...সতীশকে মাঝ-খানে বসাইয়া দিয়া বলিল—পাণ খাও!

সতীশ তাহার হাত হইতে পাণ দু'টি লইয়া মুখে ফেলিয়া দিল, রুক্মিণী একটা সিগারেট অগ্রসর করিয়া দিতে, ঘাড় নাড়িল।

রুক্মিণী জিজ্ঞাসিল—খাও না?

সতীশ নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল।

রুক্মিণী বহুক্ষণ স্বভাব দমন করিয়া রাখিয়াছিল, আর পারিল না, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—মৌন ব্রত ধারণ করেছ?

সতীশের মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, সে নতমুখে বসিয়া রহিল। কথা কয়টা কিছু নয় মনে করিয়াই সে বসিয়া-ছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে এমন একটা খোঁচা ছিল যে কথাটা বহুই আলোচনা করিতে লাগিল, সে ততই কুণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল। রুক্মিণী যখন দু'পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া তবলার তালে তালে নাচিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে রূপ-সাগরের কূলে আছাড়-বিছাড় করাইতেছিল, সতীশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া, একবার সুরাপ্রমত্ত বন্ধুগণের দিকে চাহিয়া কক্ষ ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিল। রুক্মিণী তাহা দেখিল, সতীশ যখন অন্ধকারে হাতড়াইয়া দোটা দুই সিঁড়ি নামিয়াছে, পিছন হইতে তাহার চাদরে টান পড়িল।

সতীশ সভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইল।

রুক্মিণী সরিয়া আসিয়া দেওয়ালের গায়ে হাত দিয়া আলোক জ্বালিয়া দিল। সতীশ সে আলোকে চমকিয়া উঠিল। রুক্মিণী বলিল—আমারও একটা ব্রত আছে। শুন্‌বে—কি ব্রত?

সতীশ বিন্দুমাত্র আগ্রহ-ও দেখাইল না। রুক্মিণী বলিল—বল না শুন্‌বে?—তখনি আবার সতীশের চাদরটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—কাল এসো, বল্‌বো—বুঝলে?

আর আসিবে না, সতীশ জানিত কিন্তু মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারিল না। রুক্মিণী বলিল—অনেকক্ষণ বাইরে এসেছি, এখনি মাতালগুলো হৈ চৈ করবে, যাই। কাল এসো।—সে প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল, সতীশ অস্ফুট-কণ্ঠে বলিল—আর আস্‌তে পারব না।

রুক্মিণী বিদ্যুৎ-গতিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। চক্ষে বিজুরী আনিয়া চপলকণ্ঠে কহিল—পারবে না বৈ-কি!

সতীশের কণ্ঠমধ্যে অনেক কথা গুমরিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু একটাও বাহির হইবার পূর্বেই, রুক্মিণী বলিল—লক্ষ্মীটি, এসো, ঐ সময়ে এসো, একটা দরকারী কথা বল্‌বো। বলিয়াই সে ঘরে ঢুকিয়া গেল। সতীশ অল্পক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর চিন্তাকুল হৃদয়ে রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

আরতি একটা জানালার ধারে বসিয়াছিল, সতীশ

ঘরে ঢুকিয়া অত্যন্ত আগ্রহভরে তাহাকে ধরিতে আসিয়াই থিড়াইয়া গেল। আরতির চোখে জল যেন চক্ চক্ করিতেছিল! সতীশের পা দুইটা কাঁপিয়া গেল, বুকের ভিতরে ঝড় বহিতে লাগিল, সতীশ কম্পিতপদে অগ্রসর হইয়া আরতিকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া বিছানায় আনিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে বলিল—ঘুমোও নি যে!

আরতি দৃঢ় অথচ নম্র কণ্ঠে কহিল—ঘুম আসে নি।

সতীশ তারপর কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, আমতা আমতা করিয়া বলিল—আজ কি গরম দেখেছ?

আরতি কথা কহিল না। সতীশ খোলা জানালা দিয়া আকাশস্পর্শী একটা নারিকেল গাছের দিকে চাহিতে চাহিতে বলিল—গাছের পাতা নড়ছে না, দেখেছ?

আরতি হ্যাঁ—বলিয়া চুপ করিল। একটু পরে বলিল—কাজ মিটেছে?

সতীশ যেন বুঝিয়াও বুঝে নাই এমনি ভাবে বলিল—কি বলছো?

আরতি বলিল—কাজ মিটেছে না এখনো বাকী আছে?

মিটেছে।

আর যেতে হ'বে?

সতীশ এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, বলিল—কালকের দিনটি, আর নয় বুঝলে যণি!

আরতি এ-আদরে একটুও আনন্দিত হইল না, রুক্ষ-ভাবে সতীশের হাত দুইটা ছাড়াইয়া দিয়া বলিল—ছাড়, ঘুম পেয়েছে।

সতীশ আর কিছু বলিল না, অন্ধকার ঘরে কড়িকাঠ গণিতে লাগিল। ঘণ্টাখানেক পরে অসহ্য গরম বোধ হইতে, উঠিয়া বসিয়া দেখিল, আরতি গাঢ় নিদ্রামগ্ন, একবার তাহার সুপ্ত মুখখানির পানে স্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সতীশের চিন্তা শেষ হইয়া গিয়াছিল। অপরাহ্নে ষ্টুডিওর দ্বার বন্ধ করিয়া সতীশ বারান্দায় বাহির হইতেই দেখিল, আরতি বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্নেহ সুকোমল সোহাগভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—আজ কোথায় আরতি?

আরতি উত্তর দিল না, ব্যগ্র দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সতীশ বারান্দায় ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া হাসি-হাসি মুখে বলিল—হারু গাড়ী আনতে গেছে বুঝি? কোথা যাওয়া হবে আজ?

আরতি রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তোমার দরকার?

সতীশ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল।

হারু একখানা থার্ডক্লাস গাড়ীর খোলা দরজায় মুখ বাড়াইয়া বারান্দার দিকেই চাহিতেছিল, আরতি তাহা দেখিয়াই নামিয়া গেল। সতীশ বহুক্ষণ ধরিয়া সেই-খানেই দাঁড়াইয়া আরতির দুই কথার সেই প্রশ্নটাই ভাবিতে লাগিল। যত ভাবে, সতীশের চিত্ত ততই দুঃসর্গে প্রোথিত হইয়া যায়। আরতি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, আরতি ব্যথা পাইয়াছে, প্রাণভরা বেদনার জ্বালায় জ্বলিয়া তবে কথা দু'টা বলিতে পারিয়াছে—ভাবিতে ভাবিতে সতীশের উৎসাহ, উদ্যম, আশা, আকাঙ্ক্ষা অতল তলে ডুবিয়া গেল।

সতীশ শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল, ভাবিল, আজ আর বাড়ীর বাহির হইবে না, আরতি আসিয়া তাহাকে বাড়ীতে দেখিলে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবে, ভাবিয়া সে চুপটি করিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সেই যে মেয়েটা সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া কাতর কণ্ঠে তাহাকে একটি দিনের জন্য আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল, একটি দিন, একটি দিন মাত্র—সতীশ শয্যায় উঠিয়া বসিল। একদিন বই ত নয়—ভাবিতে ভাবিতে সে শয্যা ত্যাগ করিল। কি তাহার দরকারী কথা, কি সে বলিতে চায়, জানিবার আকুলতাও অন্তর মধ্যে কম অল্প ছিল না, সতীশ স্নান কক্ষে ঢুকিয়া স্নানাদি শেষ করিয়া, কেশে-বেশে একটু-আধটু সংস্কার করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

রুক্মিণী প্রথমেই বলিল—আজ্ঞা, আমরা কি এতই কুৎসিত?

সতীশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

রুক্মিণী আবার জিজ্ঞাসিল—এতই ঘৃণ্য? চুপ করে থাকলে চল্‌বে না, বল!—মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে সে তাহার দুইটা হাত হাতের মধ্যে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সতীশের মন ভাল ছিল না, এ-সকল কথার যে কি উত্তর হইতে পারে, তাহা সে ভাবিয়াও পাইল না।

রুক্মিণী বলিল—বল! অত ভাবছো কেন? সত্যি কথা বল্‌বে, তার অত ভাবনা চিন্তে কেন?

সতীশ বলিল—আমি কখনও তা ভাবি না।

কি ভাব না?

আপনারা...

সত্যি?

হ্যাঁ।

তবে বস, বলিয়া এক-রকম টানিতে-টানিতেই তাহাকে বসাইয়া দিল।

রুক্মিণী বলিল—গান শুন্‌বে?

সতীশ ভাবিল, বলে শুনিবে। কিন্তু সাহস হইল না, আর ফিরিবার ইচ্ছাও বলবতী ছিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া রুক্মিণী বলিল—ভালো লাগেনা, না? আচ্ছা এস, গল্পই করা যাক্...

বলিয়া, রুক্মিণী অতীত জীবনের পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইয়া বিবৃতকরিতে লাগিয়া গিয়াছিল; কবে কোন্ ধনী শ্রেষ্ঠ যুবক তাহাকে...কবে কোন্ রঙ্গালয়ের বক্সে তাহাকে দেখিয়া একদল যুবক...

সতীশ অকস্মাৎ বলিল—রাত হয়ে গেছে, চল্লুম, নমস্কার!

লোকটার এই অভদ্র মনোচিত আকস্মিক আচরণে রুক্মিণী বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাই কোন কথা বলিবার পূর্বেই, চাহিয়া দেখিল, সতীশ নামিতেছে। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল, কোন কথা বলিল না।

সতীশ নামিতে নামিতে শুনিল, রুক্মিণী বলিতেছে—চুলোয় যাক্—কাপ্তেন! অমন কাপ্তেনের মুখে আমি...

সতীশ থমকিয়া গেল। রুক্মিণীর বাক্য উৎসে বাধা দিয়া যে লোকটা "আহা-হা" করিয়া উঠিল, সতীশ কোন মতেই সেই কণ্ঠস্বর প্রকাশের নয়—ভাবিলেও, ধারণা বদলাইতে পারিল না।

ছলনা, ছলনা, সতীশ বার বার এই তিন অক্ষরের কথাটাই উচ্চারণ করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সতীশ নির্জন গৃহ দেখিয়াই ঠিক করিয়াছিল, আরতিরা এখনও ফিরে নাই। সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাড়ী ঢুকিয়া একেবারেই তাহার ইডিওর দিকে চলিল। ইচ্ছা, ছবিখানির নামকরণ করিয়া আসে! আগে সে একটা নাম ঠিক করিয়াছিল, এখন আর সে নাম তাহার মনে ধরিতেছিল না। যে নাম সে এখন ঠিক করিয়াছে তাহা সে এখনই চিত্র নিম্নে লিখিয়া দিতে চায়! তার, বিলম্ব হইলে ভুলিয়া যাইবে, নয়ত আবার মতি-পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। এমন নাম আর খুঁজিয়া পাইবে না, আর তা যদি না পায়, চিত্রের নাম-করণও মিথ্যা হইয়া যাইবে।

সে চিত্রের নাম রাখিবে—ছলনা!

ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া তুলি লইয়া সতীশ চিত্রখানির সম্মুখে বসিয়া আবরণ খুলিতেই লাফাইয়া উঠিল। এই যে কে তাহার চিত্রের নামকরণ করিয়া গিয়াছে!

"চার রাত্রি ও একরাত্রি কাটে!"

এ যে আরতির লেখা! আনন্দে দুঃখে, বিস্ময়ে ক্ষোভে সতীশের বুকটা কেমন যেন ধড়াস ধড়াস করিতেছিল। সতীশ পাংশুমুখে দাঁড়াইয়া আছে, পিছনে কাহার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইয়া, ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল—আরতি!

সতীশ ভয়ে চাহিতে পারিতেছিল না, যখন দেখিল, আরতির অধরোষ্ঠ দু'খানি হাসির ঢেউ লাগিয়া দুলিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে তখন সাহসে ভর করিয়া বলিল—এ নাম কে রাখলে আরতি?

আমি।

বলিয়াই আরতি উচ্চহাস্য করিল, বলিল—আচ্ছা তুমি লুকিয়েছিলে কেন আমায় বল ত?

সতীশ উত্তর দিতে পারিল না।

আরতি বলিল—নাম ঠিক হয় নি?

সতীশ তাহার অধরে হাস্যরেখা দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, অগ্রসর হইয়া আরতির একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—তুমি জান্লে কি করে আরতি?

আরতি ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—জানা ভারি শক্ত কি-না! উনি রোজ রাত্রে বার হন, ভোর থেকে দরজা বন্ধ করে ছবি...

সতীশ আবেগ কম্পিতকণ্ঠে কহিল—তুমি কি ভেবেছিলে আরতি? আমি...

আরতি বলিল—ইস্! আমি কি না সে কোম্পানীর চিঠি দেখি নি? হাবুকে দিয়ে পড়িয়ে তবে না আমি চুপ করেছিলুম।

আচ্ছা আমার উপর তোমার সন্দেহ হয় নি?

সন্দেহ হবে কেন? তবে লুকিয়েছ বলে রাগ হয়েছিল।

আরতি বলিল—হাজার টাকায় কত গেল?

একশ'।

বাকী—ন'শ?

তোমার!

নব বসন্তে

প্রিয়জনকে উপহার দিতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে আমাদের অ্যাইভিন্যাল ক্রীমেন্সিলিন এবং বেসিন প্রস্তুত—চন্দন, বরেল, বকুল, ঘাস ও ভায়োলেট সাবান ব্যবহার করুন।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী

৬৪।১এ বেচুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।　　টেলিফোন ২৪১৬

প্রেমিকা

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]

হেলেন ভন ডনিজেস্ এক সময়ে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে খ্যাতনামা সুন্দরী ছিলেন। ইউরোপের সমসাময়িক ইতিহাসে এই নারীর স্থান আছে এবং বহু বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের গল্প ও নাটের অবলম্বন হইয়াছেন ইনি। জর্জ মেরিডিথের বিখ্যাত উপন্যাস 'The Tragi-Comedians'র নায়িকার চরিত্র এই সুন্দরীরই চরিত্র চিত্র। প্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার সার্দ্ধুর রঙ্গনাট্য 'Divorcous'র ঘটনাবলীও ইহারই বিচিত্র জীবনের ঘটনা হইতে গৃহীত। আমেরিকা হইতে প্রকাশিত 'Homes of famous Lovers' নামক বিখ্যাত পিরিজে ফার্ডিনাণ্ড ল্যাসেলের সঙ্গে ইহার প্রণয়-কাহিনীকে দান্তে ও বিয়াট্রিসের প্রণয়-কাহিনীর পাশেই স্থান দেওয়া হইয়াছে।

এই সুন্দরীর চরিত্র বিচার করিতে ইহাকে অপর সাধারণ নারীদের সঙ্গে বিচার করিলে চলিবে না। এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, মস্তিষ্কের এমন ক্ষমতা, এমন মনোহারিণী শক্তির পরিচয় জগতে বড় বেশী নারী রেখে যান নাই। ইহার খেয়ালও ছিল একটু অন্য ধরণের। কখন কি খেয়ালে কি ভাবে যে ইনি চলিতেন তাহা কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। নিজের যাহা ইচ্ছা হইত নিজে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা হইতে কিছুতেই ইনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। বংশের প্রভাব, শিক্ষা ও সংসর্গ এগুলিতেও তাঁহার চরিত্রের এই সব দোষ ও গুণ বাড়াইয়াই দিয়াছিল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে মিউনিচে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতা ছিলেন বিখ্যাত ব্যাভেরিয়ান রাজনীতিক—এবং মাতা বার্লিনের একজন ইহুদী রমণী ছিলেন। নিজের খেয়াল এবং অদম্য ইচ্ছা শক্তির উল্লেখে তিনি প্রায়ই তাঁহার শরীরের আর্য্য ও সেমাইট রক্তের সংমিশ্রনের কথা বলিতেন। সুন্দরীর বাল্যকাল মিউনিচেই অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহার পিতা ছিলেন রাজা দ্বিতীয় ম্যাক্সেসের সভাসদ্ এবং মাতা ছিলেন রাণী মেরীর বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহার পিতামাতার গৃহে রাজ্যের যত সাহিত্যিক, কলাবিদ্ ও বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সমাগম হইত। তাই হেলেনের বাল্যজীবন সৌন্দর্য্য, কলা ও প্রতিভার খেলেনেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

ছেলেবেলায় হেলেনের মত সুন্দর মেয়ে খুব কমই দেখা যাইত। ফুলের মত মুখখানি, সোণার বরণ গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ রাশি দিয়ে যেরা—নীল চোখ দুটিতে যেন বুদ্ধি উছলিয়া পড়িতেছে। বাল্যে তাঁহার চাল চলন ও ভঙ্গীমায় তাঁহাকে রাণীর মতই দেখাইত। পরী কাহিনীর সম্রাট এই অসাধারণ সুন্দরী বালিকাকে হাঁটুর উপর বসাইয়া স্বরচিত গল্প শুনাইতেন ও সুন্দরীকে পরী রাণী বলিয়া ডাকিতেন।

পিতামাতা স্বজন বান্ধব সকলেই এই সুন্দরীকে ভালবাসিতেন। বৃদ্ধরাজ পরে যিনি ব্যাভেরিয়ার হতভাগ্য রাজা লুই হইয়াছিলেন তিনি হেলেনের খেলার সাথী ছিলেন। কল্পনাপ্রিয় এই দুইটি শিশু নানা নূতন নূতন খেলার আবিষ্কার ও পরীকাহিনীর রাজা রাণী অথবা নীল পরী সবুজ পরী সাজিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। ফুলে ফুলে কক্ষগুলি সাজাইয়া ফুলের বস্ত্র, ফুলের ডানা ও ফুলের আভরণে সাজিয়া তাঁহারা পরীরাজ্যে বিচরণ করিতেন।

বাল্যকালে অন্যান্য ছেলেমেয়েরা যখন স্কুলে শিক্ষালাভ করে হেলেন তখন তাহার পিতামাতার গৃহের সজ্জিত কক্ষে সামাজিক সম্মেলনে যোগ দিতেন। এইখানেই তিনি রুবিনষ্টেনের পিয়ানো বাদন বা হেবেল ও কোলবাককে বসিতে শুনিতেন। উচ্চ আশা ও কল্পনায় এই সময়েই বালিকার চিত্ত দোদুল হইত—এবং সামান্য আঘাতেতেই হেলেন নিরাশ হইতেন। হেলেন পড়াশুনা অত্যন্ত ভালবাসিতেন, জার্মেন বড় বড় গ্রন্থকারদের গ্রন্থ ইহার কণ্ঠস্থ ছিল। জুলোজি, বোটানি ও সঙ্গীতে ইহার অসাধারণ অধিকার ছিল। জার্মেন ও ফরাসী শিক্ষয়িত্রীর নিকট ইনি শিক্ষালাভ করিতেন কিন্তু ইহার শিক্ষায় ও পাঠে কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী ছিল না। নিজের ইচ্ছামত স্বাধীন ভাবে যখন যেমন খুসী সেইভাবেই হেলেন চলিতেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধব যাঁরা ছিলেন সকলেই ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে বড়। তখনকার কালের বিলাস-সভার ললিত নীতিও এই বালিকার চোখ এড়াইত না এবং তাহা হেলেনের পক্ষে বড় ভাল আদর্শ ছিল না।

বিপুল ধন সম্পত্তিশালী একজন ইটালীয় সম্রান্ত যুবক হেলেনকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হেলেনের বয়স তখন মাত্র তের বৎসর। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষী পিতামাতাও এ বিবাহে একরূপ সম্মতিই দিয়াছিলেন।

কিন্তু বুড়োর বড় আশা ভঙ্গ হইল—এমন সুন্দরী কিশোরী লাভের আশা সফল হইল না—কারণ হেলেন এই সময়ে তাঁহার দিদিমার সঙ্গে বার্লিনে যাত্রা করিলেন। বার্লিনের জীবন হেলেনের পক্ষে অনেকটা শান্ত স্থির জীবন ছিল। এখানে ইনি অধ্যয়ন ও অন্যান্য কলা বিদ্যা শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এইখানেই রুমানিয়ার রাজকুমার প্রিন্স ম্যাকোভন র‍্যাকুইজার সঙ্গে ইঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পরবর্ত্তী জীবনে এই প্রিন্সের সঙ্গে ইঁহার জীবন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত।

হেলেনের পিতা ভিক্টর-ই-ম্যাসুয়েলের কোর্টে মন্ত্রীর কার্য্য করিতেছিলেন। হেলেন মাতামহীর সঙ্গে টিউরিনে গেলেন। যদিও হেলেনের বয়স এখন পোনের বৎসর মাত্র কিন্তুএই বয়সেই তিনি ইউরোপের বিখ্যাত বিখ্যাত সমাজে মিশিতেন এবং আদরের সহিত গৃহীত হইতেন।

এই খানেই সৌন্দর্য্য ও রসজ্ঞানে হেলেন বুলোগার লিচর্ন, মেরবিয়ার, সম্রাজ্ঞী ইউজিন, রুস সম্রাজ্ঞী, লেডী ক্রহাম, গ্রাণ্ড ডাচেস্ হেলেন প্রভৃতির ন্যায় বন্ধু লাভ করেন। এইখানেই তাঁহার যৌবনের প্রথম প্রণয়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। পল তন ক্রুসেনষ্টারহ্ যুবক নৌযোদ্ধা, ইঁহার জাহাজ তখন ভূ-মধ্য সাগরে ছিল, এই তরুণ নৌযোদ্ধা হেলেনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। হেলেন তাঁহার সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবনের শেষ ভাগেও সে স্মৃতি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত স্মরণ করিতেন।

ভাগ্য প্রেমিক প্রেমিকাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। পল ধনিত্র, হেলেনের মত সুন্দরী নাত তাহার হইতে পারে না। পল জাহাজ ভাসাইয়া কোন দূর সাগরে চলিয়া গেলেন, হেলেন পুনরায় বার্লিনে প্রেরিত হইলেন। তাহার মায়ের ইচ্ছাতেই এইরূপ হইল। মা ও মেয়ের মধ্যে সদ্ভাব কোনদিনই ছিল না। মৃত্যু পর্য্যন্ত মা ও মেয়ের মধ্যে শত্রুতার ভাবই ছিল। কিন্তু হেলেনের দিদিমা এই উদ্ধত খেয়ালী প্রকৃতির নাতনীটিকে খুবই ভালবাসিতেন।

হেলেনের জীবনের সুখের দিনগুলি তাঁহার দিদিমার আশ্রয়েই অতিবাহিত হইয়াছিল। এখানে ঐশ্বর্য্যের জীবনের সে উদ্দাম উদ্‌ভ্রান্ত ভাব ছিল না। এই শান্ত স্থির জীবনে অচঞ্চলভাবে হেলেন সাহিত্য ও কলাচর্চ্চার সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রিন্স র‍্যাকুইজা এই সময়ে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন। প্রিন্স র‍্যাকুইজা দেখিতে সুন্দর ছিলেন না। কালো উজ্জ্বল চোখ দুটি ছাড়া তাঁহার সৌন্দর্য্যের আর কিছুই ছিল না। প্রিন্স হেলেনের রূপমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চান। হেলেন উত্তরে তাঁহাকে বলেন 'তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ হওয়ার পূর্ব্বে যদি তোমার চাইতে আর কাউকে বেশী ভাল না বাসি তবে তোমাকেই বিয়ে করবো।' এই সময়ে হেলেনের রুশদেশে যাইবার খুব ইচ্ছা হয়। তিনি প্রিন্সকে ইহাও বলেন 'যদি কোন কারণে আমার রুশদেশে যাওয়া না হয় তবেই আমি তোমায় বিয়ে করবো।'

কিন্তু ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ল্যাসেলের সঙ্গে হেলেনের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতে আর সব ভালবাসার জন যাঁহারা ছিলেন হেলেন তাঁহাদের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। হেলেন ও কার্ডিনাও ল্যাসেলের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ যাহারা জানেন তাঁহারা বলেন 'এ যেন আকাশের দুইটি গ্রহ—বহুকাল কেন্দ্রচ্যুত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আবার উভয়ের একদণ্ডে সাক্ষাৎ। নীরবে—শব্দহীন হৃদয়ে এ উহার মুখ পানে চাহিলেন। পুরুষ উন্নত মস্তকে রূপমুগ্ধা দৃষ্টি তুলিয়া নারীর পানে চাহিলেন—নারীও তাঁহার নবযৌবনের সকল মাধুরী ছড়াইয়া পুরুষের পানে চাহিলেন। পরে উভয়ে উভয়ের বাহু বাড়াইয়া দিলেন—যেন এ উহার কতকালের পরিচিত সখী। সামাজিক রীতিনীতি বা চক্ষুলজ্জা কিছুই ছিল না তাঁহাদের। সান্ধ্য সম্মেলনে শত শত দৃষ্টির সম্মুখে তাহারা দু'জনে দু'জনকে দেখিয়া বিহ্বল আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। এ যেন আত্মায় আত্মায়, অন্তরের অন্তরতমের সঙ্গে মিলন হইয়া গিয়াছে—বাহিরের বন্ধন রীতিনীতি, সব অন্তরের প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে ভাসিয়া গিয়াছে।'

সুন্দরীরাণী হেলেন ভন্ ওনিজেস্।

সম্মেলন অন্তে বিদায় লওয়ার কালে হৃদয়ের উত্তেজনায় হেলেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ল্যাসেলে সুন্দরীর দুইখানি সুকোমল মৃণাল বাহু ধরিয়া তাঁহাকে প্রায় কোলে করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিলেন। সান্ধ্য সম্মেলন হইতে সুন্দরীর সঙ্গে তিনি তাঁহার দিদিমার গৃহ পর্য্যন্ত গেলেন। বিদায় লইবার কালে ল্যাসেলে বলিলেন 'কাল বিয়ের জন্য আমি দিদিমার মত নিতে আসবো, যত শীগ্‌গির বিয়ে হয় তাই করতে হবে।'

হেলেন ল্যাসেলের নাম পূর্ব্বেই জানিতেন। শুনিয়াছিলেন ল্যাসেলে একজন তুখানক ইহুদী সংস্কারক। ইনি সাধারণের বন্ধু—ধনীদের শত্রু। ধনীদের ধন বঞ্চিত করিয়া ইনি দরিদ্র সাধারণের মধ্যে বিলাইয়া দিবার পক্ষপাতী। সুন্দরী হেলেন ভাবিতে লাগিলেন। হেলেন বলিতেন সে ঝড়ের মত আমার জীবনের উপর দিয়া আসিয়াছিল—জীবনের আর সব স্মৃতি সব আশার সে ঝড়ার বেগে উড়িয়া গিয়াছিল।' প্রেমের এই ঘূর্ণীবর্ত্তে তাঁহারা দু'জনে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

কার্ডিনাও ল্যাসেলে যুবক—তরুণ সুন্দর যুবক ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি, প্রতিভা ও সামাজিক প্রতিপত্তির কথা তখন ইওরোপের ঘরে ঘরে। কৃতকার্য্যতাও সম্মানের উচ্চস্তরে আরূঢ় তিনি তখন। শ্রমজীবী দলের প্রিয় অবিসংবাদী নেতা তিনি। এমন কি বিসমার্কের মত লোকে পর্য্যন্ত মনে করিতেন যে তিনি প্রুশীয় লিবারলদের সঙ্গে পর্য্যন্ত টেক্কা দিতে সমর্থ। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত বিসমার্ক ল্যাসেলে সম্বন্ধে বলিয়াছেন এরূপ শিক্ষিত, শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যসম্পন্ন লোক বড় দেখা যায় না।

ল্যাসেলের জীবনের স্বপ্ন ও কাম্য ছিল সংঘবদ্ধ করিয়া মূল ধনী ও শ্রমিকদের সমবায়ে শ্রমজীবীদলের উন্নতি বিধান করিবেন। নিজে অবশ্য ইনি শ্রমজীবীদলের ত্রাণকর্ত্তারূপে পরিচয় দিতেন—কিন্তু ইহার মত বাবু ও বিলাসী খুব কমই ছিল। ইনি বহু খরচ করিতেন ও সহরের সেরা স্থানে বাস করিতেন। বার্লিন সহরে ইহার ভোজ ও আনন্দ সম্মেলনের মত সম্মেলন কদাচিৎ হইত। সমাজের সেরা সুন্দরীদের সঙ্গে ইনি মিশিতেন ও সুন্দরীরা ইহার অনুগ্রহ পাইলে ধন্য হইতেন। কাউণ্টেস্ হ্যাঙ্‌ফিল্ডের বিখ্যাত কাণ্ডের ব্যাপারে ইহার নাম আইনজ্ঞরূপে খ্যাতি লাভ করে। ইহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার অন্ত ছিল না। ল্যাসেলের ইচ্ছা ছিল জার্ম্মেনীতে ইনি সব সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়া তাঁহার সর্ব্বময় হইবেন এবং তাঁহার সুন্দরী হেলেনের সঙ্গে শ্বেত অশ্ববাহিত গাড়ীতে চড়িয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিবেন।

হেলেনের বয়স তখন আঠার বৎসর মাত্র। ল্যাসেলের বিবাহ প্রস্তাব হেলেনের পিতামাতা কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যাত হইল। হেলেনের পিতামাতা রাগিয়া বলিলেন নীচ হয়ে উচ্চ আশা কেন? ল্যাসেল ভাবিতেন তিনি যে কোন রাজরাণী বা রাজকন্যার যোগ্যপাত্র। তাঁহার গর্ব্বে আঘাত লাগিল তিনি হেলেনের পিতাকে দ্বৈরথ সমরে আহ্বান করিলেন।

সাজু ভন সিউইচ্ ও প্রেমিকা হেলেন।

এদিকে হেলেনকে এক রকম বন্দিনী করিয়া রাখা হইল, বাহিরে কাহারও কাছে পত্র লেখা বা কাহারও সঙ্গে কোন সংস্রব তাঁহার একেবারে বন্ধ। হেলেনকে বলা হইল ল্যাসেলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তিনি কাউণ্টেস হ্যাক্‌ফিল্ডের সঙ্গে প্রেমে মত্ত হইয়াছেন। পরে জোর করিয়া হেলেনকে দিয়া একখানা কাগজে হস্তাক্ষর করানো হইল যে তিনি ল্যাসেলেকে বিবাহ করিবার সকল সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই দ্বৈরথ সমরের কথা হেলেন পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না—পরে শুনিলেন তাঁহার পিতার বদলে প্রিন্স র‍্যাকোভন র‍্যাকুইৎসা ল্যাসেলের সঙ্গে লড়িবেন।

খুব ভাল পিস্তল চালাইতে পারেন বলিয়া ল্যাসেলের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল—র‍্যাকো সে পর্য্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারও জানিতেন না। র‍্যাকো তবু তাহার ভালবাসার হেলেনকে সুখী করিবার জন্য মরিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাহার বিধান অন্যরূপ—দ্বৈরথ সমরে প্রিন্সের মৃত্যু না হইয়া ল্যাসেলেরই মৃত্যু হইল। এই দ্বৈরথ সমরের ব্যাপার সমগ্র ইওরোপ খণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখনও জার্ম্মেনীর শ্রমজীবীদল' বলিয়া

থাকে ল্যাসেলে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। নিজের দুর্ব্বলতার জন্যই হেলেন তাঁহার পিতামাতার অনুনয় বিনয় ও তর প্রদর্শনে মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। হেলেনের পিতামাতা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন ল্যাসেলের মত বিপ্লববাদী দলের নেতার সঙ্গে তাঁহাদের কন্যার কোন সম্ভ্রম ঘটিলে হেলেনের পিতার ও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতা ভগিনীদিগের ভবিষ্যতের আশা একেবারে মাটি। সত্য-কথা হেলেন যখন জানিতে পারিলেন তখন আর তাঁহার নৈরাশ্যের সীমা রহিল না। ভাগ্যের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া হেলেন পিতামাতার হাতের পুতুল হইয়া রহিলেন।

পর জীবনে হেলেন অনেক সময়ে নিজ মনে প্রশ্ন করিতেন যে এমন অপূর্ব্ব ক্ষমতাশালী লোকের প্রাণ-নাশের জন্য কে বেশী দায়ী—তাঁহার দুর্ব্বলতা না ভাগ্য? ল্যাসেলে বাঁচিয়া থাকিলে জার্ম্মেনীর ইতিহাসে কোন স্থান অধিকার করিতেন ইহা লইয়া ঐতিহাসিকেরা অনেক আলোচনা করিয়াছেন। হেলেন লিখিয়াছেন 'ক্ষুদ্র শক্তি মানব আমরা ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। ভাগ্যকে অতিক্রম করিয়া যে সব অতি মানব উঠিতে চায়, তাহার নিধনের পথও আমরা ক্ষুদ্র মানবেরাই প্রস্তুত করিয়া দেই।'

এই সুন্দরীর জীবনের আরও আশ্চর্য্য ঘটনা এই—যে পুরুষকে ইনি পাগলিনী হইয়া ভাল বাসিয়াছিলেন সেই পুরুষের প্রাণ হন্তারককেই আবার তিনি বিবাহ করিয়া-ছিলেন। দু'বৎসর পূর্ব্বে সুন্দরী হেলেনের সঙ্গে ল্যাসেলের ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে দেখা হইয়াছিল দুই বৎসর পরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ল্যাসেলের প্রাণ বিয়োগ হইল। এই ব্যাপারের কেলেঙ্কারীতে, নিজেরে সামাজিক প্রতিপত্তি নষ্ট হইবার ভয়ে হেলেনের পিতামাতা যত শীঘ্র কন্যার বিবাহ দেওয়া যায় তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হেলেনের দুঃখের কারণ হইয়া জ্যাকোর মনেও মোটেই সুখ ছিল না। বন্ধুভাবে হেলেনকে সুখী করিবার চেষ্টা তিনি সর্ব্বদা করিতেন। এদিকে আবার এক মহা বিপদ হইল। দ্বৈরথ সমরের পর পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ প্রিন্সকে ধৃত করিবার আদেশ দিলেন। প্রিন্স বুকারেষ্ট হইতে ভিয়েনা, প্যারী, মিউনিচ প্রভৃতি স্থানে পালাইয়া বেড়াইয়া আবার বুকারেষ্টে ফিরিয়া আসিলেন। দুরন্ত শীতের মধ্যে এই ভাবে নানা অসুবিধায় পালাইয়া বেড়ানোতে প্রিন্সের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সের শরীরের এমন অবস্থা হইল যে তাঁহার জীবনের আর কোন আশা নাই। এই সময়ে একবার শুধু হেলেনকে দেখিবার জন্য প্রিন্স ভয়ানক ব্যাকুলতা আরম্ভ করিলেন। এ আহ্বান হেলেন উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। হেলেনের পিতামাতা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন ও বিবাহে সম্মতি দিলেন। হেলেনের আগমনের আনন্দে প্রিন্স দিন দিন সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। প্রিন্স একটু সুস্থ হইলে তাঁহারা তাঁহার পল্লিভবনে গেলেন—এইখানেই তাঁহাদের বিবাহ হইল।

গীর্জ্জায় বিবাহ হইতেছে—যাজক তাঁহার কর্ম্ম করি-তেছেন এমন সময় নীল পরিষ্কার আকাশ হঠাৎ ধূসর হইয়া উঠিল—কোথাও কিছু নাই অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল—বজ্র পড়িতে লাগিল। গীর্জ্জার পাশের একটা গাছেই বজ্র পড়িল। অনেক দেখিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিল। অনেক সভাই কলিয়া গেল। বিবাহের পাঁচমাস পরেই প্রিন্স বোলানে মারা গেলেন।

বিবাহে হেলেন অর্দ্ধ পয়সার সম্পত্তি বা চলিবার উপযুক্ত অর্থ কিছুই পান নাই। জ্যাকো পরিবার কোনরূপ অর্থ সাহায্য করিতে নারাজ, পিতামাতার নিকট হইতেও অর্থ প্রাপ্তির আশা নাই। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে পরমা-সুন্দরী হেলেন আবার সংসারে একাকিনী নিঃসহায় অবস্থায় দাঁড়াইলেন।

এইরূপ অবস্থায় কিছুকাল নাইসে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বাস করিবার পর হেলেন প্যারীতে এসন করিলেন। প্যারীতে কিছুদিন বাস করিবার পর ইনি বার্লিনে গেলেন। বার্লিনে গিয়া হেলেন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের সঙ্কল্প করেন। রঙ্গমঞ্চে যাওয়ার ব্যবস্থাও প্রায় ঠিক—এমন সময় বিসমার্কের নিকট হইতে এক দূত আসিলেন হেলেনকে যাচাই করিতে রাজনীতিক গুপ্তচর হইয়া হেলেনকে কার্য্য করিতে হইবে। প্রচুর অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা এবং বিলাসের জীবন এ। চিরকাল বিলাসে বর্দ্ধিত হেলেনের পক্ষে এ প্রস্তাবের মোহ কম নয়। কিন্তু সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা থাকায় এ কার্য্য হেলেনের মনঃপূত হইল না।

হেলেন ইহার পর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। জীবন কখনও সুখে যায় কখনও দুঃখে যায়। তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন—কিন্তু অভিনেত্রীর কার্য্যেও তাঁর তেমন মন লাগিল না। হেলেন নাটক উপন্যাস লিখিলেন। অভিনেতা সিজওয়াট হেল্ডম্যানকে বিবাহ করিয়া পাঁচবৎসর পরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। কখনও ভিয়েনা কখনো মিউনিচে বাস করিতে লাগিলেন। বিখ্যাত চিত্রকর লেনবাক্ ইহার বিশেষ বন্ধু হইলেন এবং ইহার চিত্র অঙ্কিত করিলেন। চিত্রকর হান ম্যাকার্ট ইহার চিত্র বহুবার বহুভাবে লইয়াছেন।

ঘিয়েটারের বন্ধুদের সঙ্গে ভ্রমণ করিবার সময় ভালন-বার্গে ভবিষ্যৎ তৃতীয় স্বামীর সঙ্গে ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই ব্যক্তির নাম ব্যারণ সার্জ্জিন সিউইচ্। সেণ্ট পিটার্সবার্গে ইঁহার সহিত হেলেনের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। হেলেন নিজে লিখিয়াছেন তাঁহার বাল্য বিক্ষুব্ধ জীবনে ইঁহার ভালবাসা শান্তির প্রলেপ দিয়াছিল। সহস্র বিপদ বরণে এ প্রণয়কে আরও সুদৃঢ় করিয়াছিল। শত অভাবেও এ প্রণয়ের বেগ মন্দ করিতে পারে নাই। ভালবাসিয়া ভালবাসার জনকে না পাইয়া হেলেন জীবনে যথেষ্ট ঝুলিয়াছেন অনেক সহিয়াছেন। তাই এবার মনের মত প্রেমাস্পদকে পাইয়া শত অভাবেও তাঁহাকে প্রেমের মোহময় আলিঙ্গনে ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন।

সার্জ্জিন সিউইচ্ রুসিয়ার খুব বিখ্যাত বংশের সন্তান। ইঁহার অনেক ধন সম্পত্তি ছিল কিন্তু নিহিলিষ্ট দলে যোগ দেওয়ায় সে সমস্ত সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। সম্পত্তিহারা হইয়া ইনি ও হেলেন আমেরিকায় গিয়া আবার নূতন ভাবে নূতন জীবন গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এই দুই প্রণয়ী আমেরিকায় পৌঁছিয়া সেখায় সর্ব্বপ্রকার কষ্টই হাসিমুখে সহিতে থাকেন। তাঁহারা উভয়েই বিখ্যাত বিখ্যাত সংবাদ পত্রে নিয়মিত লিখিতেন। হেলেন সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন, কিছুকাল রঙ্গমঞ্চেও গিয়াছিলেন, চিত্রাঙ্কন করিতেন, নিজের পোষাক ও ব্যারণের পোষাক নিজ হাতেই সেলাই ও তৈরী করিতেন। প্রয়োজন হইলে এই প্রতিভাশালিনী সুন্দরী সবই করিতে পারিতেন। হাজার দুঃখ কষ্ট বিপদের মধ্যেও সুন্দরী তাঁহার মধুর ভাব ও রঙ্গ পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিতেন। বড়লোকী চাল চলনের এতটুকু ব্যত্যয় হইতে পারিত না। এই দুঃসময়েও বন্ধুবান্ধবের তাঁহার অভাব ছিল না। তের বৎসর পরে তাঁহার স্বামীর সম্পত্তি পুনরায় উদ্ধার হয়—এই চুক্তিতে যে তাঁহাদের রুসিয়ায় গিয়া বাস করিতে হইবে।

প্রিয়তম স্বামীর সঙ্গে ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন হেলেনের জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখের সময়। সমূহ অর্থাভাব হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারা ফ্রান্সও ও ইংলণ্ড হইয়া রিগায় পৌঁছেন। এইখানে আসিয়া হেলেন সাংঘাতিক পীড়িত হন, এবং অস্ত্রোপচারের জন্য বার্লিনে গমন করেন। ম্যাডাম ব্লাভাস্কির সঙ্গে ইঁহার পরিচয় হওয়ার পর হইতেই, ইনি থিওসফির অতি ভক্ত হইয়া পড়েন।

একটু সুস্থ হইয়াই স্বামী স্ত্রী দু'জনে ইউরোপের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হেলেন মিউনিচে বাস করিতে বরাবরই অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মিউনিচের গৃহেই ইঁহারা অনেক সময় কাটাইতেন—এইখানেই তাঁহার জীবনের সন্ধ্যা অতিবাহিত হয়। রাজনীতিক মুক্তির মতবাদের কথা ও বিপ্লববাদের কথা ইহার স্বামী এখনও ভুলিতে পারেন নাই—তিনি তাহা লইয়াই গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। হেলেন ও তাঁহার স্বামীর মুক্তহস্ততা একরূপ অপব্যয়ের সমানই ছিল। তাঁহাদের ঋণও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল, অর্থও দিন দিন ফুরাইয়া আসিতেছিল। এই সময়ে তাঁহার জীবনের অবলম্বন প্রিয়তম স্বামীর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

একাকিনী হেলেনের আর কিছু সহিবার ক্ষমতা ছিল না। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল 'অতিমাত্রায় ক্লোরাল পানেই সুন্দরী রাণীর মৃত্যু হইয়াছে। যাঁহারা এই সুন্দরীকে জানিতেন তাঁহারা বুঝিলেন একটা সত্য জীবন নাট্যের যবনিকা পাত হইল।'

জগতে সুন্দরের ভক্ত সকলেই। সৌন্দর্য্য দেখিলে আনন্দ সঞ্চার হয় সকলের প্রাণেই। কিন্তু জগতে সত্য সৌন্দর্য্যের সন্ধান বড় মেলে না। জগতের সুন্দরী রাণী-দের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় সে সমস্ত জীবন প্রায়ই বড় করুণ বড় দুঃখময়। সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের উপর দেবতার কিছু অভিশাপ আছে কি। আমাদের দেশের সাধারণ সুন্দরীদের জীবনের ইতিহাস এমন ঘটনাবহুল না হইলেও প্রায়ই দেখা যায় যেমন সুন্দরীর যে ঘরে ও বরে পড়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। দুঃখে কষ্টে দুদিনেই সুন্দরীর সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া গিয়াছে। অথচ জগতে সৌন্দর্য্যের সন্ধান সকলেই করিতেছে।

আট

বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, কামনা একটা জানলার সামনে বসিয়া এক বাটী গরম দুধ চুমুক দিয়া খাইতেছিল, কটকে গাড়ী থামার শব্দে বাটীটা তাড়াতাড়ি একটা টেবিলের উপর রাখিয়া জানলা দিয়া মুখ বাড়াইল। গাড়ীর আরোহীকে দেখা গেল না, সেটা যে বাড়ীর গাড়ী এবং মাথায় অনেকগুলা বাক্স বিছানা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহা দেখিয়াই, মনটি আনন্দে ভরিয়া গেল। গাড়ীতে যে পিতা আসিয়াছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না, কামনা তড়িতবেগে নীচে নামিয়া দ্বারের সম্মুখে আসিতেই দেখিল, পিতা! কিন্তু একা নহেন, তাঁহার সহিত মাতুল ও মিঃ জোসেফ্ চৌধুরীও দাঁড়াইয়া মোটঘাটরাগুলা নামাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বহুদিনের অদর্শনের পর পিতার দর্শনে কামনার মন যে পরিমাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাদের দেখিবামাত্র তাহার শতাংশের একাংশও রহিল না। আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি এক মুহূর্ত্তে নিষ্প্রভ ম্লান হইয়া গেল।

পিতা আসিতেই কামনা কম্পিত হস্তে তাঁহার হাতটি ধরিয়া বলিল—আমাকে ত খবর দাও নি বাবা?

কন্যার বিপক্ষে অভিযোগগুলি এমনই ভাবে তাঁহার কাণে ঢুকিয়াছিল যে গাড়ীতে সারা পথ তিনি সেগুলির কৈফিয়ৎ লইতেই মনকে দৃঢ় করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু মাতৃহীন কন্যার এক সম্ভাষণেই সমস্ত বক্তব্যস্রোতে তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া গেল; বামহস্তে কন্যাকে বেষ্টন করিয়া চলিতে চলিতে কহিলেন—হঠাৎ এলুম মা, তোমার মামাকেই একখানা তার করে দিই, ভেবেছিলুম, তুমিও খবর পাবে।

বৈঠকখানায় প্রবেশ করিবার মুখে মেসার্স সেন ও চৌধুরীও আসিয়া মিলিত হইলেন। সকলে এক সঙ্গে কক্ষে ঢুকিয়া সকলে এক একখানি কেদারা অধিকার করিয়া বসিলে; কামনা পিতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ সেন অসংকুচিত কক্ষের চারিধার একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া তীব্রকণ্ঠে কহিলেন—ঘরদোরগুলো ঝাড়িয়ে রাখা উচিত ছিল।

কথাগুলা যে কামনার উদ্দেশেই কথিত হইল, সে কথা বুঝিতে কাহারই বিলম্ব হয় নাই, কামনাও বুঝিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না।

রাজেশ্বর বলিলেন—সমানস্বকে বলে দাও না মা।

কামনা বলিল—তুমি উপরে চল না বাবা, কাপড়চোপড় ছাড়বে।

যাই! কামনা, মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই বোধহয়—মিঃ চৌধুরী, এটি আমার...

আমি জানি মিঃ মিত্র।

রাজেশ্বর কন্যার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন—তাহলে তুমিও জান, কামনা।

কামনা সে কথার উত্তর দিল না, দিবার প্রবৃত্তি হইল না, এক মুহূর্ত্ত পরে বলিল—উপরে চল বাবা।

মিঃ সেন রাজেশ্বরের দিকে চাহিয়া বিরক্তভাবে কহিলেন—তাহলে আমরা উঠলুম হে!

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই যে কথাটা রাজেশ্বর তুলিয়া বসিয়াছিলেন, তাহাই মনে পড়িয়া গেল; গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—শান্ত কোথায় কামনা?

তিনি এখানে কোথা বাবা?

ছিল না?

কামনা ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রথমটা চুপ করিয়াই ছিল কিন্তু পরমুহূর্ত্তে মনে হইল যে-ই হউক, শান্ত যে এখানে আসিয়াছিল এবং কয়েক ঘণ্টা অবস্থান

করিয়াছিল—তাহা পিতার গোচর করিয়াছে! মনে হইতেই কামনার সর্বদেহের মধ্যে এক বিষের জ্বালা তীব্র হইয়া উঠিল, দৃপ্তকণ্ঠে বলিল—এসেছিলেন একদিন, ক' ঘণ্টা ছিলেন-ও, এইখানেই খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন।

রাজেশ্বর মিঃ সেনের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কি বলিবেন যেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না।

কামনা পিতার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, আমি তাঁকে এখানে থাকবার জন্যে অনেক করে বলেছিলাম, তিনি রাজী হন নি বাবা, নইলে আমার ইচ্ছে ছিল যতদিন না তুমি আস...

মিঃ সেন বোধকরি অত্যন্ত গ্রীষ্মানুভব করিতেছিলেন, বুক পকেট হইতে রুমালখানা বাহির করিতে করিতে উৎকট শব্দ করিয়া উঠিলেন—হুঃ!

গ্রীষ্মাধিক্যই যে হইার একমাত্র কারণ নহে, কামনা তাহা বুঝিল, সঙ্গে সঙ্গেই মুখখানি রোষে ক্ষোভে রক্তিম হইয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই অত্যন্ত আবদারের সুরে বলিয়া উঠিল—তুমি যাও-ত এস বাবা, আমি উপরে যাচ্ছি।

বলিয়া সে কোনদিকে না চাহিয়াই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

মেসার্স সেন ও চৌধুরী যুগপৎ বিস্ময়ে রাজেশ্বরের দিকে চাহিলেন।

রাজেশ্বর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, আবার তখনি বসিয়া পড়িয়া, মিঃ সেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তোমার কি ওবেলা সময় হবে, সেন?

মিঃ সেন তাচ্ছিল্যভাবে কহিলেন—সময়? বোধ-হয় না!

আচ্ছা—থাক্, বলিয়া তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মিঃ জোসেফ্ চৌধুরীর দিকে চাহিয়া নমস্কার করিয়া, সেনকে বলিলেন—পার ত, একবার—না—থাক্—আমি হয় ত বাড়ী থাকব না, বলিয়া ঘর ছাড়িয়া গেলেন।

তিনি যে কিরূপ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সেই সময়কার মুখের ও গমনের ভঙ্গিতেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

মিঃ সেন কয়েকমুহূর্ত উত্তেজিতভাবে কক্ষ মধ্যে পায়চারি করিয়া, চৌধুরীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিল চৌধুরী, চল হে।

মিঃ চৌধুরীর অবস্থাটা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি এখান হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচিয়া যান, অতি কষ্টে বলিলেন—চলুন।

এই তোমাকে বলে রাখছি চৌধুরী, এই মেয়েটিকে রাজেশ্বর যদি এখন থেকে সভ্য করতে না পারেন, তাঁর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে, তা তুমি দেখে নিও।—বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

জোসেফ চৌধুরীর আর কিছুই দেখিবার বাসনা ছিল না, তিনি মিঃ সেনের পূর্বেই বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে সদানন্দ আসিয়া বলিল—আপনাকে দিদি-মণি একবার উপরে ডাকছেন।

আমাকে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিঃ সেন কামনার আহ্বানকে অত্যন্ত অপমানজনক মনে করিয়াছিলেন, সদানন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তাঁর দরকার থাকে, এখানে এসে দেখা করতে বলো গে যাও! আর দেখ...

সদানন্দ চলিয়া যাইতেছিল, ডাকিয়া বলিলেন—আর দেখ্ তোমার দিদিমণিকে বলো গে যে এখানে আর একজন ভদ্রলোক আছেন, তাঁকে একলা ফেলে উপরে যাওয়া আমি ভদ্রতা বলে করি না।

'ভদ্রলোক' এ কথা শুনিয়া আরও অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন—আপনি যান্-না মিঃ সেন আমি এই খানে দাঁড়িয়ে আছি।

মিঃ সেন উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন—নাঃ! তুমি বলো গে—যাঃ-ওঃ!

সদানন্দ চলিয়া গেল। মিঃ সেন পায়চারি করিতে লাগিলেন।

চৌধুরী অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করিতেছিলেন, কহিলেন—আমি যাই!

কামনা পাছে পুনরায় মাতুল সম্ভাষণে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার সম্মুখে আবার চেহারা খানা প্রকাশ করিতে তাঁহার অত্যন্তই শঙ্কা হইতেছিল, ক্ষুণ্ণমনে বাহিরের দিকে চাহিতেছিলেন। মিঃ সেন বাম হস্তে তাঁহার হাতটা ধরিয়া বলিলেন—এক মিনিট। তারপর দু'জনেই যেতে পারব।

শিল্পীর শিল্প-জ্ঞান !

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন]

সাধনা চিত্তকে প্রকট করে ও সামর্থ্যকে অধিক শক্তিশালী করে একথা ঠিক ; কিন্তু সে সাধনার একটা লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্যের একটা বিচার ও আছে। শক্তি বিধাতা-দত্ত জিনিষ—বড় মূল্যবান। তাহার উদ্দেশ্য নিজের অপেক্ষাও দেশ ও জনের উপকারের জন্য। শক্তির বিভিন্ন ব্যবহার আছে ;—ঘোড়ার শক্তিতে বহু গাড়ী, ঘুড়ী টানে—যদি ঠিক রাস্তায় চলে, নতুবা বিপথগামী হইলে প্রাণ-সংশয় নিশ্চিত। অদ্য আমরা শক্তির অপব্যবহারের নিদর্শন স্বরূপ শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী লিখিত (গত বৈশাখের ভারতবর্ষে) "চিত্রপ্রদর্শনী"টীর সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

লিখিয়াছেন "প্রবন্ধে কেবল সেই ছবিগুলিরই উল্লেখ করিয়াছি যাহার মধ্যে চিত্রকরের 'শক্তি ও প্রাণ' দুয়েরই পরিচয় পাইয়াছি।" এস্থলে লেখক 'শক্তির' ব্যাখ্যা দিয়াছেন "নিজের Ideaকে বাহিরে আনিতে হইলে যে উপায় এবং কৌশল অবলম্বন করিতে হয়।" একথা স্বীকার্য্য। আর 'প্রাণ' কথাটার ব্যাখ্যায় কি বুঝিয়াছেন ? আমরা বুঝি কোন একটা শিল্পীর শক্তি ও প্রাণ আছে অর্থে—শিল্পী ভাবুক ও সেই ভাব প্রকাশে সমর্থ। এস্থলে প্রাণের পরিচয়—ভাবে, অর্থাৎ মৌলিক সৃষ্টিতে (Original Conception) সরল কথায়—যে শিল্পী কবির সৃষ্টি করে, কবির অনুকরণ করে না।

প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত অতুল বসুর আঁকা সার আশুতোষের প্রতিকৃতি বা Portrait. প্রশংসার সারাংশটুকুতে বলিতেছেন "সার আশুতোষের মুখের মধ্যে যে প্রধান প্রকাশ ভঙ্গী আছে তাহা শিল্পী ধরিয়া ফেলিতে পারিয়াছেন" এককথায়—অধিকল সার আশুতোষ চিত্রের মধ্যে আঁকা হইয়াছে। এখানে সার আশুতোষ শিল্পীর 'মডেল' বা আদর্শ। চিত্র বা চিত্রকরের এক চুলও আশুতোষকে ছাড়াইয়া যাইবার হুকুম নাই ; গেলে তাহা অন্যের চিত্র—আশুতোষের নয়। কাজেই কোন কিছুর সৃষ্টি ইহাতে চলিবে না ; কেবল প্রতিকৃতির সাদৃশ্য হুবহু নকল করিতে হইবে। এখানে শিল্পীর করিবার যা কিছু আছে তাহা রং তুলির ওস্তাদি পর্য্যন্তই সীমা—প্রতিকৃতির উপর কোন কৃতিত্ব নাই। জিজ্ঞাস্য, এখানে শক্তি ছাড়া প্রাণের কোন পরিচয় আছে কি ? 'প্রাণ' অর্থে শিল্পীর নিজকৃত ভাবের পরিচয়—নকল কিছুই নয়। লেখক বোধ হয় জানেন না বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের মত—"Portrait painting is the lowest branch of Art" কারণ প্রতিকৃতি চিত্র, ভাবশূন্য—মৌলিকতা শূন্য ও সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। উপরোক্ত চিত্রের ন্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহের পাতাল কন্যাতেও কালি কলমের শক্তিই সর্ব্বস্ব ; ভাবের দিকে বিন্দুমাত্রও নহে। তবে প্রত্যেক কার্য্যকেই যদি ভাব অর্থে ব্যবহৃত করা হয় সে স্বতন্ত্র কথা। প্রাণের পরিচয় তখনই পাওয়া যায় যেখানে চিত্রটী পরিষ্কার একটা কাব্যে পরিণত হয়। প্রাণের পরিচয় কল্পনার প্রসারতার উপর নির্ভর করে—যে চিত্রখানার দিকে চাহিলে তাহা দর্শককে ভাবিবার বিষয়-বস্তু কিছু দেয়, নতুবা তাহাকে Decorative (সাজান) বা Common Composition বলে (সাধারণ চিত্র) আর বাস্তব জীবনের অনুভূতিগুলিকে রূপ প্রদান করিয়া নৈতিক আদর্শে গঠন করাকে অর্থাৎ মানুষের হৃদয়ের সুখ, শোক, প্রেম, কাম প্রভৃতিকে রূপকের ভিতর দিয়া একটা অপার্থিব জিনিসের অনুশীলন করাকেই প্রকৃত 'প্রাণ'যুক্ত চিত্র বলে। এই শ্রেণীর চিত্র বিদেশীয় শিল্পীদের ভিতর ও শতকরা ১০ জনের মধ্যেই পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয়ের চিত্রের বর্ণনায় লেখক মহাশয় বলিতেছেন "অতি সূক্ষ্ম গুটীকতক রেখার টানে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন • • শুধু দেহের চারিদিকের সীমারেখা-টুকু মাত্র আঁকিয়া একটী মেয়েকে এমন কোমল ও জীবন্ত করিয়া তোলা বড় সহজ কাজ নয়। রেখার উপর খুব দখল না থাকিলে এ কাজে বড় কেউ সহজে সফলকাম হইতে পারে না ইত্যাদি।" উপরোক্ত কথাগুলি সমস্তই রেখা বিন্যাসের বক্তৃতা। লেখক যে আবোল-তাবোল বকিতেছেন তাহা পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। স্বীকার করিতাম তাহা ভাবের—যদি লেখক কোন সমালোচনায় বলিতেন "একটীমাত্র শুষ্ক গাছ বিরাট মাঠের উপর আঁকিয়া দিয়া শিল্পী জীবন-সন্ধ্যার চিত্র আঁকিয়া বসিয়াছেন।" কিন্তু সিংহ মহাশয় রেখা দ্বারা একটা দেহ আঁকিয়াছেন, কোন একটা কল্পনাকে আঁকেন নাই ; কাজেই রেখা শক্তিরই পরিচয় দিতেছে—ভাবকে নয়। আবার বলিতেছেন "এই ছবিখানির মধ্যে চিত্রকরের ক্ষমতা সব চেয়ে ফুটিয়াছে—গুহার ছাদ হইতে নামমান একরাশ পার্ব্বতীয় লতার মধ্যে শত সহস্র নাগ-নাগিনীর একত্র সমাবেশের মধ্যে। ইহাদের একত্র

সমাবেশের মধ্য দিয়া চিত্রকর মনোরম রেখা-বিন্যাসের অদ্ভুত সুষমা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।"

ইহার পরই আবার আর একটু বিস্তার পরিচয় দিতেছেন শ্রীযুক্ত অতুল বসুর "গুণটানা" চিত্রে। লিখিতেছেন "দুটী লোক গুণ টানিতেছে ইহাই বিষয় বস্তু; কাজেই বুঝিতে হইবে—ইহার কবিত্বের বা ভাবার্থের জন্য তলাইবার প্রয়োজন নাই; কারণ লেখকই বলিতেছেন 'কাজ কেবল গুণটানা।' ব্যাখ্যায় বলা হইতেছে "লোক দুটীর গুণটানার ভঙ্গীটুকুর মধ্যে চিত্রকর যে "অলস ও মন্থরগতিটুকু" ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা অদূরবর্ত্তী মাল বোঝাই কোন একটা গাধা বোটের চিত্র অতি সহজেই দর্শকের চোখের সামনে কল্পনায় ভাসাইয়া তোলে। ইহা বড় কম ক্ষমতার পরিচয় নহে।" যাক, তাহা হইলে 'ক্ষমতা'র পরিচয় আছে, প্রাণের নাই, আর 'অলস মন্থরগতি' গাধা বোট বা ঐ ভাবের কোন জিনিষকে না টানিলে হইতে পারে না এটাও সবাই বোঝে; কারণ গুণটানা পরিশ্রমের কাজ, 'সমালোচক' মোটেই নয়; অধিকন্তু কোন ভারী জিনিষকে না টানিলে পরিশ্রান্ত মাঝিদের কার্য্যের অনুকূল দেহ ভঙ্গী চিত্রে দেখানি হইবে কি প্রকারে?

লেখক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন শিল্পী হেমেন্দ্রনাথের চিত্র সমালোচনায়। তিনি লিখিতেছেন "চিত্রকর মেঘরাণীকে দেখিতে নেহাত মন্দ করেন নাই—তাই বোধ করি তিনি ইহার নাম দিয়াছেন "গোবরে পদ্মফুল" এবং "চিত্রটীর মধ্যে রং দিবার কায়দা ছবিখানির উপর রৌদ্রের আলোক ফেলিবার কায়দা সবই ভাল। কিন্তু তথাপি ছবিখানি চিত্রকর নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।" লেখক এখানে একটী অদ্ভুত বর্ণনা দিতেছেন তাহা "চিত্রকর তাঁর ছবিতে কি কি দিতে হইবে তা জানেন বটে, কিন্তু কি কি দিতে হইবে না তাহা আদবেই জানেন না।" বড় সাহিত্য জ্ঞান। এ কথাটা সোজা রাস্তায় বলিলেই চলে "চিত্রে যথাযথ কিকি দিতে হইবে তাহা জানেন না" এর জন্য দর্শন বিজ্ঞান ঘাঁটিবার কি প্রয়োজন? তাহার মতে হেমেন্দ্রবাবু মেঘরাণীর ছবি আঁকিতে বসিয়া অনর্থক একটা সহরের miniature আঁকিয়া বসিয়াছেন" এ কথাটার উত্তরে এইমাত্র বলিতেছি—কলিকাতা ফাইন আর্ট সোসাইটীর প্রদর্শনী দেখিতে একদিন গিয়াছিলাম। তখন শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। চিত্র দেখিতে দেখিতে তিনি হেমেন্দ্রবাবুর মেঘরাণীর চিত্রটীর সম্মুখে আসিয়া বিলক্ষণ প্রশংসা করিলেন। সমবেত ভদ্রলোক ও অবনীন্দ্রবাবুর ছাত্রদের মধ্যে প্রশংসা শুনিয়া যে একজন প্রশ্ন করিল "সার, এর সব ভাল কিন্তু Background ভাল ছিল। অবনীন্দ্রবাবু বলিলেন "নাহে, ও বেশ হয়েছে—ওতে বেশ একটা atmosphere আছে এবং মেঘরাণীর গতির সঙ্গে খাপ খায়।" এ কথাগুলি আমার স্বকর্ণে শোনা। পাঠক বোধ হয় জানেন শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি বাবু যে ছবি (!) আঁকেন তার ইষ্ট দেবতা, অবনীন্দ্রবাবু। গুরুর চেয়ে চেলা দু'কাটী কায়দা না দেখাইতে পারিলে আর এ যুগে বড় হইবার অন্য উপায় কি? আবার শুধু 'Background' না বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন "সহরের miniature" আঁকিয়া বসিয়াছেন "কথাটী বেশ একটু বিদ্রূপের ভাব মাখান।

সর্ব্বশেষে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন "মেঘরাণীর হাত হইতে যদি কেহ কাড়ু বালতি কাড়িয়া লয় তাহা হইলে চিত্রকর নিজেই বোধ হয় ভুল করিয়া বসিবেন—কোন বার বিলাসিনী সহরের মধ্য দিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছে।" এটা বয়সের দোষ—নতুবা চিত্র সমালোচনা করিতে করিতে মেঘরাণীর হাত হইতে কাড়ু বালতি কাড়িয়া নিবার মতলব হইল কেন? আবার বালতিটা কাড়িয়া নিতেই সে চেহারীকে বার বিলাসিনীর রূপ গ্রহণ করিতে হইবে কি প্রয়োজনে? ধন্য সমালোচক। শিল্প বিচারে অভিজ্ঞতা হইয়াছে সত্য কিন্তু সেটা শিল্পের মাধুর্য্য দেখিবার জন্য নয়—তাহার কদর্য্য অনুশীলনের জন্য! আর ধন্য ইহার দুঃসাহস! জীবনের ষোল বৎসর যে শিল্পী প্রাণপণ খাটিয়া আজ ভারতের সর্ব্বত্র যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছেন, সমগ্র ভারত প্রদর্শনীতে যিনি উপর্য্যুপরি নয় বার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যে চিন্তা-শক্তির প্রয়োজন হয় এটা লেখকের বিকৃত মস্তিষ্কে অনুমিত হইবে কি প্রকারে? আর হেমেন্দ্রনাথের জন্য লেখক "যথামনোনারায়ণের" প্রয়োজন মনে করিয়াছেন—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি নিজেই যে বহরমপুরের যাত্রী, তার এ ব্যবস্থা কি সমীচীন? যতই চিৎকার কর বাপু—বাড়াইয়া বলিলেও তুমি তৃতীয় শ্রেণীর একজন হবু-সাহিত্যিক, আর চারু বিচারেও হেমেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর!

৪৷৷ বিনামূল্যে লকেটসহিত ফটো
ফটো এনলার্জ ফিনিসিংয়ের
ফটো সহ অর্ডার সিকি মূল্য পাঠান
কলিকাতা ষ্টুডিও, পেটেন্ট রবারষ্টাম্প মেকার
৩৬নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

একখানি পত্র।

শ্রীযুক্ত 'বাসন্তী' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

আপনাদের গত সপ্তাহের বাসন্তীতে আমার নামে যে সব যুক্তিসম্পর্করহিত নিছক গালাগাল এবং নোংরা কুৎসা বাহির হইয়াছে তাহা পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম।

আপনাদের সমস্ত প্রবন্ধটি পড়িয়া সারতথ্য এইটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি যে, আমি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র মজুমদারের "গোবরে পদ্মফুল" নামক ছবিখানির যে সব দোষ দেখাইয়াছি তাহা অমূলক এবং যুক্তিহীন। বেশ ত আপনাদের সাহস থাকে ত যুক্তিতর্ক দিয়া আমার এই অমূলক এবং যুক্তিহীন মন্তব্যটাকে খণ্ডন করুন না, তাহা হইলে ত বুঝি যে লেখকের বুকের পাটা আছে। আর তা না হইলে শুধু কেবল গালাগাল দিলে, আমরা ভদ্রলোক, তাহার পাল্টা জবাব দিতে যে পারি না। নৈতিক দুর্বলতার দরুনই বলুন আর সৎসঙ্গ এবং সৎ-শিক্ষার অভাবেরই দোষেই বলুন, অশিক্ষিত যুক্তিহীন গালাগালগুলো কেমন যেন মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইতে চায় না। আমি যে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না যে আমি ভদ্রলোক। কাজেই আপনাদের কাছে সবিনয় নিবেদন করিতেছি, দয়া করিয়া এমন ভাবে যুদ্ধে নামুন যাহাতে করিয়া আমিও যোগ দিতে পারি। পুরুষের সহিত যুদ্ধ সম্ভব কিন্তু স্ত্রীলোককে আগাইয়া দিলে আমি নাচার—কেন না ওখানে স্ত্রীহত্যার পাতক আসিয়া পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট এবং সংস্কারের দোষেই বলুন বা অন্য যে কারণেই বলুন ও বিষয়ে আমি শাস্ত্রের অনুশাসন একটু মানিয়া চলি।

আমি বলিয়াছি হেমেন্দ্রবাবুর ছবি ভাল হয় নাই এবং আমার দিক হইতে তাহার যথেষ্ট যুক্তি দিয়াছি; আপনাদের জানাশোনার মধ্যে যদি কেহ লেখাপড়া জানা লোক থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া আমার এই যুক্তিগুলোর ভুল দেখাইতে অনুরোধ করুন। দোহাই ধর্ম্ম একটুখানি দেখান যে আপনারা দুদুটো সম্পাদক জোড়া মাথা খাটাইয়া এক কলমও যুক্তিপূর্ণ একটা কিছু লিখিতে পারেন এবং গালাগাল মন্দ না করিয়াও আপনারা ভদ্রলোকের সহিত কথা কাটাকাটি করিতে জানেন। আমি আপনাদের Challenge করছি, আপনারা শিক্ষিত এবং ভদ্রজনোচিত যুক্তি-তর্ক লইয়া আসরে নামুন কিন্তু দোহাই ধর্ম্ম এবার আর স্ত্রীলোক সুমুখে লইয়া যুদ্ধে নামিবেন না—কেন না তাহা হইলে আমাকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইবে।

আপনাদের লেখার মধ্যে আর একটি জিনিষ দেখিলাম, সেটা এই যে, আমি নাকি কবে একদিন হেমেন্দ্র মজুমদারের কাছে চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলাম। এই অযথা এবং অতি বড় কুৎসীত নোংরা মিথ্যাকথাটার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শুধু এই যে এতবড় একটা বিশ্রী মিথ্যাকথা যাহারা কাপুরুষের মত প্রচার করিবার প্রবৃত্তি রাখে তাহাদিগকে আমি মানুষ বলিয়াই মনে করি না।

এই প্রবন্ধের লেখক যে কে তা আমি ঠিক জানি না, কেন না নিজের নাম সাক্ষর করিতে লেখকের সাহসে কুলায় নাই, কাজেই আমাকে ভাবিয়া লইতে হইতেছে ইহা সম্পাদকীয় মন্তব্য। যিনিই এই প্রবন্ধের লেখক হউন না কেন—আমি তাঁকে challenge করিতেছি তিনি আসরে নামুন। কিন্তু মনে থাকে যেন, আমি চাই ভদ্রলোকের সহিত শিক্ষিত লোকের সহিত তর্ক করিতে, আমি চাই বিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শিক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নীচ অভদ্রোচিত গালাগালি নয়।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ।

জীবন রাখতে হলে

জীবন-রসায়ন

ইহা শরীরের রক্ত মাংস ও স্নায়ুর ক্ষতিপূরণ করে পারে অথচ উত্তেজক নয়।

—তথ্য লউন—শ্যামাদাস ঔষধালয়—৬৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উক্ত পত্র সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য।

চিত্রকর, চিত্র সমালোচক শিক্ষিত এবং ভদ্রলোক বনিবার প্রত্যাশী পত্রপ্রেরক এই চিঠিখানা বাসন্তীতে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছেন। চিঠিখানি ছাপার অক্ষরে বাহির হইবার অযোগ্য হইলেও আমরা চিত্রকর, চিত্র সমালোচক, শিক্ষিত এবং ভদ্রলোক বনিবার প্রত্যাশী লোকটির এইসকল গুণগুলির একটা পুরস্কৃত উদাহরণ এই চিঠিখানি বাসন্তীতে প্রকাশ করিলাম। চিঠিখানির বিন্যাস, বাক্য-সংযোজন বর্ণের খেলা সব আমরা অবিকল মূল পত্রের অনুরূপ রাখিয়াছি। একটি বর্ণও ছাপাখানার ভুলভাবে মুদ্রিত হইতে দেওয়া হয় নাই। পাঠকপাঠিকা পত্রখানির মূলের বিচার করিবার সুবিধা পাইবেন।

যে লেখাটির উপর পত্রে বর্ণিত 'ভদ্রতা, শিক্ষা, পুরুষত্ব নৈতিকদুর্ব্বলতা, অসুন্দরতা, যুক্তিহীনতা, গালাগাল, নোংরা কুৎসা, সংসঙ্গ, সংশিক্ষার আবহাওয়া, শাস্ত্রের অনুশাসন, ধর্ম্মের দোহাই, স্ত্রীলোক সম্মুখে রাখা, জঘন্য এবং কুৎসিত নোংরা মিথ্যা কথাটার' প্রয়োগ হইয়াছে সে লেখাটি 'দু' দুটো সম্পাদকের ঘোড়া মাথা খাওয়াইয়া' লিখিত হয় নাই। কারণ তাহার প্রয়োজন হয় নাই। পত্রলেখক তাঁহার লেখাটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডির থিসিস মনে করিতে পারেন,—অ-চ্যালেঞ্জীয় অমূল্য আন্-কোরা নূতন সম্পদে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছেন ভাবিতে পারেন কিন্তু অপর সকলেই যে পত্র প্রেরকের মতই তাঁহার প্রবন্ধটি সম্বন্ধে ভাবিবে এমন আশা করা তাঁহার সঙ্গত কি? পত্র লেখকের যে লেখাটির উপর বাসন্তীতে ঐ লেখাটি প্রকাশিত হইয়াছিল পত্র লেখকের সেই মূল লেখাটি যে কারণে ও যে গুণে "ভারতবর্ষে" স্থান পাইয়াছিল, বাসন্তীতেও বর্ত্তমান চিত্রকর, চিত্র সমালোচক শিক্ষিত এবং ভদ্রলোক বনিবার প্রত্যাশী পত্র লেখকের প্রতিবাদিত লেখাটি ঐ সব গুণেই ছাপা হইবার গৌরব লাভ করিয়াছে। স্থান পাইবার যোগ্য না হইলে বাসন্তীতে স্থান পাইত না।

পত্র ও পত্রিকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানেন অনেক সময় অনেক নাম প্রত্যাশী লোকেরা তাহাদের দুয়ারে ঘোরা ফেরা করেন। ইহার মধ্যে যোগ্যও অনেকে আছেন অযোগ্যেরও অভাব নাই। পত্র পত্রিকার ভার প্রাপ্তদের অনেক সময়ে এই যোগ্য অযোগ্যের মনোনয়নে মতিভ্রম হয়। এই মতিভ্রমের সুযোগ ও সুবিধা লইয়া অনেক অযোগ্যও সাময়িক নাম করিয়া লয়। এমন নাম করিয়া গুছাইয়া লইবার বেলায় অতি অযোগ্য কেহ যদি যোগ্য ব্যক্তির যথার্থ গুণে কালিমা লেপন করিয়া নিজ অযোগ্যতাকে আরও হাস্যকর রূপে প্রকাশ করিয়া ফেলে তবে তাহার চোখা উত্তর আসিলে তাহা বাসন্তী স্থান না দিবে কেন?

'গালাগাল মন্দ না করিয়াও যুক্তিপূর্ণ একটা কিছু লিখিয়া ভদ্রলোকের সহিত কথা কাটাকাটি' যে করা যায় —তাহা ভদ্রলোক বনিবার প্রয়াসী ব্যক্তির 'Challenge' সম্বলিত প্রেরিত পত্র খানি পড়িয়াই বেশ উপলব্ধি করা যায়।

পত্র লেখক বাসন্তী সম্পাদককে শিক্ষিত ও ভদ্রজনোচিত যুক্তিতর্ক লইয়া আসরে নামিতে Challenge করিতে-ছেন—কিন্তু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া 'এবার আর স্ত্রীলোক সম্মুখে লইয়া যুদ্ধে' না নামিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে—কেন না তাহা হইলে তাঁহাকে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিতে হইবে। নামহীন লেখা মাত্রই কি পত্র প্রেরকের মতে নারীদের? (সত্য মিথ্যা জানি না—তবে দুষ্ট লোকে কহে, ক্ষতি পরীক্ষায় স্ত্রীলোক তাঁহাকে নাকি বড় ধাপ্পা দিয়াছিল। তাই কি নারী বলিয়া পত্র প্রেরকের এত ভয়?) ইহার পরেই আবার লিখিতেছেন "যাহারা কাপুরুষের মত এত বড় একটা বিশ্রী মিথ্যা কথার প্রচার করে তাহাদিগকে তিনি মানুষ বলিয়াই মনে করেন না।" 'ধর্ম্মের দোহাই!'

বাসন্তী সম্পাদকদের প্রতি ভদ্রবনিবার, শিক্ষিত বনিবার প্রত্যাশী পত্র লেখক অতিশয় ভদ্র সম্ভাষণ করিয়া সম্পাদকদের প্রতি এ কলমের কারণ উল্লেখে বলিতেছেন 'নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে লেখকের সাহসে কুলায় নাই, কাজেই আমাকে ভাবিয়া লইতে হইতেছে ইহা সম্পাদকীয় মন্তব্য।' আবার লিখিয়াছেন "আপনাদের জানা শোনার মধ্যে যদি কেহ লেখাপড়া জানা লোক

থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া আমার এই যুক্তিগুলোর ভুল দেখাইতে চেষ্টা করুন।'

কথাটির উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। পত্র লেখকের নির্ভুল ধারণা এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিতে পারে যে তাঁহার মত শিক্ষা,ভদ্রতা ইত্যাদি প্রয়াসী বহুলোক যে কোন সংবাদপত্র কার্য্যালয়ে ছাপার অক্ষরে নামটি দেখিবার জন্য শুভাগমন করিয়া থাকেন। যোগ্য সংসারে বড় খুব বেশী মেলে না। আর অধিকাংশ জিনিসেই যুক্তির সন্ধান বড় পাওয়া যায় না। যুক্তি আলো থাকিলে তাহার ভুল দেখাইবার চেষ্টা জানাশোনা কাহারও দ্বারা করা যাইবে। কিন্তু যাহা মোটেই যুক্তি নয়,—নাম প্রয়াসীর জনকত সমসাধীর স্তুতিবাদ ও প্রতিপক্ষের ক্ষমতাশালী কাহারও প্রতি বিদ্বেষ উদ্গার মাত্র—তাহার প্রশমন প্রতিপক্ষ ও এই ভাবেই দিয়া থাকে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। পরিচয়—সংবাদপত্র অনুগ্রহ করিয়া এমন ধারা পত্র ছাপিলে ক্রমে প্রকাশ পাইবে। চিত্রকর শ্রীযুক্তহেমেন্দ্র মজুমদারের কাছে পত্রলেখক চিত্রবিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলেন কি না এবং হেমেন্দ্রবাবু তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না সে মিথ্যা সত্যের পরিচয় তাঁহারা দু'জনেই প্রকাশ্যে দিতে পারেন। তাহা জনসাধারণের অবগতির জন্য সংবাদপত্র অনুগ্রহ করিলে বাহির হইতে পারে।

পত্র লেখক এই পত্রে 'বিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শিক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাহিয়াছেন নীচ অভদ্রোচিত গালাগালি চাহেন নাই।' পাণ্ডিত্য দেখাইয়া বিজ্ঞতা দেখাইয়া অযোগ্য কেহ যদি যোগ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইয়া যা-তা বলে তবে তাহার তেমন পাণ্ডিত্যের উত্তরে যদি যোগ্যের দলের কেহ পালটা উত্তোর গায় তবে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে দোষী হইবে কে?

বাসন্তী পত্র। নারী ও নর উভয়েই তাহাতে স্থান পাইবে। পৃষ্ট যদি ইহাতে কারো ভাষে তবে বাসন্তী কি করিবে! চিত্রকর সাজিবার প্রয়াসীর পত্র বা সত্য চিত্রকর কেহ যিনিই এই যাহ প্রতিবাদের উত্তর দিবেন তাহা বাসন্তীতে ছাপা হইবে অবশ্য যতক্ষণ সেই লেখাগুলি পাগলামোর সীমা, বা নির্লজ্জতা অথবা স্তুতির সীমা অতিক্রম করিয়া না যায়।

চিত্রকর সাজিবার ও চিত্রের সমঝদারী যিনিস লিখিবার প্রয়াসী পত্র প্রেরকের স্পর্দ্ধা ও ভদ্রতার পরিচয় দিবার জন্যই পত্র খানিকে বাসন্তীতে স্থান দেওয়া হইল, নতুবা পত্রখানি ছাপার অক্ষরে আত্ম প্রকাশের সুযোগ পাইয়া শুধু এই মাত্র পরিচয় দিবে যে কালীর, আঁচড় ও উদ্ধৃত বচনের অপপ্রয়োগই সংবাদ পত্রের অনুগ্রহে উত্তম চিত্র ও ভাল জিনিস রূপে নাম পাইয়া সুবিধা করিয়া লইতে পারে।

জীবনে

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

জীবনে আমি গো গেয়েচি অনেক
সুখের গান,
আমার রাগিনী ছুঁয়েছে অসীমে
তারার প্রাণ।
বীণাটি আমার সুরের স্বপন,
হৃদয়ে হৃদয়ে করেচে বপন,
কখন্ যে তার ছিঁড়ে গেছে তার
শোনে-নি কাণ,
গানের সভায় ব'সে আছি আজ
নীরব তান।

জীবনে আমি গো খেলেচি অনেক
প্রেমের খেলা,
প্রাণের বাগানে যে রং ফুটেচে,
করি-নি হেলা।
চোখের চাহনি, ঠোঁটের কাঁপন,
এই নিয়ে দিন করিনু যাপন,
এখন দেখি গো, একা ব'সে আমি—
গিয়েচে বেলা,
মরুর তটেতে ঠেকেচে আমার
আশার ভেলা।

জীবনে আমি গো দেখেচি অনেক
চাঁদের হাসি,
কুসুম-শয়নে তুলেচি ধরায়
আঁধার-কাঁদী।
দিন থেকে মোর খুলে গেছে খিল,
গিয়েচে ফাগুন, গেয়েচে কোকিল,
জানিনা কখন্ ঝ'রে গেল শীতে
কুসুম-রাশি,
হাসির শ্মশানে বাজিছে এখন
কাঁদন-বাঁশী।

রঙ্গালয়

বঙ্গদেশে অধুনা যে কয়টি রঙ্গালয় বর্ত্তমান আছে, ষ্টার তন্মধ্যে পুরাতম। একদাকালে "ষ্টারের" স্থান সকলের উচ্চে ছিল। কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান না যায়, সেই জন্যই বোধ করি "ষ্টারের" গৌরব ও স্থান হইয়া আসিয়াছিল। সম্প্রতি "ষ্টারের" কর্ম্মকর্ত্তাগণ ইহার আমূল সংস্কার করিয়া, নববেশে নব সাজে, নব সজ্জায় নূতন নূতন নাটকের অভিনয় আয়োজন করিতেছেন, তদুদ্দেশ্যে "ষ্টার" কয়েকদিন যাবত বন্ধ আছে। খুব শীঘ্রই খুলিবে বলিয়া খবর পাওয়া গেল। আশা করি নূতন বেশের "ষ্টার" আবার পূর্ব্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিতে পারিবে।

• • • •

স্তনিলাল মিনার্ভা থিয়েটার পরাশ্রয়ে থাকিয়াও নূতন নাটকের অভিনয় আয়োজন করিতেছেন। উত্তম বটে! "মিসর কুমারী" "প্রেমের তুফান" প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর নাটক ও প্রহসন প্রণেতা শ্রীযুত বরদাপ্রসন্ন দাস গুপ্তের একখানি নীতি বহুল প্রহসন শীঘ্রই [illegible] অভিনয় করিবেন। বরদা বাবুর "প্রেমের তুফান" রঙ্গমঞ্চে রসের তরঙ্গ তুলিয়াছিল, আশা করা যায় তাঁহার এই নূতন প্রহসন খানিও দর্শককে আনন্দ দিতে পারিবে।

• • • •

দীর্ঘজীবিনী হও শ্রীমতী সরযূবালা। তোমার তুলনা হীন নৃত্যে গীতে লালিত্যে লাস্যে যুগ যুগ ধরিয়া আনন্দ-পিয়াসী দর্শককে আনন্দ দান করিতে থাক। তোমার নৃত্যে যে প্রাণের সন্ধান দেখিয়াছি, নর্ত্তনের তালে তালে যে সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইতে দেখিয়াছি, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব, অতুলনীয়, উপমাহীন।

• • • •

সরযূবালার বয়স হইয়াছে। বপুঃ ঐশ্বর্য্য তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, এ বয়সে তাঁহার পরিশ্রম না করিলেও চলিত। কিন্তু তাঁহার উচ্চ হৃদয় তাঁহাকে এখনও সৎকার্য্যে প্রবৃদ্ধ করে। সম্প্রতি তিনি অবিবাহিতা ব্রাহ্মণ বালিকার বিবাহে সাহায্যার্থে, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি করে নৃত্য লীলা দেখাইয়াছেন। সরযূবালা যে শুধু নর্ত্তকী শ্রেষ্ঠা, তা নয়, তিনি উচ্চহৃদয়া রমণীও বটেন।

দেশ-বিদেশ

ডাঃ কিচলুর আদেশ :—"মহাত্মা গান্ধির উপর ও তাঁহার কার্য্যে আমার ভ্রম বিশ্বাস আছে। মহাত্মার পথ অনুসরণ করিলে ভারতের মুক্তি হইবে। মহাত্মা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তিনিই দেশকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করিতে পারেন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, ইহুদী, খ্রীষ্টান প্রত্যেক সম্প্রদায়ই মহাত্মাকে নেতা বলিতে পারেন। সত্যাগ্রহই আমাদিগকে স্বরাজ লাভে সাহায্য করিতে পারে। কংগ্রেসের কার্য্য, স্বরাজই কার্য্যের প্রথম ধরতা হউক।"

তত্ত্বজ্ঞানিকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য বাহাই করা হইতেছে। ১৫০ জনের নামে ইতি মধ্যেই পুলিশ মার্কা মারিয়া দিয়াছেন। নির্ব্বাসনের মাঁচড় জন কয়েকের গায়ে টানিয়াছেন। আমরা আশ্বিনাছিলাম এইবার বুঝি তত্ত্বাদি থামিল। "কিন্তু মরিয়া না মরে তত্ত্বা এ কেমন বৈরী?"—এই যাবতীয় পরে কলিকাতা সহরে হঠাৎ কেন তত্ত্বাদীর সংখ্যা আরো বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা অতি বিশ্বাসী তাঁহারা হয় তো মনে করিতেছেন, এইটাই তত্ত্বাদের মস্ত কায়দা! 'মরাল'

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক লালবাতী জ্বালিয়াছে বা পরেশ উল্টাইয়াছে, তাই বাজারে একটা বিষম ত্রাসের উপস্থিত হইয়াছে। অন্য সকল ব্যাঙ্ক হইতে সঞ্চিত টাকা টানিয়া বাহির করিবার খুব হজুগ চলিতেছে। এই ত্রাসের মুখে আরও দুই একটা কেল হইলে বাজারে একটা বিষম হাহাকার জমিয়া উঠিবে। এই সঙ্কিক্ষণে ইণ্ডিয়ান্যাল ব্যাঙ্কের কর্ত্তাদের মাথে পড়িয়া ত্রাস প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য, নহিলে বাজার একেবারে মাটী হইয়া যাইবে, কার-কারবার সব বন্ধ হইবে।

চাকুরে-লেখকেরা কি ভোট বাঁধিতে পারে? কার্য্যক্ষেত্রে এখন পরিচয় ত পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু, শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ লেখকবর্গ আয়োজনের ফলায় জন্য 'পত্রিকা'র সম্পাদকীয় বিভাগের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহাদের স্থান পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইল না। অমনি লেখকেরা তাঁহাদের চাকুরী লইয়াছেন। শুনিলাম, এক পুরাতন জীর্ণ সৈনিকের মুক্তন সম্পাদক এবং অপর দুইজন লেখক 'পত্রিকা'র সম্পাদকীয় স্তম্ভরণাগার প্রবেশ করিয়াছেন। সংবাদপত্র-লেখক-লেখে-গল্পের মাহাত্ম্য এইবার ফুটিল ভাল। 'মাহক'

সার মন্টেগু ভারত পরিদর্শনে আসিবার কথা হইয়াছে। প্রকাশ যে, তিনি, শ্রীযুত গান্ধী, মহম্মদ আলি কাশ্মীর এবং মিঃ কায়াজীর সহিত মিলিত হইয়া সকলে একযোগে প্রথমে মন্ত্রীর নিকট পরে জনসাধারণের সভিত সাক্ষাৎ করিবেন।

বাসন্তী—

বাসন্তী

একখানি পুরাতন চিত্র হইতে।

শ্রী শ্রীনটনাথ শ্রীপদযুগল আশ্বাস।

বিরাট খোলা রজনী বিরাট খোলা রজনী !

আজ। আজ !! আজ !!!

"আহু রজনী হায় ভাগে পোহায়ন্থ" এবথা সকলকেই বলিতে হইবে! আজ রাত্রিকালে সহরবাসীগণ বিদ্যুতালোকের, জুড়ী-মোটর, ল্যাণ্ড, কম্পাস, ভ্যান্, নরীর ছড়াছড়ি দেখিবেন, আর বলাবলি করিবেন, দেখে এমনটি আর দেখি নাই, শুনি নাই, ভাবি নাই, নাই! নাই।

দি আইডিয়েল থিয়েটার

আজই রাত্রি ৮টায় প্রথম খুলিবে।

আইডিয়েলের বাড়ী নূতন, সিঁড়ি নূতন, দ্বার নূতন, ফ্লোর নূতন, সিন্ নূতন, পোষাক নূতন, চেয়ার নূতন, ছায়পোকা নূতন (ইহারা মনুষ্য-শোণিতের স্বাদ জানে না)—নূতনে নূতন!

তার উপর নূতন নাটক, রামদত্ত !!!

আমাদের পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন পড়িয়া সহরময় এমন হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছিল যে মেছোহাটার মেছুনিরাও লজ্জায় অধোমুখ হইয়া গিয়াছে। লোকের মুখে আর কথা নাই, নাট্য-নিজাম ও তাঁহার নাটক রামদত্তের কথা লোকের মুখে-মুখে, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, ছুটাছুটি করিতেছে। আর ঘুরিতেছে, আমাদের অভিনব অভাবনীয় দৃশ্যপটের কথা! এখনো ত আইডিয়েল খোলা হয় নাই কিন্তু বলিতে বলিতে ঐ এক কথা, আহা! কি দেখিলাম! কি শুনিলাম! এই ছিল এক প্রমোদ উদ্যান, নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে হইয়া গেল এক পোকামাকড় ছাগ ভেড়া পূর্ণ বিশাল বারিধি। এই ছিল, জীবন্ত মনুষ্য, এক মুহূর্ত্তে—এক ধূর্ত্ত শৃগালে পরিণত হইল! আরও কত কি! এক কথায় রঙ্গরঙ্গমকে কস্মিনকালেও যাহা দেখিবার আশা করেন নাই, তাহাই দেখিতে পাইবেন। ইহা ইন্দ্রজাল নয়, ভৌতিক নয়, ছায়াবাজি নয়, কেরীও নয়—একেবারে আসল খাঁটি, প্রত্যক্ষ, অভ্রান্ত।

অদ্য রাত্রি আট টায় (ঘড়ি ধরিয়া)

উর্দ্দু সাহিত্য-সাগর, নাট্যনিজাম, নাটকবিদ্যাচূড়ামণি শ্রীযুক্ত দেব শর্ম্মা পণ্ডিত মধুরামোহন মুরজর মহাশয়ের প্রকাণ্ড সপ্তকাণ্ড ঐতিহাসিক মহা নাটক

রামদত্ত

রামদত্ত—নাটককে নাটক, রামায়ণকে রামায়ণ, বেদকে বেদ, উপন্যাসকে উপন্যাস

আরও বহু-স্থান একত্রে!

নাটকে কি আছে—জানেন? দুর্ব্বল সিংহ, ম্যালেরিয়া সেন, কৃপাণী, ছনোতরা ত আছেনই, তাছাড়া আছেন, দিল্লীর একচ্ছত্র মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী কৌকর-কৌ-ছোলা বাহাদুর! দর্শক, কৌকর-কৌ-ছোলা নাট্য নিজামের এক অভিনব সৃষ্টি! ইনি ধর্ম্মে মুসলমান বটে কিন্তু আচার ব্যবহারে পূতচরিত্র হিন্দু মুনি-ঋষির অপেক্ষাও প্রবল হিন্দু! ইনি মাত্র তিনটি পদাতিক আনিয়া রামদত্ত রাজ্য গ্রাস করিয়াছিলেন। এক কৌকর-কৌ-ছোলা বারোদুর সৃষ্টি করিয়া নাট্য নিজাম মহাশয় নাট্যজগতে অমর হইয়া গিয়াছেন! আর এই ভূমিকা গ্রহণ করিবেন

কে জানেন? সেই বঙ্গনাট্যমঞ্চের সাহান-সাহা পাতসা, রাজচাঁদ প্রেমচাঁদের কল্প-গুরু স্থানীয় বাংলার রায় রায়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবোধচন্দ্র পাঁড়া মহাশয়! কোন্ অবোধ চন্দ্র জানেন কি? যিনি অবলীলাক্রমে বৃদ্ধ-বিহার বিদগ্ধ করিয়া দিয়া অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; খানীর ভূমিকায় অভিশাপ দিতে হয় নাই, কেবলমাত্র যাঁহার ভীমনাদে ঋষিকুল নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিলেন, সেই অভিনেতা আদর্শ! সেই দর্শক ভীতিপ্রদ, রমণী-মনোরঞ্জন অবোধবাবু দি গ্রেট্!

ঐ দেখুন কৌকর-কৌ-দ্ধোলা বাহাদুর রামদত্ত রাজ্যে প্রবেশ করিতেছেন। অস্ত্র বল নাই, জনবল নাই, বাহুবলও নাই, কেবলমাত্র অঙ্গুলি বলই যথেষ্ট!

তারপর ঐ দেখুন কৌরববিজয়ী মহাবীর পার্থকে দেখুন! স্মরণ করুন, সেই ভীষ্মের শরশয্যার শঙ্কটময় কাল স্মরণ করুন, সেই বীর, যাঁহার শরবিদ্ধ হইয়া মা গঙ্গা গড় গড় করিয়া পৃথিবী ভেদিয়া উঠিয়াছিলেন, স্মরণ

রাজচাঁদ প্রেমচাঁদ!

কৌকর-কৌ!

করুন সেই অমিততেজা বীরকেশরী 'বৃহন্নলা'র কথা! রামদত্ত নাটকে মহাভারতীয় সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবেন। যদি বলেন, রামদত্ত ঐতিহাসিক নাটক, ইহার মধ্যে শ্রীশ্রীমহাপুরাণ আসিলেন কিরূপে? উত্তরে মহাশয়গণ, বলি, শুনুন, নাটক, নাটক, ইতিহাস পুরাণ নহে। সতী অনুসূয়ার লীলাখেলায় যদি কামানের গোলা অশোভন না হয়, মহাপুরাণের যুগে যদি বঙ্গে আগত বর্গীর আবির্ভাব অসম্ভব না হয় তবে রামদত্তে অর্জ্জুনই বা অসম্ভব হইবেন কিরূপে?

এই দেখুন, পার্থবীর চলিয়াছেন! কদমে কদমে পা ফেলিয়া বীরকুল চূড়ামণি কাস্তবী মহাশয় ধিকি ধিকি চলিয়াছেন।

পার্থবীর সাজিয়াছেন কে জানেন, সেই নাট্য-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রাজচাঁদ প্রেমচাঁদ মুলুকচাঁদ, হাস্য-বীর-করুণ-চাঁদ অবতার শ্রীযুক্ত রতিপতি সাম্যিস্তাল। ওরফে—বুক্ষু বাবু!

আরও দেখুন—হরপার্ব্বতীর মনোমুগ্ধকর অভিনয় দেখুন! পার্ব্বতী কে ছিলেন, কি তাঁহার পরিচয় তাহাও কি হিন্দু দর্শককে বলিয়া দিতে হইবে? দর্শক! সেই পার্ব্বতী—যে পার্ব্বতীর রূপ বর্ণনা করিতে করিতে মহাকবি কালিদাস কাব্য সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়াছিলেন, ব্যাসদেব যাঁহার রূপ গরিমা দর্শনে বাগপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন—সেই পার্ব্বতীকে দেখিতে পাইবেন!

আপনারা ভারতে পুরাণে পড়িয়াছেন যোগীরাজ মহাদেব অনন্তকাল ধরিয়া যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন, সৃষ্টি স্থিতি লয় ভুলিয়া ভোলানাথ হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু জানেন কি, কেন ঐরূপ হইয়াছিল? এমন সুপুরুষ, সু-প্রেমিক মহাদেব সংসার ছাড়িয়া বিবাগী হইয়াছিলেন কেন?—আপনি রামরম্ভ দেখিলেই বুঝিবেন।

শ্রীমান হরের যোগ-নিদ্রায় অভিভূত হইবার কারণ কি?

আর এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় দৃশ্য দেখিতে পাইবেন। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির চেষ্টা কি আজই প্রথম হইতেছে? না, না, তাহা নয়, সেই রামায়ণ মহাভারতের কালেও সে চেষ্টা বলবতী ছিল, ঐ দেখুন, সেকালের মর্ত্তরাজ্যের একটি দৃশ্য দেখুন!

বাহকদের মধ্যে রাজা আছেন, মহারাজা আছেন, মোল্লা আছেন, মৌলবী আছেন, পণ্ডিত আছেন, পাদরী আছেন, আর আছে—সত্যকারের রথ! এখানি নকল নয়, আসল, ওরিজিন্যাল রথ! স্বর্গ হইতে ডিজাইন করাইয়া আনা হইয়াছে।

আর কি চান? এক সঙ্গে স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল দেখিবেন! পণ্ডিত দেখিবেন, মূর্খ দেখিবেন, সতী দেখিবেন, অসতী দেখিবেন, সতী-শোভন সম্মার্জ্জনী দেখিবেন, পণ্ডিত-মোহন লেখনী দেখিবেন! আর যাহা কখনও দেখেন নাই, তাহাই দেখিবেন।

বন্ধ্যার পুত্র সম্ভাবনা দেখিবেন, পরম-পক্ষীয়া পাত্নীর পতি দেখিয়া রসের সাগরে রসলীলা করিতে করিতে

স্বর্গের রথ! আহা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করুন!

'যন্ত্রিকাও গল্প যায় পড়িলে রসের হ্রদে' হইয়া যাইবেন। গ্যালারীর দর্শক পাছে গণ্ডগোল ঘটান, তাই তাঁহাদের তিন তোলায় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হাস্য-রসের উদ্বেলিত সাগর-তরঙ্গে তলাইয়া যাইতে হইবে! হে রসিক দর্শক ভাবনসূত্রে পাড়ি দিতে ইচ্ছা থাকে ত—অবিলম্বে চলিয়া আসুন!

পরিশেষে কয়েকটি কথা স্মারক-লিপি বলিয়া দিতেছি. স্মরণ রাখিতে ভুলিবেন না। এই রামধন্ন নাটকের ড্রেস রিহার্সালে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সহর প্রসিদ্ধ রাধামোহন কবিরত্ন মহোদয় এক মণ মধাম নারায়ণ তৈল নাট্য ধুরন্ধর মহাশয়কে প্রীতি উপহার প্রদান করিয়াছেন; এই নাটকের নাট্যসজ্জা দেখিয়া নব-নাট্যকার-মুকুটমণি, সখী কুল-আকুলকারী অধ্যাপক ঘোষ মহাশয় কি লিখিয়াছেন, জানেন? না, আমরা বলিব না, প্রথম রাত্রের অভিনয়কালে আমরা অভিনেত্রী-অন্তরিন-কুল-বান্ধব অধ্যাপক মহাশয়ের আশীষ-বাণী ফিল্ম করিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি, আসিয়া দেখিয়া যান! নাট্য ধুরন্ধর মহাশয় তাঁহার বহিবয়স নামেই নাটক উৎসর্গ করিয়াছেন!

Come & See. See & Enjoy

N.B.—প্রোগ্রাম, সঙ্গীতসহ .চারি আনা মূল্যে বিক্রীত হইবে। ইহাতে সমস্ত গান পাইবেন, ষ্টেজের সঙ্গে সঙ্গে আপনিও গুণ গুণ করিয়া গাহিতে পারিবেন, নো বাধা! একটি গানের একটি লাইন বলিয়া দিই, বিরহবিধুরা নায়িকার গান—"আমার এ'টি ওটি সবই আছে, নেইক কেবল সেই-টি!" মর্ম্ম সে'টা যে কিসের অভাব, সে যে কি কঠিন সমস্যা—আপনাকে বুঝাইতে পারি—এমন সাধ্য আমাদের নাই। কিন্তু আপনি দেখিলেই জলের মত বুঝিয়া যাইবেন। আর এক কথা, এ গান আপনার স্ত্রী কন্যাকে না শুনাইলে আপনার গো-জন্ম, মনুষ্য জন্ম বিফল।

আমাদের "চক্রের চাকী" ও "ঘুঘুর ঘানি" রঙ্গ-রস-রসায়ণ মহল্লায় পড়িয়াছে।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা।

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ২৯শে বৈশাখ শনিবার ১৩৩০, ইং ১২ই মে। [৪১শ সংখ্যা

তুর্ক-বীর আনোয়ার পাশা।

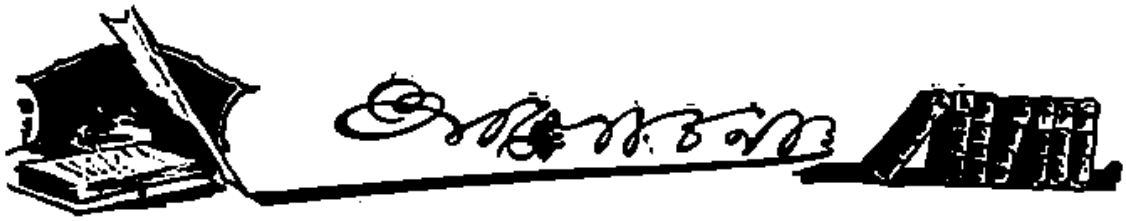

আমরা নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত ইহা সত্য কথা এবং এই নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা আমাদের মনে আসিয়াছে ইহাও সত্য কথা। মানুষের মন প্রাণ লইয়া নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা কাহারও পছন্দ না করাই স্বাভাবিক। শুধু জ্ঞান বুদ্ধিশালী মানুষ নহে—উদ্ভিদের জ্ঞানের অনধিকারী অন্যান্য প্রাণীও নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত হইতে চাহে না। চাহে না এই জন্য—নির্য্যাতন লাঞ্ছনা, সুখ শান্তির ব্যাঘাত ঘটায়,—উন্নতির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। জগতের সকল প্রাণীই বাঁচিয়া থাকিতে চাহে, সুখ শান্তি চাহে, আপন আপন অধিকার বজায় রাখিয়া জগতের ক্রমোন্নতির ধারার সহিত নিজেদের যোগ সম্পর্ক বজায় রাখিতে চাহে।

• • • •

নিজ নিজ অধিকার বজায় রাখিয়া যাহারা বিশ্বের স্রোত ধারার সঙ্গে নিজেদের যোগ সম্পর্ক বজায় রাখিতে পারে না—তাহারাই পদে পদে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হয়। লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন কোন সমাজ বা দেশের উপর বাহির হইতে তেমন ভাবে আসিতে পারে না যদি সমাজ ও দেশের ভিতর ঠিক থাকে। দেশ ও সমাজের ভিতরে গলদ জমিয়া উঠিলে, নিজেদের ভিতরেই যখন লাঞ্ছনা গঞ্জনা পূর্ণমাত্রায় চলিতে থাকে—বাহিরের লাঞ্ছনা গঞ্জনাও তখন সেই দেশ ও সমাজের উপর দেবতার অভিশাপের মত আসিয়া পড়িতে থাকে। বাহিরের লাঞ্ছনা গুলিই তখন আমাদের চোখে বড় হইয়া উঠে—কারণ তাহা লইয়া পরের দোষ খুঁজিয়া বাহির করিয়া আমরা অনেকটা সময় কথার গরু গুবরে কাটাইয়া দিতে পারি। পরে পরের ন্যায্য লভ্য অধিকার ছাড়িয়া দিবে—আমরা বসিয়া বসিয়া শুধু কথায় তাহা লাভ করিব ইহা হইতে পারে না। অধিকার যে কোন্ রকম পাইতে হইলেই তাহা জোর করিয়া পাইতে হয়। অধিকার শক্তিমানেরই আয়ত্ত, অশক্তের নয়। একজন দৌর্ব্বলতায় যাহা হারায় অপরে শক্তি দ্বারা তাহাই গ্রহণ করে। তাই হারানো অধিকার আবার যদি কোন দেশ লাভ করিতে চায় তবে তাহাকে আগে আপনার ভিতরের দৌর্ব্বলতা দূর করিতে হইবে। ভিতর কোন্ কোন্ দুর্ব্বলতায় আচ্ছন্ন হইয়া নিজ অধিকার বাহিরের উপর অর্পণ করিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে। ভিতরের ভেদাভেদ সুতীব্র রাখিয়া বাহিরের পাশ-মুক্ত হওয়া কোন কালে সম্ভব হইবে না। ভিতরের ভেদাভেদের এই সুযোগ লইয়াই তো বাহির নিজ অধিকার ছড়াইতে পারিয়াছে।

• • • •

আমাদের নিজেদের ভিতরকার দৈন্য ও দ্বন্দ্ব প্রতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কার্য্যেই এত স্পষ্ট ও সুনিবিড় হইয়া দেখা দেয় যে নিত্যকার জীবন তাহার প্রভাবে তো জ্বালাতন ও সঙ্কুচিত হইয়াছেই তার উপর যাহাও বা ছাই চাপা থাকে তাহাও এতটুকু অগ্নির সংস্পর্শ পাইলেই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। নিজেদের ভিতরকার দ্বন্দ্ব কোলাহল এমন ভাবে পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়া বাহিরের লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের হাত হইতে কি করিয়া আমরা মুক্ত হইতে পারিব? আমরা নিজেরা এ উহার ভাল এতটুকু দেখিতে পারি না। মনে মনের মিলনে—মনের মিলন-দ্বন্দ্ব হইতে যে সমাজশক্তির উৎপত্তি সে সমাজ আমাদের দেশে এখন নাই। জনলাঞ্ছনা আজ সমাজ যথেষ্ট করিতে পারে বটে কিন্তু জনের সম্মান রক্ষা ও জীবন রক্ষা সমাজ আদৌ করিতে পারে না। ধন সম্পত্তি ও অধিকার যাহার এতটুকু আছে সেই পরের অধিকারটুকু কাড়িয়া লইবার জন্য ব্যগ্র। আত্মসুখ বজায় রাখিবার জন্য মনের সুখের কথা আমরা একবার মনেও করি না। মন ও দেশ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। তাই আমাদের এ দশা। নিজেরা নিজেদের যত লাঞ্ছনা করিতেছি বাকি তত্তই আমাদের আত্মলাঞ্ছনার সুযোগে নিজ প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠ করিতেছে।

• • • •

আমরা নিজেরা নিজেদের হাতে লাঞ্ছিত হইয়া এখনও প্রথমে 'বৃটিশ জাস্টিস্' বা বৃটিশের ন্যায় বিচারের পানে চাহি—আর চাহি উপরে যদি কেহ ভগবান থাকেন তাহার পানে। নিজেদের ন্যায় বিচারে বিশ্বাস আমাদের জন্মে নাই। যে দিন কোন জাতির বা দেশের নিজেদের ন্যায় বিচারের উপর বিশ্বাস জন্মে সেদিন বুঝিতে হইবে তাহাদের ভিতরকার স্বল্প কোলাহল অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। ভিতরের উপদ্রব প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের উপদ্রবও তাহার কমিয়া আসিতে থাকে। তাই আজ দেশের নানা দিকের বিক্ষোভ, নিজেদের লাঞ্ছনা গঞ্জনার হাত হইতে মুক্ত হইতে গেলে আগে আমাদের নিজেদের ভিতর প্রথমে ঠিক করিয়া লইতে হইবে। ভিতরের গলদ ঠিক হইলে বাহিরের বন্ধন আপনা হইতেই খসিয়া পড়িবে।

• • • •

মুক্ত স্বচ্ছন্দ মনের পরিচয় আমরা আজ কোন দিক হইতে দিতে পারি না। পরাধীন জাতি পরের রাজনীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ও সত্য কথা যেমন বলিতে পারে না নিজেদের সমাজ নীতি ও দেশ নীতি সম্বন্ধেও সে তেমনি স্পষ্ট ও সত্য কথা বলিতে পারে না। স্পষ্ট ও সত্য কথা মনে জাগিলে ও বাহিরে সেই কথার রূপ দিতে পারিলে প্রতিকার আপনা হইতেই আসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। আর যেখানে মিথ্যা ও সঙ্কোচ দ্বারা আমরা নিজেদের মনুষ্যত্বকে সঙ্কুচিত ও পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছি—আপনাদের উন্নতির পথে আপনারাই পর্ব্বত প্রমাণ বাধা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি সেখান নিজেরা মুক্ত সবল মনের পরিচয় দিয়া মুক্ত স্বচ্ছন্দ তৃপ্ত হইব কি উপায়ে?

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু—সঙ্কলিত
লাফিং গ্যাসলাইট
আগামী সংখ্যা
"বাসন্তীর" অঙ্গ শোভাবর্দ্ধন করিবে।

• • • •

বাহিরের জালিনওয়ালা বাগ বা কারাগারের অত্যাচারে আমরা ব্যথিত ও অপমানিত হইয়া সাময়িক উত্তেজনা দেখাই বটে কিন্তু ভিতরে আমাদের সমাজ ও দেশের যেখানে, নিজেরা নিজেরাই যে অমন কত জালিনওয়ালা বাগ ও কারাগারের লাঞ্ছনা চালাই তাহা কি আমাদের চোখে পড়ে না! নিজেদের অত্যাচারে উপদ্রুত হইয়া দেশের জন শক্তি আজ যে তীব্র হাহাকারে বুক ভাসিয়া ফেলিতেছে এ আর্ত্তনাদ প্রশমনের উপায় তো আমাদের নিজেদের হাতেই রহিয়াছে। অথচ ইহার হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমরা কি করিতেছি? উদারতা, আত্মবোধ—নিজেদের ভাল মন্দ জ্ঞান ও সম্মিলিত শক্তির সম্মান ও মর্য্যাদা বুঝিলেই আত্মকলহের নিত্য বুভুক্ষিত অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিজ পঙ্গু মনুষ্যত্বকে আবার আমরা সোজা ভাবে দাঁড় করাইতে পারি। ততটুকু সরল ও সবল না হওয়া পর্য্যন্ত বাহিরের লাঞ্ছনা হইতে মুক্ত হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের জাগ্রত হয় নাই ইহা বলিতেই হইবে।

• • • •

দেশবাসীর হৃদয়ের অন্ধ ও হাহাকার দেশবাসীর নিজেদের নির্ম্মলতায় যত বেশী দেখা দেয় বাহিরের শক্তির পেষণে তত দেখা দেয় না। আমাদের দেশবাসী আত্মজের উপর যত অত্যাচার অবিচার করে বিদেশী বা বাহিরের কোন শক্তি তত অত্যাচার অবিচার আমাদের উপর করে না। তাই রবীন্দ্রনাথ একটি পরম সত্য কথা বলিয়াছিলেন 'এক বাঙ্গালী যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙ্গালী যখন তাহা কৌতূহলভরে দেখে, এবং যখন অপমানের প্রতিকার সাধন বাঙ্গালীর নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না, এ কথা যখন বাঙ্গালী বিনা লজ্জায় ইঙ্গিতেও স্বীকার করে, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, ইংরাজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল কারণ আমাদের নিজের স্বভাবের মধ্যে—গবর্ণমেণ্ট কোন আইনের, বিচারের দ্বারা তাহা দূর করিতে পারিবেন না।'

• • • •

তাই আমাদের অপমানিত লাঞ্ছিত হইবার যে স্বভাব হইয়া গিয়াছে, এই স্বভাব বা প্রকৃতিগত বিকলতা ও

ও পঙ্গুতা আমাদের পরিহার করিতে হইবে। আত্ম-মর্য্যাদা নিজেদের ভেতর দেখাইতে হইবে। আমরা নিজেরা নিজেদের সম্মান করিতে পারি ইহা যখন প্রমাণিত করিতে পারিব তখন অপরে আমাদের সম্মান করিতে বাধ্য হইবে। নিজেদের সম্মান নিজেরা করিতে পারিব না। নিজেরা সম্মান পাইবার ও সম্মান দিবার কোন জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারিব না—অথচ বাহির আমাদের সম্মানের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠান করাইবে ইহা কোন কালে সম্ভব হইবে না। সর্ব্বদাই অসম্ভব থাকিয়া যাইবে। তাই আত্মসম্মান জ্ঞান হইতেই দাসত্ব গঞ্জনার হাত হইতে মুক্ত হইতে হইবে—সম্মান অর্জ্জন করিতে হইবে।

• • • •

দেশে কংগ্রেসী দল ছিল—এবার বিভক্ত কংগ্রেস হইতে স্বরাজ্য দল হইয়াছে। দুই দলেই দেশের নানা সম্প্রদায়ের বড় গণ্য লোক আছেন। মহাত্মা গান্ধীর সময় কংগ্রেস যেমন অখণ্ড ভাবে একমাত্র দেশাত্মবোধকেই সম্বল করিয়া দেশের কার্য্যে অগ্রসর হইতেছিল—আজ তাহাতেও ভেদ আসিয়াছে। নিজেদের মধ্যে দুই ভেদ বিভাগ করিতে আমরা যেমন পটু অখণ্ড সমগ্রভাবে কোন মিলনকে ধরিয়া একলক্ষ্য হইয়া বিভিন্ন শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কার্য্য করিতে আমরা তেমনি অপটু। এক লক্ষ্য হারাইয়া আপনাদের মধ্যে দুই ভেদ বিভাগ ও দল বিভাগ করিয়া এ পর্য্যন্ত আমরা কার্য্যক্ষেত্রে আদৌ অগ্রসর হইতে পারি নাই। মূল লক্ষ্য হইতে ক্রমেই আমরা দূরে সরিয়া পড়িতেছি। মূল হারাণোই যেন আমাদের জাতীয় জীবনের লক্ষ্য ও কার্য্য। মূল কার্য্যের প্রণালী ও পন্থা সম্বন্ধে ভাবিতে ও জ্ঞান করিতে করিতেই দেশের মধ্যে এত বিক্ষোভ, মনান্তর, মতান্তর, বিদ্বেষ আসিয়া পড়িয়াছে—যে ইহা মেটাইতেই এখন বাহু শক্তির একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে—মূল তো বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। আজ দেশের এই বিক্ষোভ, আত্মকলহ ও বিদ্বেষ দেখিয়া দেশের বড় বড় নেতারাও বলিতেছেন কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি হইতে পরিয়া আসাতেই এ বিক্ষোভ আরম্ভ হইয়াছে। কংগ্রেসের কার্য্য পদ্ধতির মূলে সমগ্রভাবে জাতির দেশাত্মবোধ বিরোধিত করা হইয়াছিল তাই জাতি অল্প তুচ্ছ বিষয়ে—আত্ম দ্বন্দ্বে, তেমন ভাবে মন নিবিষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ মূল ভেদাভেদে মূলে গোল পড়িয়া গিয়াছে তাই নিজেদের ভিতরকার গ্লানি দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ আবার সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দু' পার্টির গঠন পদ্ধতি যদি এই মূল ভেদ বিভাগের মধ্য দিয়া আরও কিছুদিন অগ্রসর হইতে থাকে তবে জাতির দেশাত্মবোধ আত্মসংঘর্ষে যে খুব শীঘ্রই বিলীন হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই।

• • • •

বাহিরের শক্তির সঙ্গে অ-সহযোগ করিতে গিয়া তাহা না পারিয়া যদি সেই অ-সহযোগ নিজেদের মধ্যে পুরোমাত্রায় চালাইতে পারি তবে অ-সহযোগের ফল যে কি তাহাও আমরা শীঘ্রই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইব। পর অ-সহযোগে আমরা যাহা পাইবার আশা করিয়াছিলাম, আজ অ-সহযোগে তাহাকে দূরে পরাহত করিয়া দিলেও তবু বোধ হয় আমরা মূলে অ-সহযোগ বজায় রাখিলাম বলিয়াই উল্লসিত হইব। দাস মনোভাবের পূর্ণ বিকাশ এইভাবেই পরাধীন জাতির মধ্যে সার্থকতা লাভ করে সন্দেহ নাই।

• • • •

মহাত্মা বিচ্ছিন্ন জনশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া দেশ-শক্তি সংহত করিতেছিলেন। জাতির ভিতরে পূর্ণভাবে সহযোগ করিয়া বাহিরের সঙ্গে অ-সহযোগ চালাইতে চাহিয়াছিলেন। এ অ-সহযোগ যুদ্ধ বিনা অস্ত্রে বিনা রক্তপাতে বিনা বিপ্লবে সম্ভব হইত যদি জাতি ও দেশ নিজের মধ্যে সহযোগ পূর্ণ ভাবে করিতে পারিত। কিন্তু নিজেরাই যেখানে নিজেদের সঙ্গে পুরোমাত্রায় অ-সহযোগ চালাইতেছি এবং তাহাতে খুনো-খুনি রক্তপাত করিতে পর্য্যন্ত দ্বিধা বোধ করিতেছি না—তখন অ-সহযোগ করিয়া জয়ী যে হইতে পারিব আমরা তাহাতে আর সন্দেহ কি! দেশের চারিদিকে আজ সন্দেহ। অনাহারে অনশনে মরণের দ্বারে বসিয়া দেশের মানুষ নিজেদের পর্য্যন্ত পূর্ণ সন্দেহের চোখে দেখিতেছে। যাহারা দেশ চালাইবে বলিয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের অনেক ক্ষেত্র

সন্দেহ। এই ঘোর সন্দেহের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া জাতি ও দেশ মরণের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। আপন দুর্দশা আপনি ডাকিয়া আনিতেছে।

• • • •

বাংলার দারিদ্র্য যত বাড়িতেছে—বিবাহের উৎসব আনন্দ, অশ্রু হাহাকার ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। বিবাহে কত কন্যার পিতামাতা তাহাদের যথাসর্বস্ব বরের পিতা মাতার হাতে অর্পণ করিয়া পথের ভিখারী সাজিতেছে—কত কন্যা বর পক্ষের পেষণে ও অত্যাচারে আত্মঘাতিনী হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। এত অশ্রু ও হাহাকারের মধ্যেও আমাদের দেশের এই বিবাহ বা নর নারীর মিলন যে কি করিয়া উৎসব বলিয়া চলিতেছে তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। যে মিলনের অন্তরের বেদনা ও হাহাকার এমন তীব্র ও বাহির এমন চাকচিক্যময়তাহার পরিণাম যে কিরূপ হইতেছে তাহা আমরা নিত্য ভোগ করিতেছি—আশ্চর্য্য হইতেছি—মরিতে বসিয়াছি—কিন্তু তবু ইহার বেশী আর কিছু করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই।

• • • •

আমাদের দেশ অভাবের দেশ। অভাবের তাড়নায় এদেশের লোক হায় অভাব—আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান সব ভুলিয়া গিয়াছে। আজ দেশের মস্তিষ্কশালী লোকেরা শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ধনী মালিকদের যথেচ্ছাচার হইতে তাহাদের মুক্ত করিতে চাহিতেছেন। সকল দেশেই মস্তিষ্কশালী লোকেরাই দেশকে চালিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। সংবাদপত্রে, সাহিত্যে, কাব্যে, উপন্যাসে, নাট্যে মস্তিষ্কজীবি লোকেরাই দেশকে নানা ভাবে আত্মবোধে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মস্তিষ্কজীবিরা আমাদের দেশে আজ কলকারখানার দিন মজুরদের চেয়েও হীন হইয়া পড়িয়াছে। অর্থশালী মালিকদের প্রভাবে মস্তিষ্কশালীর যে কি দুরবস্থা—তাহা যে কোন লেখককে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারা যাইবে। মস্তিষ্কজীবি যাহারা পুঁথিপত্র রচনা করিতেছেন তাহারা কাগজওয়ালা, প্রুফরী বা প্রেস যাহা পাইতেছে তাহাও পান না।

• • • •

মস্তিষ্কজীবি যাহারা নিজ ক্ষমতায় একটা সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন, যে প্রতিষ্ঠানকে তাঁহারা আপনার প্রাণের চেয়েও বেশী মনে করেন সেই প্রতিষ্ঠান হইতে ধনী মালিক ইচ্ছা করিলেই, খেয়াল হইলেই তাঁহাদের দূর করিয়া দিতে পারেন। কারণ মালিক ধনের অধিকারী—সেই সূত্রে তাহারা পত্রিকারও অধিকারী। ধন গর্ব্বিতের মস্তিষ্কের ক্ষমতার উপর এই স্বেচ্ছাচার কতদিন আর এদেশে চলিবে।

• • • •

আমাদের দেশে সংবাদপত্র সেবীদের সঙ্ঘ হইয়াছে। ধনীর সঙ্গে মস্তিষ্ক জীবি লেখক শ্রমিকদের এই সংঘর্ষের কি অবস্থা হইবে এবং এ হীন অবস্থা হইতে লেখকদের পরিত্রাণ পাইয়া নিজ নিজ মান ও প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা কি ভাবে হইতে পারে সংবাদপত্র সম্মেলনে তাহার ব্যবস্থা হওয়াই আমরা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য মনে করি। সংবাদপত্র লেখক দেশকে স্বাধীনতার মন্ত্র শিখাইবেন, পথ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন—স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবেন।—কিন্তু তাঁহারাই যদি ধনী মালিকদের হাতে আজ পরাধীন ভাবে থাকেন তবে স্বাধীন সত্যবাণী তাঁহাদের লেখনীতে ফুটিবে কি করিয়া? দেশের সম্মুখে সাহিত্য সেবীদের এই মান ও জীবনের সমস্যা আজ নানা কারণেই বেশ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সকল সাহিত্যসেবীই মনে মনে নিজেদের দুরবস্থার কথা ভাবিয়া ব্যথিত হইয়া উঠিতেছেন। ব্যথা যেখানে প্রাণে এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে সেখানে লজ্জায় ও সঙ্কোচে তাহাকে প্রাণের মাঝে গোপন রাখিয়া ব্যথার কারণকে আরও বাড়িতে দেওয়া সঙ্গত কি? সাহিত্যিক নিজ মর্য্যাদা জ্ঞান হারাইয়া ধনশালীর নির্য্যাতন সহিয়া নিজে লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত অবস্থায় দেশের ও দশের মর্য্যাদা জ্ঞান আনিবেন কিরূপে? এই সব লইয়া যে সমস্যা তাহা আমরা নিজেরাই নিরাকরণ করিতে পারি—পরের বা রাজশক্তির 'সার্টিফিকেশন' বন্ধ করিবার মত বহ্বাড়ম্বরের প্রাচুর্য্য ইহাতে না দেখাইলেও চলে। আর নিজেদের ভিতরের লাঞ্ছনায় নিজেরা মরিয়া যদি আমরা কেবলি রাজা উজীর মারিতে থাকি তবে তাহা নেহাৎ হাস্যকর নহে কি?

• • • •

গত সংবাদপত্র সঙ্ঘের সম্মেলনে কোন সভ্য এই সব ব্যাপার লইয়া 'Some points of journalistic duty' ও 'Miscellaneous' পর্য্যায়ে প্রশ্ন উঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সামান্য আলোচনার পর অপর একটি সভায় এ আলোচনা হইবে স্থির হয়। কিন্তু সেই সামান্য আট দশ মিনিট আলোচনাতেই সমস্ত সঙ্ঘের সভ্যমণ্ডলী যেন সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন। সকলেই জিনিসটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন অথচ কাহারও যেন প্রকাশ্যে কিছু বলিবার সাহস নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই সংবাদপত্র সম্মেলনের যে রিপোর্ট খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে তাহাতে এ আলোচনাটির উল্লেখ মাত্র নাই। অথচ সঙ্ঘের প্রস্তাব উত্থাপনের পর প্রেসিডেন্ট হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই এ সম্বন্ধে কথা কহিয়াছিলেন। নিজেদের ঘরের কথা ও অতি সত্যকথা যাহা তাহা প্রকাশে আমরা এত ভীত কেন?

স্বাস্থ্যের কথা

[শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়]

বাঙালীর ভগ্ন স্বাস্থ্য লক্ষ্য করে কোনও কোনও দূরদর্শী ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন, যে, সে দিনের আর বেশী দেরী নেই, যেদিন এই হীনবল জাতিটা পৃথিবী থেকে একেবারে লোপ পেয়ে যাবে। যে হিসাবে জাতিটা দিন দিন বলহীন আর রোগের কবলিত হয়ে পড়েছে, তাতে তাঁদের ধারণাটা ভ্রমপূর্ণ বলে, একেবারে নিছক মিথ্যা হিসাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যে রোগ একবার এদেশে শুভাগমন করেন, তিনি আর প্রত্যাবর্ত্তনের কোনও রকম লক্ষণ ত দেখানই না, বরং এখানেই একছত্র রাজ্য বিস্তার করবার বিশেষ আশা রাখেন। ভারতবর্ষ বাঙ্গালা—চিরকালই রাজভক্ত বলে জগতের ইতিহাসে বিখ্যাত। কাজে কাজেই তিনি একবার স্বীয় অধিকার বিস্তার করে সিংহাসনের দখল নিতে পারেন, তিনি রোগই হউন, অমঙ্গলই হউন,—রাজভক্ত বঙ্গদেশ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বিশেষ কুণ্ঠা বোধ করে, সে রাজ্যের উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হয় না। তবু এই নিরীহ জাতের জন্য এ দেশ আজ মৃতপ্রায়—কঙ্কালসার—আর নানা রোগের লীলাক্ষেত্র। স্বাস্থ্যের যে কতদূর অবনতি ঘটেছে, তা দেশের যে কোনও একজন লোককে নিরীক্ষণ করলেই বেশ উপলব্ধি করতে পারা যায়।

এ কথাটা বোধ হয় কারও অবিদিত নেই, যে, প্রাণ ধারণ করবার জন্য আমাদের এই শরীর বহন করতে হয়। যতদিন জীবন, ততদিন, এই দেহটার হাত হতে আমাদের পরিত্রাণ পাবার কোনও উপায়ই নেই। জীবনের বোঝা, যে, কতদিন বইতে হয়, তা ঠিক বলা যায় না। কাজে কাজেই এ শরীরের অস্তিত্ব যে কতদিন থাকবে, তাও ঠিক নির্ণয় করা যায় না। রোগ যত আছে, তারা আক্রমণ করে, বিপুল উৎসাহে, এই শরীরটাকে। একটা কথাই সেজন্য প্রবাদ বাক্য হয়ে আছে, "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং।" এই শরীরকে, ব্যাধির কবল থেকে, বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই, জীবন ধারণের প্রধান সুখের উৎসধারা চিরমুক্ত হয়ে থাকতে পারে। বাঙালী এখনও জাতি হিসাবে একেবারে মৃত হয়ে পড়েনি বটে, কিন্তু তার বর্ত্তমান জীবন ধারাকে, ঠিক সজীব প্রাণবান, বলা চলে না। এ যেন, কোন রকমে মরতে মরতে বেঁচে থাকা; প্রাণটা যাতে দেহ হতে বিচ্যুত হয়ে না পড়ে, শুধু মাত্র তারই আয়োজন করে রাখা হয়েছে,—এখন বাঙালীর সজীবতার লক্ষণ। আজ জগতের অপর জাতির দিকে চেয়ে দেখে, বাঙালীর সঙ্গে তাদের স্বাস্থ্যের তুলনা করলে, লজ্জায় দেশের শির অবনত হয়ে পড়ে। দেহ স্বাস্থ্যহীন, কাজে কাজেই মন ঠিক প্রফুল্ল থাকে না,—সেও শরীরের অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন হয়ে পড়ে। কাজে কাজেই বুদ্ধি বৃত্তির আর চিন্তা শক্তির হ্রাস ঘটতে থাকে। আর, যদিই বা, কখনও, কোনও, বিষয় চিন্তায় বিষয়ীভূত হয়ে পড়ে,—কার্য্যকালে, তাকে কখনও কার্য্যে পরিণত হতে, দেখা যায় না। তার কারণ হচ্ছে, শক্তির অভাব। দেহের এখন শক্তি আর নাই,—যে, কোনও এক চিন্তাকে কার্য্যে রূপান্তরিত করতে পারে। কর্ম্ম প্রবণতা না থাকায়, শরীর ও মন আরও অলস, আরও অবশ, হয়ে পড়ে। কিছুদিন পরে জীবনধারা কর্ম্মহীন—নিশ্চেষ্ট জড়বৎ হয়ে ওঠে।

কর্ম্মে অনিচ্ছা বশতঃ, আর শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য শরীর এরূপ নিশ্চেষ্ট ও অপটু হয়ে পড়ে। এই ভাব, কিন্তু, বিশেষ মঙ্গলের কারণ নয়। এই জড়ত্বই, ব্যক্তিকে, তথা জাতিকে, একেবারে অকর্ম্মণ্য ক'রে তুলে, তাকে রোগের আকর করে তোলবার সাহায্য করে; আর সমস্ত জাতিকে ধ্বংসের পথে দ্রুত ছুটিয়ে নিয়ে যায়। তখন আর জীবন মরণে বিশেষ কিছু তফাৎ থাকে না। জীবন থাকা সত্ত্বেও, সে জাতি, তখন নির্জ্জীব—অকর্ম্মণ্য মৃত।

দেশের এই নির্জ্জীব ভাব, দূর হয়ে গিয়ে, কি উপায়ে আবার সজীবতা ফিরে আসতে পারে, সে বিষয়ে সকলেরই

দৃষ্টি রাখা দরকার। জীবনটাকে যে অন্ত নয়—প্রাণটা যে অচল নয়, সচল—সেইটা যাতে, সকলে উপলব্ধি করতে পারে, তারই জন্ত বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। একটা কথা আছে "বাঙালী বাক্যবীর" তার কারণ, বাঙালীর বীরত্ব কথাতে এসেই সমাপ্তি লাভ করে। বীরত্বকে কাজে পরিণত করবার মত শক্তির অভাব, সে বেশ উপলব্ধি করতে পারে। এখন সেই শক্তির প্রয়োজন যা, তার বীরত্বকে, তার কথাকে কার্য্যে পরিণত করবার সুবিধা, আর সুযোগ দান করতে পারবে তাহলে দেশের মধ্যে বহাতে হবে কর্ম্মের প্রেরণা, যাতে তাদের অলসতা দূর হয়ে, কর্ম্মের পথে অগ্রসর হয়ে, তারা বল লাভ করবার আশা, করতে পারে।

দেশের ছাত্র, আর যুবক—যাদের, আমরা, দেশের আশা ভরসার স্থলে আসন দিয়ে রেখেছি, তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি নিরীক্ষণ করলে, সত্য সত্যই নিজের অজ্ঞাতসারে, একটা নিরাশার দীর্ঘশ্বাস প্রবাহিত হয়। দেশের অন্ন বস্ত্রের অভাব, একেবারে অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু যারা বিদ্যালয়ে গিয়ে, বিদ্যা আহরণ করছে,—পাঠ্য পুস্তকে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব পাঠ করছে, তাদের স্বাস্থ্যহীন দেখলে প্রাণ দুঃখে পূর্ণ হয়ে ওঠে। স্কুল কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে, গত বৎসর বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তাতে বোঝা যায়, যে, ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও, আদৌ ভাল নয়। তার প্রধান কারণ, রোগের হাত হতে আত্মরক্ষার, বিশেষ কোনও রকম উপায় তারা গ্রহণ করে না, আর নিজেদের শরীরে অটুট স্বাস্থ্য বর্ত্তমান রাখতে তারা প্রয়াস পায় না। ইচ্ছাক্রমেই হোক্ আর অনিচ্ছাক্রমেই হোক্, মানসিক পরিশ্রম হয় তাদের যথেষ্টই—কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমের দিকে তারা আদৌ লক্ষ্য রাখে না। যে পরিমাণে মানসিক পরিশ্রম হয় তার দশ ভাগের এক ভাগ দৈহিক পরিশ্রম করলেও, তাদের শরীর, রোগের পক্ষে, সহজলভ্য শিকার হয়ে ওঠে না। শরীরের প্রতি অবহা অযত্নই হচ্ছে, রোগ ভোগের প্রধান কারণ। যথা নিয়মে শরীর রক্ষা করতে প্রয়াস পেলে, রোগের হাত হতে, উদ্ধার পাবার আশা থাকে। নীরোগ সুস্থ সবল দেহ, সকলেই আকাঙ্ক্ষা করে থাকে,—প্রকৃত-পক্ষে, এ সকলেরই চিরকাম্য,—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়—এ স্বাস্থ্য লাভ করতে, কেহই প্রয়াসী হয় না। বিনা আয়াসেই, সকলে, এই মহার্ঘ্য রত্নের অধিকারী হতে প্রয়াসী।

দেশে উৎসাহী যুবকের অভাব নাই। কিন্তু স্বাস্থ্যোন্নতি লাভ করতে হলে, যে সব কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা দরকার সে সব কাজে, তাদের প্রবৃত্ত হতে, দেখা যায় না। ইউরোপ, আমেরিকার সঙ্গে, সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হবার সুযোগ না পেলেও, স্কুল কলেজের ছেলেরা, পুস্তকের ভিতর দিয়ে, সে দেশের সঙ্গে পরিচয় লাভ করছে। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের মত, বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে, যারা, 'ভাল ছেলে' নামে অভিহিত হয়, তাদের শুধু ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগী, প্রায়শঃ বলা চলে না। তারা শুধু, মানসিক পরিশ্রম করেই, ক্ষান্ত হয় না—তারা দেহকে শক্তিশালী কর্ম্মঠ করবার জন্ত, যথেষ্ট চেষ্টা করে, যাতে করে, নিজের পায়ের ওপর নিজেরা বেশ ভাল করে দাঁড়াতে পারে। আমাদের দেশের ছেলেরা এ সমস্ত অবগত হওয়া সত্ত্বেও যে, কেমন করে, নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, তাই বিস্ময়ের বিষয়। লেখাপড়া করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও, শরীরকে ভাল রাখবার, চেষ্টা করতে হবে, কেন না, শরীর মন্দ হলে, লেখাপড়ারই ব্যাঘাত ঘটে থাকে। সুস্থ দেহ লাভ করাই হচ্ছে, জীবনে সকলের চেয়ে বড় পাওয়া। একজন সুস্থকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে, উদর চিন্তায়

শিক্ষক ব্যতিরেকে

সেতার শিক্ষা

৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১৷৷০

সেতারের অতিরিক্ত গত ৷৷০

প্রকাশক :—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

৯১৷১এ সেন লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা

এবং গুরুদাস লাইব্রেরী ও

ডোয়ারকিন কোংর নিকট প্রাপ্তব্য।

জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়তে হয় না। এমন কোনও কাজই নেই, যা একজন সবল ব্যক্তি, সুস্থ দেহে, সম্পন্ন করতে না পারে। বিদ্যার চেয়েও বেশী প্রার্থনীয় বস্তু, হচ্ছে স্বাস্থ্য। দেশের ছেলেদের এই কথাটি এখন বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন।

আজ কাল, মুখ ফলেছে, খেলার দিকে একটু আগ্রহ হয়েছে, বলাই বিস্তার। প্রায় সকল ছাত্রকেই এ বিষয়ে অল্প বেশী, উৎসাহী, দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এখানেও, কার্য্যকালে, অর্থাৎ ক্রীড়ার সময়ে সকলের উৎসাহ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বেশীর ভাগই দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে প্রয়াস পান। অকর্মণ্য, রোগ জীর্ণ, ভাল ছেলে হয়ে থাকবার পক্ষপাতীই, অনেককে, দেখতে পাওয়া যায়। নিজেদের দেহের দিকে কারেও, মন দিতে, দেখা যায় না।

আর কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে, বসে থাকলে, চলবে না। যাতে দেশের ছেলেরা, অতুল স্বাস্থ্য সম্পদের অধিকারী হতে পারে, সে বিষয়ে একটু চিন্তা করা দরকার। এরূপ নির্ব্বোধ কেহ নেই, যে, স্বীকার করে না যে শরীরকে নীরোগ সবল সুস্থ রাখা প্রয়োজন। শারীরিক পরিশ্রমই হচ্ছে, এখন সকলের চেয়ে প্রধান প্রয়োজনীয়। যাঁরা ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলায় যোগদান করেন, তাঁদের কাছে শরীরের কথা, বলবার বেশী প্রয়োজন বোধ হয় না। যাঁরা কোনও রকম দৈহিক পরিশ্রম করেন না, তাঁদের অবিলম্বে, কোনও রকম পরিশ্রমকর কার্য্যে, নিযুক্ত হওয়া, বিশেষ প্রয়োজন। অনেকে বিকালে বা সন্ধ্যা-বেলায় কলিকাতার রাস্তায় বা কোনও পার্কে একটু বেড়িয়ে আসাকে, অঙ্গচালনার অন্তর্ভুক্ত করে, শারীরিক পরিশ্রম করা হল, বলে মনে করেন, কিন্তু তাঁদের সে ধারণা ভুল। বৃদ্ধের পক্ষে সেরূপ বেড়ান সঙ্গত হতে পারে, কিন্তু বালক যুবকের পক্ষে ও নীতি স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল হতে পারে না। স্বাস্থ্যোন্নতি করতে হলে কি ভাবে চলা দরকার তার আলোচনা এর পর করা যাবে।

'সময়ের গুণ'

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

সুসময়ে দম্ভভরে
—"নাম নাহি ল'ব,"
অসময়ে—"রক্ষ' মা'গো,
—ঘোড়া পাঠা দোব"।

অত্যাচারীর প্রতি প্রেম

[কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

প্রেম কহে "অত্যাচারী, আমার উপর
যত অত্যাচার তুমি কর নিরন্তর—
আমি তত বেড়ে উঠি দেবতার মত
মহিমা মণ্ডিত যীশু প্রশান্ত উন্নত।"

৪৷৷ বিনামূল্যে ব্রুকেটসহিত ফটো
ফটো এনলার্জিং ১৯×১০
ফটো সহ অগ্রীম সিকি মূল্য পাঠান
কলিচাইও, লেন্স ও রবারষ্টাম্প সেকার
৩৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

কবে ?

নাথ, বৈশাখের রৌদ্র দগ্ধ ধূলিকীর্ণ পথে
ভ্রমিতেছি বোঝা ল'য়ে তব মনোরথে—
নাহি জানি কবে কোন্ আষাঢ়ের ছায়
এ ভার নামায়ে লবে মুক্ত করুণায় ?

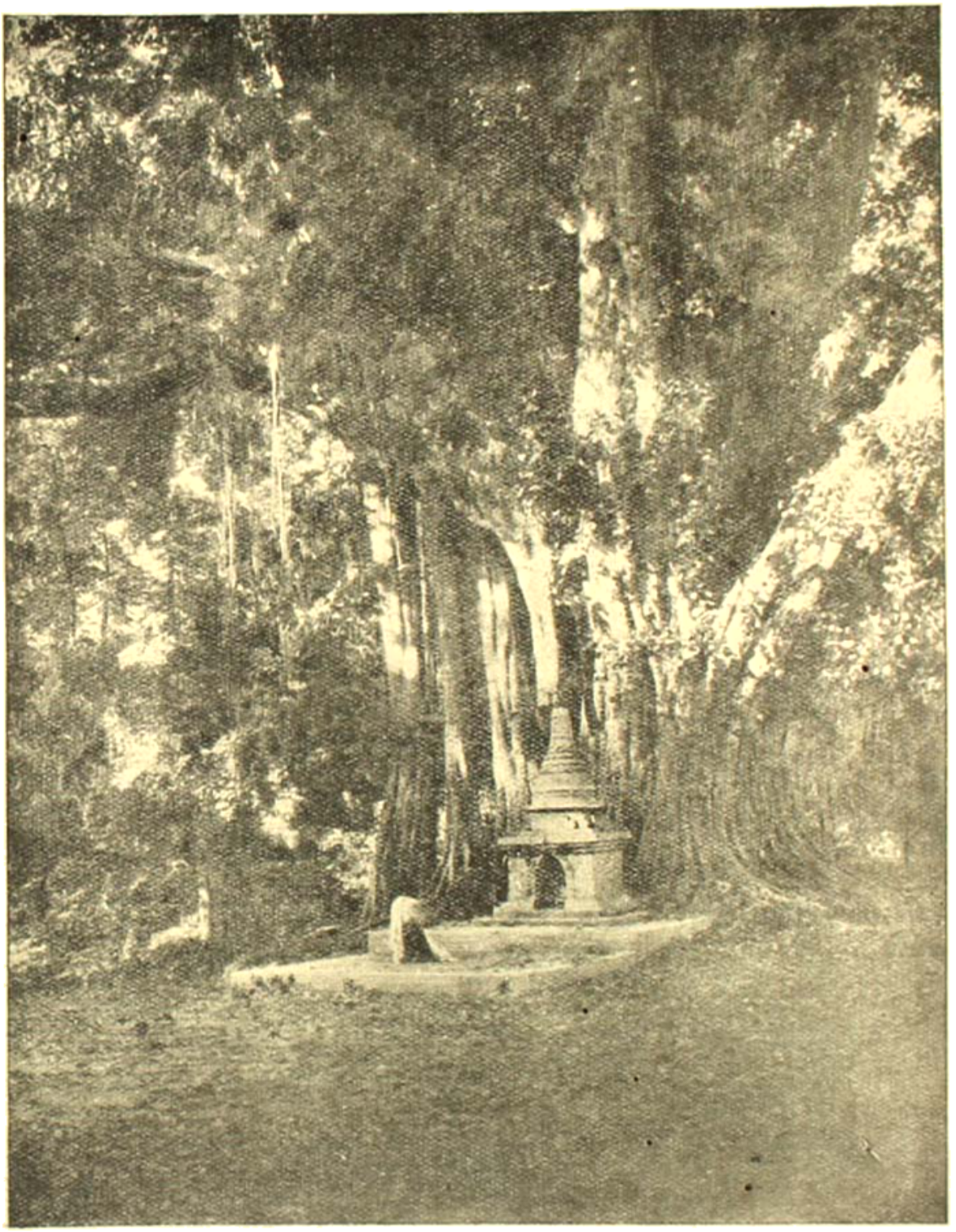

পল্লী-তীর্থ

(মেসার্স শর্ম্মা ব্যানার্জ্জির সৌজন্যে)

"ঘুম ভাঙ্গাবার কল"

[অভিনেতা—শ্রীকাঞ্চনকুমার মুখোপাধ্যায়]

প্রথম দৃশ্য

পূর্ব্ব রাত্রে স্ত্রীর সহিত কোনো বিশেষ কারণে কলহ হইয়াছিল।

পুত্র। (তাহার মাতাকে) না, ও থাকলে আমার লেখাপড়ার বড় ক্ষতি হয়। আজই গাড়ী ডাকিয়ে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও ওকে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্ত্রী। (রাগে) হুঁহোগা, আমার ঘরে নাকি তোমার পড়ার ক্ষতি হয়! আচ্ছা, আমি চল্লুম, গাড়ী এসেছে, কিন্তু এই বলা এইল খবর্দ্দার যদি আন্‌তে যাবে, ভাল হবে না, মনে থাকে যেন।

তখনও স্বামীর রাগ ছিল,—স্বামী নীরব।

তৃতীয় দৃশ্য

মা। "হ্যাঁরে সত্য, এত বেলা পর্য্যন্তও ঘুমুতে হয়! এই বলিস্ পাশের পড়া"!...

পুত্র। "জানইনে, কেউ জেগে না দিলে আমার ঘুম ভাঙে না।"

মা। "বেশ ত, কাল থেকে আমি দরজায় শেকল নেড়ে দিয়ে যাবো!"

পুত্র। "না, না শেকল নেড়ে কাণ মাথা ঝালা পালা করে দিতে হবে না। অন্য কোন রকমে ..(চক্ষু মার্জ্জনা করতঃ প্রস্থান)

—বলা বাহুল্য, বুদ্ধিমতী জননী পরদিন সত্যই অন্য উপায় বাহির করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

হারা মণি

(বংশ বন্দনা)

[শ্রীরাধাচরণ দাস]

[লাবক কবি নীলকণ্ঠের নামের ও গানের সহিত পরিচয় নাই, এরূপ বাঙ্গালী দুর্লভ। তাঁহার বহু সাধন সঙ্গীত ও তত্ত্বতত্ত্ব বিষয়ক গান অদ্যাপি বাঙ্গলার হাটে, মাঠে, বাটে, ঘাটে ধ্বনিত হইয়া থাকে। নীলকণ্ঠ প্রাচীন যুগের কবি ছিলেন—খাঁটী দেশী কবি। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিবার সুযোগ পায় নাই। Western idea বা প্রতীচ্য ভাব তিনি আধুনিক বহু তথা কথিত কবির মত বেমালুম অপহরণ করেন নাই। নব শিক্ষিতগণ নীলকণ্ঠকে 'প্রাচীন' জ্ঞানে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গলার অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত নর-নারী কখনও নীলকণ্ঠের কণ্ঠের সুধাময়ী বিশ্বৃত হইতে পারিবে না। যতদিন বঙ্গ-সাহিত্য থাকিবে—ততদিন নীলকণ্ঠের স্মৃতি বিলুপ্ত হইবে না। 'পদাবলী' সাহিত্যের একটা দিক নীলকণ্ঠ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আমরা বহু কষ্টে তাঁহার নিজের বিলুপ্ত প্রায় মধুর সঙ্গীতটী নবদ্বীপ বাসী জনৈক নিরক্ষর গায়কের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া 'বাসন্তীর' পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম। কোন মুদ্রিত পুস্তকে ইহা প্রকাশিত হয় নাই।]

বংশ বন্দনা

বাঁশের বাঁশরী স্যামের করে
বিনা বংশ মত হয় না কোন কাজ
বস্ত্র করে' বাঁশে সকল কার্য্য সারে।
পুত্র কিম্বা কন্যা বংশেতে জন্মিলে
আগে কাটে নাড়ী দিয়ে বাঁশের ছিলে
ও বাঁশ দেখ, ভূমণ্ডলে শুভ্রতি মণ্ডলে,
বাঁশের পাতায় পূজে শীতলা ষষ্ঠীরে।
বাঁশ ছাড়া কভু ঘর বাড়ী না হয়,
খুটি খোঁটা হয় বাঁশের সঞ্চয়,—
শাঁরক, পালা কঞ্চী, ভীর, আড়া, চাড়,
কি না হয় সে বাঁশ দিয়ে।
বাঁক, বাখারি, ঝুড়ি, মোরাল, সেমলে ঝুড়ি
চুবড়ী, কুলো, ডালা, বাখালের নড়ি।
চেঁচা, খাঁচা, মাচা, আসন বাঁধা চেড়ি
দেবতারি ঠাট হয়, কাঠামোটি করে।
গুণধর বাঁশ কি দিব তুলনা,
বিবেচনা করি বেদে নাহি সীমা।
গুপ্তভাবে থাকার গুঁড়ি হয় খুচি বাড়ী
ডোকলি হয়ের দীঘরেরি জালে
উজুন চেঙা হয়, কৃষকেরি করে,
ও বাঁশ ডোমেতে ঘরের চৌচির করিয়ে
বোনে খালুই, পলুই, বিতি, ঘুনী, দুয়ারি,
ও বাঁশ কুমারের চাকে হয় চাকের নাভি
হাড়ি মাঝির হাতে ইওলাড় আড়ি
হাতুড়ির বাঁট হয় কর্ম্মকারের বাড়ী
বলের নিশানের ছড়ি।
তাঁতি বাড়ী গুরুরে পানা চরকী নাটা
জাহ্নবীর জলে হয়ে থাকো খোঁটা
বাঁকা হয়ে থাক চৌপলেতে খাঁটা
মোটামুটি বিকায় হয় খানা বাজারে।
শুনতে পাই বাঁশ, বৈদ্যের নিকটে
জীবে ব্যাধি হ'য়ে পড়িলে সঙ্কটে
বংশলোচন বেটে খাওয়ালে উৎকটে
আরোগ্য হয় সে ব্যাধি।
যেথ বিবাহে বংশ প্রয়োজন
মোড়া বোড়া গুড় চাক-ভাঙা চালুন
বাঁশের যত গুণ না যায় বর্ণন
বাঁশের ছাদনা করে বিবাহ আসরে।
বাঁশ ও' নয় সামান্য জগৎ মণ্ডলে
যদি কোন কালে কারুর ভিটা মূলে
বাঁশের মূল ধরে, নির্ম্মূল করে তারে সমূলে!
সে বংশে পুত্র কন্যা থাকে ঘাঁটি
ছাদে পাতে যারে ছায়লোকা টিকটিকি
ও বাঁশ জন্মের নিশান উড়ায় পরিপাটী
বাঁশগাড়ি হ'য়ে বাটী নাড়ে নরে।
ও বাঁশ মূলের সাথি হয়ে থাক দেবালয়ে,
শ্মশানেতে থাক মড়ার বাঁশ হ'য়ে
কাছে থেকে যাও বুকে বাঁশ দিয়ে—
খুচিয়ে মার দড় দিয়ে।
নীলকণ্ঠ বলে আমার কবে হবে সে সুদিন
কবে দেখাইবে আমায় জাহ্নবী পুলিন
এই শ্মশান স্থলে দেহ হবে লীন
তথা ভস্ম হবে দেহ কলেবরে।

স্মৃতি মন্দির

মিঃ সেন ক্রমাগত অধৈর্য্যভাবে পদচারণা করিতেছিলেন, পাঁচ মিনিট পরে বুক-পকেট হইতে ঘড়িটা তুলিয়া ধরিয়া একবার রাগতভাবে সিঁড়ির দিকে চাহিয়া বিরক্ত স্বরে বলিলেন—আর দাঁড়ান যায় না, চল চৌধুরী!—চৌধুরী তাহাই চাহিতেছিলেন।

উভয়ে বাহির হইয়া গাড়ীতে বসিতে, চৌধুরী শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন—মিঃ মিত্রকে অত্যন্ত কন্যা-বৎসল বলে মনে হয়।

কন্যা-বৎসল! ও কথার কোন অর্থ নাই, চৌধুরী, অত্যন্ত দুর্ব্বল চিত্ত লোক এই রাজেশ্বর!—বলিয়া তিনি তোলোপানা মুখখানা গাড়ীর জানালায় বাহির করিয়া দিলেন।

চৌধুরীর বলিবার কথা অনেক ছিল, কিন্তু মিঃ সেনের মানসিক দুরবস্থার কথা ভাবিয়াই আপন উত্তাল হৃদয়ের বাক্যস্রোত রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

রাজেশ্বর যে বাস্তবিকই দুর্ব্বল-চিত্ত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপরে উঠিয়া, সেই যে আরাম-কেদারার পার্শ্বে মেয়েকে বসাইয়া রেঙ্গুনের নানা দৃশ্যের, পথের বিবরণ বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন, নীচে যে দুইটা লোক হাঁ করিয়া বসিয়া আছেন, গৃহস্বামীর নিকট বিদায় না লইয়া হয়ত তাঁহারা বাহির হইতেই পারিতেছেন না, এসকল কোন কথাই তাঁহার মনে ছিল না।

হঠাৎ কামনা বলিয়া উঠিল—মাসীকে ডাকি বাবা!

রাজেশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিলেন—ওঃ! সেন আছে বাইরে, না? আচ্ছা ডাকো, ডাকো!

সদানন্দকে পাঠাইয়া দিয়া কামনা ফিরিয়া আসিতেই রাজেশ্বর কহিলেন, হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলাম! সত্যি, এ-রকম ছেলে বাঙ্গালীর ঘরে যে আছে তা আমি জান্তুম না। ষ্টীমারের সমস্ত লোক যেন তার কতদিনের কত কালের পরিচিত, কত আত্মীয়! কার ছেলেকে খাওয়াবার দুধ নেই, চোকরা তার জন্যে বাটী হাতে দুধ ভিক্ষা করে' বেড়াচ্ছে, কে 'ভেকে' উঠুন জ্বালতে না পেরে অসুখ আছে, যুবক তার উনুন জ্বালবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, একটি বুড়ীর কলেরা মতন হয়েছিল, ভয়ে যখন সবাই আড়ষ্ট, সেই ছেলেটি...

সদানন্দ একতল হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাতুলের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। কথা কয়টা কামনার কাণে গেলেও সে মন দিতে পারে নাই। তার মনটি তখন সেই অজানা যুবক ও রোগপীড়িতা বৃদ্ধার চিন্তায় মগ্ন ছিল, সে পিতার মুখের পরে দুইটি আকুলভাসরা দৃষ্টি ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রাজেশ্বর বলিতেছিলেন—কামনা, বুড়ী যেন তারই মা! মা'র চেয়ে বেশীও নয়, কমও নয়! কি প্রাণে যে তার সেবা করছিল, রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে' টেনে তুলছিল, আমরা ক্যাবিনে বসে' যখন খালাসি কি সারেঙদের মুখে শুন্‌ছিলুম সে কথা, সত্যি বল্‌ছি কামনা, ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরি কিন্তু তারা মারে পেরে যে-দিকটায় ছিল, যাত্রীদের সে-দিকে যাওয়া ডাক্তারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন, ক্যাবিনে বসেই তার কাজের কথাগুলো শুনতে লাগলুম আর কায়মনে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করছিলুম যে ভগবান বাঙ্গালার ছেলে সব যেন এর মতই হয়!

কামনার বুকটি পীড়িতা বৃদ্ধার চিন্তায় ভরিয়াছিল, সাগ্রহে জিজ্ঞাসিল—তিনি সেরে উঠেছিলেন ত বাবা!

হ্যাঁ মা, সেরে উঠেছিলেন! সেরে উঠেছিলেন কেন বলি, ছোকরা তাকে যম রাজার দুটি বাহুর গ্রাস

থেকে টেনে এনেছিল! আজ নেমে-ও, তাকে পৌঁছুতে আরকের গাড়ীতেই বসোয় সেল।

কামনা শুনিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, রাজেশ্বর বলিলেন—ছোকরার মুখের একটি কথা এখন' আমার কাণে বাজছে কামনা, সে একদিন কথার কথায় বলেছিল, লেখাপড়া সে শেখে-নি, কেরাণী হবে না! পরিচয়ে বলেছিল রেঙ্গুনে একটা কাঠের আড়তে টিকের কাজ করে।—তিনি এক মুহূর্ত্ত থামিয়া পুনশ্চ কহিলেন—লেখাপড়া জানে না যে, মূর্খ যে, তার ওপর আমাদের কতই না অশ্রদ্ধা ছিল কিন্তু একে দেখে আমার সব ধারণা উল্টে গেছে, মা!

রাজেশ্বর আর কিছুই বলিলেন না। কামনা-ও কিছু বলিল না, পিতার স্নেহতৃপ্ত হৃদয়টির কথা ভাবিতে ভাবিতে সে'ও তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাকে কখনো দেখে নাই, দেখিবার সম্ভাবনাও নাই, বিদ্যা-সম্পর্করহিত, অশিক্ষিত সেই লোকটির চেহারা, তার আকৃতি অবয়ব—সমস্তই কামনার মনের মধ্যে এক সৌন্দর্য্যের জাল বুনিতেছিল।

হঠাৎ এক সময়ে মনে হইল, মাতুল এখনো হয়ত নীচে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন, অনেকক্ষণ হইয়া গেছে, নিশ্চয়ই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন, ভাবিতেই সেই জঘন্য নীচ প্রসঙ্গটা ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত মন যেন অশুচি স্পর্শে ভিজা যাইয়া 'ছি ছি' করিয়া উঠিল।

কামনা আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, পিতার সামনে আসিয়া কম্পিত মৃদুকণ্ঠে কহিল—শান্তবাবুর কথা কি বলছিলে বাবা?

রাজেশ্বরও কোন গাঢ় চিন্তায় বিভোর হইয়াছিলেন, কামনার আহ্বানে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কন্যার মুখের পানে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

কামনা কথাটা বলিয়া উত্তর লইতেই চায় এবং সেই উদ্দেশ্যেই একটি মুহূর্ত্ত পূর্বে প্রশ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু সেই কথাটাই পুনরুচ্চারণ করিতে কেমন একটা দ্বিধা আসিয়া পড়িয়াছিল, পিতা কথাটা শুনিবার জন্য উগ্রগ্রীব হইয়া রহিয়াছেন, না বলিলেও নয়—কামনা জড়িতকণ্ঠে কহিল—শান্তবাবুর কথা তুমি যে কি বলছিলে বাবা।

রাজেশ্বর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন—হ্যাঁ, সেই কথাটা, ঠিক। তোমার মামা বলছিলেন, শান্ত না-কি এখানে এসেই ছিল!

কামনা কি বলিতেছিল, রাজেশ্বর হৃদ্বেগিতে তাহাকে থামিতে বলিয়া, কহিলেন—শোন কামনা, তোমার মামার ধারণা, শান্ত এখানে ছিল বলেই তুমি ওর ওখান থেকে চলে এসেছিলে!

কামনার হাত-পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এত বড় জঘন্য মিথ্যা, কুৎসিত কথাও যে কেহ বলিতে পারে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। মুখের সমস্ত রক্ত তাহার হু হু করিয়া নামিয়া মুখখানিকে শ্বেত পাণ্ডু করিয়া দিল। কামনা অতিকষ্টে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া উঠিল—এ মিথ্যে কথা বাবা! এমন মিথ্যে···

রাজেশ্বর বলিলেন—তোমার মামা ঘোর কুমি অনুমান করেছিলেন।

কামনা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—অনুমান না বাবা, শান্তবাবু এসেছিলেন, আমি আসবার একদিন পরে আমিই ওঁকে টেলিগ্রাম করে আনিয়েছিলুম। দরোয়ান, সদানন্দ এরা সবাই জানে বাবা! তুমি তাদের জিজ্ঞাসা কর বাবা।

রাজেশ্বর কন্যার হাতদু'টি ধরিয়া বুকের কাছে টানিতে বলিলেন—আমি কাউকেই জিজ্ঞাসা করতে চাইনে কামনা।

কামনা পিতার দিকে চাহিয়া আকুলস্বরে কাঁদিয়া উঠিল! পিতা এতদূর অবিবেচনাও তাহার সম্বন্ধে করিতে পারেন, ইহা কল্পনা করিতেও তাহার বুক ভাঙিয়া যাইতেছিল। পিতা যদি সত্য কথাটা না-জানিয়া এমনই একটা অসত্য হৃদয় মধ্যে পোষণ করিতে থাকেন, কামনা তাহা সহ্য করিবে কি করিয়া? সেই মিথ্যার বশে কন্যাকে তিনি কি আর পূর্বের মত—

রাজেশ্বর প্রশান্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—আমি আমার মেয়েকেও জানি, শান্তকে-ও জানি, কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আমার কোনো দরকার নেই মা!

কামনা আর পারিল না, পিতৃস্নেহার্দ্র হৃদয় এই কথায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, কামনা মাটিতে বসিয়া পিতার পা দু'টি কোলের উপর তুলিবার চেষ্টা করিতেই, রাজেশ্বর কন্যাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহগদগদকণ্ঠে কহিলেন—তোমার মামা তোমাকে একমাস দেখেছেন, ভুল করতে পারেন, যে তাকে—এতটুকু মেয়েকে এত বড় করেছে, সে ভুল করতে পারে না! সদানন্দ! মামাবাবুকে বল, আমি নীচে যাচ্ছি।

সদানন্দ জানাইল, তাঁহারা বহু পূর্বেই প্রস্থান করিয়াছেন, রাজেশ্বর একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া কন্যাকে পার্শ্বে বসাইয়া, আবার রেঙ্গুনের গল্প সুরু করিয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

বইএর পোকা

[শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুহ ঠাকুরতা বি-এ]

কথায় বলে বই বাজারেও কাটে আবার পোকায় ও কাটে। যাদের অদৃষ্ট ভাল তাদের বই বাজারে বেরুতে না বেরুতে শেষ হয়ে যায় আর যাদের নিতান্ত দুরদৃষ্ট তাদের কাক কাক জীবনের শেষ পর্য্যন্ত প্রথম সংস্করণের বই ক'খানও কাটতি হয় না। এই শেষোক্ত গ্রন্থকার দিগের অবস্থা যে কি হয়ে দাঁড়ায় তা যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরাই বুঝতে পারবেন। বেচারাদের বই বাজারে ত কাটেই না, অত খরচ করে বই ছাপিয়ে অযত্ন ক'রে ফেলে রাখাও চলে না। যত্ন করে আলমারী বোঝাই করে রেখেও নিশ্চিন্তি নেই কখন পোকায় কেটে সব নষ্ট ক'রে ফেলে! পোকার উপদ্রবের হাত থেকে বাঁচলে না হয় একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারা যায়, এই আশায়, যে আজ না হয় কাল বই বিক্রী হতেও বা পারে কিন্তু বই বাক্স বন্দী ক'রেও নিস্তার নেই। একদিকে নিষ্ঠুর সমালোচকের খোঁচা অন্য দিকে পোকার জ্বালায় বেচারারা একেবারে অস্থির হ'য়ে ওঠে।

বাস্তবিক গ্রন্থকার কেন, বড় বড় বিদ্বান বুদ্ধিমান এমন কি প্রায় লেখাপড়া জানা লোকেই, বইএর পোকার জ্বালায় বিব্রত হয়ে পড়েন। লাইব্রেরীখানার ত কথাই নাই, অন্ততঃ যেখানে ৫০ খানা বইও একত্রে রাখা হয় সেখানেই পোকার উপদ্রব টের পাওয়া যায়।

ইঁদুর, উই ইত্যাদি ছাড়া বইএর আরও অনেক শত্রু আছে। তাদের খাদ্য শুধু মলাট বা কাগজ। এক রকমের পোকা আছে যে গুলো ছোট ছোট ছিদ্র ক'রে মলাট থেকে পিছন দিক পর্য্যন্ত একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। কোন কোন গুলি আবার একটু বাঁকা পথ ধ'রে ডানদিক থেকে বাঁ দিকে খেতে খেতে চলে। এ সব পোকার খাদ্য শুধু বই-ই নয়—কেতা-কাঠ, শুকনো তরকারী ইত্যাদি সবই এরা খায় তবে বইটাই তাদের সব চেয়ে প্রিয়। এদের চেহারা বাদামী রংএর। খুব ছোট ধরণের। হাত পা সব শুদ্ধ ছয়টী, দুইটী শুঁড়। বইএর ভিতরে ছিদ্র ক'রে ডিম পাড়ে। বাচ্চা গুলো প্রথম অবস্থায় থাকে কৃমির মত, তার পরে হাত পা ক্রমে ক্রমে গজাতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে এদের দাঁতের শক্তি পরীক্ষা চলতে থাকে বইএর উপরে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এ সব পোকা আমদানী হয়েছে ইয়োরোপ থেকে, ভারতবর্ষ এদের জন্মস্থান নয়। অবশ্য কচুরী পানার মত দেখতে সুন্দর ব'লে কেউ এদেশে নিয়ে আসেনি। হয়ত বই বা কোন পণ্য দ্রব্যের ভিতর লুকিয়ে এসে এদেশে বংশ বিস্তার করে ফেলেছে।

বইএর বড় রকমের শত্রু হচ্ছে আরশুলা বা তেলাপোকা। এদের বইএর মলাটের উপর বেজায় টান, বিশেষ ক'রে লাল রঙটীর উপর। মলাটের রঙ গুলিকে খেয়ে খেয়ে একেবারে বিশ্রী করে দেয়। এরা ডিম থেকে বেরিয়ে আর কৃমির অবস্থায় কাটায় না, একেবারে তেলাপোকা হয়ে জন্মায়।

যে সব বই খুব ঘন ঘন নাড়া চাড়া পায় সে সব বইএর ভিতর প্রায়ই পোকা দেখা যায় না। যদি দু একটাও দেখা যায় তবে সব বই একেবারে ঝাড়া মোছা করা ছাড়া এদের হাত থেকে আর বাঁচবার উপায় নাই, কারণ এরা ক্রমেই বেড়ে চলতে থাকে। যদি আক্রমণ খুব বেশী রকম হয় তবে সব বই আলমারী থেকে নামিয়ে একটা কাঠের বাক্সে বন্ধ ক'রে গন্ধক দ্রাবক ঢেলে দিতে হয়। গন্ধক দ্রাবক জিনিষটী বাতাসের সংস্রবে আসামাত্র উড়ে যায় আর বইয়ের সব পাতার ভিতর ঢুকে পোকা গুলোকে মেরে ফেলে। তখন আলমারী গুলোকে সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে তার পরে বই সাজিয়ে রাখলে শীগ্‌গির আর পোকা আক্রমণ করে না। গন্ধক দ্রাবক দিয়ে বইএর পোকা নষ্ট করবার নিয়ম হচ্ছে ২০০ কিউবিক ফুট জায়গায় ১ পাইণ্ট দ্রাবক ঢালা। আর অন্ততঃ ২৪

ঘণ্টা এর ভিতরে বই গুলোকে ডুবিয়ে রাখতে হয়। তেলাপোকার অত্যাচার যেখানে খুব বেশী সেখানে এক ভাগ সোহাগা দুই ভাগ সিরাপের সঙ্গে মিশিয়ে মিশিয়ে টীনে বা কার্ডবোর্ডে মেখে বইএর আলমারীর কোণায় রেখে দিলে তেলাপোকা গুলো খাওয়া মাত্র মরে যায়। তেলেপোকার পক্ষে সোহাগা মহা বিষ।

আর এক রকমের পোকা আছে দেখতে লম্বা ধরণের, রূপার মত রং। এরা কাগজের চকচকে ঝকঝকে পালিশটুকু আর বই জোড়া দেবার আঠা খেতে খুব ভালবাসে।

এদের হাত থেকে পুস্তকগুলো রক্ষা করবার জন্য কথা মনে রাখলে আর একটু যত্ন নিলে দামী দামী বই গুলো আর পোকার হাতে পড়ে বছর বছর নষ্ট হয় না।

১। বইতে পাতা জোড়া দিতে কখনো ভুঁতে মাখান আঠা ছাড়া শুধু ময়দার আঠা ব্যবহার না করা।

২। আলমারিটি মজবুত ও পরিষ্কার থাকা দরকার। বইগুলি একটু ফাঁক ফাঁক করে সাজিয়ে ন্যাপথলিন দিয়ে রাখতে হয়।

৩। আলগা কাগজপত্র আলমারীতে না রেখে কাঠের বাক্সে ভাল করে বন্ধ করে রাখা দরকার।

৪। মাসান্তে না পারলেও অন্ততঃ তিন মাস অন্তর বই গুলিকে আলো হাওয়া লাগান ভাল।

৫। বর্ষাকালেই বই বেশী খারাপ হয়ে যায়, তাই বর্ষার আগে নীচেকার লেখা যে কোন একটা ওষুধ দিয়ে বই গুলি মাখিয়ে রাখা উচিত। বই খানাকে বন্ধ ক'রে শক্ত করে চেপে ধরে মলাটের সবটা বইয়ের পাতার মুখ ও পিছনের বাঁধাই জায়গা বিশেষ করে ওষুধ লাগাতে হয়। যে কোন একটা লাগলেই যথেষ্ট।—

(ক)	মেথিলেটেড স্পিরিট—	৪ আউন্স
	কারবলিক এসিড—	১
	Corrosive Sublimate—	১ "
(খ)	মেথিলেটেড স্পিরিট—	১ কোয়ার্ট
	কর্পূর—	১ আউন্স
	কটকিরি চূর্ণ—	½ "
	Corrosive Sublimate—	১

দুটো জিনিষই খুব বিষাক্ত। হাতল ওয়ালা ব্রুশ দিয়ে লাগানই নিরাপদ। গরমির দিনে লাগালে মাঝে মাঝে আলমারী খুলে হাওয়া লাগাতে হয় নয়, ও বিষটা একটু ছড়াতে পারে।

(গ) কেরোসিন তেল (সব চেয়ে ভাল যা পাওয়া যায়) ১ পাইন্ট

ন্যাপথলিন— ২ আউন্স

শেষোক্ত ঔষধটি বিষাক্ত নয়। এটা লাগানই সব চেয়ে ভাল। তবে ঔষধ লাগিয়েও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা ভাল নয়। মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দেখলে পোকার ধরবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

"কান্তকবি রজনীকান্ত"

(আলোচনা)

গত পহেলা বৈশাখের "বাসন্তী"তে অন্যান্য লেখিকা শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী মহাশয়া "কান্তকবি রজনীকান্ত" নামক চরিত পুস্তক সমালোচনায় গোড়ায় বাঙ্গালা ভাষার যে চার জন উল্লেখযোগ্য জীবনচরিত লেখকের নাম করিয়াছেন, দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, তাহার মধ্যে 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত'-কার সুপ্রসিদ্ধ ও প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ মহাশয়ের নাম নাই। অথচ অতি আধুনিক লেখক-লেখিকা অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী হেমলতা দেবীর নাম রহিয়াছে। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পর যোগীন্দ্রবাবুই বোধহয় বঙ্গভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুলিখিত জীবন চরিত (মাইকেল দত্তের) প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার নাম বাদ পড়ায় আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

শ্রীরাধাচরণ দাস,
অধ্যক্ষ, রজনীকান্ত পাঠাগার, পাবনা।

বিদেশের স্মৃতি

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল]

বজ্রায় আসিয়া স্থির হইল যে 'জি' বাবুর সহিত অন্তত মায়রা পর্য্যন্ত আমাকে যাইতে হইবে। তাঁহাদিগকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া ঠিক নয়। 'জি' বাবুকে সঙ্গে লইয়া ট্রেণনে গেলাম। লোকে লোকারণ্য। শুনিলাম যে Second class টিকেট তো নাই-ই, থার্ডক্লাস টিকেট ও পাইবার উপায় নাই। কি করা যায়? 'কা' বাবুকে যাইতেই হইবে। তাঁহার খুড়ার একমাত্র মেয়ে কাতর। টেলিগ্রাফ পাইয়া যাইতেছেন। কি করা যায়, টুপির পরপারপর হইলাম। "Where is the Station master? I want him" বলিয়া প্রশ্নের উত্তর করিবার পূর্ব্বেই ফটক পার হইয়া প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখিলাম সমস্ত থার্ডক্লাস গাড়ী খালি, কেবল একখানে সমস্ত লোক বোঝাই করিতেছে। সমস্তই বুঝিলাম, মৃদুহাস্যে Station masterকে বলিলাম "We are in difficulties" তিনি সেইরূপ হাস্য করিয়া বলিলেন "have patience" আমি বলিলাম "Patience is bitter" এবং পকেটে হাত দিলাম, তিনিও হস্ত প্রসারিত করিলেন। হাতে হাত মিলিল। তিনি বলিলেন "Thank you" ইহা মুদ্রা দক্ষিণা। পরক্ষণেই একটী এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক আসিয়া আমাদিগকে ৩ খানা টিকিট দিয়া গেলেন এবং একটি খালি কামরাও দেখাইয়া দিলেন। সেখানে 'জি' বাবুকে বসাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাসায় ছুটিলাম। গাড়ী ভাসিয়া যাল বোঝাই দিয়া রওনা হইতেই 'জি' বাবুর স্ত্রী বলিলেন "আপনি তাড়াতাড়ি দুধ খেয়ে নিন" 'কা' বাবুকে রওনা করিয়া দিয়া 'ঘি, ডিম সিদ্ধ' ইত্যাদি দিয়া সেই গরম গরম দুধ অল্পের সদগতি করিলাম। এই ক্ষুদ্র পরিবারের সহিত মাত্র দুদিনের আলাপ ইহার মধ্যে ইহারা যেন আমার নিতান্ত আপনার লোক হইয়া উঠিয়াছেন। বিদায় গ্রহণ করিয়া ট্রেণনে ফিরিলাম। দেখি যে 'কা' বাবুর সহিত কয়েকটী কুলী গোলমাল করিতেছে। আমি যাইয়াই হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলাম "উঠাও, আভি, জল্‌দি চালাও" বন্য চালিতের মত তাহারা মাল উঠাইয়া লইল। এখন আর এক সমস্যা। থার্ডক্লাসে ঢুকিবার দরজা বন্ধ হইয়াছে। কাই ক্লাসের দরজা দিয়া যাইতে হইবে। উপায় নাই—অগ্রসর হইলাম। টুপিটী ভাল করিয়া মাথায় বসাইয়া লইলাম। কিন্তু এক বিপদ, সঙ্গে বাঙ্গালী বিশেষত বাঙ্গালী মহিলা আছেন। সঙ্গে মেয়েছেলে দেখিয়া গেটের লোকটী ছাড়িল না—"No I Cant allow you" আমি তখন একেবারে desperate চেঁচাইয়া উঠিলাম "Get away you fool, we have got special permission from the Station master," লোকটী তখন নরম সুরে বলিল "Show it please sir" আমি বলিলাম "We are changing to 2nd class at Mayaveram, isn't it?" শেষের কয়েকটী কথা সম্মুখ দিয়া গার্ড যাইতেছিল তাহাকে যেন লক্ষ্য করিয়া বলা হইল। দরজা খুলিয়া গেল। তাঁহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আমার বৃহদাকৃতি চামড়ার ট্রাঙ্কটি লইতে আসিলাম। একটী বৃদ্ধ ফিরিঙ্গী মাল ওজন করিতেছিলেন, তাঁহাকে বলিলাম "I have been carrying it with me all through. I am travelling 2nde lass from Mayavoram and have got special permission from the Station master" শেষোক্ত কথা কয়েকটা মৃদুহাস্যের সহিত বলা হইল। সে অমনি হাসিয়া বলিল "All right" কামরায় আসিয়া দেখি সব ফিরিঙ্গি। সর্ব্বনাশ! European compartment এ বাঙ্গালী মেয়েছেলে লইয়া উঠিয়াছি! তখনই আর একটী খালি দেখিয়া 'কা' বাবুদিগকে সরাইয়া দিয়া নিজে ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পরসা দিয়া টেণে যাইব তাহার জন্য কত মিথ্যারই যে আশ্রয় লইতে হইল। হে "সিলোন রোট মেল" তোমাকে

নমস্কার, বোধ হয় জীবনে তোমাকে ভুলিতে পারিব না।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, কামরা একেবারে বোঝাই কাজেই বসিয়া বসিয়াই রাত্রি কাটাইতে হইল। হঠাৎ বাহিরে তাকাইয়া দেখি বিশাল নীল জলরাশি চন্দ্রকিরণে ঝল্‌মল্ করিতেছে। এটী তিনিপুত্ত হবে। ভিতরে ছোট ছোট পাহাড় কি সুন্দর দৃশ্য! এমন সুন্দর কিন্তু জীবনে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ঢেউগুলি আসিয়া একেবারে লাইনের গায়ে লাগিতেছে। একটী মায়াপুরী বলিয়া ভ্রম হয়। এখানে একটী reformatory school আছে। বোধহয় এই দৃশ্যই অনেক ছেলেকে শুধরাইয়া দেয়। চারিদিকে অসংখ্য নারিকেল ও কলার বাগান। মেসোপটেমিয়া ফেরতা একটী কৃষ্ণবর্ণ বালক ফিরিঙ্গি আমুদে সৈনিক এই কামরায় ছিল। সে এটায় উঠিয়া পড়িল। আমিও জানালায় বসিলাম। দূরে পর্ব্বত রেখা দেখা যাইতেছে। বোধহয় মহীশূরের পর্ব্বত হইবে।

ত্রিচিনোপল্লী :—সকালবেলা 'মায়াভরমে' গিয়া 'কা' বাবুর খোঁজ লইয়া দেখিলাম তাঁহারা ভালই আছেন। এখান হইতে পৃথক লাইন 'কারিকল' প্রভৃতি স্থানে গিয়াছে। বেশ বড় ষ্টেশন। একজন যাত্রী নামিয়া গেল আর একজন সৈনিক পুরুষ তাঁহার ১০।১১ বৎসরের মেয়েকে লইয়া উঠিলেন। মেয়েটি আশ্চর্য্য অস্থির কেবল ছুটাছুটি করিতেছে। অল্পক্ষণ মধ্যেই আলাপ হইয়া গেল। তখন বুঝিলাম আমি ব্যতীত আরও দু'জন চ্যাপেল আবরনে আছেন। একজন পাদ্রে ধরা পড়েন, তবে কথাই বলিতেছেন না। তিনি আমাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন "Are you Mr. Prithwish Ch. Ray who came from England" আমি অবশ্যই 'না' বলিলাম। সৈনিক পুরুষ বোধহয় ৭০।৭২ বৎসরের হইবেন কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ ও আমোদপ্রিয় তাঁহার মেয়ে এরূপ হইবে না তবে কি আমাদের হইবে? তিনি আফ্রিকা ও মেসপটেমিয়া গিয়াছিলেন। সে সমস্ত স্থানের অনেক গল্প করিলেন। বাঘ, সর্প ও নানারূপ ভয়ানক জানোয়ারের গল্প আমরা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

ট্রেণ তাঞ্জোরে আসিয়া থামিল। প্রকাণ্ড ষ্টেশন। চা পানের জন্য নেমে। আর ২টী বন্ধু কফি পান করিবেন। এই একটী ধরা পড়িবার স্থান। এ দেশীয় লোক সাহেব থাকিলেও চায়ের পরিবর্ত্তে কফি পান করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না।

ট্রেণ চলিতে লাগিল। দূরে পাহাড় দেখা যাইতেছে বোধহয় নীলগিরি হইবে। সেই একই দৃশ্য অধিকন্তু স্থানে স্থানে বকফুলের চাষ দেখিলাম। ইহা কেন চাষ করা হয় বুঝিলাম না। একজন বলিলেন vegitables বিশ্বাস হইল না। দূর হইতে ত্রিচিনাপল্লীর কেল্লা দেখা যাইতে লাগিল। বিরাট খাড়া পাথরের পাহাড়ের উপর এই কেল্লা। দেখিলেই বোধহয় বর্ত্তমানকালের Jack Jonson প্রভৃতির আবিষ্কারের পূর্ব্বে ইহা অভিশয় দুর্ভেদ্য ছিল। ইহা একটী বড় ষ্টেশন এখান হইতে Erode গিয়াছে।

দান ও পুণ্য

(মনু)

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

গর্ব্ব কোরোনা পুণ্য করেছ ব'লে,
দান কর, মুখে বোলোনা দানের কথা;
গর্ব্ব প্রচারে পুণ্য সে যায় গ'লে,
ব'লে বেড়াইলে দানেরি সে ক্ষুদ্রতা।

ভ্রম ও মূর্খতা

(Colton)

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

ভ্রম,—সে কাগজ হিজিবিজি আঁকা,
প্রথমে মিটাও দাগ ও রেখা;
মূর্খতা,—যেন আলেখা কাগজ,—
চলিবে, চালা'লে তাহাতে লেখা।

অদ্ভুত সৃষ্টি

(সংগ্রহ)

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ]

সৃষ্টিকর্ত্তার ভাব বৈচিত্র্যই তাঁহার অসীমত্ব শক্তির প্রধান দৃষ্টান্ত। এই বিরাট বিশ্ব যাহার রচিত তাঁহার বাহাদুরীর পরিচয় জীব তো অহরহ পাইতেছে কিন্তু তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

সম্প্রতি আমেরিকায় একটী অদ্ভুত বালিকা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। বালিকাটীর বয় মাস বয়সেই ১৬টী দাঁত উঠিয়াছে এবং তাহা সম্পূর্ণ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন শিশুটীর অন্যান্য অদ্ভুত কাহিনীও প্রকাশ পাইয়াছে। তার দেহের ওজন ৫০ পাউণ্ড বা প্রায় ২৫ সের। ম্যাসেচিয়া ষ্টেট বাসনার বালক বোধহয় ৯ বৎসরেও এরূপ দেহ লাভ করে না। তার পর, বালিকাটি ৪২ ইঞ্চি লম্বা অর্থাৎ প্রায় ২½ হাত এবং তাহার বুকের মাপ ৩১ ইঞ্চি বা ১½ হাত। এখন হইতে স্বাধীন দেশের নাগরিকের বুকের পাটা বোধ হয় এইরূপেই বৃদ্ধি পাইবে। সে আবার কথাও বলে। মোটের উপর তাহার আকৃতি দৃষ্টে তাহাকে পূর্ণ তিন বৎসরের শিশুর মত বোধ হয়। শিশুটীর জন্মদাতা পিতার বয়স মাত্র ৬০ বৎসর এবং মাতা শিশুর পিতার সেবার জন্য স্বরূপ তেজ পক্ষ ('পিস্তিরকিনী') কিনা সঠিক জানা না থাকিলেও সে যে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্কা পূর্ণ যুবতী এ সংবাদ আমরা পাইয়াছি। এ হেন পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে যখন জন্ম, তখন একটা আশ্চর্য্য কিছু না হওয়াটাই অন্যায়। দেখা যাইতেছে তৃতীয় পক্ষ হইলেই বাজি মাত বলা যায়। এই শিশুর আবার একটী ভাইও আছে। বেচারীর কি কষ্ট! হয়তো ফুটবল খেলিতে সে আর মাঠে যাইতে চাহে না। প্রিয় তনয়ের জালা-সদৃশ ক্ষুদ্র দেহটীকে বক্ষে ভাসিয়া লাথি খাইতে গিয়া হয়তো জীব চড়ার ঘায়ে ঠেকে। আর যদি স্কুলে গুরু মহাশয়ের নিকট পৃথিবীর আকার বর্ণনা করিতে না পারে তাহা হইলে বালকটী নিশ্চয়ই বেত্রাঘাতে মস্তক ঘূর্ণনকালে পৃথিবী যে গোলাকার তাহা বুঝিতে পারে আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার তাহার এই দুঃসময়ে একটু সান্ত্বনা দেয় কেননা স্বাভাবিক বাস্তবকে (practical reality) দৃষ্টকোণে পাইয়াও সে অবহেলা করিয়া বিজ্ঞানের শান্তি পাইতেছে। যাক্, এই যে ক্ষুদ্র দেহটী, ইহা শুধু তাহার পরিবারটীকেই বিচলিত করিয়া ছাড়ে নাই। সমস্ত আমেরিকায় হুলস্থুল বাধাইয়াছে।

বালিকার স্বাস্থ্য যে সুন্দর তাহা দেহের বিবরণেই সুপ্রকাশ। বৃদ্ধ পিতার সুসময় কিনা তাই এই অদ্ভুত জীবের কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই এবং ডাক্তারের টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশীয় চিকিৎসকেরা শিশুর জন্মটাই একটী ব্যাধি কিনা এ বিষয়ে মৌলিক গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন। হতভাগা বৈজ্ঞানিকের পোড়া অদৃষ্টে আর অবসর নাই। বালিকার পা দুইখানি খুব ছোট এবং দেহের ভার বহিতে অসমর্থ; সুতরাং বালিকা একেবারেই চলিতে পারে না। সৃষ্টিকর্ত্তার কেমন নিরপেক্ষ বিচার। তিনি এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে তাহার নিকটেই সকলে ছুটিয়া আসিবে, তাহাকে আর পায়ে হাঁটিয়া কোথাও যাইতে হইবে না। তাহাকে দেখিতে সাধ হয় না, এমন লোক কয়জন আছে?

আর কোন তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী এরূপ ভাগ্য প্রার্থনা করেন কিনা বলা কঠিন তবে বালিকার মাতা এই অপূর্ব্ব রত্ন প্রসব করিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। বটেই তো; জগৎ জোড়া নাম হইয়াছে যে!

বালিকাটীকে লইয়া ব্যবসায়ীরা টানাও বেশ চলিয়াছে। বহু দরখাস্ত পড়িয়াছে। কেহবা প্রদর্শনীতে বালিকাটিকে দেখাইবার অভিপ্রায়ে ক্রয় করিতে চাহে, কেহবা বিজ্ঞাপন চালাইবার মতলবে অর্থ দিতে চাহিতেছে। আবার নাকি অনেক ঔষধ বিক্রেতা বালিকার ফটোগ্রাফ লইয়া তাহার এই ঔষধ খাইয়া এ দেহ বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা পত্র ছাপাইবার অনুমতি চাহিয়া বালিকার মাতাকে প্রচুর অর্থ লোভ দেখাইয়াছে। আহা! যদি গণেশঠাকুর কিছুদিন আগেও জন্মাতেন তাহা হইলে বালিকার পানিগ্রহণ করিয়া জাতিভেদ সমস্যার মূলে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিতেন। আর তো পায় দেখিনা। হায়, আমাদের একজিবিসনের সেই শিংওয়ালা মানুষটা যদি এই রূপসীর প্রেমে পড়েন, তবেই যোগেন যোগং ঘুচাতে হবে যায়। আমরাও ২।১টী নূতন সংস্করণের ক্ষণায়ুষ মুনি দেখিয়া জীবন সার্থক করি। হায়রে! কলির আয়ু বুঝি শেষ হয়ে আসে।

নব বসন্তে

প্রিয়জনকে উপহার দিতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে আমাদের আইভিক্লাস স্নো-ক্রিম এবং মেসিন প্রস্তুত—চন্দন, বকুল, বাসন্তী ও জবাসেট সাবান ব্যবহার করুন।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী

৬৪।১এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪৯৬

রাজকবি

(শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ)

ছিয়াশী বছর আগে ইংলণ্ডে রাজকবির (পোয়েট লরিয়েট) পদের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত ষোলজন লেখক এই সম্মানের পদ পেয়েছেন।

১৬১৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী বেন জনসন প্রথম পোয়েট লরিয়েটের পদ পান। এর আগেও অনেক কবি খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন বটে এ পদ কেউ পান নি। সেক্সপিয়ার যে বছর মারা যান সেই বছরেই এই সম্মানের পদের সৃষ্টি হয়।

বেন জনসন প্রথম রাজকবি। তারপর রাজকবি হন সার উইলিয়াম ডেভেনাণ্ট। ইনি থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন এবং ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে ইনিই সর্ব্বপ্রথম অভিনেত্রীদের নিয়ে অভিনয় প্রচলিত করেন। ইনার আগে ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে সব ভূমিকাই পুরুষের দ্বারা অভিনীত হোত। সার উইলিয়ামের পর জন ড্রাইডেন, সাদে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি রাজকবি হন।

প্রথম রাজকবির মাইনে ছিল একশ' মার্ক। তারপর ক্রমে সেটা একশ পাউণ্ড দাঁড়ায়। এই একশ' পাউণ্ড মাইনের সঙ্গে রাজকবিরা আবার রাজার মদের ভাণ্ডার হতে এক ডাঁড় করে মদ পেতেন। রাজকবিদের মাইনে ক্রমে বেড়ে তিনশ' পাউণ্ড হোল। রাজকবি বেন্থাম ষষ্ঠ রাজত্বকালের সব বা কিছু তার বদলে মাইনের সঙ্গে আলাদা পাঁচশ পাউণ্ড নিতেছিলেন।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সময়ে রাজকবির মাইনে ক্রমে গিয়ে বছরে নিরানব্বই পাউণ্ড হয়। আজকাল ইংলণ্ডের পোয়েট লরিয়েট যা রাজকবি হচ্ছেন ডাক্তার বাট্রি নিজেন।

রাজকবির পদ খুব সম্মানের হলেও অনেক কবি এ পদ পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেছেন। গ্রে, সার ওয়াল্টার স্কট রাজকবির পদ পেয়েও নেন নি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও সাদে এ পদ নিতে অস্বীকার করেছিলেন—পরে আবার গ্রহণও করেছিলেন।

রাজকবির অমন সম্মানের পদ পেয়েও অনেকের ঈর্ষ্যারই বস্তু অপরাজিতে ফেলেছে। এর মধ্যে কিসমিসে পদ্ধতির ছন্দ, তুকবন্দকে মেনে চলতে হয়েছিল। একজন কবির ঘাড়ে চেপে বসেই মারা গিয়েছিলেন।

পত্র লেখকগণের প্রতি

শ্রীযুক্ত "ব্যথাহরণ" আজিমগঞ্জ। "সতীত্বহরণ" সম্বন্ধে আমাদের প্রতিনিধির লিখিত বিবরণ পূর্ব্বেই (৩য় সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছে, আপনার বক্তব্য পাঠাইয়া দিলে প্রকাশযোগ্য হইবে কি-না বিবেচনা করা যাইবে।

শ্রীমতী অনিলা চৌধুরী বি-এ। আমরা অবগত আছি, আপনার পুরোক্ত "বাণী" ইমাই সহরের বাসিন্দাদের হইতে একখানি আবেদন পাইয়াছেন, আপনার পত্রটি ঐ কাগজেই পাঠাইয়া দিবেন। অপ্রকাশ্য কারণে "হাতীর দাঁত" দেখানো সম্ভব নয়।

শ্রীযুক্ত কল্পনাময় বসু, শান্তিপুর। আপনার "ভাবের ঘরে" প্রেরণ চিত্তরঞ্জনের নিকট পাঠাইয়া দিলেই ভাল করিবেন। "বাসরীতে অন্ত ৭৫ ভাষা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়।

যে সব বিজ্ঞাপিত কাগজ পান না, তাঁহাদের নিকট আমাদের অনুরোধ তাঁহারা যেন প্রত্যহই ডাক-ঘরে সন্ধান করেন। আমাদের অফিস হইতে সকল কাগজই এক তারিখে ডাকে দেওয়া হয়, যা পাইবার কোন কারণ নাই। তবে ডাক-বিভাগে গোলযোগ হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নয়, কাজেই আমরা অফিসকে সব সময়ে অপরাধী করা অনুচিত।

বৈশাখের শেষে সংহতি নামে বাঙ্গালী শ্রমিকদিগের একখানি মাসিকপত্র বাহির হইবে। শ্রীযুক্ত কাশিনী রায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ইহাতে নিয়মিত-ভাবে লিখিবেন। ইহার বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ দুই টাকা মাত্র, প্রতি সংখ্যা তিন আনা। কার্য্যালয়—১৯২ শ্রীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা।

বিদ্যাসাগরের গৃহ।

বিদ্যাসাগরের বাসাবাড়ী বিলাতে চলিতেছে—আগামী ২৩শে যে এই নিলামের দিন। এখানকার বাড়ীর ভোগে, উহার ঘরে, সভ্যতার বাহিতে প্রতিষ্ঠিত করে, ইংরাজরা হিসেব তাঁহাদেরই একজন। এদেশের কথা হ'চ্ছিই নেই—যে সব দেশে বাদুড়ের মত মানুষের অভাব নাই, সে সব দেশেও বিদ্যাসাগর বেশী জন্মায় না—অতিথি কবরেও দুই একটি জন্মগ্রহণ করে। সেই বিদ্যাসাগরের বাড়ী নিলামে চড়িয়াছে। অবশ্য সে ব্যাপার দ্বারা এ দেশের ভিতর যে কোনরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। জাতির প্রাণ থাকিলে, কৃতজ্ঞতা বোধ থাকিলে, এ ব্যাপারে এরূপ নির্লিপ্ত হইয়া থাকা যে সম্ভবপর হইত না, তাহা বলাই বাহুল্য। বিদ্যাসাগরের গৃহ বাঙ্গালীর তীর্থভূমি। তীর্থ-দর্শনে গমন করা জাতির কর্ত্তব্য, মানুষের কর্ত্তব্য, নারী-নিবর্ম সকলেরই কর্ত্তব্য। কথাটা হয় তো এখনো জানেন না। সুতরাং ইহা লইয়া দেশের ভিতর বিশেষভাবে আন্দোলন হওয়া উচিত। আন্দোলনকে ভাল ভাবে পরিচালিত করিতে পারিলে এই গৃহটি বর্ত্তমানের হাত হইতে উদ্ধার করিবার মত অর্থ সংগৃহীত হওয়া হয় ত একেবারে অসম্ভব মাত্র হইতে পারে।

"বরাহ"

আগামী জুলাইয়ের ২৩শে ও ২৪শে তারিখে বরিষালের অন্তর্ভুক্তি—কাটালপাড়ার সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির অধিনায়ক হইয়াছেন—সৈয়াটি মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর বঙ্গাকান্ত মিত্র এবং সম্পাদক হইয়াছেন আমাদের অন্যতম সহযোগী বন্ধু ও ভাই অধিনীকুমার—এডিটরটি। সম্মিলনীর সভাপতিকে হইবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক ফিলোটার ডাঃ শ্রীযুক্ত সরলাক্ষ ঘোষ এম্-ডি সম্পাদিত। ২৯নং হুর্গাচরণ ব্যানার্জ্জির ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। ধাত্রীবিদ্যা ও হোমিওপ্যাথী বিষয়ক মাসিকপত্রের অনেক আর্টিকেল ইহাতে আছে। আমরা ৮ম বর্ষের ১ম সংখ্যা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি।

"মনে মানিয়াছি যেন তিনটি ভগিনী
আপন ভাগের তোমায় দিব অর্দ্ধ-খানি।
ইহাতে তোমার যদি জন্মায় নন্দন,

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ৫ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩০, ইং ১৯শে মে। [৪২শ সংখ্যা

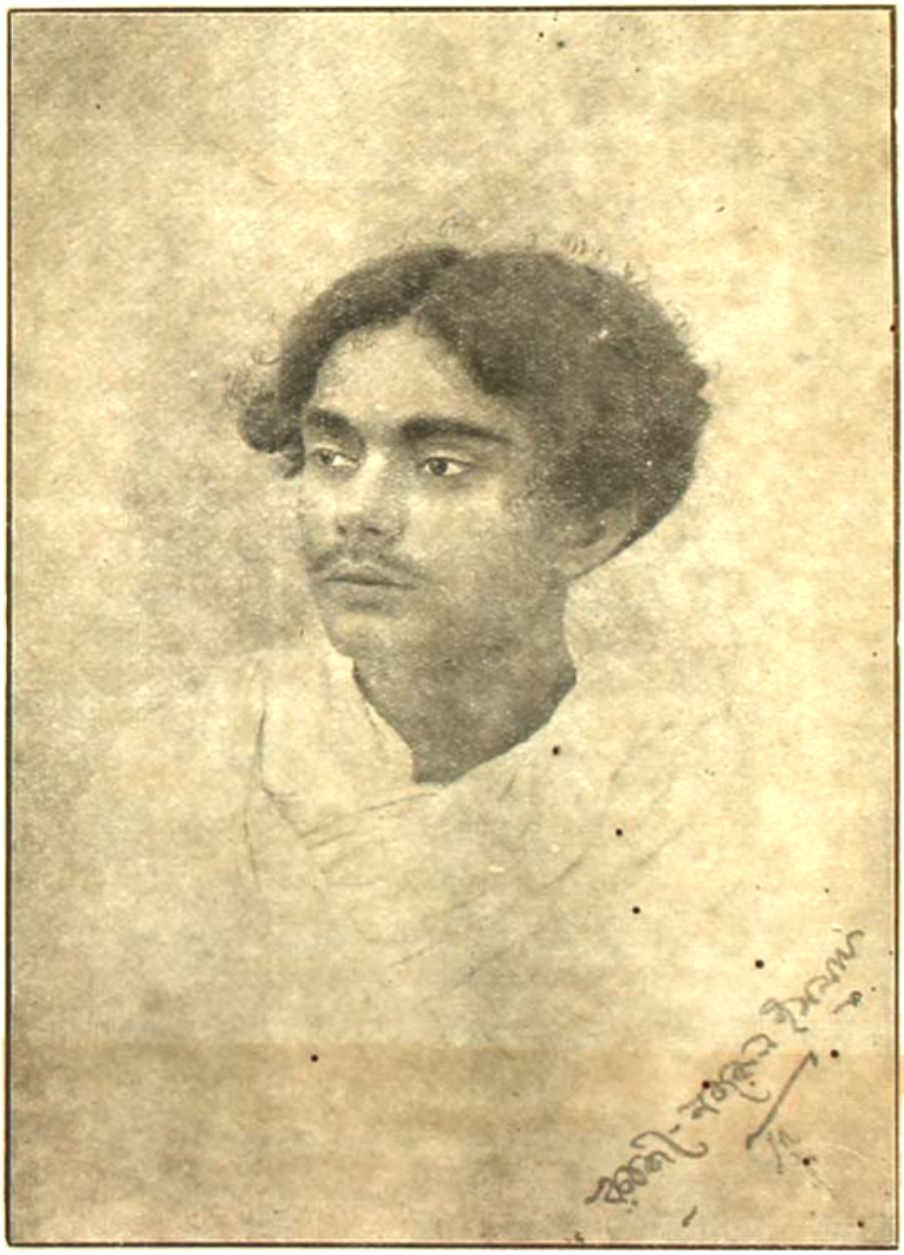

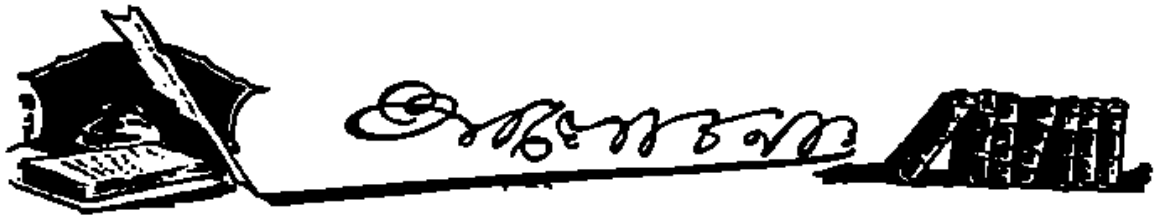

সত্য মৃত্যু জীবনে একবারই আসে—বার বার আসে না। বীর যে সাহসী যে মৃত্যুকে সে একবারই বরণ করিয়া লয়। ভীরু অ-সাহসী, জীবনে শ' বার সহস্র বার, লাখ কোটি বার মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। ভীরু জীবন বহিবার দুর্ভাগ্য যতদিন যত কাল ভোগ করে মরণ ভীতি ততদিন প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে তাহাকে জ্বালাইয়া মারে। জীবনের শেষ পরিণাম যে মরণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষ ও অপরাপর প্রাণী জন্মিতেছে আর মরিতেছে। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে যে ফাঁকটুকু থাকে তাহার মধ্যেই মানুষ নিজ মনুষ্যত্ব দেখাইতে চাহে। যে মানুষ তাহা পারে না—সে স্বভাবের ব্যতিক্রম করিতে যায়—জীবন তাহার পক্ষে মৃত্যুর সমানই থাকিয়া যায়। প্রতি মুহূর্তে মরণ বিভীষিকা যাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে সে জীবনের রস মাধুর্য্য উপভোগ করিবে কোথা হইতে? তাই বীর যে সাহসী যে, সে জীবন দেবেই মরণকে বীর ভাবে—বন্ধুভাবে আলিঙ্গন দেয়। মরণকে বীর ভাবে বন্ধু ভাবে আলিঙ্গন দিবার মধ্যে মানব জীবনের সার্থকতা বিশেষ ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।

• • • •

জগতের মানব জাতির উন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যাহারা উন্নত হইয়াছে। স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে তাহারাই মরণ ভীতিকে এড়াইবার যথাসাধ্য শক্তি ও সাহস অর্জ্জন করিয়াছে। যাহারা মরণ ভীতিকে এড়াইবার সাহস ও শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে নাই তাহারা কোন কালে কোন দিন উন্নত বা স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে নাই। মরণকে যে ভয় না করে, মরণকে যে বন্ধু ভাবে সাহসের সঙ্গে বরণ করিতে পারে জীবনের সকল ভয়ের কারণই তাহার ক্রমে কাটিয়া যায়। ভয়ের কারণ—ভীতির মলিন কৃষ্ণ যবনিকা জীবনের শুভ্র সত্য জ্ঞানালোক-রাজ্যের উপর আবরণ টানিয়া রাখে। এই কৃষ্ণ আবরণের অন্তরায় মানুষের সকল উচ্চ প্রবৃত্তি, আশা বিনাশ করিতে থাকে মানুষকে মানুষ নামের অযোগ্য করিয়া ফেলে!

• • • •

যে যত হত দরিদ্র, যে সহস্র প্রকারে নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত, জীবনে ভোগ বা আনন্দের সন্ধান সে তিল মাত্র পায় না। জীবনটা যাহার পক্ষে শুধু একটা তীব্র হাহাকারের মত জীবনের উপর তাহারই দেখা যায় ভয় বেশী মায়া। মরণকে এমন মানুষেরাই বেশী ভয় করে। মরণকে বন্ধু ভাবে ভাবিতেও গ্রহণ করিতে না পারাতেই, মরণ ভীতি তাহাদের এমন ত্রস্ত ও অযোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। যোগ্য যে সংসারে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার তাহারই আছে। অযোগ্যের সে অধিকার নাই। তাই যোগ্য নিত্য অযোগ্যের সকল অধিকার হরণ করিয়া লইতেছে। যোগ্য মরণকে ভয় করে না। সে জানে মরণ জীবনে একবার বই দু' বার আসিতে পারে না। তাই প্রতি মুহূর্ত্তে মরণ ভীতিতে সন্ত্রস্ত হইয়া জীবনকে দুর্ব্বহ বোঝা করিয়া রাখিতে তাহারা চাহে না—সেরূপ জব থুব অসাড় অচল জীবন তাহারা পছন্দ করে না।

• • • •

মরণ ভীতি দূর করিতে দুর্ব্বলে পারে না। অ-সাহসী, অস্থিরমনা পারে না। তীক্ষ্ণ দৃঢ় সঙ্কল্প, প্রচণ্ড সাহস ও রক্ত তেজ ইহার-পেছনে থাকা চাই। উন্নত হইবার, মানুষ নামে পরিচিত হইবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ও তেজেই মানুষ মরণ ভীতিকে দূর করিতে পারে। ন্যায়ের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, অন্যায় নিবারণের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা যে মানুষের প্রাণে তেমন ভাবে জাগে সে মানুষ তিলে তিলে মৃত হইয়া পলে পলে মৃত্যু বিভীষিকা দেখে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সে মরণকে ডাকিয়া লয়। ন্যায় ও সত্যদর্শী মানুষ, মনুষ্যত্বে বলীয়ান

ভেঙ্গে দীপ্ত মানুষ কখনো জীবনে সাধ মেটে না—স্বভাবের নিয়মানুসারে সে একবারই মরে। অন্যায়েই মানুষকে বার বার মারে।

• • • •

তাই যুগে যুগে মানুষ যুদ্ধে বিগ্রহে স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করিয়া লইতেছে। যুদ্ধে মরিলে মানুষ স্বর্গে যায়—এ কথা আমাদের পুরাণে ইতিহাসেও যেমন বলে—অন্যান্য দেশের পুরাণ ইতিহাসও যুদ্ধে মৃত্যু সম্বন্ধে এই কথাই বলে। তাহার কারণ বোধ হয় ইহাই যে যুদ্ধে মরিলে মানুষ দেশের জন্য মশের জন্য, নিজ গৌরব রক্ষার জন্য শুধু একবার মাত্রই মরিবে—কিন্তু মরণ ভয়ে পিছাইয়া থাকিলে সহস্র অন্যায় অবিচার আসিয়া তাহাকে এমন ভাবে ঘিরিয়া ফেলিবে যে তিলে তিলে তাহাকে মরণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। পলে পলে তাহাকে মৃত্যু বিভীষিকা দেখিতে হইবে। এ অবস্থা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। তাই লোকে বীরত্বের সঙ্গে সাহসের সঙ্গে মরণকে বরণ করিয়া লইতে উৎগ্রীব হয়।

সুলেখিকা শ্রীমতী গিরিবালা দেবীর ছোট গল্প
"অন্ধের দৃষ্টি"
ও
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
নারীর দাবী
আগামী সংখ্যার "বাসন্তীতে" বাহির হইবে।

• • • •

মরণ বরণের সাধনাও জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। তাই যুগে যুগে দেশে দেশে বীরের মত মৃত্যু কামনার বস্তু। তাই কবি গাহিয়াছেন—

'এ মৃত্যু ছেনিতে হবে, এই তার জাল,
এই পুঞ্জ পুঞ্জীভূত অন্ধের জঞ্জাল।
মৃত্যু আবর্জনা! ওরে আসিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাত কালে, এ জাগ্রত ভবে,
এই কর্ম্মধামে!

মৃত্যু ভয়—পলে পলে, তিলে তিলে মরণ ভীতি এড়াইয়া সত্য মরণকে বন্ধু ভাবে বরণ করিবার সাহস ও শক্তি না জাগিলে মানুষের ঘুম-ঘোর ভাঙ্গিবে না। কত দীপ্ত প্রভাত আশার আলোক রশ্মি দেখাইয়া আবার অন্ধকারের কৃষ্ণ যবনিকা চোখের উপর মনের উপর আস্তরণ টানিয়া দিয়া যাইবে—জাগা আর হইবে না।

• • • •

বাংলা দেশের তরুণ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কারাগারে বন্ধ থাকিয়া অনশনে মৃত্যু বরণ করিতেছেন। এক মাসেরও উপরে অতিবাহিত হইয়া গেল কবি অনাহারে আছেন। মৃত্যু যতদিন না কবিকে নিজ স্নেহ আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতেছেন ততদিন তাঁহাকে এইভাবেই মরণ সাধনা করিতে হইতেছে। মরণকে বরণ করিয়া লইবার এমন প্রচণ্ড সাহস ও উগ্র তপস্যার কথা এ যুগের এ দেশী মানুষের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। কবি নজরুল এ ভাবে অনাহারী থাকিয়া আত্মবিসর্জ্জন দিতেছেন দেখিয়া কেহ তাহাকে বলিতে পারেন খেয়ালী, কেহ বা বলিতে পারে বুদ্ধিহীন পাগলের পাগলামো। অনাহারে আত্ম প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া আর কি লাভ হইবে—তার চেয়ে প্রাণ নিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া থাকিয়া ভাল ভাল কবিতা লিখিয়া বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাদের মনোরঞ্জন কর। আমরা তাল ঠুকিয়া বলি—কিম্বা আসরে হার-মোনিয়াম বাজাইয়া গাহি—'বল বীর বল বীর, উন্নত মম শির।' কিম্বা তোমার লেখা 'আমি বিদ্রোহী—আমি বীর, পড়িতে পড়িতে আমাদের ধমনীর রক্ত প্রবাহ চঞ্চল হইয়া উঠুক জীবনের আনন্দ ও চঞ্চলতার আবেগে—পলে পলে মৃত্যু যাতনার হাত হইতে ক্ষণেকের তরেও মুক্তির নূতন আস্বাদ পাই তা নয় অমন ভাল ভাল কবিতা লেখার ক্ষমতা থাকিতেও বর্ত্তমান নূতন বাংলার একমাত্র স্বাধীন ও স্বতন্ত্র তরুণ কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াও কি পাগলামো আরম্ভ করিয়া বসিল কবিকে—কবি কি না তারা প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন!

• • • •

কবি নজরুল মাত্র চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার কাব্য সূত্রে আত্ম প্রকাশ করেন। রণক্ষেত্রে নজরুলের হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা কবিতা রূপে ফুটিয়া উঠিতে

থাকে। জগৎ জোড়া যে পুঞ্জীভূত অন্যায় রাশি ন্যায়ের উপর অবিচার অনাচার করিয়া আসিতেছে কবি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক সাজিয়া সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে গিয়াছিলেন। উচ্চ আদর্শে আত্ম-বলি, আত্মদান যে কবি করিতে পারেন তাহা তখনি প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। তারপর তখনকার মত অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের অভিযান ফুরাইল, অন্যায় মাথা নত করিল। হাবিলদার—কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

• • • •

কবির আত্ম মর্য্যাদা জ্ঞান, ন্যায় অন্যায়ের বোধ আমাদের সহজ সাধারণ মানুষের চেয়ে কিছু বেশী। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া কবি দেখিলেন এ এক যুদ্ধের বিজয়ে বা পরাজয়ে অন্যায় কিছুমাত্র মস্তক নত করে নাই। চারিদিকের পুঞ্জীভূত অন্যায়ের জঞ্জাল আরও গর্জাইয়া উঠিতেছে। যুদ্ধের পর লোকের ন্যায় অন্যায় বোধ যেন জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। কবি অন্যায় অপসরণকেই জীবনের মুখ্য কাম্য ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাই তাঁহার বাক্যে কাব্য উৎসারিত হইতে লাগিল। বাধা হীন প্রাণের আকাঙ্ক্ষা সহজ স্বচ্ছন্দ গতি ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়া অপূর্ব্ব কাব্য সৃষ্টি করিল। দেশবাসী সে মুক্ত ধারার স্বাদ পাইয়া অপূর্ব্ব উন্মাদনা ও পুলক লাভ করিল।

• • • •

কবি নজরুল ইসলাম—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মিথ্যা হীনতার বিরুদ্ধে, তাই তিনি অবাধ, চঞ্চল, বিদ্রোহী। নিজ হৃদয়ের অবাধ, চঞ্চল প্রবহমান রসধারাকে রূপ দিতে গিয়া ধূমকেতু সম্পাদকরূপে তিনি কারাগারে প্রেরিত হইলেন। কবি জানিতেন এজন্য দণ্ডভোগ তাঁহার প্রাপ্য। দণ্ডিত দেশ কবি কারাগারে গেলেন।

• • • •

আমাদের দেশের কারাগারগুলি সত্যই নরক। কারাগারের উদ্দেশ্য যোধায় গেলে লোকের চরিত্র সংশোধন হইবে—আর অন্যায়ের দিকে মতি যাইবে না। কিন্তু এসব কারাগারে চরিত্র শোধন হওয়া দূরের কথা মানুষ এমন অমানুষ হইয়া এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে যে জীবনে আর তাহার ইচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ হইবার উপায় থাকে না। কারাগার যতদিন শুধু হীন চোর, জোচ্চোর জাকাত ও খুনের দলেরই আড্ডা ছিল ততদিন কারাগারের দিকে কারো তেমন দৃষ্টি পড়ে নাই। কিন্তু এই কারাগারেই যখন ক্রমে দেশের বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, মানুষের মত মানুষেরা ক্রমাগত যাইতে লাগিলেন তখন সকলেই বুঝিলেন কারাগারগুলি আর কিছু নয়, এগুলি Human Slaughter House.

• • • •

কারাগারের সংস্কারের জন্য কারাগারের নীতি বদলাইবার জন্য তাহার পর হইতে অনেক কথা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর মত দেশপূজ্য লোক হইতে, আলীভ্রাতৃদ্বয় হসরৎ মোহানী, লালা লাজপৎ, প্রভৃতি কত কত মহামান্য দেশনেতা জেলে পচিতেছেন—দেশের কত তরুণেরা কারাগারে যম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিলে তিলে মরণ যাতনা ভোগ করিতেছেন—কারাগার সংস্কার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কত কথাও হইয়াছে কিন্তু কথার মত কথা এমন তীব্র প্রতিবাদ আর কেহ করেন নাই—যেমন ধারা আজ দেশ কবি কাজী নজরুল ইসলাম করিতেছেন। দেশ কবি যদি এই Human Slaughter Houseকে সংশোধনাগার করিতে পারেন তবে দেশ ত্রাতবান হইবে সন্দেহ নাই।

• • • •

কবির অনাহারে আত্মদানের মধ্যে এমন একটা তীব্র সঙ্কল্পের জীবন্ততা আছে যাহা নিবারণ করাইতে গেলে দেশ শাসনের চলিত নীতিধারাই আমূল পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। তাই আহার করিয়া জীবনধারণের জন্য বন্ধুজনের এত অনুরোধ উপরোধ কবি রাখিতে পারিতেছেন না। অন্যায়ের প্রতিকার আগে—তারপর অনুরোধ! তবে সে অনুরোধ রক্ষা করা যায়! কিন্তু দেশ কবির ভক্তদের সে প্রতিকার করিবার ক্ষমতা আছে কি? প্রতিকার করিবার ক্ষমতা যদি না থাকে তবে এ অনুরোধ করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের নাই। মরণ ভীতি এড়াইয়া মরণকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই যে দু'বাহু ও বক্ষ প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছে সে সাময়িক ক্ষুধা তৃষ্ণার মায়া ও সাংসারিক বাস্তবতার চেয়েও কোন উচ্চ স্তরের বাস্তবতার সন্ধান পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

• • • •

তাই মনে হয় দেশ কবি নজরুল আত্মদানের—একটা নূতন আদর্শ দেখাইতেছেন। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে বিনা খাদ্যে পানীয়ে কবি আজ আত্ম উৎসর্গের সাধনায় সমাহিত। কবি রুদ্রকে ডাকিতেছেন—শান্ত সুন্দর সত্যকে চাহিতেছেন। অন্যায় ন্যায় যারা রোধ করিতে চাহিতেছেন। তাই কবি নজরুল শুধু মাত্র দেশের খেয়ালের তৃপ্তিবিধানের কবি নহেন—ইনি সত্য কবি,—দেশের আত্মবোধ জাগ্রত করিবার সাধক কবি!

• • • •

মরণ যদি সত্যই কবিকে বরণ করে—তবে বাংলা দেশ একজন সত্য কবি হারাইবে। ইহা সত্য কথা এবং কোন দেশ বা জাতির পক্ষে এমন তরুণ সাহসী কবিকে হারানোও সোজা সম্পদ হারানো নহে। কিন্তু

কবির প্রাণের ইচ্ছাকেও যদি দেশবাসী এতটুকু রূপ দিতে না পারে তবে দেশ আরও যে কত জিনিস হারাইবে তাহা ভাবিতেই আমরা শঙ্কিত হই। ভগবান দেশ কবির মুখ রাখিও। তার বিশ্বজয়ী অমর ভরবারী সে আজ তোমার পায়ের তলে অর্পণ করিয়া তোমার ভাষের কাঙ্গার প্রাণ বিলাইয়া চলিতেছে—তাহাকে নিরাশ করিও না।

• • • •

বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইনের যে পরিবর্ত্তন হইবার কথা ছিল এবং যাহা লইয়া জমির মালিকদের মধ্যে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল সে ভয় সম্প্রতি কাটিয়া গিয়াছে। এখন নিঃশঙ্ক অবস্থায় আবার জমির মালিকেরা জমি বন্দা-বিলি করিতে পারিবেন। যে চাষ করিবে আইনের বলে সেই জমির মালিক হইতে পারিবে না। আইনে এই ভাবে যে ব্যবস্থা হইবার কথা উঠিয়াছিল তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। দেশের একটা মহা দুর্ভাবনা ও চাঞ্চল্যের কারণ দূর হইল। এই সুব্যবস্থার কথা সরকারের দেশময় প্রচার করিয়া দিয়া দেশের বিক্ষোভ দূর করা কর্ত্তব্য। আপনাদিগের মধ্যে মারামারি কাটা-কাটি দাঙ্গা মোকর্দ্দমার সব কারণ সম্প্রতি তিরোহিত হইল।

লাফিং গ্যালারি

(১)

হা হা হাসি, হো হো হাসি, অনাসুখো হাসি, দন্ত বানিক হাসি, দুখের হাসি, সুখের হাসি, পেটো হাসি, কাষ্ঠ হাসি, লৌহ হাসি—আরও কত রকমের হাসি যে চলিত আছে, তার ঠিক-ঠিকানাই নেই! বিনয়বাবু কতকগুলো হাসির প্রতিচিত্র এনে আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়েছেন, সে গুলোর নামকরণ করে দিতে হবে। বিনয়বাবু চিত্রকর, চিত্রকরের মত কথাই বলে খালাস পেলেন, কিন্তু নাম করণ করার যে কি বিপদ তা তিনি বুঝবেন কেমন করে? সেটা আমাকেই হাড়ে হাড়ে বুঝতে হচ্ছে। এ তেড়ী নয় বা গোঁফ নয় যে কেবল তেড়ীবান, গুম্ফবান মনুষ্য গুলিকে চটিয়েই অব্যাহতি পাওয়া যাবে, হাসির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন, এমন এক শ্রেণীর জীব, যাঁদের সম্বন্ধে কোন কথা বলতে যাওয়া আমি একেবারেই সুবিবেচনা মনে করি নে। কারণ আমার এই বিশ্বাস (আমার বিশ্বাস অভ্রান্ত না হলেও হতে পারে) যে তেড়ীবান বা গুম্ফবান ব্যক্তিদের চটালে এক লাঠির ভয় ছাড়া অন্য ভয় বিশেষ কিছু নেই এবং বিনয়বাবুর হাসির প্রতিকৃতি গুলি যদি শুধু পুরুষদের মুখ থেকেই প্রাপ্ত হতে নেওয়া হ'ত তা হলেও সেই একই ভয় ছাড়া অন্য ভয় না থাকলেও পারত। কিন্তু এতে আছেন আবার তাঁরাও, যাঁদের কি হাসি, কি কান্না—দুই-ই আমার কাছে এ পিঠ আর ও পিঠের মত! এগোলেও সর্ব্বনাশ, পেছোলেও প্রায় তাই-ই! অথচ এ-গুলিকে বিনি নামে ছেড়ে দেওয়াও চলে না। কারণ চিত্রের নাম না হলে শুনি চিত্র-ও নাকি অ-চিত্র হয়ে পড়ে! বাজারে চিত্র সমালোচকদের যেরূপ সংখ্যাধিক্য হয়ে পড়েছে তা'তে কি আর প্রাণ বাঁচাবার যো থাকবে? তর্জ্জন, গর্জ্জন' সম্পাদক, বম্পন, শেষ আবার সাগর উত্তরণ ঘটে যাবে—তয়েই আমার হৃৎকম্প হচ্ছে। তারপর আমি যদি বা পার পেয়ে যাই, নাম ধাম গোপন করে,' গরীব বেচারা সম্পাদক দুজনের বাঁচবার কোন আশা থাকবে না, তাঁদের কেস্ একেবারে হোপ্‌লেস্ হয়ে পড়বে! সেটা আমি সঙ্গত মনে করিনে। সাহিত্যের হাটে যাঁরা অতি ভদ্রলোক, কোন সময়েই যাঁরা ভদ্রতা ভুলতে পারেন না, তাঁরা যে আমার জন্য সম্পাদকদের বিব্রত করে তুলবেন—এটা আমি গহ্লও করি না। সত্যি কথা বলতে কি, সংবাদ ও সাময়িক পত্রের সম্পাদকরা লেখা ছাপাবার একটা বাধ্য বাধকতার মধ্যে পড়ে বেমালুম কতকগুলো লোককে কলম বাজী করে যাচ্ছেন কিনিয়ে

• • •

মাথা ক্রয় করাবেন, অন্ততঃ আমার গাফিলির দোহাই দিয়ে, সেটা আমি কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারব না। শুধু কি সম্পাদকদের এইটুকু কষ্টই ভোগ করতে হয় মশাই? তা নয়! ভদ্রলোকরা যখন সম্পাদকদের সঙ্গে সমানে সমানে ঝগড়ায় পেরে ওঠে না, তখন আবার উড়ো চিঠিতে হাতীর নাচ দেখায়ে আনন্দ পেতে চায়! লোকের বাড়ীতে খোকা হলে যেমন সেই কারা ঢোল একদল বাজিয়ে গান করতে এসে গৃহস্থকে আনন্দ দিয়ে যায়,—ঠিক তেমনি ভাবে আনন্দ দান করতে উড়ো চিঠিগুলোও সম্পাদকদের কপালে এসে লাগে!

যাওক, তার জন্ত আমার মাথা ব্যথা আদৌ নেই। তাঁরা যখন সম্পাদক, চাল ভরোয়াল, বর্শা চর্ম তাঁদের ও থাকা সম্ভব। তবে কথা কি জানেন মশাই, আমার জন্তে একটা "কিছু" ঘটে, এটা আমি চাই নে। তাই ক্ষুণ্ই ক্ষোভ সম্বোচকদের ভয়েই বলুন, আর ভক্তিতেই বলুন, চরণারবিন্দে নতি করে'। এবং ঘরের ও পরের শ্রীমতীদের শ্রীশ্রীহাসি গুলির শ্রীশ্রীনামকরণ করে' বিদায় গ্রহণ করা গেল।

[লাফিং গ্যালারির প্রথম স্তবক মাত্র শ্রীকস্তাচিৎ স্তচকিত টীকাকারস্ত। প্রকাশিত হইল, আরও দুই একটি স্তবক আছে, তাহাও যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে। অনেক হাসিই ইহার মধ্যে পাওয়া যাইবে না, তজ্জন্ত কাহারো ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই. যেহেতু ভবিষ্যতে এ দর্পণে তাঁহাদের চিত্র অতি অবশ্যই প্রতিবিম্বিত হইবে। বাসন্তীর গ্রাহক গ্রাহিকাগণের জ্ঞাতার্থ বলিয়া দিতে হইল—সম্পাদক, বাসন্তী।

খোকার হাসি!

মা যে সন্দেশটা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, খোকা, আড়চোখে তাহা দেখিয়া ফেলিয়াছে।

নাঃ, দেখব নাঃ!

এক চক্ষু হরিণ!

ওগো, চাই কিরে, চাই কিরে!

পথ হাঁটা কি ঝকমারি।

সমঝদার

তেরে নাক্, তেরে নাক্, হা—হা—হা।

বাবাজীবনেষু—

হাসির দাঁত না, দাঁতের হাসি ?

চাকুম-চুকুম-কুস্-কুস্-কুস্।

এক ভিলে তিনটী পাখা।

নব কুল-কামিনী

বেশ—বেশ!

আমরা বুড়ো-হাবড়া...

মার দিয়া হামে মার্ দিয়া

বড় ভালবাসি ঐ অধরের হাসি...

সিঁথির সিঁদুর হাতের নোয়া!

সতীর-পতি

বিশ্ব প্রেম

"মেঘেতে বিজুরী খেলে"—

ফল্স টেরিয়ার।

ছেলে-দিলে ঘাঁৎকে ওঠেনা ত ?

এ্যাপ্রিসিয়েটেসান

গুরু-গম্ভীর।

আকর্ণ-বিস্তৃত।

রাঘব-বোয়াল

চোরা বালি

অহরীতে অহর চেনে
অন্তে বোঝে—কাচ।

দিল সাচ্চা।

হাস্ত পেলেই হাস্ত করি,
নৃত্য পেলেই নাচি।

বিধবা

[শ্রীসুধা দেবী]

এক

"বলি ও ভালখাগীর মেয়ে এরি মধ্যে পিত্তি গিলতে বসেছো এখনও যে কাক কোকিলে কিছু খায়নি।" এই কথা বলতে বলতে শশীমুখী রমলার ঘরে রায়-বাঘিনীর মত ঢুকে পড়লো। রমলা তখন পূজার আসনে বসে তার আরাধ্য দেবতাকে একাদশীর উপবাসজনিত সমস্ত ক্লান্তি দিয়ে পূজায় নিমগ্ন। তার চোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারা ঝরে পড়ছিল—বোধ করি তার দেবতার পা ধুয়ে দিতে। বৌদির মধুর সম্ভাষণে তার বুক কেঁপে উঠলো। দেবতার সৌম্য কান্তি মুখ খানি সে ভুলে গেল। সে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে "কি বলছো বৌদি!" তার স্বর কি ভীতি করুণায় ভরা, মুখ খানি ম্লান। "বলি আবাগী আমরা কি তোর দাসী বাঁদী যে তোর মুখপানে চেয়ে ঠায় বসে থাকবো? বেলা আট টা বেজে গেল এখনও কি উপরে জল দিয়ে আসবার সময় হয় নি? তোর না হতেই ত কেবল নিজের পিত্তি গিলতেই ব্যস্ত। আমরা কি তোমার"—বলেই শশীমুখী দাঁতের ওপর দাঁত দিয়ে সজোরে একটা চড় মারলে। রমলা সহ্য করতে পারলো না। তার মাথা ঘুরে গেল। মাটীতে পড়ে যেতেই পূজার আসনে পড়ে গিয়ে তার কপালের এক জায়গা কেটে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো। তার চোখ জলে ভরে উঠলো। সে তাড়াতাড়ি উঠে বল্লে "বৌদি আমি ত জল গরম করে অনেকক্ষণ উপরে দিয়ে এসেছি। তুমি ঘুমুচ্ছিলে পাছে আবার তোমার মাথা ধরে, তাই ডাকি নি। আর লতিকে ত আমি বলে এসেছি, বৌদি জলের কথা।" রমলার কথা শুনে শশী চীৎকার করে বলে উঠলো—চুপ্ কর হারামজাদী আবার চোপ্‌রা। লতি যেন ওর বাপ বাড়ীর রেওৎ! লতিকে উনি হুকুম করে এসেছেন। আসুক ও তোমার তেলামী ভাঙ্গছি দাড়াও—" বলেই শশীমুখী যেমন উগ্রমূর্ত্তি হয়ে ঢুকেছিল আবার ঠিক তেমনি হয়েই ঘর থেকে চলে গেল। আর রমলা সেইখানে পাষাণ প্রতিমার মত স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে রইল। তখনও তার কপাল থেকে রক্তের ধারা তার গণ্ড বয়ে তারই একটা পাথরের শিবের ওপর পড়ছিল—যাকে সে জাগ্রত দেবতা বলে জানতো। জানি না সেই নিষ্পাপ সমাজ পীড়িতা বালিকার রক্ত সেই জাগ্রত দেবতার বুকে গিয়ে বেজেছিল কি না। জানি না সেই রক্তের ধারা ভাগীরথীর ধারার মত বয়ে গিয়ে ভগবানের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করে তাঁর চোখে পড়েছিল কি না, তারপর রমলা বসে পড়লো। বুক ভাঙ্গা কান্না তার কণ্ঠে এসেই অরুদ্ধ হয়ে ঘরে পড়তে লাগলো। হায়! এত করে সে ক্রীতদাসীর মত সারাদিন খেটে মরে তবুও তাদের মন পায় না। দু'টো মিষ্টি কথা পায় না, পেট ভরে দু'টো খেতে—তা ও অর্দ্ধেক দিন পায় না। আজ পাঁচ বৎসর, সে বিধবা হয়ে এসেছে। সেই অবধি সে জ্ঞাতি গুষ্টে দাসী বৃত্তি করে আসছে, কখনও একটা মিষ্টি কথা শুনে নি। আজ তার মনে পড়ে গেল, অনেক দিনের কথা। তখন তার মা বাপ জীবিত। তার কত আদর কত সোহাগ। তারপর বিবাহ। দশ বছরের মেয়ে রাঙ্গা চেলী পরে শ্বশুরবাড়ী গেল। সেখানে কত সুখ কত স্বপ্ন। আর একটা সুন্দর মুখ তার মনের কোণে একটু একটু ফুটে উঠলো, তাকে সে মাত্র একটি বছরের জন্যে পেয়েছিল।

সেও একদিন হঠাৎ কোথায় চলে গেল! আর সেও ফিরে এলো এই বাড়ীতে বর্ষাজলে-পরা যুঁই ফুলের মত। এ সমস্ত তার চোখের সামনে ছবির মত ফুটে এক নিমিষেই মিলিয়ে গেল।

দুই

রমলা আজ পাঁচ বছর হ'ল হাতের নোয়া খুলে সিঁথির সিঁদুর মুছে বাপের ঘরে এসেছে। দশ বছর বয়সে তার বিয়ে হয় কিন্তু স্বামী সৌভাগ্য তার ভাগ্যে ছিল না। এক বছর না ঘুরতেই তার কপাল পুড়ে গেল। সে বুঝলো না যে স্বামী কি জিনিষ। সে যে কত বড় জিনিষ হারালো, তাও সে একবারও বুঝলো না। কিছুদিন আগে সে যেমন তার সইদের সঙ্গে বৌ বৌ খেলতো, খেলা ভেঙে গেলে ঘোমটা খুলে ফেলতো। সে ভাবলে আজ ও তাই হলো। সে আরামের নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। মাথার ঘোমটা খুলে গায়ের গহনা খুলে ভাবলে বাঃ বেশ ত। অভাগীর কপালে সুখ নেই তাই স্বামীর মৃত্যুর সাত দিন পরে তার শ্বশুর গেল মারা। তাই তাকে সকলে অলক্ষী বলে পাঠিয়ে দিল, আর এই দীর্ঘ পাঁচ বছরের ভেতর নিয়েও যায় নি বা কোন খবর ও নেয় নি। তারও প্রথম প্রথম তাদের কথা মনে হতো, তারপর ধীরে ধীরে তার হৃদয় থেকে তাদের কথা মুছে গেল।

বাপ মার কাছে এসে সে খুবই সুখে ছিল। কিন্তু সে সুখও তার ভাগ্যে ভগবান বেশী দিন লেখেন নি। ভগবান যাকে মারেন, মানুষে তাকে কেমন করে সুখ দেবে বল। রমলা বাপ মাকে ও বেশী দিন নিয়ে সুখ ভোগ করতে পেলো না। বাপ মাকে ও সে এক বৎসরের মধ্যে হারিয়ে বসলো। বাপ মাকে হারিয়ে সে বুঝলো যে তার আদরের দিন ফুরিয়ে গেছে। তারপর ক্রমে ক্রমে সে জানতে পারলো তার আপন বলতে আর কেউ নেই। এত বড় বিশ্ব সংসারে সে একা, একা। তারের সংসারে সে এমনি করে তার পূর্ণ যৌবন নিয়ে লাঞ্ছনা প্রহারের মধ্যে দিয়ে মৌন হয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল। যে দিন থেকে সে এমনি ভাবে নীরবে সমস্ত সহ্য করে আসছে। অথচ স্বামীকে তার মনে নেই। ঠিক যেমন ধারা।

এক একবার একটী অপরিচিত সুন্দর মুখ তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে, তাকেই সে আপন বুকের মধ্যে পুরে রাখতে চায় কিন্তু তখুনি আবার সে তাকে হারিয়ে ফেলে। কিছুদিন তার আর দেখা পায় না। বুক কেঁপে ওঠে তার ভয়ে। সাগরের তাণ্ডব তরঙ্গের মত কান্না তার বুকের মাঝে জমাট হয়ে তাকে সকাল সাঁঝে দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে মারে। হয় ত কোনদিন সমস্ত রাত নিজের বিছানায় চোখের জলে কাটিয়ে দিয়ে ভগবানকে বলে ওগো প্রভু আমার—ওগো আমার নিষ্ঠুর দেবতা আমায় এ অসহ্য জ্বালায় আর জ্বালিও না। আমায় শান্তি দাও, কোন পথে তোমায় পাব তা বলে দাও। কিন্তু হায় তার এই বুক ভাঙা কান্না, হৃদয় ভরা প্রার্থনা তিনি শুনেছেন কি না কে জানে। রমলার দিন এমনি ভাবে কাটছিল।

তিন

সে দিন সারা রাত জ্বরের প্রকোপে ছটফট করে ভোরের সময় রমলা একটু ঘুমিয়ে পড়লো; কখন যে দিনের সমস্ত আলোটুকু তার ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে তা সে টের ও পায় নি। তার ভাইঝি লতিকা তাকে দু'বার পিছিমা পিছিমা বলে ডেকে ফিরে গেছে। তবুও তার ঘুম ভাঙে নি। সে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে। এদিকে আট-টা বেজে গিয়েছে। শশীমুখী রোজকার মত মুখ ধোবার জল না দেখে একটু গরম হয়ে উঠলো। তারপর যখন নীচে এসে দেখে যে বাসি পাট তখনও সারা হয় নি, এমন কি রান্নাঘরের চাবি তখনও বন্ধ তখন শশী আর থাকতে পারলে না। ন'টা বাজলেই এখনি স্বামীর ভাত চাই অথচ কিছুরই জোগাড় নেই। শশীমুখী মত্ত হস্তিনীর মত রমলার ঘরে ঢুকে দেখে যে তখনও রমলা ঘুমুচ্ছে। একেই সে রেগে এসেছে তার উপরে তার ঘুম শশীমুখী আর স্থির থাকতে পারলে না। নিকটেই একটা ঝাঁটা পড়েছিল তাই নিয়ে সজোরে রমলাকে ঘা পাঁচ ছয় বসিয়ে দিল। রমলার ঘুম ছুটে গেল কিন্তু ওঠবার শক্তি তার তখন ছিল না, সে শুধু রুদ্ধ কণ্ঠে বল্লে "বৌদিগো আমার বড্ড জ্বর হয়েছে তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আর মের না গো, আমি এখনি—" রমলা আর কিছু বলতে পারলো না, অশ্রু তার কণ্ঠ রোধ করলো। এমন সময় রমলার দাদা ধীরেন এসে বল্লে কি

হয়েছে গো এত গোলমাল কেন? শশীমুখী হাত মুখ নেড়ে বলে "ওগো বেশী কিছু হয়নি গো, বেশী কিছু হয়নি তোমার গুণধর বোন কাল সারা রাত বাসর জেগেছিলেন কি না, তাই আজ আর উনি রাঁধতে পারবেন না, ওঁর শরীর খারাপ হয়েছে। ন-টা বেজে গেল এখন তুমি কি খেয়ে আপিস যাও বল ত? বলেই শশীমুখী আবার এক ঘা রমলার গায়ে বসিয়ে দিল। রমলা বাবা গো বলে চীৎকার করে উঠলো। ঠিক এমনি সময়ে মুমুখের বাড়ী থেকে একটী যুবক জানালা খুলে বল্লে—ধীরেনবাবু আপনি মানুষ না পশু! অবলা নারীর ওপর এই অত্যাচার হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছেন। পাড়ার ভেতর ভাল হচ্ছে না মশাই, এমন বাড়াবাড়ি করলে আমাদের পুলিশে জানিয়ে আনতে হবে কিন্তু তা বলে দিচ্ছি।" বলেই সশব্দে জানালাটি বন্ধ করে দিল। শশীমুখী তখন হেসে বলে উঠলো, দেখলে তো, আমি মিথ্যে বলি কি সত্যি বলি, তোমার বোনের আপনার লোক কে? কাল সমস্ত রাত ওরই সঙ্গে ফুস্ ফুস্ হয়েছিল ভাবলুম তোমাকে একবার ডেকে দেখাই। কিন্তু তোমার ত আর ঘুমই ভাঙলো না। রোজই যে এ রকমই না হয় তাই বা কে জানে।

তখন তোমায় আমি বলেছিলুম তুমি ত হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলে। কেমন এখন ত বিশ্বাস হলো নাও এখন সামলাও! বলেই স্বামীর মুখের পানে শশিমুখী চেয়ে একটা অশ্রাব্য কথা বলে উঠলো। ধীরেন হাসি-মুখে শশীমুখীর হাত ধরে বাইরে এসে বল্লে "ও আমি অনেকদিন আগে থেকেই জানি। তোমাকে কি আমি অবিশ্বাস করতে পারি! ও যে আমার নিজের চোখে দেখাই হয়ে গেল শশী।

ছান্ন

সমস্ত দিন অনাহারে রমলার দেহ অবশ হয়ে পড়েছে সে কেবলই ভাবছে হায় আজ তার একি হলো! যে দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা তার মাথায় দিয়েছে সে ত আর ইহজীবনে নামবে না। সহোদর ভাই হয়ে আজ যে অপবাদ তার এই পবিত্র হৃদয়ে এঁকে দিয়েছে তা ত আর মরণ না হলে নষ্ট হবে না! ওগো দেবতা আমায় আমার পথ দেখিয়ে দাও। প্রভু তুমি মুক্তি দাও ওগো আমায় মুক্তি দাও এর ভার আর আমি বইতে পারি না। রমলার চোখ ভারী হয়ে উঠলো জলে। সে বালিশে মুখ রেখে কেঁদে উঠলো। হায় এ জগতে তার আপনার বলতে কেউ কি নেই? এত বড় বিশ্ব জগতে কত শত লোকের স্থান রয়েছে তার কি কোথাও একটু স্থান হবে না, কেউ কি তাকে আদর করে বুকে নেবে না? যদি সকলেই তাকে ঘৃণা করে, তবুও একজন তাকে আদরে বুকে তুলে নেবে। সে তাকে কিছুতেই ত্যাগ করবে না। রমলা ভয়ে শিউরে উঠলো। হায় ভগবান আজ কোন মহা পাপের জন্য বিনা অপরাধে এই অখণ্ডনীয় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিলে তুমি! হে দেবতা আমার, হে সর্ব্বস্ব আমার তুমি আমায় অপরাধ নিও না।

• • • •

নীরব রাত। আকাশে দ্বিতীয়ার চাঁদ তখনও হাসছে। রমলা কি জানি কার উদ্দেশে একবার শেষ প্রণাম করে পিছনের দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে নীরবে বাহির হয়ে পড়লো। কিছুদূর যেতেই কে যেন ডাকলে 'রমলা।' রমলা চমকে উঠলো। পিছনে কিন্তু কাউকেও দেখতে পেল না। আবার চলেছে। এমন সময়ে কে যেন তার সামনে এসে দাঁড়াল। তার পর বলে রমলা, এত ভারী রাতে একা তুমি কোথা যাচ্ছ? রমলা যুবককে চিনতে পারলো। এ সেই সামনের মেসের সেই যুবক। সেদিন এই যুবকই তার জন্যে অপমানের বোঝার ভাগ নিয়েছে। রমলা নীরব। যুবক তখন বলে "কোথায় যাচ্ছ রমলা? আত্মহত্যা করতে? তাত আমি দেব না। সে যে মহা পাপ। এস তুমি আমার সঙ্গে এস।" রমলা ক্ষণিকের জন্যে সমস্ত ভুলে গেল। ধর্ম্ম ভুলে গেল, দেবতা ভুলে গেল। একেবারে বলে বসলো—বেশ তাই চল। মনে ভাবলো আত্মহত্যার চেয়ে বোধ হয়—ভালো।

• • • •

জনশূন্য রাজপথে গাড়ী চলেছে। রমলা একধারে মড়ার মত পড়ে আছে। আর সরোজ সামনের সীটিতে বসে আছে। এমন সময় সহসা রমলা সরোজের পা

ধরে বল্লে—যেমুন আমি আপনার ছোট বোন, আমাকে ছেড়ে দিন। আমার ভুল হয়েছে। আমি আমার নিজের পথে যাব। "বলতে বলতে রমলা কেঁদে উঠলো। আঁচলে চোখ মুছে এবার আরও মিনতির সুরে বল্লে "আমাকে ছেড়ে দিন আমি আমার পথে চলে যাই। আমার স্বামী আজ অনেক দিন পরে আমায় ডেকেছেন আমি তাঁর কাছে যাই আমাকে ছেড়ে দিন।" সরোজের সারাদেহ শিউরে উঠলো। সে নিজেকে তাড়াতাড়ি মুক্ত করে নিয়ে বল্লে—তবে চল বোন তোমাকে বাড়ী রেখে আসি; আত্মহত্যা কিছুতেই করতে দেব না তোমাকে। রমলা গম্ভীর স্বরে বলে উঠলো—" বাড়ীতে ফিরে যাবার ত আর আমার উপায় নেই। মৃত্যুই আমার একমাত্র পথ।

"রমলা তোমার শ্বশুর বাড়ী কোথায় বলতে পার?"

"পারি, হরিপুর।"

সেখানেও তোমার কি কেউ নেই?

তা বলতে পারি না।

তোমার স্বামীর নাম কি বলতে পার? রমলা কোন উত্তর দিল না, তারপর হঠাৎ বল্লে আমার শ্বশুরের নাম ঈশানাথ রায়, তবে তিনিও নেই।

কেউ নেই সেখানে? শাশুড়ী দেওর?

না, একটি দেওর ছিল—সেও আমার বরাতে—নেই! সরোজবাবু, যম ছাড়া আপনার লোক আমার আর কেউ নেই। সর্প দেখলে মানুষ যেমন ভয়ে চমকে ওঠে পিছিয়ে যায় রমলার কথা শুনে সরোজও তেমনি চমকে উঠলো, তারপর হঠাৎ দরজাটা সজোরে খুলে চলন্ত গাড়ীর ছাদে গিয়ে বসলো। কোচম্যান বল্লে—বাবু ছাদে এলে যে? সরোজ শুধু একটা সিগারেট বের করে তাতে আগুন দিবার জন্য বাতিটা তুলে নিয়ে হাওড়ার দিকে গাড়ী চালাতে বলে দিলে।

শেষ

"কে বাবা সরোজ এলি"—বলে একটা বৃদ্ধা মুটীরের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো। সন্ধ্যা তখন বেশ গাঢ় হয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে পড়েছে। নিকটের লোক স্পষ্ট চেনা যায় না। "হ্যা মা এই'যে আমি এসেছি—

বলে সরোজ মায়ের চরণধূলি মাথায় তুলে নিল। বৃদ্ধা বল্লে—আয় বাবা আমিও বসে বসে ভাবছিলুম, এত দেরী হয় কেন আসতে। কালই তোর আশীর্ব্বাদ, পরশু বিয়ের দিন। লোকজন নেই কেইবা দেখে শুনে। একটু জিরিয়ে তোর দিদিকে নিয়ে আসগে যা। শুভকর্ম, দেরী করিসনে আর।" সরোজ মা'র পায়ের কাছে রমলাকে ছেড়ে দিয়ে বল্লে, মা এক লক্ষ্মীকে পথে কুড়িয়ে পেয়েছি। আজকের দিনে তাকে তোমার কোলে তুলে নাও মা! —বলেই সরোজ রমলার দিকে ফিরে বল্লে, বৌদি মাকে প্রণাম কর। আলোটা গেল কোথায় মা, সবই যে অন্ধকার —বলতে বলতে সরোজ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। সরোজ মাকে সব কথা বল্লে, শুনে বৃদ্ধার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়লো। তিনি রমলাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে তার মাথায় হাত রাখলেন।

• • • •

সরোজ রমলার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বল্লে বৌদি কালকের কথা ভুলে যেও। মনে কর, সেটা দুঃস্বপ্ন। রমলা অশ্রুভরা চোখে সরোজের মাথাটায় হাত রেখে বল্লে—ঠাকুরপো! আমায় তুমি ক্ষমা কর। তোমার মত দেবতাকেও আমি সন্দেহ করেছিলুম। সরোজের অশ্রুতে রমলার বুক আর রমলার অশ্রুতে সরোজের মাথা ভেসে গেল।

আরও করুণকণ্ঠে রমলা বল্লে—বিধবার জ্বালা ত এক নয় ভাই। তার জন্যে কিছু মনে করবে না, বল!

সরোজ বল্লে—কিছু না, শুধু এই মনে করব—তুমি আমার অভাগিনী বিধবা বৌ-দি।

৪৷৷ বিনামূল্যে লকেটসহিত ফটো
ফটো এনলার্জিং ১২×১০
ফটো সহ ভ্রমণের সিকি মূল্য পাঠান
কমিশন্ড ও লেডিজ রবারষ্ট্যাম্প বেকার
৩৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

অন্ধ

মিঃ সেন ঘনিও সকালে বার বার করিয়া বলিয়াছিলেন যে অপরাহ্নে তাঁহার কোথায় নাকি জরুরী এন্‌গেজমেণ্ট আছে, কিন্তুতেই এদিকে আসিতে পারিবেন না, কিন্তু ঘড়ির কাটায় পাঁচটার ইঙ্গিত করিতেই দেখা গেল মিঃ সেন তাঁহার ঘরের গাড়ী হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে বৈঠকখানার দিকেই অগ্রসর হইতেছেন।

রাজেশ্বর বৈঠক খানাতেই একখানা কি দলিলের পাতা উল্টাইতেছিলেন, সেনকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া বলিলেন—তুমি এসেছ, বড়ই ভাল হয়েছে, সেন। কাশীতে একখানা বাড়ী আছে, এই তার দলিল, বিক্রী হবে, মনে করছি, নিয়ে রাখি। শেষকালে দরকার ত হবেই!—তিনি দলিল খানা মিঃ সেনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

মিঃ সেন দলিল খানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া টেবিলের ধারে রাখিয়া বলিলেন—সময় মত দেখব' খন। এখন বেরুবে?

রাজেশ্বর চেয়ার খানায় হেলান দিয়া গোটা দুই হাই তুলিয়া বলিলেন—নাঃ আজ আর বেরুব না!

কি করবে—বাড়ী বসে! চল একটু ঘুরে আসা যাক্। মিসেস্ সেন, মলয় তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন!

রাজেশ্বর আর আপত্য করিলেন না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই উভয়ে মিঃ সেনের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিসেস্ সেন একটা প্রকাণ্ড টেবিলের মধ্যস্থলের আসনটি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার এক পার্শ্বে মলয়, অন্যপার্শ্বে ডঃ লাহিড়ী উপবিষ্ট। অল্প দূরে বিষণ্ণ মুখে মিঃ চৌধুরী বসিয়া সিগারেট টানিতেছিলেন। ইঁহাদের দেখিয়া মিসেস্ সেন ছাড়া সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মিসেস সেন চেয়ার হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ উত্থিত হইয়া কহিলেন—বসুন মিঃ মিত্র! আপনার রেঙ্গুনের গল্প শোনবার জন্যে আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত রয়েছি। আজই আরম্ভ করে দিন, মিঃ মিত্র! কি বল লাহিড়ি? মিঃ মিত্র, এঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হয় নি বোধ হয়, ইনি আমাদের ডক্টর শ্রীভেনাস্ বিমলেন্দু লাহিড়ী, ইনি··· লাহিড়ি, ইনি মলয়ের পিসে ম'শায়!

ডঃ লাহিড়ী কর প্রসারিত করিয়া দিলেন; উভয় কর মিলিত হইল।

মিসেস্ সেন বলিলেন—এঁর সঙ্গে ত আপনার আলাপ হয়েছে মিঃ মিত্র। মিঃ চৌধুরী অনেকদিন বিলাতে ছিলেন, সেখানে ফোটোর কাজে ইনি অসাধারণ উন্নতি করেছেন। আমাদের দেশে যা কখনও সম্ভব বলেই আমরা বিশ্বাস করতুম না, অন্ধকার ঘরে বিনা আলোর সাহায্যে উনি ফোটো তুলে···

রাজেশ্বর সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন—অন্ধকারে ফোটো! সে কেমন—মিঃ চৌধুরী?

মিসেস্ সেন তদগত চিত্তে কহিতে লাগিলেন—মিঃ চৌধুরী, আপনি একদিন আপনার যন্ত্র পাতি গুলো আন্‌বেন, মিঃ মিত্র দেখে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন।

রাজেশ্বরের বিস্ময় তখনও বিদূরিত হয় নাই, তিনি পূর্বের মতই কহিলেন—এ রকম কোনো আবিষ্কারের খবর···

মিঃ চৌধুরী পেচক সদৃশ কণ্ঠে কহিলেন—আপনাকে আমি পরে বল্‌ব মিঃ মিত্র।

মিসেস সেনের উদ্দেশ্য কি ছিল বলা যায়, তিনি মুক্ত ও প্রশংসমান কণ্ঠে মিঃ চৌধুরীর বহুবিধ গুণ কীর্ত্তন করিয়া উপসংহারে কহিলেন, মিঃ মিত্র আমাদের সমাজে এমন ছেলে খুব বেশী আছে বলে মনে করবেন না।

মিঃ মিত্র কি মনে করিতেছিলেন কে জানে, তিনি কোন কথাই বলিলেন না। মিসেস সেন বলিতে লাগিলেন—আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে যে একটা অবসাদ এসে গেছে, সকল বিষয়েই যে চর্বিত চর্বনের ভাব দেখা যাচ্ছে, তা থেকে যে-ই একটু সরে গিয়ে একটা নতুন পথ ধরবে, সেই উন্নতি করবে। মিঃ চৌধুরী যে সেই আদি কালের ডাক্তারী আর ব্যারিষ্টারী ছেড়ে একটা নতুন পথ ধরেছেন, এ থেকে যেমন তাঁর চরিত্র ও বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছে, উন্নতির পথ ও সুগম হয়ে গেছে। আপনি কি বলেন মিঃ মিত্র?

মিসেস্ সেনের কথা শেষ হইতেই মিঃ চৌধুরী চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন—আমাকে আর কিছুক্ষণের জন্যে ছুটি দিতে হবে মিসেস্ সেন!

মিসেস সেন হাস্য মুখে কহিলেন—না, না মিঃ চৌধুরী, অত আড়ষ্ট আপনাকে হতে হবে না, আজ প্রশংসা এ নয়, সত্যি কথা! বলিয়া তিনি সগর্বে একবার সকলকে দেখিয়া লইলেন।

মিঃ চৌধুরীর মুখ রাজেশ্বরের দৃষ্টি অনুভব করিয়াই কালো হইয়া উঠিয়াছিল, তাড়াতাড়ি সমস্ত কাণ্ডটার শেষ করিয়া দিতে একেবারে প্রস্থানোদ্যত হইয়া কহিলেন—আমার একটু কাজ আছে মিসেস্ সেন!—বলিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। শুভ…

মলয় বলিল—কিন্তু মিঃ চৌধুরী, কাল আপনার সেই ফোটোগ্রাফটা গিয়ে মলাইকে দেখাতে হ'বে মনে থাকে যেন!

কথাটা কাণে গেল কি না ঠিক বলিতে পারি না, মিঃ চৌধুরী ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া একটি মস্ত নিঃশ্বাস ফেলিলেন। রুমাল বাহির করিয়া মুখটা, মণিবন্ধ দুইটা বেশ করিয়া মুছিয়া, হ্যাট্, ষ্ট্যাণ্ড্ হইতে টুপি ও ছড়িটি তুলিয়া হন হন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দুরদৃষ্ট বেচারার জানিলেনও না যে কক্ষমধ্যে তখনও তাঁহার প্রসঙ্গই আলোচিত হইতেছিল।

মিসেস্ সেন বলিতেছিলেন—এ রকম ছেলেকে আপনার করতে পারা যথেষ্ট ভাগ্যেরই কথা মিঃ মিত্র! তুমি কি বল? নয়?

মিঃ সেন বলিলেন—নয় আবার! আমার যদি আর একটি মেয়ে থাকতো, আমি এখনই চৌধুরীকে জামাই করতাম!

মিসেস্ সেন কতকটা আনন্দে ও কতকটা নৈরাশ্যে একবার চারিদিক লক্ষ্য করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে কহিলেন—হতে পারতও তাই, যদি কামনা আমাদের বাধ্য হ'ত।

রাজেশ্বর এতক্ষণ বিমনাই ছিলেন, কামনার নাম উঠিতেই পিতৃ হৃদয় সচকিত হইয়া উঠিল, তিনি বার বার মিসেস সেনের মুখের পানে চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু মিসেস সেন সেই যে কথা গুলি বলিয়া ম্লান মুখের সুদ্ধ দৃষ্টি ফেলিয়া কক্ষ প্রাচীরে চাহিয়া বসিয়াছিলেন, কোন কথাই আর বলিলেন না। অথবা সেই অবাধ্য মেয়েটির সম্বন্ধে তিনি এতই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আর কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনাও করিলেন না।

মিঃ সেন বলিলেন—রাজেশ্বর! তোমাকে আমি আগেই বলেছি ডক্টর লাহিড়ীর সঙ্গে আমার মলয়ের…

মধ্য পথেই বাধা দিয়া রাজেশ্বর বলিলেন—শুনেছি, সেন। ভগবান এদের সুখী করুন, এই আশীর্বাদ করি।

ডক্টর লাহিড়ী ও মলয় সঙ্গে সঙ্গে নত মস্তকে আশীর্বাদ গ্রহণ করিল। সকলের অলক্ষ্যে উত্তরের মুখই সায়ং কালের সূর্য্যোদয় তরু শিরের মত রাঙাইয়া উঠিল।

মিঃ সেন বলিতে লাগিলেন—রাজেশ্বর, কাগার কাণ্ডটা দেখলে, লর্ড বিশপ সকলেই এ বিবাহ সমর্থন করেছেন। সেদিন আমাদের গবর্ণর ও আমাকে বলছিলেন, সেন, আপনি যে মহৎ আদর্শ স্থাপন করছেন, আজ না বুঝলেও, আপনার দেশের লোক একদিন তা বুঝতে পারবে। তখন তাদের স্মরণ করতেই হ'বে, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মিলনের সূচনা আপনিই প্রথম করে যেন। তার জন্য তারা আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবে!

এ কথাগুলির একটিও অতিরঞ্জিত নয়। সত্যই

মহামান্য বঙ্গেশ্বর সেদিন এইরূপ স্তুতি করিয়া মিঃ সেনের করমর্দ্দন করিয়া দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কথাগুলো বাংলা দেশের সমস্ত ইংরেজী কাগজে হুবহু উদ্ধৃত হইয়া গিয়াছিল। বাংলা কাগজে বাহির হয় নাই, কারণ বাংলা কাগজের উপর মিঃ সেনের আন্তরিক অশ্রদ্ধা ছিল। মিঃ মিত্র এ দেশে ছিলেন না তাই, নহিলে মিঃ সেনের মুখ হইতে শুনিবার পূর্ব্বেই কাগজে দেখিতে পাইতেন, পরে অবশ্য মুখেও শুনিতে হইত।

মিসেস সেন স্বামীর অন্যমনস্কতায় বিশেষরূপ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন, বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—লর্ড রিপণের একখানা চিঠি ছিল না?

ছিল ত। বলিয়া মিঃ সেন দাঁড়াইয়া উঠিলেন—দেখি, দাঁড়াও!

ডঃ লাহিড়ী বলিলেন—সেখানা আমার বাড়ীতে আছে, কাল আনব' খন।—তিনি অপরাধীর মত ক্ষীণ দৃষ্টি ফেলিতেছিলেন।

রাজেশ্বরের চিঠি দেখিবার আগ্রহ এক তিলও ছিল না, তিনি প্রশান্ত নয়নে কেবল মলয়কেই নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, শেষে বলিলেন মলয় সুখী হোক্, তা হলেই হ'ল—চিঠি থাক্!

মিসেস্ সেন ডঃ লাহিড়ীর দিকে, চাহিয়া তৎর্সনা পূর্ণ স্বরে কহিলেন—তুমি সেদিনই দিয়ে যাবে বলেছিলে লাহিড়ী। কাল এনো, ভুল না!

ডঃ লাহিড়ী অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইলেন।

মিঃ সেন বলিলেন—রাজেশ্বর, আমাদের বড় আশা ছিল, কামনারও···রাজেশ্বরের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া কেমন একটা সঙ্কোচ আসিয়া পড়িয়াছিল, একটু থামিয়া বলিলেন—জোসেফ্ চৌধুরীর মত ছেলে খুব কমই মেলে, রাজেশ্বর।

মিসেস্ সেন স্বামীর বাক্যবিন্যাসের অক্ষমতায় অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উঠিলেন, কহিলেন—মিঃ মিত্র, আমরা যদি ভুল না বুঝে থাকি চৌধুরী কামনার প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট!

আকৃষ্ট।

আমাদের তাই মনে হয়।

রাজেশ্বর উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। কথাটা যেন, বিশ্বাস করা ত দূরের কথা, শুনিতে হইবে বলিয়াই তাঁহার আশা ছিল না।

মিঃ সেন বলিলেন—তুমি একটু চেষ্টা করলেই···

কিসের চেষ্টা সেন?

মিসেস মিত্র মধ্যস্থ হইয়া কহিলেন—যদি শুধুন মিঃ মিত্র, চৌধুরী যে সুপাত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ কারুই থাকতে পারে না, আর আর্থিক অবস্থাও তাঁর খারাপ নয়, বিশেষ করে' তিনি অনেক সম্ভ্রান্তবংশের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে জড়িত, এক কথায় আমরা সকলেই যা চাই, ঠিক তাই! তবে···

রাজেশ্বর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন।

তবে কামনা একটু—একটু অবাধ্য! সেটা আমার মনে হয় আপনি কোনদিন দেখবার সুযোগ পান নি বলেই—হয়েছে!

মিঃ সেন কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন—আহা! যা-হারা একটি মেয়ে! তবে এটা ঠিক, মিত্র, এটা তুমি চেষ্টা করলেই পার।

রাজেশ্বর অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন; দুইমুহূর্ত্ত পরে বলিলেন—কি পারি হে?

মিসেস্ সেন ধৈর্য্যহারার মত বলিলেন—আপনি কি কিছুই বুঝতে পারছেন না মিঃ মিত্র?

রাজেশ্বর সহজসিদ্ধ স্বাভাবিক স্বরেই বলিলেন—কৈ না!

মিসেস্ সেন গর্জিয়া উঠিলেন—আপনার মেয়ের মত আপনি করাতে পারেন। বুঝতে পারছেন ত, কামনাকে আমরা মেয়ের মত ভালবাসি বলেই তার সারা জীবনের সাফল্য কামনা করেই এই প্রস্তাব করছি।

আপনাদের প্রস্তাবই এখন পর্য্যন্ত আমি···

আপনি কামনাকে জোসেফ চৌধুরীর সঙ্গে···

আমার মেয়ে ঠিক সেকালের গৌরী নয়, মিসেস্ সেন, যে দান করলেই করতে পারি।

আপনি তার পিতা, অভিভাবক!

রাজেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—সব সত্যি, কেবল ব্যবসাদার নই, মিসেস্ সেন! মেয়েকে বাচিয়ে বেচতে পারি না! পিতা হ'য়েও না, অভিভাবক হ'য়েও না!—

অজগরের প্রতি পাপিয়া

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

হে অজগর বৃথায় তুমি
তুলছো হেতা হাই,
তোমার সাথে আমার বিবাদ নাই।
তুমি বেড়াও বিষ দিয়ে
আমি বেড়াই শিষ দিয়ে
বনশ্রী দেয় আদর করে
সাত মহলায় ঠাঁই।
তোমার সাথে আমার বিবাদ নাই।

২

কুলরাণী কয় আবার কথা
লতা আমার বোন,
আমার ধরা হয় না পুরাতন।
ফুটাই আমের মঞ্জরী
ভ্রমর ফিরে গুঞ্জরি,
জ্যোৎস্নারি তুফানেতে
সুরের তরী বাই।
তোমার সাথে আমার বিবাদ নাই।

৩

তুমি থাকো কোণের ভিতর
মহিষ করো গ্রাস,
হরিণ শিশুর গলায় লাগাও ফাঁস।
মরো ব্যাধের তীরে
তরুর শিকড় ঘিরে
গোপন করাই ব্যবসা তোমার
চলছে একাধাই।
তোমার সাথে আমার বিবাদ নাই।

৪

তুমি হলে বিপুল কায়া
আমি হলাম ক্ষীণ।
তোমার হাতে কোদাল দেখ
আমার হাতে বীণ।
আঁধার বাসো ভালো,
আমি যে চাই আলো,
অচেনাকে প্রকাশ করাই
ধর্ম আমার ভাই
তোমার সাথে আমার বিবাদ নাই।

৫

হিংস্র তুমি তোমায় জানি
অখ্যাতিতেই খ্যাতি
তুমি অসুর আমি সুরের জাতি।
তোমার ছোবল বেশ
জানে গোধন মেষ,
বিষের আমি বেদন বুঝি,
সুধার গাথাই গাই।
তোমার সাথে আমার বিবাদ নাই।

জীবন রাখতে হলে

জীবন-রসায়ন

ইহা শরীরের রক্ত মাংস ও স্নায়ুর ক্ষতিপূরণ কর্ত্তে পারে অথচ উত্তেজক নয়।

—তথ্য লউন—শ্যামাদাস ঔষধালয়—৬৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্ব-শিল্প সাহিত্যে নূতন বাণী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন নামক একটি ভদ্রলোক "শিল্পীর শিল্প-জ্ঞান" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া আমার বৈশাখের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত "চিত্র প্রদর্শনী" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এখন দেখা যাক্ এই লোকটির শিল্প-জ্ঞানের দৌড় কতদূর।

লেখক শ্রীযুক্ত অতুল বসুর আঁকা নার আশুতোষের Portrait প্রসঙ্গে আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, "লেখক বোধ হয় জানেন না বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের মতে Portrait painting is the lowest branch of art. কারণ প্রতিকৃতি চিত্র ভাবশূন্য মৌলিকতাশূন্য ও সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ।" সত্যই দাদা জানিনা যে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের এমন ধারা উদ্ভট মত কখন থাকিতে পারে এবং এই নূতন তথ্যটা আবিষ্কারের জন্য আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আমরা Arcriticদের লেখা অনেক বইই পড়িয়াছি এবং এখনও পড়িতেছি কিন্তু এমন ধারা প্রলাপ বকিতে তাঁহাদের আজ পর্যন্ত কখনও শুনি নাই। লেখক দয়া করিয়া এই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী-প্রবরদের নাম করিবেন কি? সেন মহাশয় নিজেকেই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী বলিয়া ধরিয়া লন নাই ত? কিন্তু তাহাও ত হয় না; তিনি লিখিয়াছেন, "বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের"; তবে, তিনি যদি নিজেকে একাই একশ বলিয়া ধরিয়া লইয়া থাকেন তাহা হইলে অবশ্য কোন কথা চলে না। অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণে যাহাকে বলে 'গৌরবে বহুবচন' এইটি তাহারই একটি নিদর্শন নয় ত? তাহা হে, Portrait ভাবশূন্য নয় এবং তাহাতে মৌলিকতার অবসর যথেষ্ট আছে। জগৎবরেণ্য শিল্পী Leonardo da Vinciর নাম লেখক মহাশয় কি কখন শুনিয়াছেন? যাঁর নাম শুনিলে আজও জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সম্ভ্রমে মাথা হেঁট করেন; সেন মহাশয় বোধ হয় জানেন না এই শিল্পী যে চিত্র আঁকিয়া বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন তাহা একটি Protrait.

এই Portraitটির নাম হচ্ছে "Mona Lisa del Gioconda" ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম Artcriticদের মতে এই চিত্রটি জগতের একটি 'সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন। Artএর দিক হইতে Raphaelএর মাতৃমূর্তি ছাড়া কোন চিত্র বোধহয় এই portraitটির সমান সম্মান আজ পর্যন্ত ইউরোপে পায় নাই। "Lowest branch of art" আঁকিয়া এই চিত্রকরটি এত সম্মান কিরূপে যে পাইল তাহা লেখক মহাশয় বোধহয় বুঝিতে পারিতেছেন না; যাক্, ফাঁকি দিয়া কোন রকমে বেচারা পাইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে আর যাহাতে এরূপভাবে কেহ ঠকাইয়া না যায় সেন মহাশয় নিশ্চয়ই সে বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন। এই অপূর্ব portraitটি সম্বন্ধে বিখ্যাত Artcritic এবং সাহিত্যিক Theophile Gautier লিখিয়াছেন, "Leonardo da Vinci's Mona Ilsa del Gioconda, the miracle of painting, the work in which art most nearly approached to perfection." Gautier লিখিতেছেন, "The divine Leonardo spent four years in painting this portrait." এই Portrait এর চিত্রকরকে Gautier, divine বলিয়া ও যেন হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। দেখছো দাদা একবার ব্যাপারখানা, একটা Portraitকে কিনা বলা হইল, "The work in which art most nearly approached to perfection." Lowest branch of art কিনা most nearly approached to perfection. Gautier নিশ্চয়ই একটা তৃতীয় শ্রেণীর হবু সাহিত্যিক ছিল—তা না হইলে একটা Portraitকে কিনা artএর চরম বলিয়া ছাড়িয়া দেয়।

যাক্ এখন সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি Titian

বলিয়া কোন শিল্পীর নাম তিনি কি কখন শুনিয়াছেন? এঁর মত শিল্পী ইউরোপের ভাগ্যে দু একটি বই আর জোটে নাই। এঁর Portrait of "Avalos Marquis of Gaust" শিল্পজগতের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। Gautier উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়াছেন, "what is absolutely clear in this masterpiece is it's immortal beauty. The face expresses the enjoyment of perfect beauty, the calm of absolute harmony. ভাগ্যিস্ সেন মহাশয় সে যুগে জন্মান নাই তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই Titianকে গিয়া বলিয়া আসিতেন, "ওকে Portrait বলে না মশাই, Portrait হবে ভাব শূন্য, মৌলিকতা শূন্য ও সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ আর তোমার এ যে যন্ত্রবৎ মৌলিকতা পূর্ণ, ভাবপূর্ণ এবং সীমাহীন।" যাক্ Titian যানে মানে বড্ড বাঁচিয়া গিয়াছেন। তারপর Rambrandt যাঁর তুল্য শিল্পী ইউরোপে দুটি একটির বেশী জন্মান নি, তাঁর সম্বন্ধে artcritica বলিয়াছেন, "The portraits of Rambrandt are incomparable masterpieces of art." তারপর, যখন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী Vandyak; এঁর সম্বন্ধে বিখ্যাত artcritic Lionel Cust লিখিতেছেন, "The chief achievements by Vandyak were not his sacred pictures but the series of Portraits. Both as likeness and as paintings they are to be equally admired. জাপানী শিল্পী ogata Korin যাঁর নাম আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদের তালিকায় স্থান পাইয়াছে, তাঁর সব চেয়ে সেরা শিল্পসৃষ্টি হচ্ছে "A character portrait" এই Portrait আঁকিয়া ইনি জগৎবরেণ্য হইয়াছেন। ভাগ্যিস সেন মহাশয়ের উপর এই সব জগৎবরেণ্য শিল্পীদের বিচারের ভার পড়ে নাই তাহা হইলে বেচারাদের lowest branch ofartএর lowest classএর দাসই বেঞ্চে পাখার ঝুঁপি মাথায় দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। ওরে দাদা, portrait আর ফটো এক নয়। Portraitটা হচ্ছে একটা উচ্চশ্রেণীর art শুধু হুবহু নকল করিলেই Portrait হয় না। Portrait আঁকিতে হইলে কি কি চাই জানেন? "In painting a portrait there are two considerations, its likeness to the original and its *asthatic effect*. A portrait paniter must be something of a Psychologist to read the character, the very soul in the face. He must interpret *not merely copy*." (Lionel Cust).

• • • •

Wats, যাঁর চেয়ে বড় আধ্যাত্মিক এবং ভাবুক শিল্পী ইউরোপে আজ পর্য্যন্ত আর একটিও জন্মায় নি, তাঁর আঁকা Portrait সম্বন্ধে artcritica • বলিয়াছেন, "As noble record of noble and gracious womanhood and expression, it deserves to rank with the artists' finest works."

যে portrait আঁকিয়া Titian, Leonardo de Venci, Rambrandt, Valasquez, Vandyake, Gransbarough, Reynolds, Whistler, Wats, প্রমুখ বিশ্বশিল্পীরা বরেণ্য এবং ধন্য হইয়া গিয়াছেন, সেই portraitকে lowest branch of Art যে লোক সজ্ঞানে বলিতে পারে তার নামের পূর্ব্বে এবং পরে কি prefex এবং suffix যে বসাইতে হইবে তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

অতুল বসুর আঁকা সার আশুতোষের প্রতিকৃতি সম্বন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম, "সার আশুতোষের মুখের মধ্যে যে বিশেষ প্রকাশ ভঙ্গী আছে তাহা শিল্পী ধরিয়া ফেলিতে পারিয়াছেন।" লেখক মহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন, "এক কথায় অবিকল সার আশুতোষের চিত্রের মধ্যে (?) আঁকা হইয়াছে।" ওগো পণ্ডিতপ্রবর তা নয়! "অবিকল মূর্ত্তি" আর "বিশেষ প্রকাশভঙ্গী" এ দুটোর মধ্যে আসমান জমিন তফাত। একটা হচ্ছে মানসিক আর একটা হচ্ছে দৈহিক, একটা হচ্ছে মনোগ্রাহ্য আর একটা হচ্ছে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। অবিকল মূর্ত্তি চোখে দেখা যায় আর প্রকাশভঙ্গী-টুকু দেখিতে হইলে চাই অন্তর্দৃষ্টি। তাই Lionel Cust লিখিয়াছেন, "A portrait painter must be something of a psychologist to read the character, the very soul in the face."

তারপর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহের "পাতালকন্যা" সম্বন্ধে লেখক লিখিয়াছেন, "প্রাণের পরিচয় সেইখানে পাওয়া যায় যেখানে চিত্রটি একটি পরিষ্কার কাব্যে পরিণত হয়। প্রাণের পরিচয় কল্পনার প্রসারতার উপর নির্ভর করে—যে, চিত্রখানার দিকে চাহিলে তাহা দর্শককে ভাবিবার বিষয়বস্তু কিছু দেয়, নতুবা তাহাকে decorative (সাজান) বা common composition (সাধারণ চিত্র) বলে।"

• • • •

ওগো পণ্ডিত প্রবর, decorative art যে সব চেয়ে পরিষ্কার ভাবে কাব্যে পরিণত হয় এবং কল্পনার প্রসারতা যে decorative art এ সবচেয়ে বেশী। অজন্তার চিত্র, রাজপুত আর্ট, মোগল আর্ট যাদের চেয়ে কাব্য এবং কল্পনার খেলা খুব কম পিছনেই আছে, এ সবই হচ্ছে decorative art. অবনীবাবু, নন্দলাল বসু, যাঁদের সম্বন্ধে artcitica বলেন, "চিত্র ক্রমে সুরে এবং কাব্যে পরিণত হইতেছে" তাঁদের দুজনের চিত্রই হচ্ছে decorative school এর অন্তর্গত। তারপর জগৎবিখ্যাত ফরাসী শিল্পী Dulac যাঁর কবিত্ব এবং কল্পনার অন্ত নাই, তাঁর সমস্ত চিত্রই decorative. Burne Jones যাঁর চেয়ে কবিত্বপূর্ণ এবং ভাবুক শিল্পী ইউরোপে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন এবং যাঁর সম্বন্ধে Julia Cartwright বলিতেছেন, "The feauture (?) which distinguished him above all his contemporaries was his rare imaginative faculty" তাঁর আঁকা অধিকাংশ ছবিই decorative art এর কটায় (?) পড়িয়া যায়।

• • • •

আমার খুব বিশ্বাস অজ্ঞলোক decorative art বলিয়া যে আর্টের একটা বিভাগ আছে তাহা জানিতেন না। তিনি আমার প্রবন্ধের মধ্যে decorative এই কথাটা পাইয়া বোধ হয় অভিধান খুলিয়া তার অর্থ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, ফলে অর্থ করিয়াছেন "সাজান" ওহে বাপু decorative art এর বাংলা 'সাজান ছবি' নয়।

তারপর এক স্থলে লিখিয়াছেন Decorative art বা Common Composition." এই Common Composition কথাটার এখানে যে কি অর্থ হইতে পারে তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। লেখক ইহার বাংলা করিয়াছেন, "সাধারণ চিত্র।" এই Common Composition কথাটা লেখক বোধ হয় নিজেই সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বোধ হয় ইংরেজী শিল্প পরিভাষার কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্যই এই নূতন কথাটির সৃষ্টি করিয়াছেন।

• • • •

তারপর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র মজুমদারের চিত্র প্রদর্শনী সম্বন্ধে লেখক লিখিতেছেন, "কলিকাতা আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনী দেখিতে একদিন গিয়াছিলাম। তখন শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। চিত্র দেখিতে দেখিতে তিনি হেমেন্দ্রবাবুর মেঘরাগীর চিত্রটির সম্মুখে আসিয়া বিলক্ষণ প্রশংসা করিলেন। সমবেত ভদ্রলোক ও অবনীন্দ্রবাবুর ছাত্রদের মধ্যে শুনিয়া কে একজন প্রশ্ন করিল, "সার, এর সব ভাল কিন্তু Background টা? অবনীন্দ্রবাবু বলিলেন, "না হে ও বেশ হয়েছে—ওতে বেশ একটা atmosphere আছে এবং মেঘরাগীর গতির সঙ্গে বাধ যায়।"—এ কথাগুলি আমার স্বকর্ণে শোনা।"

বাধায় আমার দেখিতেছি সব গুণই আছে—একে ত এই বিদ্যে তাহার উপর আবার মিথ্যা কথা বলা রোগটা বেশ ভাল রকমই আছে—এ যেন 'গোদের উপর বিষফোড়া।'

অবনীবাবু যেদিন প্রদর্শনী দেখিতে যান সেদিন আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। অবনীবাবু হেমেন্দ্রবাবুর ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে কথা বলিয়াছিলেন তাহার সার অর্থ এই যে, শিল্পীদের প্রত্যেক জিনিষ দেখিবার একটি রূপ আছে, সেই রূপে সেই পদার্থটিকে দেখিলে তবে শিল্পী তাহাকে রূপরূপ দিতে পারে। এই যে মেঘরাগী এরও একটা রূপ আছে, একটা standpoint আছে যে রূপে এবং যে standpoint হইতে দেখিলে ইহার রূপরূপ প্রকট হইয়া উঠে। সে রূপে এবং সেই standpoint হইতে এই মেঘরাগীটিকে মোটেই দেখা হয় নাই। তাই ছবিটা এত প্রাণহীন হইয়া উঠিয়াছে।" ঠিক এই ভাবের কথা অবনীবাবু বলিয়াছিলেন। সেন

মহাশয়ের এই স্বকর্ণে শোনা অদ্ভুত কথাটা পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। তবু ভাবিলাম, হয়ত বা অবনীবাবু কোনদিন লেখকের বাড়ী গিয়া গোপনে চুপিচুপি এই কথাটা বলিয়া আসিয়াছেন। তাই সেদিন তাঁহার সহিত দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি হেমেন-মজুমদারের ছবির সম্বন্ধে এই সব কথা কোনদিন বলে-ছিলেন?" তিনি ত আকাশ হইতে পড়িলেন—বলিলেন, "সে কি হে! তুমিও ত সেখানে ছিলে,—আমি কখন ও কথা বল্লুম?"

ছোট আদালতে দক্ষিণা লইয়া মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া বেড়ান যাহাদের পেশা তাহারাও বোধ হয় এই অলজ্যান্ত মিথ্যাটা বলিতে হুবার ঢোঁক গিলিয়া লইত; কিন্তু ধন্য দাদা, তোমার তাহারও দরকার হইল না—একেবারে বেমালুম, অসঙ্কোচে সাফাই (?) মিথ্যাকথা বলিয়া গেলে—অভ্যাসটা দেখিতেছি বহুকালের।

লেখক মহাশয় আমাকে 'তৃতীয় শ্রেণীর হবুলাহিত্যিক' বলিয়াছেন। সে কথা শিরোধার্য্য। যে দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হইতেছেন স্বয়ং কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে দেশে আমার মত লেখক তৃতীয় শ্রেণীর কেন যাদশ শ্রেণীর সাহিত্যিকও নয়। তবে যখন দেখি সেন মহাশয়ের মত বিদ্যা লইয়াও লোকে এদেশে কলম ধরিতে সাহস করে এবং সেই লেখা কোন সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন, সত্য বলিতে কি, আমার এতদূর পর্য্যন্ত ভরসা হয় যে আমাদের চেয়েও নিম্নশ্রেণীর লেখকেরা এ দেশে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইবার আশা করিতে পারে।

শ্রীবিষপতি চৌধুরী মুর্খ এ।

[নিবন্ধটির স্থানে স্থানে অসম্বন্ধ অভদ্র ভাষা ও ভাবের প্রয়োগ থাকায় আমাদের বাধ্য হইয়া কয়েক স্থলে (তারা চিহ্নিত অংশ) বাদ দিতে হইয়াছে। মূল নিবন্ধের সহিত বর্জ্জিত অংশের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না, ব্যক্তিগত আক্রমণ, তদুপরি অসংযত ভাষা ভাবের সমন্বয় ভদ্রলোকের লিখিতে না-ও বাধিতে পারে, ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা চলে না।—সঃ বাঃ]

জীবন-সঙ্গীত

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল্]

জগৎ দেবার চায় কি জানো?
চায় কি জগৎ-বাসী?
দরদ প্রাণের ভালবাসা,—
নয়কো হিংসা-রাশি!
দেওয়ার মাত্রা বাড়িয়ে সে যাও,
দেওয়া—সে যাও ভুলে।
ফুটাও অমল হাসির কুসুম
ধূলার ছিন্ন মূলে!
ঘরের মাঝে জমনা নয়,
মোছ নয়ন-নীরে,
ছুটাও বুকের ঘূর্ণী বাতাস
স্নিগ্ধ মলয় চিরে!
ভাঙো আবার জীর্ণ পাচিল
কণ্ঠে উঠাও রব
—নাই অশুচি, সবাই শুচি,
প্রাণের স্বজন সব!
বেচারী ভূদৃষ্টিতে নয়
চাপা চরণ-তলে,—
তোমার ছোট গণ্ডী ভিড়াও
মস্ত ভিড়ের দলে!
প্রবল দুঃখবাত্যা বহুক্,
সটান্ খাড়া রবে,—
কোটি ভাইয়ের অটুট বাঁধায়
বন্যার বেগ স'বে।
(এখন) দাঁড়াও দিবিন্ একতরে
নয়কো টলে পড়া,—
এতেই জীবন পাকা হবে,
পাকা বনের গড়া!

বিদেশের স্মৃতি

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল]

ট্রেণ আবার চলিতে আরম্ভ করিলে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল—আমরা ক্রমে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের মস্তকের দিকে উঠিতেছি। দূরের শৈল নিবাস খোদাই-কানালের উচ্চ পর্ব্বতগুলি দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে ট্রেণ খোদাইকানাল রোড ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। সৈনিক পুরুষ বলিলেন "Here is a monkey station" কিন্তু মর্কট একটীও দেখিলাম না। অসংখ্য তেঁতুল ও বাবলা গাছ রাস্তার দুইপাশে বেশ দেখাইতেছে। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে অসংখ্য মর্কট একেবারে প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত হইল। ইহারা গোরা কুলুরের মত হইয়া গিয়াছে। ভগবান রামচন্দ্র দেশে ফিরিবার সময় বোধ হয় ইহারা এইখানেই "made their home."

কলাবাগান আবার বাড়িয়া উঠিল। ১২ টার সময় ট্রেণ ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'মদুরার' সমীপবর্ত্তী হইল। দূর হইতেই সেই ভুবনবিখ্যাত মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইলাম; একটী নদী পার হইয়া ট্রেণ ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। 'কা' বাবুর ট্রাঙ্ক আমার কামরায় ছিল, নামাইয়া দিলাম। আর একটী ভদ্রলোক ট্রাঙ্কেণ্ড্রমএ যাইতেছিলেন তাঁহার সহিত তাঁহাদিগকে দিয়া একটু পরে আসিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া যাইব বলিয়া ফিরিলাম। দেখি সকলেই নামিয়া গিয়াছে একটা বদমাইস্ চেহারার লোক আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। আর যাওয়া হইল না অথবা তাঁহাদের নিকট বিদায় লওয়াও হইল না। তাঁহারা কি ভাবিবেন বিবেচনা করিয়া একটু লজ্জিত হইলাম কিন্তু তাঁহাদের এখন আর কোন চিন্তা নাই, সঙ্গী পাইয়াছেন। অতি কষ্টে Refreshment room হইতে একখানা রুটি ও মাখন যোগাড় করিলাম। জল নাই। অগত্যা একবাটি ঠাণ্ডা কফি সংগ্রহ করিয়া দেখিলাম, আবার আমি একেশ্বর। সুতরাং বেশ করিয়া আনাদি করিয়া সেই আহারের সহযোগে কোনরূপে উদর পূর্ত্তি করিলাম। মাদুরা পুরাতন ও বৃহৎ নগর। রেল লাইনটী চক্রাকারে সহরটীকে বেষ্টন করিয়া দুবার নদী পার হইয়াছে। একটী সুন্দর হ্রদ সহরের সম্মুখেই বর্ত্তমান। বহুলোক স্নানাদি করিতেছে। বাঁকের মুখে সেই ভুবনবিখ্যাত মন্দিরের এক ঝলক দেখিয়া লইলাম।

বাবলা গাছের বন ও কলা ক্ষেতের মধ্য দিয়া ট্রেণ অতি দ্রুত চলিতে লাগিল। মনমদুরাই ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে দেখি মুণ্ডিত মস্তক, প্রকাণ্ড শিখা, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক রেখা কৃষ্ণবর্ণ লোকগুলি ঘুরিতেছে। Up mail এইখানে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া গেল। কাল ঐ ট্রেণেই ফিরিব ইচ্ছা আছে। চারিদিকে ধান ক্ষেত আর তার মধ্যে বাবলা গাছ জলে অর্দ্ধেক ডুবিয়া রহিয়াছে। একটী রাখাল তীরে দাঁড়াইয়া আর কতক-গুলি মহিষ জলে ডুবিয়া রহিয়াছে। আর কোনদিকে পাহাড় দেখা যাইতেছে না। আমরা পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আবার সাগর সমতলে আসিয়াছি।

পরবর্ত্তী একটী ষ্টেশনে একটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিরাটা-কৃতি শ্বেতাধারী ব্রাহ্মণ গলায়, সোণার হার, হাতে সোণার বালা, কতকটা মাথা মুণ্ডিত, পায়ে চর্ম্মপাদুকা, খুটী করিয়া চুল বাধা, "কফি, কফি" হাকিয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্রই 'কফি'। একটা লোক আসিয়া "you want tea sir" জিজ্ঞাসা করিয়া গেল। লোকটী Spencerএর লোক।' একটী হৃষ্টপুষ্ট মহিলা ছেলে কোলে করিয়া ট্রেণের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। রঙ্গীন রেশমী শাড়ী পরা ও কাঁচুলী আটা, হাতে গলায় সোণার গহনা। বোধ হয় একটু উপর শ্রেণীর হইবে। নিম্নশ্রেণীগুলির এত বাহার নাই এবং আকৃতি প্রায় রাক্ষসের মত।

হু হু শব্দে বাতাস চলিতেছে। আবার বুঝি সমুদ্রের কাছে আসিলাম। মাঠে ভেড়া চরিতেছে—হরিণের মত দেখাইতেছে।' চারিদিকেই বিস্তৃত জলাভূমি। তাল গাছের সংখ্যা ও বাতাস বাড়িয়া যাইতেছে।

'রামনদ' ষ্টেশনে বহুলোক উঠা নামা করিল। একটী ভদ্রলোক একখানা Indian Painting by Percy Brown হাতে লইয়া আমার কামরায় উঠিলেন। একটী পাহারাওয়ালা 'এণ্ডুপেণ্ড' বলিয়া সাহেব লোকের গাড়ীতে অন্য কাহাকেও উঠিতে বারণ করিল। এটী District Head Quarters. মেয়েরা কাণে এত ভারী সোণার গহনা পরিয়াছে যে কাণের নথি ২।৩ ইঞ্চি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এবং কাণের ছিদ্রটী একটী টাকা অপেক্ষাও বড় হইয়াছে। এই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বীভৎস চেহারার উপর রঙীন শাড়ী আর এই দোদুল্যমান কর্ণাভরণে তাহাদিগকে বাস্তবিকই রামায়ণ বর্ণিত রাক্ষসী বলিয়া বোধ হইতেছে। হইবেই বা না কেন? রাক্ষসপুরী লঙ্কার নিকটেই আসিয়াছি। একা এই রাক্ষসের রাজ্যে আসিয়াছি মনে করিয়া গাটা যেন ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। মনে হইল আজই তো মদুরা হইতে মন্দির দর্শন করিয়া ডাকগাড়ীতে ফিরিতে পারিতাম। কিন্তু ফিরিতাম কোথায়? 'তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরেই' যার এক রাত্রি দাঁড়াইবার স্থান নাই তার পক্ষে লঙ্কাই বা কি কিষ্কিন্ধ্যাই বা কি?

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। দেখিতে দেখিতে দুদিকে তমালতালি বনরাজীনীলা তটভূমি আর পরক্ষণেই সেই চিরপরিচিত নীলাম্বুরাশি তাহার অফুরন্ত সৌন্দর্য্য আমার পিপাসু নয়নের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিল।

কি একটা কাঁটা গাছের জঙ্গল। মণ্ডপম্ ক্যাম্পে একটী লোক কিচির মিচির কি বলিয়া গেল। cylone শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম লঙ্কাদ্বীপে যাইব কি না জিজ্ঞাসা করিল। এখানে লঙ্কা যাত্রী (তৃতীয় শ্রেণীর) মোষ ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা হয়। 'No' বলিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্র কিন্তু চঞ্চলতা নাই। কয়েকখানা নৌকা ৪।৫টী পাইল তুলিয়া যাইতেছে। দূরে ভগবান রামচন্দ্রের নির্ম্মিত সেতুর ভগ্নাংশ জলের উপর মাথা তুলিয়া জগতের নশ্বরত্বের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। এইস্থান হইতে নব নির্ম্মিত লৌহসেতু ফেলে আমরা পাম্বানদ্বীপে রামেশ্বরম্ যাইব। মন কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মণ্ডপম্ ষ্টেশনে বহুলোক ছুটাছুটী করিতেছিল কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটী বাঙ্গালীও নাই অথবা তাহাদের একটী কথাও বুঝিবার উপায় নাই। একা এ বিষম দুঃসাহসের কাজ করা ঠিক হয় নাই। কোথায় থাকিব কি খাইব তাও জানি না। এখন আর ভাবিয়া ফল কি।

দুই পাশে তমাল তাল আর নারিকেলের বন রঘুবংশের বর্ণনার কথা মনে হইল। চক্ষে না দেখিলে এরূপ বর্ণনা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না তবে কবিরা নাকি মাঝে মাঝে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া থাকেন। ২ পাশে সমুদ্র, মধ্যে সামান্য পরিসর অধির উপর গভীর তমাল বনের মধ্য দিয়া ট্রেণ চলিয়াছে। ক্রমে সমুদ্র আরও কাছে আসিতেছে। দূরে একখানা জাহাজ দেখা যাইতেছে। এখন অনেক জাহাজ দেখিতেছি। ট্রেণ একেবারে সমুদ্রের উপর আসিয়া পড়িল। দুই দিক হইতেই লাইনের গায় অশান্ত তরঙ্গরাশি আছড়াইয়া পড়িতেছে। এমন সুন্দর দৃশ্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সমস্ত দ্বিধা দূর হইয়া গেল। বামদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে নীল জলরাশি নীল আকাশ চুম্বন করিতেছে। সুশীতল সমুদ্র শীকর-বাহী সমীরণ মন প্রাণ জুড়াইয়া দিতেছে। আমরা সমুদ্রের বুকের উপর দিয়া যাইতেছি। প্রকাণ্ড সেতু ইঞ্জিনিয়ারকে ধন্যবাদ দিতেছে। প্রায় ৫ মিনিট বলিয়া সমুদ্র পার হইয়া ট্রেণ "পাম্বান" দ্বীপে উপস্থিত হইল। প্রথম ষ্টেশন "পাম্বান" চারিদিকে নারিকেল

নব বসন্তে
প্রিয়জনকে উপহার দিতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে আমাদের অ্যাইডিয়াল প্রীসেপ্টিসিন এবং মেসিন প্রস্তুত—চন্দন, রয়েল, বকুল, যাস্ত ও ভায়োলেট সাবান ব্যবহার করুন।
ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী
৬৪।১এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪৯৬

শ্রেণী। এখানেও অনেক লোক নামিয়া গেল। ইহাকে লঙ্কা দ্বীপ বলিলেই হয়।

"রামেশ্বরম" ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল। চারিদিকে নারিকেল, তাল ও তমাল বন। আর বালুকা স্তূপ। লোকজন বড় দেখা যায় না। 'কুলী কুলী বলিয়া ডাকিতে ২ জন কুলী হাজির হইল, তাহারা মাল নামাইতেছে এমন সময় একটী লোক ২।১টী ইংরাজী বুলি বলিয়া অযাচিত-ভাবে সাহায্য করিতে লাগিল। মাল লইয়া আসিবার সময় সে হাত পাতিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পকেটে একটী পয়সাও ছিল না। যাহা হউক 'হনুমান ভ্রম' নাম শুনিয়াছিলাম, সেইখানেই যাইতে বলিলাম। হঠাৎ একটী লোক শিষ্য লইব। বুঝিলাম সে পাণ্ডার লোক। প্রথম আমার পথিক দেখিয়া একটু ভয় পাইয়াছিল পরে ভ্রম্ শুনিয়া বাঙ্গালী বুঝিয়া জুটিয়া গেল। সে বাজারে আমার বাসা দিবে এবং কাল দর্শন করাইবে ইত্যাদি ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল। তাহার মত লোকের সাহায্যের আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশন হইতে বাহির হইলাম। একটু দূরেই দেখিলাম নূতন শুক্‌শুকে একটী বাড়ীতে লেখা রহিয়াছে Mahabir Chatram জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এটী গভর্ণমেণ্ট হইতে যাত্রীদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এইখানেই পাণ্ডা বলিলাম। পাণ্ডাজী বলিলেন "ইহা এখনও খোলা হয় নাই বাজারে চলুন" অর্থাৎ একেবারে ফরতল-গত করিতে চান। আমি দাঁড়াইলাম। একটী যুবক বাড়ীতে বসিয়াছিল, দৌড়াইয়া আসিল, ভাঙ্গা ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিল যে আমি তথায় থাকিতে পারি। জিনিষ-পত্র তুলিয়া ঘরে ঢুকিলাম। একতালায় নূতন ঘর— পাণ্ডাজীও ঢুকিয়া মেজের বসিয়া পড়িলেন। আমি তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া কামাইয়া লইলাম। পাণ্ডাজী একদৃষ্টে আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি দেখিয়া বিস্মিত হইতেছিলেন। বোধহয় মনে করিতেছিলেন যে মানুষ এত অনাবশ্যক দ্রব্যেরও সৃষ্টি করিতে পারে।

ক্ষুদ্রের অহঙ্কার

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী]

তরুরে জড়ায়ে রহিছে লতা
বিনায়ে বিনায়ে গরব কথা ;
"আমারে চাহিয়া দেখনা তুমি,
তোমারে জড়ায়ে র'য়েছি আমি ;
আপনার দেহে রেখেছি ঘিরে,
তোমার বিশাল শরীরটীরে ;
সকল বিপদ আপন হ'তে,
রেখেছি ধরিয়া বুকটী পেতে ;
বোঝনা তুমি যে—এ মোর সুখ।"
উছলি উঠিল তরুর মুখ ;
কহিল হাসিয়া, "তাইত লতা।
আমিই বুঝিনে তোমার ব্যথা !
তুমিই আমারে রেখেছ ধরে !
তা' নহিলে ঘটে যেতাম প'ড়ে !!

বিয়ে

[শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর]

(প্যারডি—আর কবে দেখা দিবি ইত্যাদি)

আর কবে বিয়ে দিবি মা ঠাকুরমা,
ফুরালো ক্রিকেট খেলা, বিয়ে দেগো এই বেলা,
পড়ে' পড়ে' তনুক্ষীণ ক্রমে আঁখি জ্যোতিহীন
এখনো বিয়ে না দিলে আরকি করিব ক্ষমা।
খাওয়ালি পরালি সাধ্যে করিলি কত যতন
অনাদর যা কেন এত দেখ্‌বি কবে বধূ রতন ?
চোখে চশমার ঠুলী, পেকে এলো চুলগুলি
বয়স ত আর কম হবে না, বড়ই কেন বয়স কমা।

দেশ-বিদেশ

ভারতে বোলশেভিক ষড়যন্ত্র

কানপুর হইতে সংবাদ আসিয়াছে ভারতের বোলশেভিক ষড়যন্ত্রের গ্রেপ্তার ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী হইতে ভারতে বোলশেভিক ষড়যন্ত্র কি ভাবে প্রসারিত হইয়াছে তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

গুলবাদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট দল গঠন করিয়া বোলশেভিক আন্দোলনের চেষ্টা করিতেছিল। গত ১ই তারিখে সে নাকি হুবলে পরিচয়ণ করিয়া ফেরে এবং প্রায়শিক ডি-আই-ডি কর্ত্তৃক ট্রেনে মিঃ আহমদ হুসেন কর্ত্তৃক পেশোয়ারের একটি পমন পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন সে কানপুর জাতীয় মুসলমান বিদ্যালয়ে ছিল। ইহার সহিত কিছুদিন যাবৎ সে সংশ্লিষ্ট ছিল। প্রকাশ যে, তাহার নিকট হইতে কয়েকখানি বোলশেভিক দলিল পত্র এবং পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে। তাহার এক বন্ধু এবং মস্কোর দপ্তর অফিস হইতে ও ঐরূপ কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। ভারতের বাহিরের বোলশেভিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে সে সকল সময় এই কার্য্যের জন্য সাহায্য ও অর্থসাহায্য পাইতেছিল। গুলবাদিকে ১২ই তারিখে ডাকঘাড়ীতে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিচারার্থ পেশোয়ার পাঠান হইবে।

ফরিদপুরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বৈঠক অবশেষে বৈঠকেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার দলবল লইয়া হিন্দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা কে কথায় কথায় out of order করার অবশেষে তিনি সভাক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিয়া যান। সংবাদ আসিয়াছে যে, চিত্তরঞ্জনের দল সভাক্ষেত্র ছাড়িয়া আসার পর বেশ নির্ব্বিবাদে সভার কার্য্য চলিয়াছিল।

শিক্ষক ব্যতিরেকে

সেতার শিক্ষা

৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১৷৷০

সেতারের অতিরিক্ত গত ৷৷০

প্রকাশক :—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

৪৷১এ সেন লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা

এবং গুরুদাস লাইব্রেরী ও

ডোয়ারকিন কোংর নিকট প্রাপ্তব্য।

অভিনয়ের এক এক খানা ছবি তুলিবার জন্য বায়স্কোপের অভিনেতা অভিনেত্রীরা আমেরিকাতে কত টাকা পাইয়া থাকেন, তাহা শুনিলে আপনারা অবাক হইয়া যাইবেন। প্রসিদ্ধ প্রহসন-অভিনেতা চার্লি-চ্যাপলিন, ৩ বৎসর মধ্যে আটখানা ছবি তুলাইয়া ৩২০ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। মেরী পিকফোর্ড তিন খানা ছবি তুলাইয়া তাহার প্রত্যেক খানার জন্য ১০ লক্ষ করিয়া টাকা পাইয়াছিলেন। বর্ণাঢ্যালঙ্কার আট খানা ছবি তুলাইয়া প্রত্যেক খানার জন্য ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা করিয়া পাইয়াছিলেন। ডিমিই আর অনেক খানা ছবি তুলাইয়া প্রত্যেক খানার জন্য ১।০ লক্ষ করিয়া টাকা পাইয়া ছিলেন, কনষ্ট্যান্স টালম্যাজ কয়েকখানা ছবি তুলাইয়া প্রত্যেকখানার জন্য ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা আদায় করিয়াছিলেন।

গত যুদ্ধের ফলে ইউরোপে আইবুড়ো মেয়েদের সমস্যা অতি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। ফরাসী সরকারী বিভাগ বলিতেছেন, আইবুড়ো অবস্থাতেই মরিতে হইবে, না হয় সতীনের ঘর করিতে হইবে, ইহাদিগকে বিবাহ করিবার পুরুষ নাই। এই সব মেয়েদের মধ্যে অনেকেই বলেন গত ১৯১৩ সালে ইউরোপের অধিবাসী সংখ্যা ছিল ৪৩ কোটি; অতিরিক্ত মেয়ের সংখ্যা ছিল—১০ লক্ষ। ইউরোপের বর্ত্তমান লোক সংখ্যা ৪৭ কোটি ৫৩ লক্ষ। পুরুষ সংখ্যার অতিরিক্ত মেয়েদের সংখ্যা ১৯২৩ সালে ১ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে বর্ত্তমানে ২০ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। ফ্রান্সের অবস্থাই অধিক সঙ্গীন, সেখানে প্রতি হাজার পুরুষে ২২৯ জন স্ত্রীলোক বেশী, জর্ম্মণীতে প্রতি হাজারে ১০০ বেশী, অষ্ট্রীয়াতে ৩৩ জন বেশী, ইতালীতে সব চেয়ে কম—মাত্র ১০ জন বেশী। হিন্দুস্থান

এই সভায় অনেক রকম কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। শনিবারের সভায় দেশবন্ধু সভাপতি শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে বলিয়াছেন যে, আইন জ্ঞান তাঁহার খুবই কম। ইহার উত্তরে জগবাবুর বলা উচিত ছিল যে, পার্শ্ব-বিচার চিত্তরঞ্জনের জন্য অতি অল্প ফোঁক খর্চে গিয়াও পান তাবে। চিত্তরঞ্জন যে বড় আইনজীবী, সে কথাটা দেশ উদ্ধারের কাজেও সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণ আছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন সভাপতির ব্যবহারের নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব পেশ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভায় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, এখানে রঙ্গ-রসের অভিনয় হইতেছে। এই কথায় সভাপতি অত্যন্ত চটিয়া গিয়া তাঁহাকে সভাগৃহ ত্যাগ করিতে বলেন। এবং সভাপতিকে অপমান করিবার উদ্দেশ্যেই এরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে বিনা তাহা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জনকে জ্ঞাপন করিতে বলা হয়। চিত্তরঞ্জন জ্ঞাপন করিয়া দেন যে, শরৎ বাবুর অপমান করিবার উদ্দেশ্য ছিল। যাক্ ব্যাপারটি যে কিছু হয় নাই তাহাই লাভ। হিন্দুস্থান।

ভ্রম সংশোধন—আজিকার গ্যালারির শেষ পৃষ্ঠার (১২৮পৃঃ) দুইখানি চিত্র ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। "চোরা বালি" "দিল সাচ্চা"র ঘাড়ে পড়িয়াছে। পাঠক-পাঠিকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য একথা এখানে বলিয়া [illegible]

শিল্পী।

শিল্পী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা।

বাসন্তী

৯ম বর্ষ] ১২ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩০, ইং ২৬শে মে। [৪৩শ সংখ্যা

তুর্কি সেনাপতি ইস্‌মিদ পাশা

সংবাদ পাওয়া গেল, সেনাপতি ইসমিদ্‌কে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। বার্লিন হইতে জনৈক ষড়যন্ত্রকারী এই উদ্দেশ্যে লুসেনের পথে আসিতেছিল, পথেই তাহাকে আটক করা হইয়াছে। সেনাপতি বীর ইসমিদ নিজ প্রাণ বিপন্ন জানিয়া ভীত হন্ নাই, তিনি বলিয়াছেন, সেনাপতিকে হত্যা করা সহজ নয়।" অবসর সময়েও ইসমিদ তরবারির দিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকেন।

ব্রহ্মদেশীয় নৃত্য।

লোকে বলে ব্রহ্মদেশ নাকি মায়ার দেশ স্বপ্নের দেশ। এ-দেশের লোক—এখনও যাঁরা বর্মা যাবার সুযোগ পান নাই, তাঁহারা স্বপ্নের দেশের কথা শুনতে বা ছবি দেখতে আগ্রহান্বিত ভেবে আমরা ক'খানি নাচের ছবি এখানে তুলে দিলাম। নাচ দেখতে কারুরই অরুচি হয় না, এই ভরসাই আজ ছবি না দিয়ে নাচের ছবিই দেওয়া গেল। স্বপ্নের দেশের নাচের মধ্যে নূতনত্ব দেখা যাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

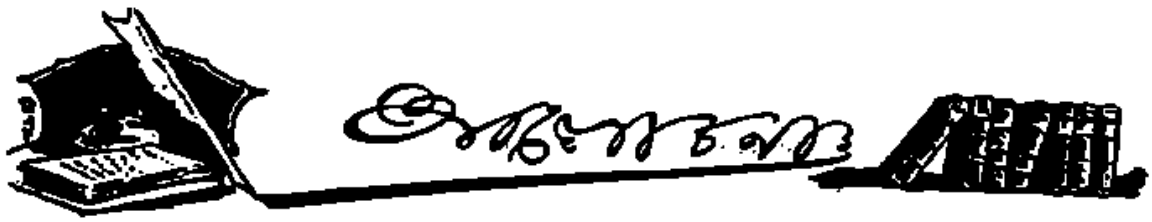

কংগ্রেস কি করিয়া দেশের সার্বজনীন জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইতে পারে তাহা মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর হইতে দেশের লোকে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কংগ্রেসের ছত্রতলে দাঁড়াইয়া মহাত্মা দেশবাসীকে ডাকিয়াছিলেন—সে ডাক শুনিয়া দেশবাসী জাতির গৌরব ছত্রের পানে চাহিয়াছিল। নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া ছত্রের প্রভায় প্রভাবান্বিত মহাত্মার মূর্তি দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া এক লক্ষ্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে চাহিয়াছিল। মহাত্মা চলিয়া গেলে সে গৌরব ছত্রের তলে দাঁড়াইবার মত যোগ্য লোক আর মিলিল না। দেশবাসী এক লক্ষ্য হারাইল। লক্ষ্য হারা দেশবাসী এমন বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছে।

• • • •

কংগ্রেসে ও স্বরাজদলে যেন মনোবাদ লাগিয়া গিয়াছে। এবে অপরের ত্রুটি সন্ধানই বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত। দেশের অন্য কোন ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবসর তাহাদের নাই। কংগ্রেস ও স্বরাজ্য এই দুই দিন পূর্বেই এক কংগ্রেসের দল বা জাতীয় প্রতিষ্ঠান নামেই পরিচিত ছিল। এক লক্ষ্যে মিলিত হইয়া এক মনে ইহা দেশের কাজ করিতেছিল। অন্ততঃ লোকের এই ধারণা। তারপর ক্রমে তাহা দু'দলের এমনি মনের অমিল, মতের অমিল হইয়া গিয়াছে যে দেখিয়া বিস্ময় আসে।

• • •

কার্য্য পদ্ধতি লইয়া যে অমিল চূড়ান্ত হইয়া এতটা ভেদ বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছে সে কার্য্য পদ্ধতি কিন্তু এখনও মোটেই আরম্ভ হয় নাই। স্বরাজ্য দল কৌন্সিলে ঢুকিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেছেন, আর কংগ্রেস দল তাহাতেই খাঁড়কাইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কোন পক্ষেরই বিচলিত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে তাহা বোঝা যায় না। অনেক লোক পরিত্যক্ত আইন ব্যবসায় আবার অবলম্বন করিয়াছেন—অনেকে ভাবের আতিশয্যে গত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত। মিলিত দল আজ ছত্র ভঙ্গ—ইহাদের উপরে চালনা করিবার এমন একজন যোগ্য ব্যক্তি নাই যাহার কথা দুই দলের লোকেই শুনিবেন। দলে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। একে অপরকে হীন বুদ্ধি বলিয়া মনে করে।—তাই সকলেই নিজ নিজ বুদ্ধি বিদ্যা দেখাইয়া প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহেন।

• • • •

দুই দলে বাক্ বিতণ্ডা ও কুৎসা নিন্দার কার্য্য যতটা চলিতেছে—দেশের প্রকৃত হিতকর কার্য্য তাহার শত ভাগের এক ভাগও ইহার কোন দলই করিতেছে না। ইহাদের বাক্‌বিতণ্ডা শুনিতে শুনিতে দেশবাসীর কাণ ঝালা পালা হইয়া গিয়াছে। লোকে আর ইহাদের কোন দলেরই কথা শুনিতে চাহে না। কংগ্রেস বা জাতীয় প্রতিষ্ঠান লইয়া আজ তাহা দু-দল যে কাণ্ড করিয়াছে তাহা দেখিয়া দেশবাসী বিস্মিত অবাক। মনে শুধু ভাবে—আরো কত দিন—কত দিন!

• • •

সার্ভেণ্ট পত্রিকার নামে একটা কলঙ্ক কাহিনী উঠিয়াছিল যে সার্ভেণ্ট নাকি কংগ্রেস তহবিল বা তিলক স্বরাজ ফণ্ড হইতে ছ'হাজার টাকা পাইয়াছে। এ কলঙ্ক কাহিনী প্রথম দু'চার জন লোকের মুখে তারপর ইংরেজী খবরের কাগজে প্রকাশ হয়। অমৃতবাজার বিশেষ ভাবে এই কলঙ্ক কাহিনী প্রচার করিয়া আপনার রোষ ঝালন করেন—যেমন ধারা ঠাকুর ঘরে, কেরে সেই ব্যাপার! পরে সার্ভেণ্ট এ কলঙ্ক আরোপের জবাব দিয়েছেন বটে। তবে এই ছ'হাজার টাকা সার্ভেণ্ট পাইয়াছে বলিয়া তাহার যে কোন কলঙ্ক হইয়াছে এমন কথা আমরা মনে করি না, কোন দেশেই কোনরূপ প্রচার কার্য্য সংবাদপত্রের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না! বাংলা হইতে মহাত্মা গান্ধীর সময়ে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে যত টাকা উঠিয়াছিল সেই টাকা দিয়া দেশে যদি একখানা কি

দু'খানা ভাল সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠা হইত তবে দেশবাসী তাহাতেও অনেক উপকৃত হইত। সুপরিচালিত হইলে তাহা দেশের একটা সম্পদ হইত। তাহা হয় নাই—সার্ভেণ্ট জাতীয় দলের মুখ পত্র—সার্ভেণ্ট দেশের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ ভিন্ন নিচ আদর্শ কখনো ধরে নাই। সার্ভেণ্টের উপর দিয়া অনেক বিপদ ঝড়া বহিয়া গিয়াছে। তবু সার্ভেণ্ট যথা শক্তি নির্ভীকতার সঙ্গে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে—কখনো পাশ কাটাইয়া যায়। নাই এমন অবস্থায় সার্ভেণ্টের প্রয়োজনের সময় যদি সার্ভেণ্ট এই সামান্য টাকা কংগ্রেসের মারফতে পায় তাহাতে দোষের বা কলঙ্কের কি থাকিতে পারে তাহা ত আমরা ভাবিয়া পাই না!

ভারতে নাকি বলশেভিক বড়যন্ত্র ভীষণ ভাবে আত্ম প্রকাশ করিতেছে। বলশেভিক বিপ্লবের ভীতি আজ-কাল সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই বিপ্লব ভীতি হইতে ভারতও রেহাই পায় নাই। নানা রকম বিপ্লব সাহিত্য প্রচার করিয়া নাকি বলশেভিকরা ভারতের মন বিষড়াইয়া দিতেছে। এই অজুহাতে কয়েক জন লোক গ্রেপ্তার ও হইয়াছে। কোন দেশে বিপ্লবের উপাদান যথেষ্ট মজুত থাকিলে তাহা এইরূপ ইন্ধনে সহজেই জ্বলিয়া উঠে। আমাদের এ দেশেও কি বিপ্লবের কারণ ও উপাদান যথেষ্ট জমিয়াছে? নতুবা এত দেশ থাকিতে ভারতে এত টাকা পয়সা খরচ করিয়া বলশেভিকেরা বিপ্লবের ইন্ধন জোগাইতেছে কেন? তবে এসব বল-শেভিক বিপ্লব প্রচেষ্টার কথার সঙ্গে পুলিসের রিপোর্ট মারফতেই আমাদের পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে। তাই যাহা শুনি, তাহাতেই চমকিয়া আমরা বলি- উঃ কি ভীষণ!

* * * * *

মানুষ দুঃখে পড়িয়া—না খাইতে পাইয়াও যেমন মরে আবার সুখে থাকিয়া, প্রচুর ভোগ বিলাস করিয়াও সেই রূপেই মরে। দুঃখের তাড়াই যে মৃত্যুর একমাত্র কারণ তাহা নহে। আমাদের দেশের লোক অভাবে, অনটনে ভুগিয়া না খাইতে, না পরিতে পাইয়া অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, কেহ বা দুঃখের জ্বালা সহিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করে। কিন্তু আত্ম ঘাতীর সংখ্যা এমন দুঃখীর দেশেও খুব বেশী নয়। কিন্তু জগতের সব চেয়ে ধনী দেশ আমেরিকা, এমন ধনী দেশেও এত লোকে আত্মহত্যা করে কেন? গত বৎসর আমেরিকায় এক লক্ষ বৃদ্ধি হাজার লোক আত্মহত্যা করিয়াছে। এঃ আত্মঘাতীদের মধ্যে কোটিপতি পুরুষ ও মহিলার সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। আত্মঘাতী যাহারা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে তিনভাগের এক ভাগ স্ত্রীলোক। একশ বছরের বৃদ্ধা হইতে পাঁচ বৎসরের শিশু পর্য্যন্ত এই আত্মঘাতীদের মধ্যে আছে। অতি তুচ্ছ কারণেও ইহাদের কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে। সেগুলি এমন তুচ্ছ কারণ যে তেমন তুচ্ছ কারণে যে কেহ আত্মহত্যা করিতে পারে তাহা বিশ্বাসই হয় না। মনে হয় এমন তুচ্ছ কারণে যাহারা নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে তাহারা পাগল ভিন্ন আর কিছু নহে। সামান্য মানসিক ক্ষোভে বা দুঃখে চঞ্চল হইয়াই ইহারা নিজ প্রাণ এমন ভাবে বিসর্জ্জন দেয়! জীবনে সুখ যে জাতি অতি মাত্রায় চাহে—দুঃখের সংস্পর্শে তাহারা অতিশয় বিক্ষুব্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শোনা যায় পরকালে যাহারা বিশ্বাসী তাহাদের মধ্যে আত্মহত্যা কম। কারণ তাহাদের মধ্যে ধারণা তাহাকে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হয়। তাই পরলোক বিশ্বাসী আমরা হাজার দুঃখ কষ্টে পড়িয়া—না খাইয়া মরিলেও আত্মহত্যা করিয়া জীবনের জ্বালা জুড়াইতে ভীত হই। ইহকাল পরকালের ভীতি ছাড়িয়া দিলেও এই সব আত্ম-হত্যার মধ্যে বোধ হয় আরো একটি বড় কথা আছে। সে কথাটি এই—মানুষ হইয়া জন্মিয়াও—মানুষের উচ্চ জ্ঞান নীতি ও বুদ্ধি পাইয়াও কুকুর বেড়ালের মতই একটা অদৃষ্ট শক্তির হাতের ক্রীড়নক হইয়া আছে। যুগে যুগে কত মানুষ আসিতেছে—জীবনে কত দুঃখ বেদনা ভুগিতেছে—কিন্তু এ জীবনের পরিণাম কি! জীবনের শেষ পরিণাম এত দুঃখ ভোগের পর—মৃত্যু! জীবনে পূর্ণ সুখ স্বাচ্ছন্দভোগী কেউ নাই। পুঞ্জীভূত দুঃখের মধ্য দিয়া এ জীবন চালাইয়া লইয়া যাইতে হয়। তাই এক শ্রেণীর আত্ম বিদ্রোহী জীবন বিদ্রোহী লোকে এমনি করিয়া জীবনকে বধ করিবার জন্য চঞ্চল হয়—ও আত্মহত্যা।

করিয়া জীবন দীপ নিবাইয়া দেয়। আত্মহত্যাও সংক্রামক ব্যাধির মতই বিস্তার লাভ করে। রুশিয়াতে এক সময়ে আত্ম হত্যার অতি প্রাবল্য ঘটিয়াছিল। পল্লি, নগর—আত্মহত্যায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই সব আত্মহত্যা হইতে বোঝা যায়—মানুষ চলিত সহজ জীবনে, ও চলিত সহজ মৃত্যুতে কোন কালেই মোটেই তৃপ্ত নহে। পরের হাতে ন্যস্ত—অদৃশ্য শক্তির হাতে ন্যস্ত ও পরিচালিত মানব জীবনে মানুষ বোধ হয় সত্যই তৃপ্ত কোন কালেই নহে। তাই সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতে বিশ্বে এই আত্ম হত্যা প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তবে যুদ্ধ বিগ্রহ বা অনাচারে মৃত্যুর চেয়ে আত্মহত্যা করিয়া জীবনের জ্বালা জুড়ান ভাল কি মন্দ ইহা লইয়া জীব তত্ত্ববিদেরা গবেষণা করিতে পারেন বটে। আত্মহত্যার কারণ সম্বন্ধেও নানা জল্পনা কল্পনা চলিতে পারে।

• • • •

হুগলী জেলে কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনশন ব্রত এখনো চলিতেছে। সংবাদপত্র সেবীর সম্পাদক জেল-কয়েদী কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি চাহিয়াছিলেন। অনুমতি পান নাই। কবি নজরুলের অনেক বন্ধু বান্ধব ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হুগলীর জেল ডিপার্টমেন্টের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন—অনুমতি মিলে নাই। কবির মৃত্যুর পূর্বে সাক্ষাতের অনুমতি মিলিবে কি না তাহাও কেহ জানে না। উত্তম ব্যবস্থা! তারপর আমরা জানি প্রতি জেলেই সরকারী ব্যবস্থা ছাড়া বেসরকারীও কয়েকজন সদস্য ও থাকেন—তাঁহারাও মাঝে মাঝে জেল পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য লেখেন। হুগলী জেলের বর্তমান ব্যাপার লইয়া এই যে দেশময় আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে ইহা বে-সরকারী সভ্যদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে কি? তাঁহারা ইহার মধ্যে কোনদিন হুগলী জেলের ব্যবস্থা দর্শনে ও তদন্তে গিয়াছিলেন কি। অব্যবস্থায় জেল কয়েদী মরিতে পারে—কিন্তু তা বলিয়া এই গরমে ব্যবস্থাপক সভার পরিদর্শকগণ ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের হাওয়া ও ঠাণ্ডা সরবতের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া কি ও নরক পরিদর্শনে যাইতে পারেন।

অবশ্য বে-সরকারী পরিদর্শকেরা জেল পরিদর্শন করিতে গেলেই যে তাঁহারা তাঁহাদের মন্তব্য হইতেই দেশবাসীর মনের সকল গ্লানি দূর করিয়া দিতে পারিবেন এমন আশা দেশবাসী করে না। তবে দেশবাসী তাঁহাদের নিকট এটুকু পাইবার আশা করে যে তাহাদেরই স্ব-দেশী কেহ ক্ষমতা পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহারই করিতেছেন। দেশের ব্যবস্থা ও নীতি প্রণেতা দেশ-রক্ষক সরকারেরও দেখা কর্তব্য যে মানুষের জীবন মরণ লইয়া যে ব্যবস্থায় খেলা আমরা সে ব্যবস্থায় সত্যি গলদ কতটা আছে। যে মরণ পিপাসুদের মৃত্যু আসন্ন তাহাদের বাঁচাইবার ব্যবস্থায় এত বিলম্ব দেখিলে মনে হয় তবে কি এই ভাবে চিরকালই ইহারা শুধু মরিবে!

• • •

হায়দারাবাদের নিজাম বাহাদুর বেরার প্রদেশটি ভারত গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে ফিরিয়া পাইতে চাহেন। এই উপলক্ষে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে অনেক লেখা লেখি, কথা চালাইতে হইবে। তাই স্যর আলি ইমাম নিজাম বাহাদুরের এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। এ কাজে স্যর আলি ইমাম দৈনিক হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন। কার্য্য এক বৎসর ব্যাপী চলিবে—তার পরেও চলিতে পারে। কার্য্যের জন্য আপাততঃ তাঁর লক্ষ্য মুদ্রা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে—পরে আবশ্যক হইলে আরো হইবে। এক দরবারেই বার লক্ষ টাকা ব্যয়—তবে এ দরবারও রাজ্য লইয়া দরবার!

• • • •

সরকার বাড়িয়াছে বলিয়া দেশবাসী নানা ভাবে আপত্তি দেখাইয়াছে। কৌন্সিলের সভ্য অনেকে তাঁহাদের অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছে বলিয়া প্রতিবাদ স্বরূপ বর্তমান কৌন্সিল ছাড়িয়া আসিয়াছেন। হয়তো আগামী অধিবেশনে তাঁহারা আবার সভ্য হইবার জন্য প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবেন। কোন কোন কৌন্সিল-সভ্য কৌন্সিল ছাড়িয়া আসিয়া প্রতিবাদ করাই ভাল মনে করিয়াছেন। কিন্তু যাহা কৌন্সিলের সমবেত অমত স্বত্বেও পাশ হইয়া গেল তাহার খণ্ডন এক্ষণে আবার কৌন্সিলরেরা কি ভাবে করিবেন তাহা বোঝা যাইতেছে না। এই সরকার

বিগুণ করিবার কালে কৌন্সিলরেরা বাধা যতটা দেওয়া সম্ভব তাহা দিয়াছিলেন—তবু লবণ কর দ্বিগুণ হইয়াছে। তারপর সংবাদপত্রে ইহার বিরুদ্ধে আলোচনা তাহা যেমন ঢিমে তালে চলা উচিত তাহা এক রকম চলিতেছে। কিন্তু ইহা তীব্র প্রতিবাদ মোটেই নহে। বঙ্গভঙ্গের সময় বাংলার সুরেন্দ্রনাথ যেমন তীব্র আন্দোলন চালাইয়া Settled factকে unsettled করিয়াছিলেন—এ আন্দোলনে তেমন শক্তি ও প্রাণ যেন নাই। বঙ্গভঙ্গের দুঃখ বাঙ্গালীর দুঃখ হইলেও সমগ্র ভারতই সে দুঃখে সমভাগী হইয়াছিল। কিন্তু লবণ কর সমগ্র ভারতের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় হইলেও কোন প্রদেশই ইহার বিরুদ্ধে তেমন তীব্র প্রতিবাদ যেন করিতে পারিতেছে না। আন্দোলনের মুখপত্র হইয়া সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' যেমন আগুন জ্বালাইত জনমতের তীব্র শক্তি যেমনটি এখন আর এক খানাও তেমন ধারা কাগজ আছে কি!

* * *

সত্য সমিতির কার্য্যকারীতা তখন যেমন দেখা গিয়াছে এখন তাহাও যেন দেখা যায় না। লবণ করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা এ পর্য্যন্ত কয়টা হইয়াছে! কিছুই হয় নাই। লবণ কর দ্বিগুণিত হওয়ার জন্য লবণের দাম যাহা বাড়া উচিত দেশীয় লবণ ব্যবসায়ীদের দয়ায় তার চেয়ে ঢের বেশী বাড়িয়াছে। এই কর বাড়ার সুযোগে মফঃস্বলের ব্যবসায়ীরা লবণের মূল্য অসম্ভব বাড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং গড়ে যাহা পিছু লবণের জন্য তিন আনা মাত্র খরচ না বাড়িয়া অনেক বেশী বাড়িতেছে। লবণ ব্যবসায়ীরা দেশেরই লোক, তাহাদের এই অতি লাভের ফন্দী কি দেশবাসীরাই প্রশমিত করিতে পারে না! কিন্তু তাহা কি সম্ভব? সরকার লবণের টেক্স যেমন বাড়াইয়াছেন তেমন ব্যবসায়ীকে লবণ বিক্রয় সম্বন্ধে যদি একটা বাঁধা ধরা দরও নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তবে ভাল হয়। টেক্সকে শিবতী রূপে দাঁড় করাইয়া তবে আর এই অন্যায় বেশী চলিতে পারে না।

দান।

[শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক বি-এ]

অপবাদের বোঝা দিয়ে
করলে আমায় ধন্য,
তোমার চোখে আর ত নহি
নিতান্ত নগণ্য।
দারুণ বিষ লতার হারে
ব্যথিত হই অহঙ্কারে
তোমার দেওয়া কালো এ দাগ
মুছবো কিসের জন্য।

২

কদম্ব আমায় ফলে নিক
অলস ছিলাম চৈতে,
তাকলে তুমি আদর করে
দুখের ফলম্ বৈতে।
কাঁটার পথে চলছি একা
মিলছে সখা তোমার দেখা।
নিঃস্ব আমি বিশ্ব পেলাম
কাজ কি লোকারণ্য।

৩

হাসছে লোকে আজকে দেখে
আমার এ হীন সজ্জা
লজ্জা নিবারণের দেওয়া
ভূষণ, নয় এ লজ্জা।
তোমার হাতের পিচকারী আজ
ছোপালে বুক রাঙ্গাধিরাজ
তাপিত দেহ আনন্দেতে
হচ্ছে অবসন্ন।

রসো বৈ সঃ

"আর্টে বর্ণসঙ্কর"

(ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)

এক সাহেব বোলেছেন "সব আর্টেরই পরিণতি সংগীতে, কারণ একমাত্র সংগীতেই আর্টের দেহ এবং আত্মার অবাধ মিলন সম্ভব।"

অবশ্য ঐ কথাগুলির মানে এ নয় যে ভিন্ন ভিন্ন আর্টের প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য নেই। স্বাতন্ত্র্য থাকতে বাধ্য দুই কারণে—প্রধানতঃ কাণে শোনার আনন্দের সঙ্গে রসনা তৃপ্তির তুলনা হয় না। সুন্দরী স্ত্রীলোক, ভীমনাগের সন্দেশ এবং কৈবর্তদিগের টাট্‌কা পৃথক জিনিষ এবং পৃথক ধরণের আনন্দ সৃজন করে। শুধু তাই নয়, এরই মধ্যে কোন আনন্দ উচ্চশ্রেণীর, কোনটি বা নিম্নের। অবশ্য এমন লোকেরও অভাব নেই যাঁরা এ পার্থক্য ধরতে পারেন না, তাঁরা বলেন উপভোগের আবার ক্লাস কি? সবই সমভাব।" কিন্তু এ প্রকৃতির লোকেরাও আনন্দের শ্রেণীবিভাগ কোরতে রাজী হন, যদি তাঁরা এই বিশ্বাসে আস্থবান হন যে তাঁরা পূর্বোক্ত তিনটির মধ্যে কোন একটি আনন্দ বস্তুকে উপভোগ হতে বঞ্চিত হবেন না। লোকে সমালোচনা হয় না; Nude artএ আবার অজন্তার বাহাদুরী কে দেখে? সুন্দরী বাইজীর গান কি কখন খারাপ হয়? বেশী চিনি এবং দুধ দেওয়া চা বাস্তবিকই সুখরোচক।

প্রকৃতি বিষয় সংক্রান্ত এবং ভাব সংক্রান্ত, বিষয় বিচিত্র, অনুকূল ভাবগুলিও বিচিত্র। তাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয় সাদৃশ্য অনুভূতির দ্বারা। সে অনুভূতিরও একটি গতি আছে; প্রথমে খেয়াল মাফিক ভাল লাগা এবং না লাগা reflex actionএর মতন, যাতে আত্মরক্ষা এবং পূর্বতন সংস্কার অটুট থাকে তাতেই আত্মপ্রসাদ হয় তার উল্টোটাই বিতৃষ্ণা করে। এই বিচারে বুদ্ধির স্থান নেই, instinct বলের মতন পূর্ব অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করিয়ে চলে। তারপর বুদ্ধির তাড়ায় পসন্দের জিনিষ শিব হয়, অপসন্দের জিনিষ অমঙ্গলের রূপ ধারণ করে। সামাজিক মন এবং ব্যবহার শিবকে বরণ করে এবং অশিবকে পরিহার করে। এই অবস্থায় আর্ট এবং বিজ্ঞান সমাজের চোরাবালির ভেতর নিজের গতি হারিয়ে ফেলে আর্ট National হয়, বিজ্ঞানের সাহায্যে যুদ্ধ চালান হয়। কিন্তু ঐ বুদ্ধির গতি বোধির দিকে, অনুভূতি intuitive হওয়া চাই, তা না হলে এই সামাজিক মঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। ইতিমধ্যে বুদ্ধির চাপে প্রবৃত্তি যেমন নিঃচড়ে যায়, আবার কয়েকটা প্রবৃত্তি মার্জিত ও হয়। সেই মার্জিত প্রবৃত্তিগুলির সাহায্যে যে বিষয়গুলি নির্বাচিত হয় তাদের ভেতর এমন একটি মিল পাওয়া যায় যার অনুভূতি অন্য মিলের অনুভূতির তুলনায় স্বতন্ত্র। একেই বোধ হয় Gentile autonomy of art বোলেছেন।

প্রত্যেক সৌন্দর্য্য অনুভূতিই স্বধর্ম পালন কোরে স্বরাজ্য লাভের আশা করে। কিন্তু হয়ে ওঠে না। কারণ সোজা মন জড়পদার্থ নয়, তাকে অন্য পরমাণুতে ভাগ করা যায় না এবং আর্ট politics নয় যে ভূগোল মেনে চলবে।

আর্টের আত গোড়ায় থাকে, পরে আত ঘুইয়ে যেতে মরে। সেদিন দিলীপ রায় একটি খোকার গান শুনে বল্লে "বড়ই ভাল লাগল, খোকার বাহাদুরী দেখে নয়, তার গান শুনে musical feeling মনে উঠছে বোলে।" দিলীপ-রমাধবের Croceএর Aerthetics পড়ে ফিজ।

কিন্তু মানুষ বোধহয় অজ্ঞাতসারে দিলীপের ঠিক উল্টো কথা বলে এবং ঠিক উল্টো কাজ করে।

গ্রেরেটির কি মিষ্টি স্বভাব এবং তার গলাটি কি মিষ্টি—এ দুটি বচনের সঙ্গে রাসবাজারের রসগোল্লার কোন সম্বন্ধ নেই; কিন্তু তবুও আবদ্ধার বলি।

লোকে কবিতা গায়। বাংলার সাধারণে কি কেউ হিন্দী গান শোনে? নব্য ছেলেমেয়েরা রবিবাবুর গান

ছাড়া কেউ গায় না—তাঁর "সোণার পাখী ছিল সোণার খাঁচাটিতে, মনের পাখী ছিল বনে" কীর্ত্তনে শুনেছি। একজনকে রজনী সেনের গান গাইতে অনুরোধ করায় আমরা এই উত্তর পাই "কোন্ রজনীবাবু? যিনি একটি গানে ভজনখানেক পাপ এবং পাপী দেখেন? মুলো খেতে খেতে মুলোর চেকুর ওঠে ও খৃষ্টানীভাব হিন্দুদের ভাল লাগতে পারে না।" আর একজনকে কীর্ত্তন গাইতে বোলে বোলতেন "শশি আমার ঘর ঘর—" Modratesদের গাইতে বল লেদে জোর চাই, নজরুলের গান গাও।" অবনীবাবু এবং তাঁর চেলাদের ছবিতে মেয়েরা রোগা রোগা, দুর্ভিক্ষ এবং ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বোলে তাঁরা থাকতে জানেন না বলা হয়—যেন ঐ সব স্ত্রীমূর্ত্তি আমাদের ভবিষ্যৎ পুত্রকন্যার গর্ভধারিণীর মূর্ত্তি। গোঁসাইজীর গলার এত জোর যে তিনি সুরে তানবীর থাকেন। তাজমহল একখানি প্রস্তর মূর্ত্তি, সাহেবেও একথা বলেন।

এ সবই ভুল ধরে নেওয়া যাক্, কিন্তু লোকে ঠিক ঐ কথাগুলি হোক্ আর না হোক্ ঐ ধরণের কথা কয় এ কথা ঠিক। লোকেরা মূর্খ বোলে চলবে না কেন না রসানুভূতি বিষয়ে যার যারে না। আনন্দ উপভোগের কথা হচ্ছে, এখানে সাধারণে যা করে তা অবহেলা কোরলে চলবে না—সাধারণের আনন্দে অধিকার থাকুক আর না থাকুক কারুর আনন্দ মোটের উপর বেশী হোক্ আর না হোক, তারা আনন্দ পায় একথা ঠিক, এবং তারা ভাবে যে তারা সমান পরিমাণেই আনন্দ পাচ্ছে। লোকে যা বলে তার উপর আমার তত্তুর শ্রদ্ধা নেই—কিন্তু কেন বলে এ জানতে ইচ্ছা হয়।

এর উত্তরে তাঁরা ভুল রসিক। ভুল সূক্ষ্ম কথা ব্যবহার কোরলেই আগে থাকতে রায় দেওয়া হল। 'সূক্ষ্ম' রসিক মানে শিক্ষিত সম্প্রদায় অর্থাৎ যাদের ভাবগুলি হিন্দু হোটেলে ইলিস মাছের মতন সরু চরে চেরা যায় আর ভুল মানে যাদের ভাবগুলি সব কলেজ ছোয়ারের বক্তৃতার মতন এলোমেলো। অর্থাৎ সোণারকের সংস্কৃত ব্যাখ্যা শুনো না, কেন? গরু খেলে সংস্কৃত ভাষার মুৎপত্তি হয় না কেন? কারণ সংস্কৃত লিখতে গেলে মন পবিত্র রাখতে হয় অর্থাৎ গরু না খেয়ে থাকতে হয়। ও উত্তরে চলে না। আসল উত্তর আমার এই বোলে মনে হয় যে জীবনে এবং জ্ঞানে অনুকৃতিতে বর্ণসঙ্কর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জাত থাকে না, যদি থাকাই তার ধর্ম্ম হত তা'হলে জাতের গায়ে আংটা থাকত। বর্ণসঙ্কর চিরকালই ঘটে। শুধু ঘটে নয়, ঘটলেই তারিফ করি।

নায়িকার ভাষা এবং রূপ নায়কের প্রাণে সুরের আলো জ্বলত করে। বীরবলের কি কর্ণচোখ—কোথায় সাহিত্য রস আর রসনা, একেবারে ব্রাহ্মণ শূদ্রের মিলন—তাঁরা লেখা সব চাইনী। সাহিত্যে Pre Raffaeliteদের কবিতা, এমন কি গল্প বুঝতে গেলেও তাঁদের ছবির সঙ্গে পরিচয় থাকা উচিত—Blessed Damozel কি Aylwinএর কথা স্মরণ করুন। নতুন ধরণের বাঙ্গালী ছোকরার ছবির তলায় দু' ছত্র কবিতা না থাকলে বোঝাই যায় না। নন্দ বাবুর 'যমুনা' রবি বাবুর 'বলাকার' illustration মাত্র, একটি সুস্পষ্টোখিত ধ্বনির বিকাশ। গিরীশ বাবুর 'যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে" ভাস্কর্য্যে Daphueর কথা মনে করিয়ে দেয় না কি? অবনী বাবুর কাজরীতে এবং Botticelliর Springএ সুর ও নৃত্যভঙ্গীতে মুখরিত। এবং Titian, Rubensএর ছবি ছোকরার ঘরে কেন টাঙান থাকে তার কারণ অনুসন্ধান কোরতে তাঃ গিরীন্দ্র শেখরের কাছে যেতে হবে না।

আর যদি গ্রীক আর্টের কথা তোলা হয় তা হলেও বলি, সেখানে ন্যায়িতি পরিমিতির চাপে জীবন ফুটে ওঠে না সব চাপা থাকে। সেখানে সব সামঞ্জস্য অর্থাৎ দেহ ও আত্মার অখণ্ডীন মিল—স্বাতন্ত্র্য নেই। গ্রীক্ আর্টে যদি স্বাতন্ত্র্য না থাকে তা হলে ভারতবর্ষের আর্টে থাকতে পারে না—কেন না তারা খুষ্টি জানত আর আমরা আধ্যাত্মিক—অধ্যাত্ম জগতে সবই Synthisis শুনেছি,—তা না হলে কেউ রামপ্রসাদের গান গাইত? এই আলোচনায় গোটা কয়েক সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য।

(১) আমাদের আর্টে জাত ছিল না এখন হয়েছে।

(২) জাত খানিকদূর পোষায় তারপর নয়—তারপর কি হয় Conan Doyle জানেন।

(৩) Art এ Patel Bill এর আজকাল বিশেষ রকম দরকার কেন না লোকে art এর জাত নিয়ে খেপেছে।

(৪) তবে যেমন বড় লোকের জাত থাকেনা এবং যেমন জাতের দরকার ও নেই তেমনি বড় আর্ট ছুৎমার্গের অতীত যেমন রবি বাবুর কবিতা—তাতে গান ও পাওয়া যায়, ছবিও আঁকা যায়, পোষাক পরিচ্ছদ ও পরা যায়, নাচা ও যায়, আবার তাতে পুতুল তৈরী ও হয়।

(৫) জাতীয়তার পক্ষে জাত জাত করা অন্যায়—এবং সে অন্যায় দূর কোরতে গেলে জাত না খুইয়ে বড় জাতি হতে হবে।

চাউনি

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

নদীর পথে জলকে যেতে আপদ পায়ে পায়ে,
দুই বৌড়া লুকিয়ে থাকে শ্যামল বনের ছায়ে ছায়ে!
দুই চোখে তার চাউনি বাঁকা,
অবাক-হয়ে-তাকিয়ে-থাকা,
তাল-তমালের ভিড় যেখানে মিশিয়ে গেছে গায়ে গায়ে—
বিপদ ভারি পায়ে পায়ে!

• • • •

মুখ ফিরিয়ে কলসে যাব, নয়ন যে তার সঙ্গে চলে,
দিনের শেষে যখন মেঘে কোন্ এয়োতির সিঁদুর জ্বলে!
চাউনি যেন কাতর ব্যথায়,
আমার দুটি পায়ে লতায়,—
হোঁচট্ খেয়ে মরব কিনা শেষকালে ঐ ঘাটের তলে?
অবোধ নয়ন সঙ্গে চলে।

তেপান্তরের বাতাস বাজায় মেঠো সুরের মিষ্টি বাঁশী,
রাঙা আলোয় নদীর জলে আল্‌তা-সোনা হাসির রাশি।
কোকিল গুলোর চিট্‌কিরিতে,
সবুজ পাতার শিট্‌কিরিতে,
কে যেন মোর জড়িয়ে গলায় বিনি-সুতোর সোহাগ-ফাঁসি—
বাতাস বাজায় মেঠো বাঁশী।

• • • •

সইলো, তোরা বলতে পারিস্, এমন ক'রে তাকায় কেন?
কেই বা তাকে দিব্যি দিলে, যোবার মত রইতে যেন?
মনের কথা থাকলে বুকে,
বললে পরেই যায় তো চুকে!
ধুক্‌পুকিয়ে মরিনে আর, ছাঁপ ছেড়ে তাই বাঁচি যেন!
মিথ্যে অমন তাকায় কেন?

গ্রাহকের দিকে

স্নানের আরাম পাইতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে, আমাদের আইডিয়াল্ সীরেরিন্ এবং মেদিনে প্রস্তুত :—চন্দন, রয়েলবকুল বাথ ও ভায়লেট সাবান ব্যবহার করুন।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী

৩৪১।এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।　　টেলিফোন ২৪৯৬

মান্যবর শ্রীযুক্ত "বাসন্তী" সম্পাদক মহাশয়
মান্যবরেষু—

বিনীত নিবেদন—

গত ২৯শে বৈশাখ তারিখের "বাসন্তী" তে ও তাহার পূর্ব্ব সংখ্যায় শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীলাল ঘোষ ও আমার "অমৃত বাজার পত্রিকা"র কার্য্যে ইস্তফা দেওয়া উপলক্ষে আপনার মন্তব্য পাঠ করিলাম। এ সম্বন্ধে "সংবাদপত্র সঙ্ঘের" কর্ত্তব্য কি তাহা আপনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "সংবাদপত্র সঙ্ঘের" গত অধিবেশনে এ বিষয় আলোচনার জন্য আপনি উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সভার কার্য্যাবলীর মধ্যে উহার উল্লেখ না থাকায় আলোচনা হয় নাই। সভার কার্য্যাবলী স্থির করিবার জন্য সম্পাদক হিসাবে আমিই দায়ী। এ কারণ আমার কৈফিয়ৎ আপনারা সর্ব্বতোভাবে দাবী করিতে পারেন। আমি জানি পত্রিকার সংস্রব যে কারণে আমরা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, তাহাতে সংবাদপত্রের লেখকগণের মধ্যে গুরুতর চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে "বাসন্তী"তে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনেকের মুখেই শুনিয়াছি। অনেক সম্পাদক ও লেখক আমাকে বলিয়াছেন আমাদের এই লাঞ্ছনার পর তাঁহারা কেহই নিজের মান সম্ভ্রম নিরাপদ মনে করিতে পারেন না। সংবাদপত্র সেবিগণের এ চাঞ্চল্যের বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়াও আমি কার্য্যাবলীতে যে ইহার উল্লেখ করি নাই তাহার কারণ এই যে আমি "সংবাদপত্র সঙ্ঘের" সম্পাদক। আমার নিজের স্বার্থ বিজড়িত এরূপ কোন বিষয় কার্য্যাবলীর ভিতর উল্লেখ করিলে কাহারও কাহারও মনে হইতে পারিত যে আমি নিজ স্বার্থ সাধনোদ্দেশে সঙ্ঘের শক্তি ব্যবহার করিতেছি। আমার বিশ্বাস তাহাতে সঙ্ঘের সভ্যদিগের আমার প্রতি যে বিশ্বাস আছে তাহা ক্ষুণ্ণ হইত। শুধু এই কারণে আমি কার্য্যাবলীর মধ্যে এ বিষয়ের উল্লেখ করি নাই। অবশ্য উপেনবাবু, কিশোরীবাবুর সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাঁহারা সঙ্ঘের সভ্য। তাঁহাদিগের "পত্রিকা"র সংস্রব ত্যাগ উপলক্ষে সংবাদপত্র সেবী মাত্রেরই মাঝে ইজ্জত বাঁচাইবার উপায় স্থির করিবার জন্য গত কার্য্যাবলীতে এ বিষয়ের উল্লেখ করা কিছু দোষের হইত না। কিন্তু আমার সহিত ঐ ব্যাপারের সংস্রব আছে বলিয়া আমি উল্লেখ করি নাই। ইহাতে হয়ত আমার oversensitiveness ও প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আমি কার্য্যাবলীতে কোন বিষয়ের উল্লেখ না করিলেও সভ্যদিগের তাহা আলোচনা করিবার বাধা হয় না। ইতি ভবদীয়

শ্রীমৃণালকান্তি বসু

[সঙ্ঘের শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু এম্-এ মহাশয় সংবাদপত্র সঙ্ঘের সভায় উক্ত বিষয়টির উল্লেখ যে কারণে করেন নাই, তাহা আমরাও বুঝিয়াছিলাম; তাহার বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই। কিন্তু আমরা সভায় প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং তৎসম্বন্ধে সম্যক আলোচনা হইবে আশা ছিল। তাহা ত হয়ই নাই, এ রকম একটা গুরুতর বিষয় আলোচনা করিবার জন্য আজ পর্য্যন্ত সঙ্ঘের কোন অধিবেশন হইল না। সভ্য কেহ প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে চাহিলে সম্পাদক মহাশয়ের সভার কার্য্য বিবরণীতে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে বাধ্য নাই। মৃণালকান্তি বাবুর নিজ স্বার্থ জড়িত আছে, তিনি নিজে কিছু করিতে পারেন না কিন্তু অন্য কোন সভ্য কি ইহার আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না? সংবাদপত্র সঙ্ঘ—সংবাদপত্র সেবিগণের সঙ্ঘ, এ আলোচনা সাহিত্যসেবীগণেরই আলোচ্য। আশা করি কেহ এ গৌরবের, বুঝি না।—সঃ বাঃ]

দু'মাথা গাছ

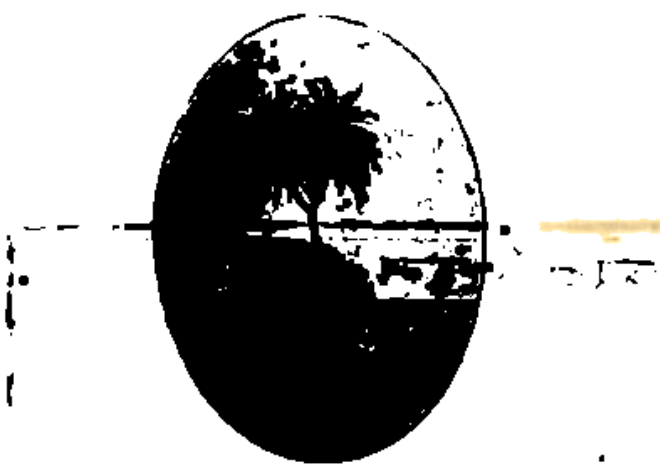

ধীরবাবুর ঘরে একটী আশ্চর্য্য দৃশ্য থাকে। গাছটির দুইটি মাথা। বিশ্বাই সে খুব বেশী চিন্তা করে।

নূতন দ্রৌপদী

ইতালী দেশের সুবর্ণ-বর্ণা কোটিপতি ব্যাঙ্কারটী দ্রৌপদীর পর পর পাঁচটী স্বামীর অন্বেষণ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি ১৯ বৎসর বয়সের সময় বিবাহ করেন। এখনো তাঁহার বয়স ২৮। এই সাত বছরেই পাঁচটিকে খাইয়া তিনি বরের অপেক্ষায় আছেন। দ্রৌপদী বটে তবে নূতন রকমের—এই যা।

অন্ধের দৃষ্টি

[শ্রীগিরিবালা দেবী]

বৈশাখের অপরাহ্ণ। সমস্ত দিন প্রখর জ্বালা বর্ষণের পর সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। চারিদিকে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। বালীগঞ্জে নূতন রাস্তায় উঁচুর একখানি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ীর বারান্দায় পায়চারী করিতে করিতে একটি ২৬।২৭ বর্ষীয় যুবক ঘন ঘন পথের পানে চাহিতেছিল। যুবক-টির পরিধানে সাহেবী পোষাক, গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। দোহারা বলিষ্ঠ অবয়ব, গোঁফ দাড়ী কামানো মুখ মণ্ডল 'হিমানীতে' মার্জ্জিত। মস্তকের তরঙ্গায়িত কেশ গুলি চেরা সিঁথিতে পরিণত হইয়াছে। যুবকটির নাম, সুনীলকুমার মিত্র। পুলিশ বিভাগের বড় চাকুরীতে উন্নীত হইয়া সম্প্রতি তিনি আসানসোল হইতে এখানে আসিয়া বাসা করিয়াছেন। দুই বৎসর হইল সুনীলের বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু অন্যান্য ভাবে নানা স্থানে ঘুরিয়া এ পর্য্যন্তও পত্নী মহামায়াকে আপনার নবপ্রতিষ্ঠিত সংসারে নিজের নিকটে আনা হয় নাই। অবশ্য অবকাশের মধ্যে কয়েক বার শ্বশুরালয়ে শুভাগমন করিয়া সুনীল তরুণী পত্নীটির সহিত আলাপ সালাপ জমাইয়া তুলিয়াছিল। সেই প্রেম ও ভালবাসা এখন চিঠিপত্রে আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। বিরহের অনেক হা-হুতাশ লিপিবদ্ধ করিবার পর আজ তাহাদের মিলন দিবস নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মহামায়া তাহার মাসীমার সহিত আজই ভোর বেলা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এখনও দুইটি পিপাসিত হৃদয় গভীর মিলনে মিলিত হইতে পারে নাই। প্রাতঃকালে মাসীমা বাসায় আসিয়া খবর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন "সুনীল যেন মহামায়াকে আনিবার জন্য ঘরা করিয়া লোক না পাঠায়, আহারাদির পর বৈকালে তিনিই মহামায়াকে বালীগঞ্জে পাঠাইয়া দিবেন।" অবিবেচক মাসীমার প্রতি বিলক্ষণ রূপে অসন্তুষ্ট হইয়া উৎকণ্ঠিত সুনীল সমস্তটা দ্বিপ্রহর শূন্য শয্যায় শূন্য মস্তিষ্কে অতিবাহিত করিয়াছে। আজ রবিবার, আফিসের কাজ নাই, এমন দিনটি যিনি ব্যর্থ করিয়া দিলেন তাঁহার উপর রাগ করিয়াই সুনীল তৃষিত চাতকের মত অনিমেষে পথ পানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল, ব্রাকেটের উপরকার ঘড়িটায় ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ছয়টা বাজিয়া গেল। নারিকেল বৃক্ষের শীর্ষ হইতে অস্ত রবির ম্লান আভা ধীরে ধীরে বিলীন হইল। প্রাঙ্গনের বেল কুঁড়ি গুলি পাতার মধ্য হইতে সহসা প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল। সুনীল আকাশ পটে দ্বিতীয়ার মলিন চন্দ্রমা উদয় হইলেন। কিন্তু মহামায়া আসিল না।

সুনীল বিরক্ত চিত্তে বারান্দা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ঢুকিয়া হতাশ ভাবে আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িল। ভৃত্য নিধিরাম দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল—হুজুর, এখন কি চা হুকুম হয়?" মুখ বিবৃত করিয়া তিক্ত কণ্ঠে সুনীল বলিল "না, না এখন নয়, মেমসাব এলে চায়ের জল চড়াস!" সুনীল বিলাতের পরিবর্ত্তে ৩ মাস বম্বে প্রবাস করিয়াই সাহেব হইয়া উঠিয়াছিল। নকলনবীশের নেশায় বিভোর প্রান্ত যুবক সাহেবী বেশভূষা করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া পত্নীটিকেও উক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটী দেখাইয়াছে, কিন্তু সুনীলের আদরিণী সুন্দরী শিক্ষিতা বধূটী কি ভাবে যে এ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া লইয়াছিল সেটা সাধারণের নিকটে প্রকাশ নাই। কি চাকরদের নিকটে সুনীল স্ত্রীকে মেমসাব' বলিয়া গৌরবান্বিত করিত। আর নিভৃতে তাহাকে 'ডলি' বলিয়া আদর করিত। সেকেলে বিশ্রী 'মহামায়া' নামটি তাহার আদৌ ভাল লাগিত না। শ্রীমতী মহামায়ার—পরিবর্ত্তে শ্রীমতী ডলি—নাম আহির

করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু নামধারিণী কোন প্রকারেই প্রকাশ্যে নূতন নাম গ্রহণে সম্মতা না হওয়ায় অগত্যা সুনীলকে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল।

কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল। সুনীলের শিক্ষিত যন্ত্রে ঘা দিয়া কয়েক খানি গাড়ী ঘর ঘর শব্দে পথ মুখরিত করিয়া চলিয়া গেল। রাস্তার গ্যাসের আলো গুলি প্রজ্বলিত হইল। গৃহে গৃহে সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়া উঠিল। চাঁদের আলে পাশে দুটি একটি করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। নিধি টেবিলের উপরে বাতিটি রাখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। সুনীলের মনে শান্তি ছিল না; সে গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসিয়া একটি সিগারেট ধরাইল। সিগারেট টানিতে টানিতে মনে মনে সংকল্প করিল—আর মিনিট পাঁচেকী অপেক্ষা করিয়া মহামায়ার মাসীর বাড়ী নিজেই যাইবে। নিষ্ঠুরা মাসীর বোনঝিটিকেও দুইটি কড়া কথা শোনাইয়া দিবে। তাহার কি এতটুকু বুদ্ধি নাই? হায় নারী, তোমরা জান না, তোমাদের জন্যই এ ভূভারবাহী নিরীহ গোবেচারীদের কত নাকাল! কত যন্ত্রণা!

সুনীলকে আর বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না। মহামায়াকে বহন করিয়া সুনীলের আকাঙ্ক্ষিত গাড়ী আসিয়া দ্বারে থামিল। নিধি চতুর ভৃত্য, সময় বুঝিয়া কাজ করিতে জানে। ক্ষিপ্র পদে সুনীলের নিকটে মেমসাহেবের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া একটি রজত মুদ্রা পুরস্কার পাইয়া গাড়ীর নিকটে ছুটিয়া গেল।

অকস্মাৎ সুনীলের মলিন বদনে হাসির অরুণালোক ফুটিয়া উঠিল। সুনীল দর্পণের নিকটে দাঁড়াইয়া কেশ বেশের একটু সংস্কার করিল। গন্ধ যুক্ত রুমাল দিয়া মুখ খানি সযত্নে মুছিয়া ফেলিল। একটি ছোট পানের খিলি মুখে পুরিয়া দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়ে সিঁড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। অল্পকাল পর সিঁড়িতে মৃদু পায়ের শব্দ হইল, মহামায়ার অঞ্চলবদ্ধ চাবির গুচ্ছ ঝিনি ঝিনি বাজিয়া জানান দিল "ওগো, নূতন প্রেমের নূতন বঁধু, তোমাদের মিলনের আর বিলম্ব নাই।" পুলকে মলনা হাস্যমুখী তরুণী শেষ সিঁড়িটা অতিক্রম করিতেই দুইটি বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে বন্দী হইয়া লজ্জায় প্রিয় বক্ষে মুখ লুকাইল।

নিভৃত শয়ন কক্ষে স্ত্রীকে পাশে বসাইয়া অভিমান জড়িত কণ্ঠে সুনীল কহিল "এতক্ষণে তোমার সময় হইল ভলি? কি করে যে আমি সমস্ত দিনটা কাটিয়েছি তাও কি তাও মনে হল না?" মাসীমাকে বলে একটু বেলা বেলি আসা গেল না?" মহামায়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল "তা কি বলা যায় গো, দুপুর রোদে তিনি যখন আসতে দিলেন না, তখন কি আমার জোর করে কিছু বলা সাজে?—তা তুমি তো আর আমার আশা পথ চেয়ে ঘরে বসে ছিলে না, কোথায় বেড়াতে—না কোন্ কাজে গিয়েছিলে বুঝি?" বলিতে বলিতে সুনীলের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিল। সুনীল সাদরে স্ত্রীর চিবুক স্পর্শ করিয়া গদ গদ কণ্ঠে কহিল "কাজেও যাইনি, ভলি, বেড়াতেও যাইনি। আমি সারা সকালটি করি নাই কিছু করি নাই কিছু, ভলি আর,—শুধু, কক্ষের তলে, বসিয়া বিরলে মুঁ খানি তোমার ভেবেছি।" মহামায়া স্বামীর হাত খানা হাতের মধ্যে লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল "আর বলতে হবে না! আমার জন্যে ঘরেই যখন বসে আছ তখন বাইরে যাবার পোষাক পরেছ কেন?" সুনীল প্রসন্ন নয়নে নিজের পরিচ্ছদের পানে চাহিয়া গর্ব্বিত স্বরে উত্তর দিল "এ আমার বাইরে যাবার পোষাক নয় ভলি, ধুতি চাদর গুলো আমি পরিত্যাগ ক'রেছি। ও গুলো পরে' না যায় চলা ফেরা, না হয় কাজ কর্ম্মের সুবিধা! তাই এই পথই অবলম্বন করেছি। আচ্ছা এ পোষাকে আমায় তোমার ভাল লাগছে না ভলি?" ভলি কথা কহিল না, গম্ভীর মুখে মৌন হইয়া রহিল! সুনীল পত্নীর ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "সাহেবী পোষাক তোমার পছন্দ হয় না ভলি? আমার কিন্তু খুব পছন্দ হয়।" "আমার মোটেই ভলে লাগে না, আগে যখন তোমায় ধুতি চাদর পরা দেখেছি তাই আমার ভাল লেগেছে। কত দিন হ'ল তোমার ঘাড়ে এ ভূত চেপেছে বল দেখি?"

"ছ মাস আমি ধুতি ছেড়েছি। এটা কি অন্যায় ভলি?"

"অন্যায় আমার নয়? খুব অন্যায়; পরের অনুকরণ কেন করতে যাব! নিজের যা আছে তাই ভাল। সকলেরই জাতীয়তা রক্ষা করা উচিত।"

সুনীলের বক্ষে যেন সহসা হাতুড়ীর ঘা পড়িল। তাহার বিশুদ্ধরূপে ইংরাজী উচ্চারণ ও কথা বলিবার প্রণালী, নিখুঁতরূপে টাই বাঁধা, পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিয়া বন্ধু মহলে কত বাহবা পড়িয়া গিয়াছিল, অনেকের বিশ্বাস সুনীলের এই গুণেই কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া এত শীঘ্র তাহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ দিয়াছে। যাহার জন্য বাহিরে তাহার কত গৌরব, কত সুখ্যাতি সেইটাই কি না সর্ব্ব প্রথমে মহামায়া অপছন্দ করিয়া বসিল। যাহাতে তাহার এত অনুরাগ, সেইটাই মহামায়ার বিরাগের কারণ হইল! ইহারই নাম কি মহামায়ার শিক্ষা? না—আধুনিক রমণীর রীতি নীতি?"

সন্ধ্যার ঘোর কাটিয়া বাহিরে ম্লান জ্যোৎস্নায় ধরণী স্নাত হইল। মাঠের দিক্ হইতে একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া সুধাকরের পদ্মা দোলাইয়া ঘাটের মশারী নাড়িয়া সবেগে বহিয়া গেল। পথের পাশের বৃহৎ বটবৃক্ষের মধ্য হইতে একটি অজানা পাখী করুণ কোমল কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। নিধি ডাকিল—'মেমসাব চা এনেছি।' মহামায়া উঠিয়া ভৃত্যের হস্ত হইতে চায়ের ট্রে' লইয়া মধুর কণ্ঠে বলিল—"আমায় তোমরা সকলে 'মা' বলে ডেকো নিধি, মেমসাব নয়।" পত্নীর কথায় সুনীলের বক্ষে যেন আবার কিসের ব্যথা ঘনাইয়া আসিল। সে যে কি ব্যথা তাহা সে জানে না, কিন্তু তবু এ ব্যথা। এ যে তাহার বড় আশার মিলন রজনী, এ যে তাহার সেই গুলি! কিন্তু কোথায় যেন কিসের ব্যবধান রহিয়াছে, সে ব্যথা অপসারিত না হইলে দুইটি হৃদয় নদী তো একত্রে মিশিবে না; মিলন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

(২)

কয়েকদিন পরে সেদিন দ্বিপ্রহর বেলা, সুনীল ধীরে ধীরে বাড়ী ঢুকিল। কি একটি কার্য্যোপলক্ষে বেলা দুইটার সময় তাহাদের আফিসের ছুটী হইয়া গিয়াছিল। চুপে চুপে অপ্রত্যাশিত ভাবে মহামায়াকে 'চমকিত' পুলকিত করিবার ইচ্ছায় সুনীল পা টিপিয়া টিপিয়া শয়ন কক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; মন তাহার কৌতুকে আনন্দে পরিপূর্ণ। আশা ছিল দেখিবে—মহামায়া তাহারই চিত্র বক্ষে লইয়া কখন নিরীক্ষণ করিতেছে, কখন বা, তাহার উপর কোমল অধর দুটি স্থাপন করিয়া তাহারই প্রতীক্ষায় উতলা হইয়াছে। অথবা সুনীলের বহু আয়াসে লিখিত বিচিত্র প্রেমপত্র গুলি খুলিয়া বিরহিণী বিরহের অশ্রুনীরে ভাসিতে ভাসিতে দীর্ঘ বিপ্রহরকে অতিবাহিত দিতেছে। তাহার আঁখিতারা ঘড়ির পানে নিবদ্ধ, কণ্ঠে মৃদু মৃদু গীত ধ্বনি—

"যার আশে রেখেছি এ প্রাণ, সে কিরে আসিবে ফিরে?

সুখ, সাধ অবসাধ, ভাসিতেছি—আঁখি নীরে।"

শয়ন কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুনীলের সুখ স্বপ্ন অন্তর্হিত হইয়া গেল। কল্পিত—ছবি মুছিয়া গেল। সুনীল দেখিল, দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া মহামায়া চরকায় সুতা কাটিতেছে। তাহার শিথিল অঞ্চল মেজের লুটাইতেছে। এক রাশি ভিজা চুল পিঠের উপর বিন্যস্ত। মধুর কণ্ঠটি নীরবে নাই, কিন্তু তাহাতে প্রেমের বিলাপ, ধ্বনির পরিবর্ত্তে ধ্বনিত হইতেছিল—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই
দীন-দুখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই।"

বাহিরে রৌদ্র বিভাষিত নীলাম্বর তলে ঘন কোলাহল মুখর জগৎ কাহার মায়ামন্ত্রে যেন কিয়ৎকালের জন্য স্তব্ধ নীরব। ঘন ছায়াঞ্চল বটবৃক্ষ শাখা দোলাইয়া সুর সুর শব্দে রৌদ্র তাপিতা প্রকৃতিকে তাহার অব্যক্ত বেদনা জানাইতেছিল। গাছের ডালে বসিয়া বিশ্রাম সুখের মধ্যে কয়েকটা কাক রহিয়া রহিয়া কা—কা করিতেছিল। সমবেত চড়াই পাখী ছায়া শীতল বারান্দায় কিসের জটলায় যেন মাতিয়া গিয়াছিল। চারিদিকেই মধুরতার পরিপূর্ণ সমাবেশ, মহামায়ার কণ্ঠও সুধা বর্ষণ করিতেছিল তবুও সুনীলের চিত্তে কিসের একটা অস্বস্তির আভাস আসিয়া উঠিল। সে যে এ সব ভালবাসে না, শুধু ভালবাসে না, তা নয় যেন ঘৃণাও করে। চরকা, আতীর সঙ্গীত তাহার দুইই চক্ষের বিষ! সেই অপ্রীতিকর ঘটনা, মথিত ক্লিব তাহারই গৃহে, তাহারই বড় আদরের বড় ভালবাসার ডালির এই ভ্রান্তি, এই বর্ব্বরতা!

এই কি পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম? ইহাই কি শিক্ষিতা রমণীর গৌরব?

নীরস কণ্ঠে সুনীল ডাকিল "তলি!" মহামায়া চমকিয়া চাহিল; স্বামীকে নিকটে পাইয়া তাহার বিশাল চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইল। সে ক্ষিপ্রহস্তে চরকাটি গৃহের কোণে রাখিয়া চেয়ার খানা সুনীলের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল "আজ খুব সকালে ছুটি হ'ল বুঝি? চোরের মত চুপে চুপে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছ বল তো?" সুনীল আফিসের পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে কহিল "বেশীক্ষণ আসিনি তলি, এই আস্‌চি। রোজ দুপুর বেলা তুমি কি নিয়ে যেতে থাক, তাই দেখ্‌তে নিঃশব্দেই এসেছিলাম বটে, কিন্তু সত্যের খাতিরে অস্বীকার করবার উপায় নেই তলি, তোমায় এই নীচ কাজ করতে দেখে বড্ড দুঃখিত হয়েছি। তাঁতি আর জোলারাই তো ওসব করে, ভদ্রলোকের কাজ ও নয়!" মহামায়ার হাস্যবদন মুহূর্ত্তের মধ্যে মলিন হইয়া গেল, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। একটু মৌন থাকিয়া মহামায়া আস্তে আস্তে বলিল "যাঁরা—এ হতভাগা দেশের কথা ভেবে, দেশের উপকার করতে চান্, আপনার ভাত কাপড়ের সংস্থান আপনারাই করতে চেষ্টা করেন—তাঁদের পথ অনুসরণ করা ছোট লোকের কাজ নয়। কাজে কেউ ছোট হয় না; ছোট হয় মনে ভাবিতে!" সুনীল উত্তেজিত হইয়া বলিল—"তলি, তোমার মুখে এ কথা শোনবার আশা করি নি আমি। চরকা কেটেই স্বরাজ পাওয়া যাবে—এ পাগলের পাগ্‌লামী তুমিও বিশ্বাস কর?" "শুধু বিশ্বাস করি না যাঁরা এ কথা বলেন তাঁদের ভক্তি করি। যাঁরা দেশের কাজে সর্ব্বস্ব সঁপেছেন মনে মনে তাঁদেরি আমি পূজা করি।" সুনীলের নিকট হইতে উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মহামায়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সুনীল চেয়ারে দেহ ভার রক্ষা করিয়া মুদ্রিত নয়নে ভাবিতে লাগিল—এখন কি উপায়ে মহামায়ার মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিবে। সে যুক্তি দেখাইতে পারে—তর্কের দ্বারা বিজয়ী হইতেও পারে—কিন্তু যে ব্যক্তি তর্ক করিবে না, তর্কের সম্ভাবনায় উঠিয়া যাইবে—কি উপায়ে কোন্ কথায় সুনীল তাহার উজ্জ্বল হৃদয় নদীর ধারা ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিবে? অথচ ইহা নীরবে সহিবার ক্ষমতাও তাহার নাই। অন্তরের বিরুদ্ধ ভাব অন্তঃকরণে লুকাইয়া মুখে স্ত্রীর মতের সমর্থন করা তাহার কর্ম্ম নয়। অনেক ভাবিয়া ও সুনীল এ সমস্যা পূরণ করিতে পারিল না। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তেমনিই পড়িয়া রহিল। কতকাল পূর্ব্বে যে অধীর, আনন্দে, কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হইয়া সুনীল বাড়ী আসিয়াছিল, সে কৌতুক-কল্পনার সুন্দর মূর্ত্তাবলি তাহার হৃদয় হইতে দূরে—বহুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কিয়ৎকাল পর মহামায়া একখানি রেকাবে কয়েক টুক্‌রা কদ ও মিঠাই সাজাইয়া গেলাসে জল লইয়া ফিরিয়া আসিল। মেঝের আসন পাতিয়া—আসনের সম্মুখে খাবার রাখিয়া সুনীলের নিকটে গিয়া ডাকিল "ঘুম পেয়েছে নাকি? ওন্‌ছো, ওঠো, উঠে হাত মুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে, সন্ধ্যা বেলা—না হয় ঘুমিয়ো।"

সুনীল কথা বলিল না, তেমনি চক্ষু মুদিয়া নীরবে রহিল। মহামায়া স্বামীর স্কন্ধে কোমল বাহু দুটি জড়াইয়া পুনরায় বলিল "রাগ হয়েছে নাকি? চরকা কাটা ভালবাস না, তোমার সাম্‌নে আর চরকা কাটবো না, তা হলেই হবে ত। এখন ওঠো—আজ না আমায় বেড়াতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে? নিয়ে যাবার ভয়েই বুঝি চালাকী হচ্ছে?" স্ত্রীর অনুযোগে সুনীলের উঠিতে হইল,—রেকাবী শূন্য করিয়া ঘটিতেও হইল। মহামায়া প্রফুল্ল পাণের খিলি মুখে পুরিয়া সুনীল বলিল "আমার তো দশ কর্ম্মই শেষ হ'ল, এইবার তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও তলি, যতীনবাবুর স্ত্রী তোমায় দেখ্‌তে চেয়েছেন,—সেখান থেকে বায়স্কোপ দেখে রাতে বাড়ী ফেরা যাবে।" "তুমি বেশ তুষা কর, আমার তৈরী হতে দেরী হবে না।" বলিয়া মহামায়া বন্ধ ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পর মহামায়া ফিরিলে তাহার অভিনব সাজ সজ্জা দেখিয়া সুনীল বিস্মিত হইল। এই বেশে মহামায়া বাহিরে যাইবে? মোটা খদ্দরের শাড়ী ও খদ্দরের জামা পরিধানা পত্নীকে কেমন করিয়া সে বন্ধুমহলে লইয়া যাইবে। বড় অপমানের কথা, বড় লজ্জার কথা! সুনীল একবার ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "তলি, এমন সাজে

কি দেখছ? এ সাজ ছেড়ে এস 'লক্ষ্মী'।" "আমার সাজ ঠিক মনঃপূত হ'য়েছে—চেয়েই দেখ না, যদি ভাল না লাগে তবে না হয় অন্য ব্যবস্থা করা যাবে!" বলিয়া মহামায়া স্বামীর মুখের উপর চক্ষু মেলিয়া দিল। সুনীল সে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিল। দন্ত ধৌত ও ওড়া লাল পেড়ে শাড়ী ও আস্তিনে লাল পাড় বসানো ছোট হাতা জামাটীতে সত্যই মহামায়াকে খুবই মানাইয়াছিল; তাহার অর্দ্ধ চন্দ্রবৎ নির্ম্মল ললাটে উজ্জ্বল সিন্দুরের টিপটি জ্বল জ্বল করিতেছিল। গোলাপের পাপড়ির মত অধরৌষ্ঠ তাম্বূল রাগে রঞ্জিত, হাস্যমুখী তরুণীর পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে যে এ বেশে মানায় নাই এ কথা সুনীল বলিতে পারিল না, কারণ সেটা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। কিন্তু শিক্ষাভিমানী মিষ্টার চ্যাটার্জ্জীর বাড়ীতে এমন সাজে পত্নীকে লইয়া যাওয়ার কল্পনায় সুনীলের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জীই যে তাহার সাহেবী মন্ত্রের দীক্ষাগুরু। সুনীল ম্লান হাসির সহিত বলিল "সত্যি তোমায় খুব মানিয়েছে শুলি, তবু এ চট্ পরে তোমার যাওয়া হবে না। আমি পূজোর সময় তোমায় যে সিল্কের শাড়ী ব্লাউজ দিয়েছিলাম সেইটে পরে এস। নতুন হারটা গলায় দিয়ো।" "সে শাড়ী ব্লাউজ বিলেতী, এখন কি সে সব কেউ পরে? আর হারের কথা বলছ, সেটা আমার ভারী পছন্দ হয়েছিল বলে, আমার বড় ভালবাসার আরশায় দান করেছি।" "দান করেছ? আমার প্রীতি-উপহার কোথায়—কাকে তুমি দান করেছ শুলি? আমার স্নেহোপহার তোমার কাছে এতই হেয়, যে কাছেও রাখ্‌তে পার্‌লে না?" "ছিঃ, অমন করে বোলো না, তোমার যেওয়া দ্রব্য যে আমার বড় আদরের বড় স্নেহের,. তাইত সেটা আমি "তিলক সরাজ ভাণ্ডারে" দান করেছি।" "তিলক সরাজ ভাণ্ডারে" তুমি দান করেছ। আমার গয়না সেখানে, এ অসহ্য শুলি! শুলি! তোমার এ বাড়াবাড়ি কখনো আমি সইতে পারব না, আমায় এর প্রতিকার করতে হবে।" "হাঁ, প্রতিকার করতে হবে বৈকি, এটা তো ঘুমিয়ে কাটাবার যুগ নয়, সকলকেই জাগতে হবে।" বলিয়া মহামায়া সুনীলের হাত ধরিল, ক্রোধে দিশেহারা সুনীল স্ত্রীর হাতের মধ্য হইতে হাতখানা টানিয়া লইয়া তীব্র স্বরে বলিল "দুই বছর ভরে তোমায় যা শিখ্‌তে বলেছি এই কি সেই শিক্ষা শুলি? তোমার বাপ্ মা শিক্ষার নাম করে তোমায় এই শিক্ষাই কি দিয়াছিলেন? তুমি কি আমার সেই শুলি, আমার যত সব অপ্রিয় কাজ তাই তোমার দ্বারা সাধিত হচ্ছে!" মহামায়ার কাল চক্ষে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। পিতামাতার প্রসঙ্গে অন্তর প্রদীপ্ত হইয়া, রুদ্ধ কণ্ঠে মহামায়া বলিল "দুই বছর আগের আমি তোমার সে শুলি নই, ঠিক বলেছ, এখন আমি বড় হয়েছি। আমার বয়স হ'য়েছে, এখন কি আমায় আর শুলি ব'লে? আমি এখন মহামায়া। আমি বাড়াবাড়ি কিছুই করি নি, তুমি যে পাপ করছ আমি তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে চাচ্ছি, সেটাও কি আমার অন্যায়? আমার বাবা মার শিক্ষার দোষ? তাঁরা আমায় স্বামীর খেলার পুতুল হ'তে শিক্ষা দেন নি, সহধর্ম্মিণী হ'তেই শিখিয়েছেন।" বলিতে বলিতে মহামায়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।　　(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

তরণী

(মহাভারত)

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

'জীবন'-নদীতে পর-পারে যেতে
এ 'দেহ'-তরণী মূলে,
'ক্ষমা' তা'র হাল, 'সত্য' নঙ্গর—
আছে পাছে দুটী মূলে;
'ন্যায় পরতার' গুণের ধড়িটি
স্রোতোহীন জলে টানি,'
দুবাতাসে 'দানশীলতার' পালে
ভিড়িবে,আপন কূলে।

স্ত্রীশিক্ষা সমস্যা

[শ্রীবিশ্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।]

অধুনা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য জনসাধারণের মধ্যে বেশ আন্দোলন চলিতেছে। স্ত্রীলোকদিগকে কিরূপে শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা লইয়া নানাপ্রকার মত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ "শিক্ষা" বলিলে লোকে পুস্তক পাঠ, হস্তলিপি, অঙ্ক কষা প্রভৃতিই বুঝিয়া থাকেন। সেই জন্যই এদেশে যে সকল বালিকা বিদ্যালয় আছে তাহাতে বালিকাদিগকে ঐ তিনটী বিষয় শিক্ষা দিবার জন্যই চেষ্টা করা হয়, ইহার উপর সূচীকার্য্য শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা অনেক বিদ্যালয়ে আছে।

প্রথমেই দেখা যাউক আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কালে কিরূপ ভাবে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহা জানিবার জন্য বোধ হয় অনেকেরই আগ্রহ হইতে পারে। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবভূতি ভট্টাচার্য্য এম্, এ মহাশয় প্রাচীন শাস্ত্র হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। গত বৎসর কলিকাতায় প্রাচ্য সম্মেলনে সেই প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল। তিনি স্ত্রীশিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করিয়াছেন। বাৎস্যায়ন রচিত পুস্তক হইতে নারীদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি উদ্ধৃত।

(১) উদ্যানের কার্য্য, ফুলবাগান, শাক সব্জীর জন্য স্থান নির্ণয়। গাছের ডাল পালা ছাঁটা এবং কেঁচে জল সেচন ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া। মহাকবি কালিদাস বৃক্ষে জল সেচনরতা শকুন্তলার বর্ণনা করিয়া ইহার সমর্থন করিয়াছেন। (২) উত্তম রন্ধন। (৩) হিসাবনিকাষ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া, (৪) সূত্র নির্ম্মাণ ও বস্ত্রবয়ন শিক্ষা দেওয়া। বাৎস্যায়ন যাহাকে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শিক্ষা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সেই সকল বিদ্যা অধুনা আমাদের নারীসমাজ হইতে লুপ্ত হইয়াছে; ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। প্রাচীনকালে স্ত্রীশিক্ষার যে প্রচলন ছিল তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। লীলাবতী, খনা প্রভৃতি অনেকেই বিশেষ বিদুষী ছিলেন। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে প্রাচীন ভারতে পুরুষদিগের শিক্ষার ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। এখনও পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির মধ্যে নারী শিক্ষা প্রণালী কেবল পুস্তকের মধ্যেই নিবদ্ধ নহে। তাঁহারা পুস্তক ছাড়াও নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। অতীতের তুলনায় আমরা বর্ত্তমান নারী শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত তো করিতে পারিই নাই—বরঞ্চ অনেক অবনতিই হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই স্ত্রীশিক্ষা দিবার বিশেষ পক্ষপাতী। আজকাল অনেক গ্রামে নগরে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। সর্ব্ব প্রথমেই স্ত্রীশিক্ষার দরকার কারণ ইংরাজিতে একটী কথা আছে "The hand that rocks the cradle rules the world."

এদেশে মাতা-ই ছেলেপিলে লালন পালন করেন এবং যেরূপ শিক্ষা দেন, ছেলে মেয়ে সেই শিক্ষানুযায়ীই গড়িয়া উঠে। অতএব মাতা যদি শিক্ষিতা হন তবে তিনি ছেলে মেয়েদের রীতিমত শিক্ষা দিতে পারেন। সুতরাং মাতাই যখন ছেলেদের শিক্ষার একমাত্র হেতু তখন স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন।

আজকাল মেয়েদের বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয় সত্য কিন্তু তাহারা কিছুই শিক্ষালাভ করিতে পারে না, তাহার একমাত্র কারণ বাল্যবিবাহ, তাহাদের সাধারণতঃ ১০ কি ১২ বৎসরের সময়ই বিবাহ হইয়া থাকে। ঠিক এই সময়ই তাহাদের লেখাপড়ার উপযুক্ত সময়। এই সময় যদি তাহারা লেখাপড়া না করিতে পারে, তাহা হইলে কিরূপে তাহারা শিক্ষিতা হইবে? যদি মেয়েদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হয় তাহা হইলে এই বাল্যবিবাহের মূলে কুঠারাঘাত করিতেই হইবে। এই বাল্যবিবাহ প্রথা উঠাইয়া যে পর্য্যন্ত মেয়েরা রীতিমত শিক্ষিতা হইতে পারে, সেই পর্য্যন্ত তাহাদের বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। বাল্যবিবাহ এখন নানা দোষে

দেশ হইতে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু নারীদের শিক্ষার সুবিধার জন্য তাহাদের সংসার যোগ্য কর্মক্ষম করিবার জন্য ইহা লোপ হইতেছে না—লোপ হইতেছে সে অন্য গায়ে।

পূর্ব্বকালে রাজকন্যা মুনি-ঋষিকন্যা, গৃহস্থের কন্যাদের কত বৎসরের সময় বিবাহ দেওয়া হইত? তাঁহাদের ইতিহাস পড়িলে ইহা বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তাঁহারা বেশ বয়স্থা হইলেই তাহাদের বিবাহ দেওয়া হইত। এবং তাঁহাদের স্বয়ম্বর প্রথাও চলিত ছিল। কিন্তু অধুনা মেয়েরা ১০।১১ বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতেই তাহাদের বাড়ীর অন্দরে আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। অল্প বয়সেই নারীদের অশিক্ষিত অবস্থায় সংসারী ও ছেলে মেয়েদের জননী করিয়া তুলিয়া দেশকে ডুবাইয়া ফেলাই যেন দেশবাসীর প্রধান ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে।

আজকাল দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ছেলেরা ক্রমে ক্রমেই অধঃপতির দিকে ধাবিত হইতেছে। তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই একটা আপাতমধুর বিষয়ের জন্য ভবিষ্যৎ জীবনটাকে জলাঞ্জলী দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে। এই সময় যদি একটী ১৫।২০ বৎসরের বালকের সহিত ১০।১২ বৎসরের মেয়ের বিবাহ দেওয়া হয় তবে দুই জনের ভবিষ্যৎ জীবন একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা অনেকেই জীবনে উন্নতি করিতে পারে না। সেই জন্য মেয়েদের একটু বেশী বয়সেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

অনেকে বলেন যে মেয়েদের শিক্ষা দিলে তাহারা নিজেদের ইচ্ছা মত কার্য্য করিবে, সংসারের প্রতি কিছুই মন দিবে না, এবং স্বাধীন ভাবে চলা ফেরা করিবে। ইহা তাহাদের ভুল ধারণা। কারণ যাহার যেরূপ স্বভাব তাহা সে কিছুতে ত্যাগ করিতে পারে না। সে বিদুষীই হউক অথবা মূর্খই হউক। তাহার স্বভাব চিরকাল এক-প্রকার থাকে। অনেকে বলেন যে মেয়েরা যাহারা তিন পাতা ইংরেজী শিখিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের, সমাজ, স্বধর্ম্ম, কোন কিছুই বিশ্বাস করেন না। তাহারা এবিষয় পুরুষদেরও পরাজিত করিয়া থাকেন। কিন্তু মেয়েরা শিক্ষিতা হইয়া কি দেশের কোন কাজেই লাগেন না? তাহাদের মধ্যে বিবেক নাই কি? অনেকে বলেন যে স্কুলে শুধু বিলাসিতাটাই বেশী আড়ম্বরের সহিত শিক্ষা হইতেছে। যে গরীব দেশে মেয়েদের একখানা মোটা কাপড় হইলেই হইয়া যাইত সেই দেশের মেয়েদের আটপৌরে নিত্য সজ্জার সেমিজ, পেটী কোট, ব্লাউস জামদানী সাড়ী, রুমাল, হিলউচু জারবী জুতা, পাউডার, পমেটম হাতঘড়ী চাইই। এ নাহলে শিক্ষিতা নারীর এক মুহূর্ত্ত ও চলে না। তাঁহারা প্রত্যেক কার্য্যেই ইংরেজের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত। ইহার উত্তর এই যে এখনও বাঙ্গালী মেয়েদের স্বাধীনতা প্রদান করা হয় নাই। তাহারা ত এই সমস্ত জিনিষ ইচ্ছা করিয়া বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনে নাই, তবে তাহারা এগুলি কোথায় পাইল? মেয়েরা যে অশনে, বসনে ইংরেজের অনুসরণ করিতেছে, ইহা কেবল আমাদেরই দোষে। আজকাল ছেলেরা যাহারা দুচার পাতা ইংরেজী শিখিয়া-ছেন তাহারা সদাসর্ব্বদাই কিরূপ ভাবে ইংরাজের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিবে তাহা নিয়াই ব্যস্ত এবং

জীবন রাখতে হলে
জীবন-রসায়ন
ইহা শরীরের রক্ত মাংস ও স্নায়ুর ক্ষতিপূরণ কর্ত্তে পারে অথচ উত্তেজক নয়।
—তথা লউন—শ্যামাদাস ঔষধালয়—৬৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তাঁহারাই তাঁহাদিগের মেয়েদের নানাপ্রকারে সাজাইতে ব্যস্ত। যাঁহারা একটু বড় চাকুরী পাইয়াছেন, তাঁহারা একখানা সাহেবী কেসনের বাড়ীতে না থাকিলে তাদের দিন চলেনা। একজন করিয়া তরফা লাগান খানসামা, এবং সাহেবী পোষাক ছাড়া একেবারেই চলে না। কিন্তু ইংরেজ জাতি অন্য কোন জাতির কোন একটা বিষয় অনুকরণ করিতে বড়ই ঘৃণা বোধ করেন। তাঁহাদের আত্ম সম্মান জ্ঞান বড় বেশী। আমাদের আত্ম সম্মান জ্ঞান নাই বলিয়াই আজ আমরা পদে পদে সকল জাতির নিকট উপহাসাস্পদ হইয়া দাঁড়াইতেছি। আমরা নিজের সমাজ, এবং ধর্ম্মকে অপমান করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না। আমাদের ন্যায় হতভাগ্য জাতি এই পৃথিবীতে আর কে আছে? আমরা যদি আমাদের সাহেবী নেশা কাটাইতে পারি তাহলে মেয়েরা কিছুতেই ইহা করিতে পারিত না। অতএব আমরাই ইহার জন্য বিশেষরূপে দায়ী। আমাদের এই সাহেবী ধরণ ছাড়িতে হইবে। এবং আমরা উহা বর্জ্জন করিলে মেয়েরাও বিবিয়ানা নেশা কাটাইতে সমর্থ হইবে। আজকাল প্রত্যেক জাতির মেয়েদের ভিতরে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এখন বাঙ্গালী মেয়েদের আর দুহাতে পায়ে মৃথন বাঁধিয়া ঘরের কোণে করিয়া রাখা উচিত নহে। যাহাতে তাঁহারা দিন দিনই শিক্ষিতা হইয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। নারীশক্তি ব্যতীত কোন জাতিই উন্নতির সোপানে অগ্রসর হইতে পারে নাই, পারিবেও না। এই যে সেদিন ইংরেজ এবং জার্ম্মানীর মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গেল, এই যুদ্ধে শতকরা প্রায় ৯০ জন স্বদেশ ভক্ত বীর স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দেশের কার্য্য রীতিমত সম্পাদন করিতে অধিক স্ত্রীলোক অগ্রসর হন। নারীরা অতীব দক্ষতার সহিত সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা শিক্ষার প্রভাবে নয় কি? ইহা কি তাঁহাদের একটা কম গৌরবের বিষয়। যে ফরাসী মহিলাদিগের ন্যায় বিলাসী পৃথিবীতে নাই তাঁহারাও যুদ্ধের সময় মেথর হোমের কার্য্য হইতে রাজ্যশাসন পর্য্যন্ত সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। রুস ও জার্ম্মানীর নারীগণ কাপ্তেনের পোষাক পরিয়া সৈন্যদল গঠিত করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। আর এ দেশের মেয়েরা সামান্য একটু শিক্ষিতা হইতেই কত বাধা, আপত্তি?

অনেকে হয়ত বলিবেন তাঁহারা অবলা তাঁহারা কি করিবেন? কে বলে নারীদিগকে অবলা? তাঁহারা কখনও অবলা ছিলেন না এবং হইবেনও না। তাঁহারা না করিতে পারেন এরূপ কার্য্য পৃথিবীতে বিরল। শাস্ত্রেও নারীশক্তির অনেক দৃষ্টান্ত আছে। সেই মহাপরাক্রান্ত অসুরগণ সমস্ত দেবগণকে এবং স্বয়ং সুরপতিকেও প্রত্যেক যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বর্গ হইতে বার বার বিতাড়িত করিয়াছিলেন সেই দুর্দ্ধর্ষ অসুরগণ ভগবতী কর্ত্তৃকই নিহত হইয়াছিল।

আজ কাল আমাদেরদেশে স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনও নারীশক্তি ব্যতীত কৃতকার্য্য হওয়া সুদূরপরাহত। নবীন তুরস্কের জাতীয় নেতা মুস্তাফা কামাল পাশা তুর্কে সর্ব্ববিষয়ে নারী স্বাধীনতা আনয়নের জন্য চেষ্টিত। জগতের স্বাধীনতা প্রয়াসী সকল জাতির মধ্যেই নারীরা আত্মশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিতা হইতে চাহিতেছেন। নারীশক্তি ব্যতীত কোন জাতীর উন্নতির আশা নাই। তাহা আমাদের নারীদেরও আজ শিক্ষায়, জ্ঞানে আত্মক্ষমতায় মহিমান্বিতা হইয়া সত্য সুহাসিনী ও দেশলক্ষ্মীরূপে পরিগণিত হইবে।

রাজেশ্বর আর একটি মুহূর্ত্তও সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না। একটা বিদায় সম্ভাষণ ও জানাই-

তাহাদের সম্পর্ক কি, কামনা অনেক ভাবিয়াও তাহা নিরূপণ করিতে পারিল না।

বার প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না, তিনি সরাসর বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া দ্রুতবেগে গাড়ী হাঁকাইতে কহিয়া দিলেন।

কামনা দ্বিতলের বারান্দায় একখানা লম্বা চেয়ারে অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে পিতার প্রতীক্ষা করিতেছিল, পিতাকে আরক্ত মুখে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকটি দমিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে ভাবকে সে মনের মধ্যে স্থায়ী হইতে না দিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এক মুহূর্ত্তকাল নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া পিতার কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল।

পিতাও সেই মুহূর্ত্তে বারান্দা দিয়া কক্ষাভিমুখে আসিতেছিলেন, কামনাকে দেখিয়া ডাকিলেন, কামনা!

কামনা নিঃশব্দে পিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাজেশ্বর জামা খুলিয়া আলনায় টাঙ্গাইয়া দিয়া, নিকটস্থ চেয়ারখানিতে বসিয়া বলিলেন—বোস্ কামনা!

কামনা বসিল না, আস্তে আস্তে পিতার পাশটিতে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল। পিতা যে কারণেই হোক, অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার বক্তব্যও যে গুরুতর, কামনা তাহা ঠিকই বুঝিয়াছিল তাই শঙ্কিত হৃদয়ে পিতার বক্তব্য শুনিবার আশায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজেশ্বর বলিলেন—কতকগুলো লোক আছে কামনা, বাইরেটা তাদের বেশ চকচকে, দেখে খুব শ্রদ্ধাও হয়, ভেতরটা এত জঘন্য, একবার যে দেখেছে সারা জীবনে সে আর ভুলতে পারবে না!

ইহা যে কোন পরিচিত ব্যক্তিরই পরিচয় কামনা তাহা বুঝিল কিন্তু সে লোক যে কে, তাহার সহিত

রাজেশ্বর গম্ভীরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—সভায় বক্তৃতার সময় যত লম্বা লম্বা কথা বল্‌বে, আর কাজের সময় করবে, ঠিক তার বিপরীত। তাও কি তার জন্যে একটু লজ্জিত হবে—কিছু না:! যেন কর্ত্তব্যই করে যাচ্ছে, এমনি ভাবে করবে। সভার বক্তৃতা, খবরের কাগজের প্রবন্ধ—সবই করেছে, কিন্তু যেন কোন সম্বন্ধ নেই তার সঙ্গে—যেন একেবারে অন্য লোক। বুঝলি কামনা?

কামনা বলিল—সেই রকম লোকই ত বেশী আজ!

রাজেশ্বর সাগ্রহে কহিলেন—ঠিক বলেছিস্ কামনা, সেই রকম লোকই বেশী। তোর মামাকে দিয়েই দেখ্ না মা, সমাজ সংস্কার ত তোর মামার একেবারে জন্মগত অধিকার! সেই বুড়ি বাইশ বছর বয়স থেকে সভা-সমিতি করে, বক্তৃতা দিয়ে, ইংরাজী কাগজে প্রবন্ধ লিখে খুব নাম জাহির করলে, দেশের লোক ভাবলে সত্যই বা আবার একজন রামমোহন রায় এসেছে! স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্যে তোর মামার সে সব কি ভীষণ বক্তৃতা, মেয়েদের চিন্তায়, কাজে, কর্ম্মে চলাফেরায় সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা দেবার জন্যে তোর মামা বিলেত থেকে মোটা মোটা টাকা ঢেলে যেম এনে দেশে তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেল্লে, লোকে বল্লে, একটা যুগান্তর এসেছে, বাংলাদেশের চেহারা বুঝি বা বদলে যায়। সমস্ত ইয়োরোপ আমেরিকায় চিঠি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সে কি হৈ-চৈ! কিন্তু যেমন কাজের সময় এসেছে, অমনি যে নিধে, সেই নিধে। স্বাধীনতা রাজার আমলেও বাঙ্গালী যে তিমিরে ছিল, ঠিক সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। এত সভা-সমিতি, এত বক্তৃতা—এক চুল এদিক ওদিক তাদের হয় নি।

কামনা নিঃশব্দে পিতার পায়ের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজেশ্বর বলিতে লাগিলেন—সত্যি বলছি মা, তোর মামাকে এতদিন শ্রদ্ধার চোখেই দেখে এসেছি। যদিও সব সময় অতি-প্রবন্ধ, অতি-বক্তৃতা আমার ভাল লাগত না, তবু তাকে শ্রদ্ধা করতুম এইজন্যে যে, লোকটা অন্তরে যা বিশ্বাস করে, কাজে তা দেখাবারও সাহস রাখে। আজ এক মুহূর্তে এক কথায় আমার সব ভুল ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে মা! আজ আর তোর মামাকে আত্মীয় বলতেও আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না!

আকুল আগ্রহে অধীর হইয়া কামনা কথাটার শেষ জানিবার জন্য বারবার পিতার পানে চাহিতে লাগিল।

রাজেশ্বর বলিলেন—তোর মামাতো বোন্ মলয়ের সঙ্গে এক ডাঃ লাহিড়ীর বিয়ে হবে—শুনেছিস্ কামনা?

শুনেছি বাবা!

এই ডাঃ লাহিড়ী যে, কি তার পরিচয় আমি জানি-নে, শুনলুম ফিলাত ফেরত ডাক্তার, গৃষ্টান, আবার লেখক, বক্তা।

হ্যাঁ বাবা, ডাক্তার লাহিড়ী "বিশ্ববাণীতে" অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখেছেন, সাহিত্যে ওঁর···

রাজেশ্বর আপনার মনেই কহিয়া উঠিলেন—হবে! ছোকরা যদি ভাল হয়, ভাল কথাই, আমার আপত্তি সেখানে নয় মা, আমি ভাবছি কি, এই বিয়ের ঘটক কে? তোমার মামা নিজে, না পাত্র পাত্রীই! এইটেই আমি জানতে চাই।

কামনা ইচ্ছা করিলেই অনেক কথাই বলিতে পারিত কিন্তু কি জানি কেন, কোন কথাই তাহার জিহ্বাগ্রে যোগাইল না।

রাজেশ্বর কহিলেন—ডাক্তার লাহিড়ী যাঁর তোমার মামার মেয়ে মলয়—এদের পরস্পরের খুঁটনের মিলনের ফলে যদি এ বিবাহ হয়, হোক্, উত্তম কথা। কিন্তু তা যদি না হয়, কেবল তোমার মামার মাতব্বরী নেবার মতলবেই একাজ হয়ে থাকে, তা'হলেই···

কামনা বলিল—না বাবা, মলয়ের সঙ্গে ডাক্তার লাহিড়ীর অনেকদিনের আলাপ! ডাক্তার লাহিড়ী যখন মুঙ্গের ডাক্তার হয়ে মেসোপটেমিয়া যান, তখনই মামীমার কাছে মলয়কে পাবার প্রস্তাব করেছিলেন।

আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না কামনা!

কেন বিশ্বাস হয় না, অবিশ্বাসের কারণটা যে কি, জানিবার জন্য কামনা অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল অত্যধিক আগ্রহ জন্মিয়াছিল বলিয়াই মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসিতে পারিল না।

তাহার প্রয়োজন ও হইল না, রাজেশ্বর গম্ভীর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—তাই যদি হবে, মেয়ের ইচ্ছাই যদি তোমার মামার কাছে বড় হয় তবে তিনি আমার মেয়ের মনের ইচ্ছা না জেনেই এমন প্রস্তাব করতে আসেন কেন?

নিজের নামোল্লেখে কামনা কাঁপিয়া উঠিল। মামা কি প্রস্তাব করিয়াছেন সে জানে না কিন্তু পিতার কথার ভাবে ইহা সে স্পষ্টই বুঝিল যে নিশ্চয়ই অসাধারণ একটা কিছু মাতুল মহাশয় করিয়াছেন, তাহাতেই পিতা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আসিয়াছেন।

রাজেশ্বর বলিলেন—তোমার মামী বল্লেন, তিনি তোমার মন জেনেছেন!

পিতা থামিলেন, কিন্তু হত্যাপরাধে অপরাধী বোধ করি বিচারকের মুখের শেষ কথাটা শুনিবার আগ্রহে এত খানি আকুল হয় না, যেমন কামনা হইয়াছিল। পিতা দেখিতে না পান্, বাহুতরে বেতস পত্রের মতই সে কাঁপিতেছিল।

রাজেশ্বর বলিলেন—তোমার মামী বল্লেন, তোমার মন জেনেছেন, আমি জানি, কিছুই জানেন নি, জানবার চেষ্টাও করেন নি। আমার মেয়ের মন জান্লে কখনই বল্তে পারতেন না, কামনা ঘোষেদ্ চৌধুরীর প্রতি আকৃষ্ট!

কামনা হত চেতনের মত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—বাবা!

রাজেশ্বর বাম হস্ত প্রসারিত করিয়া কন্যার কটিদেশ ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিলেন—আমি জানি কামনা, আমি জানি!

ইহাতেও যেন কামনার তৃপ্তি হইতেছিল না। মনে

হইতেছিল, পিতা কতটুকুই বা জানেন! বলিতে গেলে, প্রায় কিছুই জানেন না। সেই বর্বর কামুক লোকটার কতটুকু পরিচয়ই বা তিনি পাইয়াছেন। কিন্তু সে কথা কুমারী কামনা কেমন করিয়া পিতাকে জানাইবে? কোন্ মুখে সে কথা উচ্চারণই বা করিবে!

রাজেশ্বর প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশীই জানিয়া ফেলিয়াছিলেন। কাহাকেও জানাইয়া দিতে হয় নাই, বলিয়া দিতে হয় নাই, নিজেই জানিয়াছিলেন - বলিলেন —সেটা একটা বোম্বেটে কামনা! আস্ত বোম্বেটে। আমি একদিনেই বুঝেছি

বলিবে না, বলিবে না করিয়াও কথাগুলা বিদ্রোহী সৈনিকের মত কামনার কণ্ঠরোধ করিয়া বাহিরে আসিতেছিল, কামনা অতি কষ্টে তাহাদের দমন করিবার চেষ্টা পাইতেছিল, রাজেশ্বর বলিলেন—আগই তোমার মামার ওখানে তাকে আমি বেশ করে চিনে নিয়েছি। জোচ্চোর! হোমরাগ্! অন্ধকারে ফোটো তুলতে পারে বলে তোমার মামা-মামীর সে কি জাঁক! তোমার মামার মত না পড়ে বিদ্বান লোককে ঘুষুতে তোলান শক্ত নয় কিন্তু যে সব খবর রাখে, তার কাছে ধাপ্পাবাজী চলবে কেন, বল! বলুম, বাপু, সে ফোটো তোলাটা কি রকমে হবে শুনি? শুনেই বাছাধন চটে দিলেন! অথচ চা খাবেন, পাউরুটি চিবোবেন বলে টেবিলের ধারে সভা জমকে বসেছিলেন!

কামনা বলিল—আমাদের সবাইকে একদিন অন্ধকার ঘরে বসিয়ে ফোটো তুলতে চেয়েছিলেন...

"তা ত চাইবেনই! বাড়ীর কর্ত্রীটিকে যখন অমন আনাড়ী পেয়েছেন আর ভয় কারে? তারপর একটা কিছু ঘোর ঘোষিয়ে ছবি হয় নি বলতেন, তোমরা ত আর কিছু বুঝতে না, ভাবতে বল কপ্তার কাজ, বিগড়ে গেছে, হবেও বা, আর দিনকতক পরে ও বিদ্যার কথাটা চাপাও পড়ে যেত! আসল যা উদ্দেশ্য একটা নতুন কিছুর রকুণ করে নাম করে নেওয়া, তা ত হয়েই যেত কি না!

তা হ'লে ওটা কিছু নয়?

নারে পাগলি, না। ওটা একটা চাল—বুঝলি নে!

তুমি ওখানে বলে এসেছ—বাবা?

না রে, আর আর বলবার সময় পেলুম কৈ! যে তোর মামা-মামীর তাগ্রাকে পাত্রস্থ করবার তাড়া, পালাতে পারলে বাঁচি! তবে—একদিন বলে আসব!

কামনা মৃদুকণ্ঠে কহিল—না বাবা, তুমি কেন বলে ওদের অপ্রিয় হতে যাও?

রাজেশ্বর হাসিলেন, বলিলেন—অপ্রিয় ত এমনি হয়ে এসেছি মা। বেশী আর কি হ'বো। তবে জানিয়ে রেখা দরকার কামনা, ও রকম Sneak জন্তু পরিবারের মধ্যে স্থান না পায় যাতে তাই করা উচিত।

কামনা অনুনয়ের স্বরে কহিল—না বাবা, তোমার কোন কথায় থাকবার দরকার নেই।

সে কথা থাক্ মা! তোমার মামার ব্যবহারে বড়ই দুঃখ হয়েছি কামনা! তিনি নিজে একটা অসমসাহসিক কাজ করে ফেলেছেন, তাই সর্বাগ্রে চেষ্টা করছেন, বল পুরু করতে! কিন্তু এটা বোঝেন না যে সবাই তাঁর মত নাম আর কাজকে ঘর আর বার করে আলাদা আলাদা ব্যবহার করে না।

রাজেশ্বর এক মুহূর্ত্ত থামিয়া সস্নেহ স্বরে কহিল—আমি বলে এসেছি কামনা, আমার কামনাকে জীবনের অন্য সকল বিষয়েও যেমন স্বাধীনতা আমি চিরদিন দিয়ে এসেছি, তার জীবনের সাথী খুঁজতে সেই স্বাধীনতাই তাকে দোব! আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা, কামনার ইচ্ছার তলেই থাকবে, কোন কারণেই উপরে ঠেলে উঠবে না!

কামনা একাগ্রচিত্তে, বোধকরি তাহাপেক্ষাও বেশী, চেতনহারা চৈতন্যের মতই পিতার কথাগুলি গ্রাস করিতেছিল, পিতা যখন বক্তব্য শেষ করিয়া দক্ষিণ হস্তখানি ধীরে ধীরে কামনার মস্তকের উপর রক্ষা করিলেন, কামনা জ্ঞান পাইয়া জাগিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি পিতার সন্নিকটে বসিয়া পড়িল।

রাজেশ্বর স্নেহসিক্তস্বরে বলিলেন—মা, আমার অন্তরের, অন্তরের অন্তরের এই একই কথা, কোনদিন তার কোন পরিবর্ত্তন হবে না।

কামনার গলার মধ্যে যেন অশ্রু ভরিয়া আসিয়াছিল, ধরিতকণ্ঠে কহিল—সে কি আর আমি জানি নে বাবা।

রাজেশ্বর দুই হাতে কামনাকে তুলিতে তুলিতে বলিলেন—তুই আবার জানবিনে কামনা! তুই যে বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে মা আমার! তবু—একথা তোকে মাঝে মাঝে বলি কেন—জানিস কামনা? পাছে কোন দিন কোন কারণে তুই ভুল বুঝে ফেলিস্, আমার সেই ভয় মা!

পিতার স্নেহাদ্র স্বরে কামনার কণ্ঠে জল ছল ছল করিয়া উঠিল, পিতার জানুর মধ্যে মুখ রাখিয়া আর্দ্র কণ্ঠে কহিল—না বাবা, তোমাকে আমার ভুল কখনই হবে না।

না মা! দেখিস্!—বলিতে বলিতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু আশীর্বাদের মতই কামনার কবরীতে ঝরিয়া পড়িল।

নারীর দাবী

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

আজকাল নারীর অভাব অভিযোগের কথা প্রায়ই শুনা যাইতেছে, সকল নারীর মনেই যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা অনেক রকমেই পাইতেছি।

অনেক পুরুষ হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চান, যেন এ কথাটা তাঁহারা মোটে কেয়ারেই আনিতে চান না। নারীর আবার অভাব অভিযোগ কি? নারী সযত্নে গৃহাভ্যন্তরে রক্ষিত, থাকিবার জিনিস, তাহার আবার দাবী কি? প্রাণহীন পুতুল কি দাবী করিতে পারে? সে যে কথা বলিতেই পারে না।

আজ অর্দ্ধেকের বেশী পুরুষ বুঝিয়াছে নারী আর ঘুমাইয়া থাকিবে না, নারী এখন জাগিয়াছে সে তাহার প্রকৃত অধিকার চায়; যাহারা বুঝে নাই তাহারা নানা তর্ক যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছে ইহা কখনই হইতে পারিবে না। নারীর আগরণ, এ শুধু স্বেচ্ছাচারিতা প্রদারতার একটা আহ্বান মাত্র। নারীকে দাবী করিতে দেওয়া হইবে না, তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতেই হইবে।

কিন্তু মুখ বন্ধ করা—সে কি একটা কথার কথা? নারীর মধ্যে যে সত্য জাগিয়া উঠিয়াছে, সে সত্যকে এখন জোর করিয়া চাপিয়া রাখা কোন মতেই চলিবে না। মিথ্যার আবরণ কতক্ষণ টিকিতে পারে? মিথ্যা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। সত্য প্রকাশ হইবে, সে কখনই গোপনে থাকিবে না। নারীর মধ্যে সত্য ফুটিয়া উঠিতেছে, নারী অন্তরের চক্ষু উন্মীলন করিয়া আপনার অবস্থা প্রণিধান করিয়াছে।

এ তো শুধু একটা দেশের আলোড়ন নহে, গোটা জগতের আন্দোলন। আর একটা পুরুষ ও মেয়ে দুয়ের মধ্যেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। দেশের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। আজ কার দিনে কেহ অধীন হইয়া থাকিতে চায় না, সকলেই চায় স্বাধীনতা তবে—পুরুষের হৃদয়ে ও যে ইচ্ছাটা জাগিয়া উঠিতে চায়, নারীর হৃদয়ে কেন তাহা জাগিবে না? সত্য পুরুষ নারী ভেদ রাখে না, সে সকলের হৃদয়েই জাগিয়া উঠিতে পারে। নারী পুরুষের অধীন, তাহাই বলিয়া সে এযাবৎ অনেক পীড়ন, অনেক অত্যাচার সহিয়া আসিয়াছে। এই বাংলার নারীনির্য্যাতন আজ নূতন কথা নহে। নারীকে এমনভাবে চাপিয়া রাখা হইয়াছে যে তাহার অবস্থা ভাবিলে জ্ঞান থাকেনা। নারীকে অনেক স্থলে দেবী নামে উক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু সে দেবীকে যে কিরূপ সম্মান দেখানো হয় তাহা নারী ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না।

দেবীত্বের নামে এমন অবধি অত্যাচার আর কোথাও চলে নাই, বাংলাতেও বহুকাল আগে চলে নাই।

নারী বুঝিয়াছে তাহাকে শুধু ভুলাইয়া রাখা হইয়াছে। পুরুষ তাহাকে এমন স্থানে রাখিয়াছে যেখান হইতে কিছুর নাগাল পাওয়াই তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত। ছেলের হাতে খেলনা দিয়া তাহাকে যেমন ভুলাইয়া রাখা হয়, নারীকে অন্তঃপুর দিয়া তেমনি ভুলাইয়া রাখা হইয়াছে।

নারী চায় নাগাল পাইতে, স্বামীর পার্শ্বে থাকিয়া, ভ্রাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সাহায্য

করিতে। সে চায় সাম্য, সে স্বেচ্ছাচারিতা চায় না, মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে চায়। পুরুষকে অতিক্রম করিয়া চলিতে সে চায় না, সে চায় তাহার পার্শ্বে থাকিতে; পুরুষে যাহা পারে, নারীর তাহা করিতে যাওয়া অনুচিত কেন? নারী অন্তঃপুরে থাকিবে, বহু ঘরে রক্ষিত তৈজসের মত, তাহাকে যাহা বুঝাইবে, তাহাই সে বুঝিবে—কেন? অথবা তাহার নিজের জ্ঞানে যে সত্য মনে আসিয়া উঠে, পুরুষের ভয়ে তাহা গোপন করিয়া মিথ্যারই সমর্থন করিতে হইবে—কেন?

নারী বুঝিয়াছে যত সে নত হইয়া থাকিবে ততই তাহাকে নত হইতে হইবে। সেতাই জোর করিয়া বলিতেছে—না, আমরা আর তাহা চাই না যাহা আমাদের মাতামহী পিতামহী পাইয়াছেন। আমরা নূতন যুগের মানুষ, আমরা যুগধর্ম্ম মানে চলিব।

অত্যাচারের ফল আছেই—নহিলে চিরদুর্ব্বলা নারী আজ এ সবলতা লাভ করিল কোথা হইতে? পুরুষের কম অত্যাচার কি? নারীর গায়ে অনেক পুরুষের নিষ্ঠুরতার চিহ্ন অঙ্কিত, ইহারা শুধু পড়িয়া কাঁদে, আর কিছু এতদিন পারে নাই। কিন্তু আর না, তাহাদের সে দীর্ঘশ্বাস বেদন নিয়া পৌঁছিয়াছে ভগবানের চরণতলে, তাঁহার আসন টলিয়াছে, তিনি সত্য শক্তি প্রেরণ করিয়াছেন, তাই চিরদুর্ব্বলা নারী আজ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে দণ্ডায়মানা, নারীর বুকে তাই আজ উৎসাহ, সামনে আশাপথ বিস্তৃত।

নারী যুগ যুগান্তর ধরিয়া মা হইয়া আসিতেছে, সে মাতৃত্বপথ হইতে নিজেকে বঞ্চিতা করিতে কিছুতেই পারিবে না, তাহার নারীজন্মের সার্থকতা সে লাভ করে মা হইয়া। জগতের প্রারম্ভে—আদিযুগে নারী ছিল মা, জগতের শেষে—তখনও নারী থাকিবে—মা।

মা হইলেই যে সব হারাইয়া ফেলিতে হয় তাহার কোনও অর্থ নাই। মা হইয়া সে নিজের জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারে সে কথা সত্য, কিন্তু সে সার্থকতা সত্য মিথ্যার মিশ্রিত।

নারীর জাগরণের যুগ এ, নারী জাগিয়াছে, জাগিতেছে জাগিবে। নারী নিজেকে শুধু বিলাসপুত্তলী বলিয়া ভাবিতে পারিতেছে না, মনের মধ্যে সে যে বড় হেয় নয়, সে শুধু সাজাইয়া রাখার জন্যই সৃজিত হয় নাই, এই ভাবটা গাঁথিতে পারিয়াছে। নারী আর পিছনে থাকিবে না, পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে।

লাফিং গ্যালারির দ্বিতীয় স্তবক আগামী সপ্তাহে দেখা যাইবে।

শিক্ষক ব্যতিরেকে

সেতার শিক্ষা

৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১৷৷০

সেতারের অতিরিক্ত গত „ ৷৷০

প্রকাশক :—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

৪৷১৷১ সেন লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা

এবং গুরুদাস লাইব্রেরী ও

ডোয়ারকিন কোংর নিকট প্রাপ্তব্য।

৪৷৷ বিনামূল্যে লুকোসাইজ ফটো ফটো এনলার্জমেণ্ট ১২×১০ ফটো সহ প্রীম সিকি মূল্য পাঠান কলিকাতা ফটো ষ্টুডিও, লেন্স ও রবার ষ্টাম্প মেকার ৩৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বিদেশের স্মৃতি

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল]

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ খাঁটি বাঙ্গালী হইয়া পাণ্ডাজীর সহিত নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে আমি দর্শন করিতে আসি নাই, বেড়াইতে আসিয়াছি। তবে কাল সকালে একবার মন্দির দেখিয়া লইব। উত্তরে বাজারের দিকে চলিলাম। এ একটী ক্ষুদ্র বাজার। একস্থানে অনেক এতদ্দেশীয় মেয়েরা মুড়ি মাখার লইয়া ঠেলা ঠেলি করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম গভর্ণমেণ্ট হইতে চাউল বিক্রয় হইতেছে তাহা লইবার জন্য ঠেলা ঠেলি—এখানেও দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। চাউল একেবারে পাওয়া যায় না। বাজার অবশ্যই ক্ষুদ্র। একটু গিয়া শুনিলাম সম্মুখেই মন্দির। পাণ্ডাজী এক হিন্দুস্থানী দোকানদারকে গরম আঠার লুচী ভাজিতে হুকুম দিয়া আমাকে লইয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিলাম না, কাল সকালে দেখিব। চারিদিকে ঘুরিয়া আসিলাম। এত বড় বিরাট মন্দির আর কোথাও দেখি নাই। ৪টী ফাটক একটী কাটকে আগ্রার কোটের মত বিনা বন্দুকে রহিয়াছে। চারিদিকে ব্রাহ্মণদের বসতি আর ঘুরে শূদ্রেরা থাকে। 'রামরক্ষা' ইত্যাদি স্থান আর দেখা হইবে না কারণ কালই ফিরিতে হইবে। নগর ভ্রমণ শেষ করিয়া দোকানে ফিরিয়া আহারাদি শেষ করিলাম। দোকান-দারের এক হিন্দুস্থানী বালক ভৃত্য বোধহয় এই রাক্ষসের ত্রাসে আমাকে তাহার আজ তাই বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি কতক খাদ্য দ্রব্য পূর্ব্বেই আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছিলাম, বলিলাম কাহাকেও দাও। একটী ভিখারী দাঁড়াইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল—'বুটা?' 'না' শুনিয়াই সিংহের মত লম্ফ দিয়া আসিয়া সেই গরম লুচীও মিষ্টি তুলিয়া লইয়া নিমিষের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। বোধহয় বহুদিন পরে তাহার এই তৃপ্তি। ভিখারী, কিন্তু 'বুটা' খাইবে না। আহারাদি করিয়া একটী দেশলাই কিনিলাম ১০ বিলাম দেড়১০ ও ২টা বাদামী না কি দিল। এখানে ঐ তাম্র-মুদ্রার এখনও প্রচলন আছে। বাসায় ফিরিবার পথে ষ্টেশনে গিয়া শুনিলাম যে যদিও ট্রেণ ১০-৩০টায় সন্ধ্যা ছাড়িবার কথা পুঁথিতে লেখে, তথাপি তাহা ধনুষ্কোটি ও মণ্ডপম্‌এর মধ্যে ৯-৩০টার পর যখন ইচ্ছা আসিতে পারে। কাল দর্শনাদি কিছু সংক্ষেপে করিতে হইবে।

বাসায় ফিরিয়া দেখি আমার প্রকাণ্ড বাড়ী অন্ধকার, দরজা বন্ধ। ব্যাপার কি? সাহস করিয়া দরজা ঠেলা-ঠেলি করিলাম 'ম্যানেজার' 'ম্যানেজার' বলিয়া চীৎকার করিয়াও কোন উত্তর পাইলাম না। একটা রশি দিয়া দরজা বাঁধা আছে। মনে হইল মালপত্র বোধহয় সব শেষ হইয়াছে। রশিটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া ঘরের সামনে বসিয়া দেখি তালা বন্ধই আছে। ঘুরিয়া বাতি আলিয়া সমস্ত ঠিক আছে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু এই প্রকাণ্ড বাড়ীতে আমাকে একাকী রাত্রিযাপন করিতে হইবে ভাবিয়া গাটা যেন কেমন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! একটু জলও নাই। আধখানা বাতি সম্বল, তাহাতে ৩ ঘণ্টার বেশী চলিবে না। যাহা হউক ভাবিয়া কল নাই সুতরাং দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানা করিয়া লইলাম। বাহিরে হঠাৎ যেন কাহার পদশব্দ শুনিলাম। ভাবিয়া উত্তর না পাইয়া দরজা খুলিয়া ফেলিলাম। চোর ডাকাতের কথা মনে আসিল না। মানুষের মুখ দেখিতে পাইব এই আশাতেই দরজা খুলিয়া ফেলিলাম। একটী তরুণ বয়স্ক ভেলেও ভদ্রলোক পাশের ঘরের দরজা খুলিতেছেন। মানুষের মুখ দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ইংরাজীতে যাহা জিজ্ঞাসা করি তাহারই উত্তর 'Yes sir' 'No sir'। তিনি এখানকার রক্ষক এইমাত্র বুঝিলাম। এই বাড়ীতে রাত্রিবাস করিবেন কিনা তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। ইসারা ইঙ্গিতে কিছু জল চাহিলাম। তিনি এক গ্লাস জল দিলেন। কিন্তু আমার যে কয়েকটী ভাষা জানা আছে তাহা দ্বারা পায়খানা কোথায় এ প্রশ্নের উত্তর আদায় হইল না; কি করি এতো আর ইসারা করিয়া দেখাইতে পারি না। হাঁক ছাড়িয়া ঘরে ফিরিলাম তিনিও দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। শরীর বড় ক্লান্ত ছিল, শয়ন মাত্রেই নিদ্রা। ৪টার একবার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ২।১টী মশার গুন্ গুন্ শব্দ ব্যতীত আর কিছুও শুনা যায় না। এ প্রকাণ্ড বাড়ীতে আমি একা ভাবিতে ভাবিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম।

১১ই ডিসেম্বর—সকালবেলা উঠিয়া দেখি যে

আমার ধরণার সামনেই ২জন লোক আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া শুইয়া আছে। যাহা হউক তাহা হইলে একা ছিলাম না।

প্রভাত হইয়াছে। সুশীতল সাগর সমীরে শরীর স্নিগ্ধ হইয়া গেল। নিকটেই একটী ইঁদারা আছে তাহা হইতে জল তুলিয়া মুখ হাত ধুইয়া ঘরে ফিরিলাম। জিনিষপত্র বাঁধিয়া পাণ্ডা মহাশয়ের জন্য একটু অপেক্ষা করিলাম। তিনি আসিলেন না, তখন মহম্মদ স্বয়ং পর্ব্বতের নিকট গমন করেন ইহাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাজারের দিকে চলিলাম। বাজারের ভিতরে খানিক দূর গিয়াই পাণ্ডা ওতাহার সঙ্গীর সহিত দেখা হইল। অবশ্য তাহারা আমার সন্ধানেই যাইতেছিল। আহার প্রস্তুতের হুকুম দিয়া মন্দির দর্শনে গেলাম। আগেই বুঝাইয়া দিলাম যে পূজা অর্চ্চনা কিছুই করিব না।

জুতা জোড়াটী মন্দিরের পার্শ্বে এক বাড়ীতে রাখিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এ এক বিরাট ব্যাপার। দেখিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যাইতে হয়। সারি সারি অসংখ্য স্তম্ভ বিরাটাকৃতি ছাদটিকে ধরিয়া রহিয়াছে। বিশাল পাষাণশ্রেণী, উপরে ছাদে নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত। এই বিরাট বারান্দার রাস্তা মন্দিরের চারিদিকেই ঘুরিয়া গিয়াছে। এরূপ বিরাট corridor দুনিয়ার পৃথিবীতে আর কুত্রাপি নাই। তিন দিক প্রদক্ষিণ করিয়া অবশেষে দরজায় গেলাম। নিকটে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী তথায় হাত পা ধুইয়া দেব দর্শনে চলিলাম। সমস্তই প্রায় লিঙ্গমূর্ত্তি—"বিশ্বনাথ" "মহাদেব" "রামেশ্বর" ইত্যাদি। একটী পার্ব্বতী মন্দিরও আছে। সম্মুখে বিশাল বৃষমূর্ত্তি পর্ব্বতের মত বসিয়া আছে। রামেশ্বরম ও মাদুরায় এই দুই মন্দির আজও হিন্দুস্থাপত্যের সাক্ষ্যস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। উত্তরভারতের প্রায় সমস্তই মুসলমানদের প্রাচীন গৌরবের পরিচায়ক; আর্য্যকীর্ত্তি আর্য্যাবর্ত্তে নাই। দক্ষিণাপথে আছে। কারণ দক্ষিণাপথ মুসলমানদের অত্যাচারের হাত হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাইয়াছিল।

ফিরিবার পথে মন্দিরের মধ্যে বাজার হইতে কিছু কড়ি ইত্যাদি কিনিয়া বাজারে ফিরিলাম। আহারাদি অর্থাৎ পরম পুরী ইত্যাদি সেব করিয়া একটী হিন্দুদের কাফি খানাহারে যাইয়া চায়ের সন্ধান করিলাম। চা মিলিল না। পরম কাফি একপাত্র চাহিলাম। একটী গ্লাসে, একটী পিতলের বাটীতে একবাটী কাফি দিল, তাহার মধ্যে একটী ছোট গ্লাস। আমি ইহাদের কায়দা জানিতাম না। চুমুক দিবার জন্য পাত্রটী মুখে তুলিতেই ভদ্রলোকটী মুখ বিকৃত করিয়া উঠিলেন। সঙ্গীর দিকে ফিরিতেই তিনি বলিলেন যে এখানে ব্রাহ্মণগণ ঘুটা করিয়া কাফি পান করে না। সুতরাং তা করিয়া মুখে ঢালিয়া দিয়া কাফি পান সেব করিলাম। বাসায় ফিরিতে ফিরিতে দেখিলাম mixed trainএ অসংখ্য যাত্রী আসিয়াছে। অধিকাংশই হিন্দুস্থানী। সকালবেলায় রামেশ্বরকে বড়ই রমণীয় বোধ হইতে লাগিল। চারিদিকেই অনন্ত বিস্তৃত সমুদ্র, অসংখ্য নারিকেল, তাল ও তমাল গাছ; আর কালো কালো মেয়েগুলি রঙ্গিন শাড়ী পরা।

বাসায় ফিরিয়া জিনিষপত্র বাঁধিয়া আবার সাহেব লোক হওয়া গেল। ধর্ম্মশালার রক্ষকদিগকে ।০ বখসিস্ দিয়া ষ্টেশনে আসিলাম। কাল যে মুটে গিয়াছিল সেই আসিয়া বসিয়া আছে। মাল লইয়া ষ্টেশনে গেল। থার্ডক্লাসের ব্যাঙ্গালোর পর্য্যন্ত টিকেট কিনিলাম। শুনিলাম, ত্রিচিনাপল্লী, ইরোড ও জলারপেট হইয়া যাইতে হইবে। মনে করিয়াছিলাম Vellapuram হইয়া যাইব। কিন্তু কথায় বলে "Man proposes God disposes" সুতরাং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে যেটীও দেখা হইয়া যাইবে। এইটিই নাকি সোজা রাস্তা তিন জায়গায় গাড়ী বদলাইতে হইবে কাজেই বড় ট্রাঙ্কটী through book করিয়া Guardএর সহিত দিলাম।

কুলীকে দিয়া জাব কিনিয়া সঙ্গে লইলাম। সাহেব লোকের গাড়ীতে উঠিলাম। পাণ্ডার লোক দুটী এ দুই দিন চাকরের মত খাটিয়াছে। ছোটটি জুতা পর্য্যন্ত বহিয়াছে। কতক মাল নিজেরাই লইয়াছে। তাহাদিগকে আমার নাম ও ঠিকানা দিলাম এবং তাহার পাণ্ডার নাম লিখিয়া লইলাম। আমার কার্ডের পৃষ্ঠে তাহাদিগকে একখানা certificate লিখিয়া দিয়া তাহাকে ১৲ ও তাহার সঙ্গীকে ।০ পারিশ্রমিক দেওয়াতে তাহারা পরম সন্তুষ্ট হইয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। কুলীটীও বেজায় খাটিয়াছে। তাহাকে বলিলাম, পকেটে যা বাকী আছে তাহাকেই দিব। বাহির করিয়া দেখি ।১০—সে এক প্রকাণ্ড সেলাম করিয়া পয়সা লইয়া প্রস্থান করিল। উঠিয়া গাড়ীতেবসিলাম। কেবলমাত্র একটী জাপানী ভদ্রলোক আছেন, ইনি ২।১টি ইংরাজী শব্দ জানেন। আলাপ করা সম্ভব হইল না। তিনি ভদ্রতা করিয়া তাঁহার বিছানায় আমাকে বসিতে দিলেন এবং সঙ্গে আনিত ফলা দিতে চাহিলেন। বলিলেন—বোম্বাই যাইবেন। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। রমণীয় 'রামেশ্বরম্' বিদায়! আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না কে বলিতে পারে! কয়েক ঘণ্টার জন্যও তুমি আমার এই আজীবন সৌন্দর্য্য পিপাসু অন্তঃকরণকে তৃপ্ত করিয়াছ।

শেষ।

দেশ-বিদেশ

কুমারী বিধুমুখোপাধ্যায় মাসে পঞ্চাশ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত (যেন) ও ল্যাবরেটরি অব এডুকেশনের সহিত নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। কুমারী বিধুমুখোপাধ্যায় সম্যক পরিচয় আমরা পাঠক পাঠিকাগণের জানার্থে নিম্নে উল্লেখ করিলাম। কুমারী উড়িয়া বালিকা; উহার পূর্ব্বে কোন উড়িয়া বালিকা-ই এরূপ প্রতিযোগিতায় অধিকারিণী হইতে পারিত বলিয়া শুনি নাই। বিধুমুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ ও বি-টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষকেন্দ্রীয় মনোনয়নে বিলাত যান। সেখান হইতে অক্সফোর্ড এডুকেশনাল ডিপ্লোমা পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। বর্ত্তমানে কুমারী কটক হাইস্কুলে স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিতা আছেন। কুমারী বিধুমুখী স্ত্রীশিক্ষার সাহায্য করিয়া উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠা লাভ করুন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

ত্রিপলিন ছয়লাবের উপরোক্ত পত্রে গত শুক্রবার বিশ্ব মুসলমানেরা তাহাদের ঈদ উৎসব সম্পন্ন করিয়াছে। সর্ব্বত্রই পৌষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া মুসলমান বালকবৃদ্ধযুবা ঈদগাহ পরিদর্শন হইয়াছিল।

কলিকাতার ঈদ-জামাতে প্রায় পঞ্চাশ সহস্রাধিক মুসলমান সমবেত হইয়াছিল। অনেক স্থানে ছুরী-কাঁচাদিতে গরু কোরবানের কথা হইয়াছিল। ডিপ্লোমেসি, ডিপ্লোমিসি মেসোপিলাস, ইরেন উল্লাস, ডায়েনেসাস এবং ঈদগাহ আমোদ-প্রমোদের স্থান সমূহে ঈদের ও ভিড়ের অবস্থা দেখা গিয়াছিল।

পৃথিবীর ধনকুবেরদিগের কোষ্ঠীর অনুকূল ঐক্যের সাহায্যে ভবিষ্যৎ হইতে হয়। তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করে কোন ধনীদাতার ভাবনায় তাঁহারই দাসিত—কারখানার প্রতিদিন ৩ হাজারের অধিক গাড়ী প্রস্তুত ও বিক্রয় হয়, ইহাতে তাঁহার বাৎসরিক আয় প্রায় ৩৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ২৯ বৎসর পূর্ব্বে ইনি ৯০ হাজার টাকা ধার করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহার বর্ত্তমান নিজ সম্পত্তির মূল্য ২ শত ২৫ কোটি টাকা। ইনি এ পর্য্যন্ত ৩০ লক্ষ মোটর গাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন।

মহারাজ আর্চ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চীফ কমিশনারের উপদেষ্টা পার্লামেন্ট এসিষ্টেন্ট থাকা যাইবার মর্ম্মে মন্ত্রীসভা এবং ইণ্ডিয়ার এসিষ্টেন্ট পলিটিকেল অফিসার থাকা যাইবার মর্ম্মে ভারতের গভর্ণমেণ্টের তারের দ্বারা ভারত কাইসার-ই-হিন্দ মেডেল (ইণ্ডিয়া মেডেল) উপহার দিয়াছেন।

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব বিলাত গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান হইয়াছে যে সরকারী প্রস্তাবে আসামী, বর্ণনায়, আপিলের প্রস্তাব যদি নিজেরা চালাবার করেন, তাহা হইলে এদের প্রথা বলিয়া গণ্য হইবেন, এই প্রকার একটী আইন পাশ করিয়া। করা হইয়াছিল এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বেশ কিছু আপত্তিজনক উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে আবেদন প্রার্থনার ও ভিন্ন গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন। এই সব গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবটী গ্রহণ করিবেন বা বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

প্রস্তাবের ৭টি ধারা ভারত কমিটি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অনেক মতামত গভর্ণমেণ্টের নিকট আসিয়াছে। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তাহা স্থির করিবেন। মোটর উপর কোন নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে যেসব প্রস্তাবাধারণের মতামত সংগ্রহ করা হইবে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের শেষ দিন গভর্ণমেণ্ট ১লা জুলাই পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

(যেসের বাণী)

আর্কিন-মুলুকের সকলই অদ্ভুত। গত বৎসরে সেখানে ১ লক্ষ ২০ হাজার লোক আত্মহত্যা করিয়াছে। এই আত্মঘাতী সকলের মধ্যে ১১ জন কোটীশ্বর, ৪৫ জন ধনবতী মহিলা এবং ৮৮ জন ব্যাঙ্কওয়ালা। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, যাহারা আত্মহত্যা করিয়াছে তাহাদের তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৪০ হাজার স্ত্রীলোক; এই স্ত্রীলোকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা যিনি তাঁহার বয়স ১৫০ বৎসর—তিনি বৃদ্ধ-প্রপিতামহী; আর সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা যে তাহার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। এই আত্মঘাতীদের মধ্যে কলেজের ছাত্র ৩৮ জন, স্কুল-কলেজের অধ্যাপক ৫০ জন, বর্ণপরিচয়ক ১৯ জন, ছাকিম ও উকীল ১২ জন, চিকিৎসক ৮৩ জন, এবং বাণিজ্য-ব্যবসায় বা কারবারের কর্ত্তা বা অধ্যক্ষ ১০০ জন। এক মুসলমান সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকের মধ্যেই আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহা পরিমাণে অল্প বলিয়া সে সম্প্রদায় আত্মঘাতী হইয়াছে। এক ব্যক্তি পকেট খেলা ছাড়িতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। দুইবার ট্রেণ ধরিতে পারে নাই বলিয়া এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছিল। সংসারের নিকটবর্ত্তী পৃথিবীর আকর্ষণ আর বিলম্ব সহে নাই, এই প্রমাণে অভিভূত হইয়া কোন ব্যক্তি আত্মঘাতী হইয়াছিল। বিড়াল লইয়া বিবাদের ফলে এক পুরুষ আত্মহত্যা করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার আত্মঘাতী ও আত্মঘাতিনীর সমাচার।—কি দুঃখে কারণে মার্কিণের লোকে আত্মহত্যা করে—সেখানে ত আমাদের দেশে আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া কথিত। কারণ, পরকালে ও পরলোকে বিশ্বাস আমাদের আছে। আত্মহত্যা সম্বন্ধে হত হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় এই—ইহা আমরা বুঝি। কর্ম্মের ফল ভোগিতেই হইবে :—যে কোন ভাবিবে তাহার ত মৃত্যু নাই, সে যে অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয় নিত্যধামবাসী। পরকালে অবিশ্বাসী আমেরিকার দেশে আত্মঘাতীদের সংখ্যা যে বিপুল হইয়া উঠিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার মহাশয়ের নূতন সামাজিক উপন্যাস "মেয়াদ্দি" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য দুই টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ধরণীপ্রসন্ন দাস গুপ্তের নূতন রঙ্গনাটিকা "হকমারী" শীঘ্রই বিদ্যালয় থিয়েটারে অভিনীত হইবে। মহাশয়ের "হকমারী"তে নূতন ধরণ কিছু উপহার বিশেষ বলিয়াই আমরা মনে করি।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিক

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ২৯শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩০, ইং ২রা মে। [৪র্থ সংখ্যা

মিঃ ষ্ট্যানলিবল্ডউইন।

বাসন্তীর—২য় বর্ষ

"বাসন্তী" বহু দোষ ত্রুটী সত্ত্বেও বঙ্গীয় জনসাধারণের মনরঞ্জন করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিতেছে। আগামী ৩রা আষাঢ় ১৩৩৩ শনিবার ২য় বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। যাহারা প্রথম বর্ষের বাসন্তীর গ্রাহক গ্রাহিকা ছিলেন, ২য় বর্ষে তাঁহাদের যে আমরা গ্রাহক গ্রাহিকারূপে পাইবে তাহাতে আমাদের আদৌ সন্দেহ নাই ; যাহারা কলিকাতা সহরে প্রতি শনিবার নগদ মূল্য ক্রয় করিতেন, তাঁহারাও যে বাসন্তীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিতে বিরত হইবেন না, ইহাও আমরা খুব আশা করি। কারণ আমরা জানি, প্রথম বৎসরের বাসন্তী সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছে। বাসন্তীর গল্প, উপন্যাস, নির্ভীক স্পষ্ট আলোচনা পাঠক-পাঠিকাগণকে আনন্দ দান করিয়াছে। বাসন্তীর রঙ্গীন চিত্রগুলির প্রশংসা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। বাসন্তীর ব্যঙ্গ চিত্র, কার্টুন প্রভৃতি জনসাধারণকে যেমন আনন্দ দিয়াছে, তেমনি ভাবাইয়াছে। বাসন্তীর ভেন্ট্রি কল্পতরু, বাসন্তীর মিথিলা-বিদ্যা-গুল্ফ প্রদর্শনী, লাফিং গ্যাসাদি প্রভৃতির কথা বঙ্গের সর্ব্বস্থানে প্রচলনের মতই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

২য় বর্ষের বাসন্তীতে এ সকল ত থাকিবেই, চিত্রসংখ্যা যাহাতে আরও বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহারই চেষ্টা করিতেছি।

১ম বর্ষের বাসন্তীতে যে সকল খ্যাতনামা সুধী লেখক লেখিকাবৃন্দ লিখিয়াছেন, তাঁহারা ত লিখিবেনই, তাহা ব্যতীত আরও কয়েকজন প্রতিভাবান লেখক লেখিকার রচনা-সম্ভারে বাসন্তী সমৃদ্ধ হইবে। বিশেষ আনন্দের কথা, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্-এ ডি-এল মহাশয়ের ছোট গল্প-ও বাসন্তীতে প্রকাশিত হইবে। বাঙ্গালীর ঘরের নিখুঁত ছবি আঁকিতে সিদ্ধহস্তা সুলেখিকা শ্রীমতী সরলাবালা বসুর একখানি সুন্দর উপন্যাস ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে আরম্ভ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ভূতপূর্ব্ব 'বাঙ্গলার কথা'—সম্পাদক দেশ-প্রাণ সুভাষচন্দ্র, হেমন্তকুমার প্রভৃতি তরুণ দেশকর্ম্মীদের রচনাও বাসন্তীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবে। ভারতী-সম্পাদক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল্ ও ঔপন্যাসিক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা ও গল্প বাসন্তীতে প্রকাশিত হইবে। চিন্তাশীল লেখক যমুনা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্-এ বি-এল ও প্রতিভাবান শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের লেখা-ও বাসন্তীর সম্পদরূপে দেখা দিবে। বাসন্তী সম্পাদক খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকও ছোট গল্প লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার মহাশয়ের গল্পগুলি অতঃপর বাসন্তীতেই প্রকাশিত হইবে।

আগামী ২য় বর্ষ হইতে প্রতি সপ্তাহের বাসন্তীতে বাঙ্গলার মেয়ে বলিয়া একটি বিভাগ থাকিবে। ইহাতে বাঙ্গলার মেয়েরা তাঁহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির বিষয়ে আলোচনা করিবেন। বাঙ্গলার মেয়ে বিভাগে মেয়েদের জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার আছে, তাহা আগামী সংখ্যার বাসন্তীতে ঘোষণা করা যাইবে।

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় বাসন্তীর রঙ্গীন চিত্র-বিভাগের ভার লইয়াছেন।

আমরা আশা করি ১ম বর্ষের গ্রাহকগ্রাহিকাগণ যাঁহাদের ৩৮শ সংখ্যা পত্রিকা (যাহা ৮ই আষাঢ় শনিবার প্রকাশিত হইবে) প্রাপ্তিতেই বর্ষ পূর্ণ হইবে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া ৮ই আষাঢ়ের মধ্যে গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা করিলে টাকা মণিঅর্ডার করিবেন, যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা ঐ তারিখের মধ্যেই একখানা কার্ডে সে কথা জানাইয়া দিবেন। যাঁহাদের মণিঅর্ডার অথবা নিষেধপত্র আমরা ১০ই আষাঢ়ের পূর্ব্বে পাইব না, তাঁহার নামে বার্ষিক মূল্য চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিতে ১০ই আষাঢ়ের সংখ্যা ডাকে পাঠাইব। ভিঃ পিতে গ্রাহকদের কিঞ্চিৎ বেশী খরচ পড়িবে এবং ভিঃ পি ফিরিলে, আমাদের অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। অনর্থক কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্থ করিতে কেহই ইচ্ছুক নহেন, আমরা জানি।

তাই বিশেষ অনুরোধ, গ্রাহক গ্রাহিকারা তাঁহাদের অভিপ্রায়মত কার্য্য যেন ৮ই অথবা ১০ই আষাঢ়ের মধ্যেই করিয়া ফেলেন, কারণ সাপ্তাহিকপত্র প্রতি সপ্তাহেই বাহির হয়, এক সপ্তাহ দেরী হইলে কাগজ পাইতে অনেক গোল বাধিতে পারে।

স্মরণ রাখিবেন—১ম বর্ষের শেষ সংখ্যা ৮ই আষাঢ় ১৩৩০।
স্মরণ রাখিবেন—২য় বর্ষের প্রথম সংখ্যা ১৫ই আষাঢ় ১৩৩০।
পত্রাদি ও টাকাকড়ি আমীর নামে পাঠাইবেন :—

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র
পরিচালক, বাসন্তী
১৪ নং জগন্নাথ বসুর লেন,
পটুয়াটোলা, কলিকাতা।

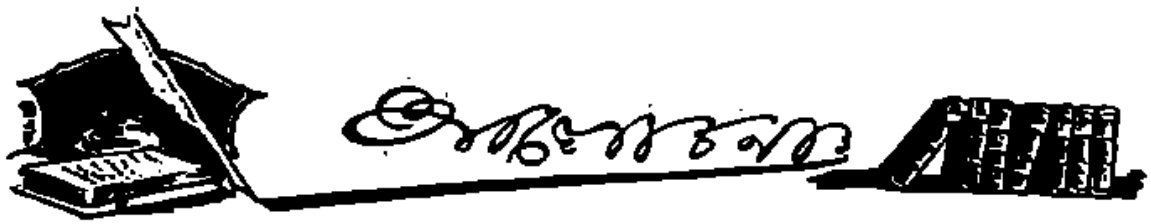

ধনধান্য প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা এই দেশ। এ দেশের মাটীতে সোনা ফলে। খনির সোনার মত অনিশ্চিত এ সোনা নহে। খুব বেশী প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটিলে বাংলার চাষীদের মাটি চষিয়া এই স্বর্ণ লাভ অতি নিশ্চিত ঘটিয়া থাকে। কত যুগ, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বাংলার প্রকৃতি বাংলা দেশকে এই অপূর্ব্ব শস্য সম্পদে ভূষিতা করিয়া আসিতেছে—তাই বাংলার এই অফুরন্ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দিকে সকলেরই লোলুপ দৃষ্টি। যে দেশের মাটি এমন ভাবে স্বর্ণ বিতরণ করিতে পারে সে দেশের উপর বহুদূর নর সমাজের দৃষ্টি না পড়িবে কেন? খুব ভাল দোআঁশ খনির স্বর্ণ পাইবার অনিশ্চিত আশাতে, ও খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে জানিয়াও কত লোকে জীবন পণ করিয়া সেই স্বর্ণ লাভ করিতে যায়। অকাতরে বিপদকে বরণ করে কিন্তু এ দেশের মাটির সম্পদ আহরণ করিতে বিপদ বা ঝঞ্ঝাট তেমন কিছুই পোহাইতে হয় না। বাংলার এ শস্য সম্পদ নানা কারণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্বর্ণ খণির চেয়েও মূল্যবান। কারণ এ শস্য সম্পদ পেটের খাইবার যোগায়, মানুষকে সতেজ সবল মন ও দেহ লইয়া চলিবার সুযোগ দেয়।

• •

বাঙ্গালী গাহিতে শিখিয়াছে—

'আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন—তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।'

সোনার বাংলার রূপ সত্যই ভালবাসিবার রূপ। ভালবাসা স্নেহ প্রীতি সবই বাংলা তাহার অধিবাসীর প্রাণে দিতে পারিত—এখনও বাংলা তাহা পারে কিন্তু যে রূপ প্রাণে প্রাণে তাহাদের অপূর্ব্ব উন্মাদনা জাগাইয়া রাখিত, যে রূপে তাহাদের প্রাণ শক্তি সঞ্জীবিত থাকিত, রূপের সঙ্গে তেমন যোগ যারা বজায় রাখিয়া চলিতে বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছে। তাই বাঙ্গালী আজ নিজের সম্পদ নিজে বুঝিতে না পারিয়া প্রাণের সকল উন্মাদনা হারাইয়া অবসাদে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আজ ষড়ৈশ্বর্য্য শালিনী এই শ্যামল দেশ তাহার সর্ব্বস্ব দিয়াও বুভুক্ষুদের প্রাণে উন্মাদনা আনিতে চাহিতেছে—কিন্তু না পারিয়া ক্রমে ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেছে।

• • • •

বাংলা দেশে এত সম্পদ থাকিতেও বাঙ্গালী অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে হাহাকার করিতেছে। বাংলার শস্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও ভারতের বাহিরের ক্ষুধা মিটাইতেছে অথচ বাংলার অন্তরের ক্ষুধা বাংলার এই শস্য সম্পদ মিটাইতে পারিতেছে না। বাংলার এই শস্য সম্পদকে পণ্য করিয়া তাহার ব্যবসাতে কত লোকে কোটিপতি হইয়া যাইতেছে অথচ বাঙ্গালী যে নিরন্ন ও দরিদ্র তাহাই রহিয়া যাইতেছে।

• • • •

বাংলার রূপকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে—বাংলার অধিবাসী বাঙ্গালীরাই। সোনার মা পাইয়াও তাহার ছেলেরা সোনার ছেলে হইতে পারে নাই, তাহারা কাঙ্গাল হইয়াই আছে। সোনার বাংলা দেশের উপর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদেরও মন কত ভাগ্যবান বাঙ্গালীর যে সকল গাড়ি জুড়ী ও মোটর চলিতেছে ও যে সকল আকাশ স্পর্শী সুখ নিকেতন উঠিতেছে তাহার সকলই বাংলার এই শস্য সম্পদের প্রভাবেই। বাংলা দেশের কল কারখানা, জমিদারের জমিদারী, বাবুদের বাবুয়ানা সবই চলিতেছে এই শস্য সম্পদের প্রভাবে। বাংলার এই শস্য সম্পদ লইয়া ব্যবসায় করিয়া সাগরপারের জাতীরা ধনী হইতেছে, মাড়য়ারীরাএই ব্যবসায়ের মধ্যস্থতা করিয়া কোটিপতি বনিতেছে। বাংলার পাটের কল, চটের কল ধানের কল সকলই এই শস্য সম্পদে চলিত।

• •

অথচ বাংলার এই শস্ত সম্পদ আহরণ যাহারা করে তাহারা ইহার প্রকৃত মূল্য জানে না। ইহারা কাঁচের মূল্যে কাঞ্চন বিলাইয়া দিয়া পরকে ধনশালী হইবার সুযোগ করিয়া দেয়, অথচ নিজে কি উপায়ে ইহা দ্বারা ধনাগমের ব্যবস্থা করিবে তাহা জানে না। বাংলার চিরস্থায়ী দারিদ্র্যের ইহা অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলার ধান, বাংলার বিভিন্ন প্রকার কলাই, সরিষা, প্রভৃতি তুঁসি মাল অন্যান্য দেশে অজস্র চালান হইয়া যাইতেছে। কেহ ইহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছে না—মূল্য দিয়াই লইতেছে। কিন্তু তাহার মূল্য নির্দ্ধারণের ক্ষমতা যাহারা চাষ করিয়া শস্ত উৎপন্ন করিতেছে তাহাদের নাই। ক্রেতা যাহারা তাহারাই মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছে। পাটেরও অবস্থা; ঐপ্রকার বাঙ্গালীরা তাহাদের জমিতে কোন কোন বৎসর ধানের চেয়েও পাটই বেশী বোনে। কিন্তু এই পাট ভিন্ন দেশীয়েরা তাহাদের ইচ্ছামত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া ক্রয় করে। যে বার তাহারা ইচ্ছা করিয়া দু' পয়সা মূল্য বেশী দেয় সে বার বাঙ্গালী খুশী হয়। যে বার দু' পয়সা মূল্য কম দেয় সে বার দুঃখিত হয়। যে বার বিদেশীরা পাট না কেনে সে বার পাট উৎপন্নকারী বাঙ্গালী বুঝিতে পারে না যে পাট লইয়া তাহারা করিবে কি। পাটের কোনপ্রকার ব্যবহারই তাহারা জানে না—তাই বিদেশীরা পাট গ্রহণ না করিলে তাহারা চক্ষে সরিষার ফুল দেখিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

বিদেশীরা বাংলার পাট গ্রহণ করে। তাহারা তো ইহাতে লাভবান যথেষ্ট পরিমাণে হয়ই তা ছাড়া এই পাটের ব্যবসায়ের মধ্যবর্ত্তী যাহারা করে তাহারাও প্রচুর উপার্জ্জন করে। ব্যবসায় চলিলে বাজারের সকলেই যেন দু' পয়সা পায়—তুলনায় পয়সা পায় না শুধু তাহারাই যাহাদের জমিতে পাট হয়—এবং যাহারা কষ্ট করিয়া রোদে বৃষ্টিতে বর্ষায় গলা জলে দাঁড়াইয়া এই পাট উৎপাদন করে। দেশের লোকে পাট তৈরী করা পর্য্যন্তই জানে, কিন্তু তাহার পর যে পাট দ্বারা আর কি কাজ হইবে তাহা জানে না। তাই পাট হইয়া গেলেই তাহারা মনে করে তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ! এখন পাট উচিত মূল্যে বিদেশী কিনিয়া লয় ভাগ্য—না কেনে বিশেষ দুর্ভাগ্য!

• • • •

যে দেশের শস্ত সম্পদের ব্যবহার দেশের লোকে এইরূপ জানে সে দেশের শস্ত সম্পদকে লাভবান পণ্যরূপে চালানো যাইবে কিরূপে? অথচ কৃষি সম্পদ আজি পুরো দস্তুর পণ্যরূপে দাঁড়াইয়াছে। এই পণ্যের যুগে ব্যবসায়ের হিসাবে ইহার সদ্ব্যবহার করিতে না পারিলে দেশের দারিদ্র্য কখনো ঘুচিবে না।

• • • • •

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশও নানা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় উন্নত হইয়া কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত প্রকারে চালাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। অনেক দেশে কৃষি বিভাগের মধ্যে স্বাস্থ্য, খাল খনন, নদ নদী, বাঁধ রক্ষা প্রভৃতি কার্য্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা পড়িয়াছে। দেশে আগে খাদ্যের ব্যবস্থা ও প্রাথমিক শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া তারপর অন্যান্য উচ্চ কথায় তাহারা মনোনিবেশ করিতেছে কিন্তু আমাদের দেশে তাহার কি ব্যবস্থা হইতেছে! বাংলার জনসাধারণের স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য প্রভৃতি রক্ষা করিতে হইলে বাংলার কৃষি সম্পদ রক্ষা ও তাহার উপযুক্ত মূল্য দেশবাসীদের দ্বারা নিরূপিত ও নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

• • • •

দেশে যে উত্তেজনা ও উদ্দীপনা আসিয়াছিল তাহা আজ নাই। তাই আবার দেশে সাময়িক কৃত্রিম উত্তেজনা আনিবার জন্য অনেকেই উৎসুক। কিন্তু উত্তেজনা আসিবে কি প্রকারে ও তাহা জনসাধারণের মধ্যে থাকিবে কি প্রকারে? কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া দেশের কেহ কেহ এই উত্তেজনার ভাব বজায় রাখিতে চাহেন। তাহা কোন ক্রমে সম্ভব হইতে পারে বটে—যদি দেশে লবণ কয়ের মত নানা কর নিত্য বসিতে থাকে। কিন্তু তাহাও অধিক দিন চলিবে না। কারণ পদত্যাগ আছে আবার পদ গ্রহণের উত্তেজনা, উদ্বেগ আছে। আর এমন কর যে নিত্য নূতন বসিবে তাহারও কোন প্রমাণ নাই। কৌন্সিল—এখনো দেশের লোকে মোটেই বুঝিতে পারে

নাই। নূতন যাঁহারা কৌন্সিল প্রবেশ কামী তাঁহারাও দেশের লোককে কৌন্সিলের স্বরূপ বুঝাইবার কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন তাহার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। দেশের লোকে যদি নূতন প্রবেশার্থীদের চেষ্টার ততটুকু বুঝিতে পারে তবে এক রকম মন্দ হইবে না।

• • • •

আজ কৌন্সিল প্রবেশের মত-দ্বন্দ্ব লইয়া যে ভাবে কংগ্রেসের দল ভাগ হইয়াছে এতটা হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। যে-দেশ উত্তেজনায় নিজের জীবন মরণ সমস্যা ভাত কাপড়ের সন্ধান করিবার জন্য চাষের দিকে ও চরকার দিকে মন দিয়াছিল আবার উত্তেজনা শুনে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চরকাকে নীরব করিয়াছে সে দেশে যে কৌন্সিলের বাক্ বিতণ্ডায় বেশী উত্তেজনা আসিতে পারিবে তাহা মনে হয় না। মহাত্মা কৌন্সিল একেবারে বাদ দিয়াও দেশের সকল দিকে উত্তেজনা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। আজ দেশের কর্মীরা কৌন্সিল ধরিয়াও যদি অপর দিকের উত্তেজনা সমূহকে বজায় রাখিতে পারেন তাহাতে ক্ষতির কারণ কিছু নাই। তবে যে কোনরূপ উত্তেজনার মধ্যেও লোকে পেটে খাইতে চাহিবে, পরিধানের বসন চাহিবে। তাই এ দু'টি অতি আবশ্যকীয় বস্তুকে বর্জন করিয়া দেশে কোনরূপ উত্তেজনা রক্ষা সম্ভব হইবে না।

• • •

স্বরাজ্য দল অর্থাৎ সি-আর-দাসের দল বোম্বাইয়ের নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যথা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে কাউন্সিল গমন করিতে মেজরিটি পার্টি তাঁহাদের বাধা দিতে পারিবেন না। কিন্তু কথা কি, সভায় দল পুরু করা যতটা সহজ, দেশের কাজ করা, জনসাধারণকে লইয়া যে কাজ তাহা করা কি তত সহজ? জনসাধারণ ত ছোট বুঝিবে না, মেজরিটি বুঝিবে না, তাঁহারা মহাত্মার কথাই জপ-মালা করিয়া বসিয়া আছে, তাহাদের লইয়া যদি কাজ করিতে হয় তবে কাউন্সিল গমন করিবার পূর্ব্বে নেতারা একবার তাঁহাদের উদ্দেশ্যটা বুঝাইবার চেষ্টা করিলে ভাল করিবেন। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে জনসাধারণের বস্তু করিয়া দিয়াছিলেন, কংগ্রেস বলিতে দেশবাসী যদি কিছু বুঝে, কিছু মত পোষণ করে তবে সে মহাত্মার বাণী! মহাত্মার বাণী দেশের লোককে বুঝাইতে হইবে, আইনজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিরা বুঝিলেই হইবে না, সাধারণকে বুঝিবার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে।

• • • •

একটা সুখের কথা, বিদ্যাসাগরের বাড়ী নিলামে চড়িলেও পরহস্তগত হয় নাই। দেশীয় প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বাটীটি বিশ হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন, দেশের লোক এই টাকাটা দিলেই ব্যাঙ্ক বাড়ীটি জনসাধারণের হস্তে ছাড়িয়া দিবেন। বাঙ্গালী জাতির মহাপরীক্ষা সমাগত। বাঙ্গালী তাঁহাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিবার সুযোগ পাইয়াছে, দেখা যাক্, সে সুযোগ সে গ্রহণ করে, না চির-উদাসীনের মত হেলায় ত্যাগ করে! হিন্দুস্থান সোসাইটি দেশের লোককে এই মহাপরীক্ষার সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ভাষা-ভাষী ও জনসাধারণের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

• • • •

আমরা ভারতবাসী যে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া স্বাধীনতা হারাইয়া কেবল পরাধীন হইয়া আছি, তা নয়। আমরা স্বাধীনতা ত হারাইয়াছি-ই উপরন্তু মনুষ্যত্বটুকুও আমাদের লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কিছুদিন পূর্ব্বে বিহার প্রদেশে মদ্য উৎপাদন ও আমদানী রহিত করিবার উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিটি বসিয়াছিল। সম্প্রতি সেই কমিটি রায় দিয়াছেন, মদ্য বন্ধ করা চলিতে পারে না। তাঁহারা তিনটি কারণও দিয়াছেন, বলিয়াছেন, মদ বন্ধ করিলে বিহার-উড়িষ্যার আদিম অধিবাসীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবে, যেহেতু তাহারা বহুদিন হইতে মদ্য পান করিতেছে; দ্বিতীয় কারণ, সরকার বন্ধ করিলেও গোপনে মদ্য আমদানী হইবে; তৃতীয় কারণ দেখাইয়াছেন, মদ্য বন্ধ করিলে সরকার দেউলিয়া হইয়া পড়িবেন। বলা বাহুল্য ইহারা কোন কারণেই মনুষ্যোচিত যুক্তি দেখান নাই। মদ বন্ধ করিলে প্রথমটা আদিম-অধিবাসীরা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে সত্য কিন্তু যখন তাহারা এই উত্তেজক বিষ পান ত্যাগ

করিতে বাধ্য হইয়া শরীরে স্বাস্থ্য, মনে তেজ সঞ্চয় ও অভাব-অনটনের কবল মুক্ত দেখিতে পাইবে তখন তাহাদের সন্তোষ হইবে কি অসন্তুষ্টই থাকিয়া যাইবে, কমিটির সদস্যেরা তাহা বলেন নাই। তাঁহাদের দ্বিতীয় যুক্তিও অত্যন্ত কাপুরুষোচিত। সরকার মদ উৎপাদন ও আমদানী বন্ধ করিলে পার্শ্ববর্তী দেশীয় রাজ্য হইতে মদ আসিবে, তাঁহারা বলিয়াছেন। সরকার ইচ্ছা করিলে এই আমদানী বন্ধ করিতে পারেন কি-না সে ক্ষমতা সরকার রাখেন কি-না, এ কথা বলা হয় নাই। কমিটির শেষ যুক্তি অত্যন্ত সমীচীন হইয়াছে—বলিতে হইবে। মদ, তথা আবগারী বিভাগ হইতে সরকারের যথেষ্ট আয় হয়, সে আয় বন্ধ করিলে সরকারের দেউলিয়া হইবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে স্বীকার করি কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সরকারের আয় কমিবার ভয়ে দেশবাসীকে এমন উৎসন্নের পথে টানিয়া লইয়া গিয়া সরকার কি অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবেন? আর যাহারা অতি বড় দরদী হইয়া সরকারের আয়ের মাত্রা বজায় রাখিতে মদ রহিত-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রায় দিলেন, তাঁহারা রায় দিবার পূর্ব্বে একটি বারও দেশবাসীর মুখ চাহিয়াছেন কি? দেশবাসীর মুখ তাঁহারা চাহেন নাই, তাঁহারা মাসীর দাত, মা'র চেয়েও তাঁদের টান-টা বেশী বৈ কি! তাই সরকারের ভাবনা ভাবিলেন, দেশের অধিবাসীদের ভাবনার তাঁহাদের অবসর ছিল না! যে হতভাগা দেশের মাথা-ওলা লোকের এই হীন দশা, তাহাদের উপর বিদেশীরেরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে না ত কি করিবে?

• • • •

আটত্রিশ দিনের উপবাসের পর কবি নজরুল ইস্‌লাম অন্নজল গ্রহণ করিয়াছেন। কাজীর সুহৃদ্‌বর্গ ডাঃ সুরওয়ার্দ্দির মারফতে অন্নজল গ্রহণ করিবার অনুরোধ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেই কাজি তাঁহার অনশন ব্রত ভঙ্গ করিয়াছেন কি-না ঠিক বলা যায় না,—তবে তরুণ কবির মাতৃভক্তি তাঁকে তাঁর মরণ-সাধনা হইতে বিচ্যুত করিয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে। কবির ধর্ম্ম-মা একজন হিন্দু মহিলা, তিনি কাজিকে অন্নজল গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, কবি নজরুল মা'র অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। কবি বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে পুনরায় অন্নজল স্পর্শ করিয়াছেন।

• • • •

কবি আত্মদান করিতে চাহিয়াছিলেন। অত্যাচারের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা যখন থাকে না, তখন মানুষ, প্রকৃত মানুষ যে—সে আপনাকে বলি দিয়া-ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখিয়া থাকে। কাজিও রাখিয়াছিল। হয়ত আর অল্প দিনের মধ্যেই কবির আত্মদান-যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া যাইত; হয়ত আর অত্যল্পকালের মধ্যেই বাংলার হতাশাচ্ছন্ন অন্ধকারে একটি স্ফুলিঙ্গ চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত; দেশাত্মবোধের অগ্নি-শিখা ক্ষণেকের তরে জ্বলিয়া চিরনির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইত, কবির আরব্ধ কর্ম্ম, কবির দেশ-সেবা ব্রত সমস্তই অপূর্ণ রহিত, কবি তাঁহার বাঞ্ছিত অমরালোকে মহা-প্রস্থান করিতেন। জগদীশ্বরের ইচ্ছায়, আবার কবিকে আমাদের ফিরিয়া পাইবার আশা হইয়াছে। আশা হয়, কবি কারাপ্রাচীরের বাহিরে আসিয়া আবার কোন-দিন উন্নতশিরে উন্নতকণ্ঠে গাহিতে পারিবেন—

বল বীর, বল মম উন্নত শির!

• • • •

কবির আত্মদান-ব্রত কবিকে কঠোর মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণের মত দেশবাসীর নিকটে পরিচিত করিয়াছিল, আবার মাতৃ-আহ্বানে কবির যে পরিচয় পাওয়া গেল, ইহা কুসুমের মতই কোমল; একমাত্র কবি চিত্তেই এই বিরুদ্ধতা, কোমল, কঠোর পাশাপাশি অবস্থান করিয়া থাকে। ইহাই কবির আসল স্বরূপ!

• • • •

নায়ক বনাম দেশবাসীর ধাঁধা মিটিবার মোড় ফিরিয়াছে। এই প্রাদ্ধ আদালত পর্য্যন্ত না গড়াইলেই সব দিকে ভাল ছিল। সম্পাদক সম্পাদকে গড়াই, কাগজে কলমে চলিলেই মানায় ভাল, আদালতের কাঠ গড়ায় সম্পাদক-কে আদৌ মানায় না। যাক্, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এখন সম্পাদকদ্বয় করমর্দ্দন করিয়া ঘরে ফিরিলেই বাঁচা যায়।

• •

লয়েড জর্জের পর বোনারল ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু অতি অল্পদিন মাত্র এই মহা সম্মানের কার্য্য করিবার পরই প্রধান মন্ত্রী বোনার ল মহোদয় ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুণ এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ ষ্ট্যানলি বলডউইন প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। বোনার ল, নানাদিক হইতেই ইংলণ্ডের অর্থনীতিক সমস্যা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার মন্ত্রীত্বের অল্পদিন মধ্যেই তথাকার করভার অনেক কমিয়া গিয়াছিল। করভার নিত্য কমিতে থাকিলেও ইংলণ্ডের শ্রমিক সমস্যা এ সময়ে যেন তীব্ররূপে দেখা দিয়াছে। চারিদিকের অভাবের ক্ষুধা যেন আর কিছুতেই মিটিতেছে না। এই মন্ত্রীর পরিবর্ত্তনে ভারতের শাসননীতি যে কিছু বদ্‌লাইবে এমন আশা অবশ্য কেহই করিবে না। আমলাতন্ত্রের হাত হইতে ভারতের শাসনতন্ত্র যে খসিয়া সাধারণ তন্ত্রদের হাতে পড়িবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। তবে বিলেতী রাজনীতির কিছু কিছু ইহাতে উপলব্ধি হইতে পারে বটে।

• •

জগৎ জোড়া আবার যেন মহা চঞ্চলতা ও বিক্ষোভ চলিতেছে। করাসী ও জার্মেনি কম জমেই পাকিয়া উঠিতেছে। চীনে দস্যু শক্তি যথেচ্ছ নিজ অধিকার চালাইতেছে। তুর্ক গণ্ডগোল এখনও মেটে নাই—নিকট প্রাচ্য সমস্যার কোন নিরাকরণ হয় নাই। বিনা যুদ্ধে হইবে কিনা তাহাও বলা যায় না।

• • • •

মহাত্মা গান্ধীর বয়স কম হয় নাই। তার উপর তিনি জেলে আছেন। প্রায়ই শোনা যায় মহাত্মার স্বাস্থ্য অতি খারাপ। মহাত্মার স্বাস্থ্য মন্দ তিনি ১০৫ ডিগ্রী জ্বরে ভুগিতেছেন। একথা শুনিলে জেলের বাহিরে মহাত্মা ভক্ত যাহারা আছেন তাঁহাদের চিত্ত ব্যাকুল হওয়া স্বাভাবিক। অথচ জেলের ভিতরের ঠিক খবর কাহারও জানিবার উপায় নাই। জেল কর্তৃপক্ষেরা মহাত্মার স্বাস্থ্য সংবাদ যদি প্রতি সপ্তাহে একবার দেশের লোকের অবগতির জন্য বাহিরে প্রচার করেন তবে ভাল হয়। মহাত্মার স্বাস্থ্যের সত্য অবস্থা জানিয়া লোকে সুস্থির থাকিতে পারে। নানা গুজব ও উঠিতে পারে না।

ভূ-স্বর্গ

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।]

চোখের আগে যে সব শোভা
এরেই আমি বড় গণি,
ঐ যে পাহাড় নিবিড় কালো
ঠিক যেন ও নিকষমণি।
নদীটি ঐ চলচে ছুটে
ঢেউএর মাথায় মানিক ফুটে।
কুণ্ডলিত রেখায় রেখায়
প্রান্তরে ঐ ঘুমায় ধনি।

পান্না সবুজ পাতায় ঘেরা
তরুলতার স্নিগ্ধ হাসি,
নীলার কাছে সুনীলিম
আকাশটি ঐ ভালবাসি।
লাল চুনী ফুল-সোনার ফলে
হীরার ধারা নিত্য ঝরে,—
এর কাছে কি স্বর্গশোভা?
ভূ-স্বর্গ মোর এই ধরণী।

স্বাস্থ্যের কথা

[শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়]

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

স্বাস্থ্য পরম সম্পদ। ধন ঐশ্বর্য্য কিছুরই সঙ্গে এর তুলনা করা চলে না। বাঁচিয়া, সুখভোগ করিতে হইলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকা চলে না। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের দেশে স্কুল কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার যে বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে শতকরা পঁচিশ জনও প্রকৃত সুস্থ দেহী নহে। এটা যে কি রকম দুঃসংবাদ তা যাঁরা দেশের ভবিষ্যতের দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করেন তাঁরা অনায়াসে বুঝিতে সক্ষম এর প্রধান কারণ আমাদের দেশবাসী শরীর রক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আজকাল স্কুল কলেজে খেলিবার ও ও ব্যায়ামের বন্দোবস্ত করা আছে কিন্তু কয়জন ছাত্র ক্রীড়া ও ব্যায়ামে যোগদান করে? খুব অল্পসংখ্যক। কাযে কাযেই কেবল মাত্র মানসিক পরিশ্রম করে, শরীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকায় আমাদের ছাত্রেরা ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ছে।

এখন আমাদের দেখা দরকার কি করলে শরীর ভাল রাখা যায়। পরিশ্রমের কথাটাই আমাদের সর্ব্বপ্রথমে মনে আসে। অলসতাই স্বাস্থ্যহানির কারণ আর পরিশ্রমই স্বাস্থ্য সম্পদ দান করে। সুস্থদেহী হতে হলে পরিশ্রমী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সেই কারণেই ক্রীড়া ব্যায়াম প্রভৃতি আনন্দদায়ী শ্রমকর কার্য্যে যোগদান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

এমন অনেক স্বদেশী (?) লোক আছেন যাঁরা ফুটবল ক্রিকেট খেলার বিষম বিরোধী। তাঁরা বলেন—ওসব বিদেশী খেলা, আমাদের দেশের উপযোগী নহে—আমাদের দেশের প্রচলিত যে সব খেলা আছে তাহাই সকলের পক্ষে মঙ্গল কর।

কথাটা সত্য হইতেও পারে। কিন্তু বিদেশী ক্রীড়াগুলি নানা কারণে দেশের মধ্যে বহু প্রচলিত ও অধিক আনন্দদায়ী হইয়া পড়িয়াছে। এই ক্রীড়া ও শরীর রক্ষার বিশেষ অনুকূল। কিন্তু দু এক ক্ষেত্রে যে কুফল পাওয়া যায়, তাহা ক্রীড়ার দোষে নয়—তাহা ক্রীড়কের দোষেই ঘটিয়া থাকে। সুনিয়মে এই খেলা খেলিলে শরীরের উৎকর্ষই ঘটিতে পারে। কিন্তু শারীরিক ক্লান্তিকে উপেক্ষা করিয়া ক্রীড়ার দক্ষতা দেখাইতে গিয়া, অস্বাভাবিক উত্তেজনা প্রকাশের ফলে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহাতে শরীরের অপকর্ষও ঘটিয়া থাকে। তাই বলিয়া এই খেলাকে নিন্দনীয় বলা যায় না। এই খেলাতে ও যে অনেকে যোগদান করে উহা আনন্দেরই কথা। ক্রীড়ার আমোদের মধ্য দিয়াও তবু কয়েকজন কায়িক পরিশ্রম করিয়া থাকে।

একথা ভুলিলে চলিবে না যে শরীরের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যায়াম প্রভৃতির চর্চ্চা ও সাধারণ পরিশ্রম এক জিনিষ নহে। রাস্তায় যে সব কুলী মজুর দেখিতে পাওয়া যায়, শারীরিক পরিশ্রম তাহাদের খুব বেশীই করিতে হয়—কিন্তু সেই কারণেই যে তাহাদের শরীর খুব ভাল থাকিবে এমন বলা যায় না। কেন না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের পরিশ্রম শরীরের অতিরিক্ত হইয়া পড়ে, আর সে পরিশ্রমের উপযোগী খাদ্যের সংস্থান করিতে তাহারা সক্ষম হয় না। সকল বিষয়েই এক পরিমিত ভাব আছে। অপরিমিত হইলেই তাহা ভাল অপেক্ষা অভাবেরই কারণ হইয়া থাকে। পরিশ্রম বিষয়েও একথাও ঠিক খাটে। পরিমিত পরিশ্রম স্বাস্থ্যের যেরূপ অনুকূল, অপরিমিত পরিশ্রম সেই অনুপাতেই স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। কাজেই পরিশ্রম বিষয়েও খুব সংযত ও সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

শরীর রক্ষার পক্ষে যেমন পরিশ্রম অপরিহার্য্য, শরীরের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যায়াম ও তদ্রূপ। ক্রীড়াতে আনন্দ ও পরিশ্রম একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে—কিন্তু শরীরের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে ক্রীড়া দ্বারা তাহা ঘটা সম্ভব পর নহে। ক্রীড়াদ্বারা সুস্থদেহ লাভ করা যায় বটে কিন্তু সুস্থদেহ ও সবল দেহের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। সুস্থ ও সবল দেহ লাভ করাই পরম সৌভাগ্যের বিষয় আর এই সুস্থ ও সবল দেহ লাভ করাই আমাদের সকলের কাম্যনীয় হওয়া প্রয়োজন। শরীর রক্ষার জন্য যেমন পরিশ্রম করা দরকার, শরীরের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সেইরূপ ব্যায়াম অনুশীলন করা প্রয়োজন। শারীরিক উন্নতি লাভ করার যত রকম পন্থা আছে, ব্যায়ামই হচ্ছে তাহাদের সকলের প্রকৃষ্ট।

ব্যায়াম অনুশীলনের কথা উঠলে সঙ্গে সঙ্গে আপত্তিও নানারকম উঠে থাকে। প্রথম আপত্তি ওঠে—সময়ের অভাব। সকলেই এটাকে দৈনন্দিন কাজের ওপর একটা অতিরিক্ত কাজ মনে করে শঙ্কিত হয়ে পড়েন তাই তাঁরা এটাকে একটা অপ্রয়োজনীয় কাজের বোঝা বলে গণ্য করতে দ্বিধা করেন না। এই অনাবশ্যক (?) অতিরিক্ত কাজের জন্য একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করা তাঁদের এক মহা সমস্যার বিষয় হয়ে ওঠে। সাধারণ লোকের কথা বাদ দিলেও দুঃখের বিষয় যে স্কুল কলেজের ছাত্রেরাও

এ বিষয়ে সময়ের অভাব বলে অনুযোগ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না! এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি থাকতে পারে? জাতির অধঃপতনের, এর চেয়ে প্রকৃষ্ট নিদর্শন আর আছে কি? পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে 'সময়ের মূল্য' সম্বন্ধে নানা বিধ প্রবন্ধ পাঠ করে, তাদের এতটুকু সময় জ্ঞান হয়েছে যে বাঁধাধরা সময়ের মধ্যে তারা এই ব্যায়াম অনুশীলনের জন্য একটু ও সময় অপব্যয় করতে পারে না!

ব্যায়ামের জন্য সময়ের অভাব বলে ছেলেরা যে অনুযোগ করে, প্রধান কারণ তারা ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না—নচেৎ তারা জেনেও সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকে? দেশের কারণ যদি সত্য হয় তা হলেই সর্বনাশ! এর চেয়ে দোষের কারণ আর কিছু থাকতে পারে না। আর যদি প্রথম কারণকেই সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় তাহলে এখনও অনেক আশা আছে। যে প্রকৃত পক্ষে নিদ্রিত থাকে তাকে জাগান খুব কঠিন কাজ নয়; কিন্তু যে জাগ্রত অবস্থায় কপট নিদ্রার ভাণ করে শয্যাশায়ী থাকে তাকে জাগরিত করার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। অজ্ঞতা খুব বেশী দোষের বিষয় নয়—কেননা জ্ঞানের আলোতে সে আপনিই বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু জ্ঞানের আলোকের ওপর যে পর্দা আড়াল করে অন্ধকার করে রাখে—তাকে আলো দান করতে যাওয়া বাতুলতা। যারা ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞাত নহে তাদের ব্যায়ামের প্রতি অনুরাগ জন্মান বিশেষ কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করলেই, তার সময়ের জন্য আর কাকেও ভাবতে হবে না। তখন অপরাপর কাজের মত এটাও একটা অপরিহার্য্য কাজের অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে। আহার নিদ্রা যেমন প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ঘটে থাকে তার সময়ের অভাব কখনও উপলব্ধি করতে হয় না—ব্যায়ামও যখন একটা অপরিহার্য্য দৈনিক কার্য্যের তালিকাভুক্ত হবে, সেদিন—ব্যায়ামের সময়ের জন্যও বিশেষ চিন্তিত হতে হবে না।

যাঁরা সময়ের অভাব বলে অভিযোগ করেন, তাঁরা কি একবারও চিন্তা করে দেখেন,—দিনের মধ্যে কতটা সময় তাঁরা অপব্যয়ে নষ্ট করেন! একটু ভাল করে চিন্তা করে দেখলে, অনায়াসেই উপলব্ধি করা যে কাজের সময়ের চেয়ে বাজে সময়ের মাত্রাই অনেক বেশী। প্রয়োজনাতিরিক্ত নিদ্রা, বাজে গল্প, বাজে আমরা কত সময়ই না নষ্ট করে থাকি। কিন্তু এই একটা অত্যাবশ্যকীয় কাজের বেলা, সময় অভাবের দোহাই দিয়া আমরা কেমন নিশ্চিন্ত থাকি! কিন্তু আর ত নিশ্চেষ্ট থাকার সময় নাই। কাজ আমাদের করা চাই। দিবারাত্রির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আধঘণ্টা—এমন কি পনের মিনিট সময়ও কি আমরা ব্যায়ামের জন্য নই (?) করতে পারি না? একটু চেষ্টা করলে বোধহয় এই সময়টুকু অপব্যয়ের জন্য আমাদের ক্ষুণ্ন হতে হয় না। এই পনর মিনিট বা আধঘণ্টা সময় ব্যায়ামে নিঃশেষিত করলে আমরা তার পরিবর্ত্তে যে অমূল্য রত্ন লাভ করতে সক্ষম হই, তাতে মনে হয় যে শুধু পনের মিনিট কেন পনের ঘণ্টা সময় এই কাজে অতিরিক্ত করলেও আমাদের ক্ষতির চেয়ে লাভের অঙ্কটা পূর্ণ হয়ে উঠে। এমন কোন লোক দেখা যায় না, যিনি বলতে পারেন, যে আমি ব্যায়ামের জন্য এক কোয়ার্টার সময়ও নষ্ট করতে পারি না।

স্কুল কলেজের ছেলেরা বলে, যে ব্যায়ামের জন্য সময় অপব্যয় করতে হয়, সে সময় পড়লে ঢের বেশী কাজ হবে। ছেলেদের মুখ থেকে এরকম কথা শুনলে, তাদের সহজ জ্ঞানের অপূর্ব্ব বিচার শক্তির কথা ভেবে আশ্চর্য্য হতে হয়। অথচ কতটা সময় যে বাজে কাজে, গল্প তামাসায় খরচ হয়, তার হিসাব একবার মিলেয়া চিন্তা করবার সময় পায় না আর তার প্রয়োজনও বোধ করে না। কেবলমাত্র শরীর সম্বন্ধে উদাসীন থাকার ফলে তারা এই সামান্য সময়কে অনাবশ্যক কাজে নষ্ট করা বলে মনে করে। এটা তারা বুঝতে চায় না, যে, কেবলমাত্র মানসিক পরিশ্রম করে, আর শারীরিক পরিশ্রম সম্বন্ধে উদাসীন থাকায় তাদের দৈহিক অবনতি ঘটে; আর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তিরও হ্রাস ঘটে থাকে। তাদের মস্তিষ্কও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে কাজেকাজেই পাঠ অভ্যাস করতে, প্রয়োজনাতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যারা স্কুল কলেজে বা পরীক্ষা মন্দিরে Physical Exercise সম্বন্ধে সুন্দর সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখে খুব ভাল নম্বরই পায়, তারা সেই সম্বন্ধে নিজেরা কি করে যে উদাসীন থাকতে পারে, এ একটা ভাববার কথা! সময়ের অভাব বলে ব্যায়ামে প্রবৃত্ত না হওয়া যে একটা ছলনামাত্র এসকল ছাত্র নিজেরাই সকলের চেয়ে বেশী জানে—এ সম্বন্ধে অপরের মতের সঙ্গে একমত হবার প্রয়োজন হয় না।

সময়ের অভাবে যে যিনি অনুযোগ করেন, তিনি যদি প্রতিদিন সকালে আধঘণ্টাকাল ব্যায়ামে ক্ষেপণ করেন, তাহলে দিনের শেষে তিনি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে থাকেন এই ভেবে, যে,—যে সময়ের অভাবের জন্য তিনি এত অনুযোগ করছিলেন, সেই সময়ও কি করে তাঁর হাতে তখনও পড়ে আছে, সমস্ত দৈনিক সময় কাজই যেন সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হয়ে গেছে! এর প্রধান কারণ এই, যে, প্রকৃতপক্ষে ব্যায়াম অনুশীলনের ফলে তাঁর দেহে শক্তি আর ও সজীব, মন আরও বেশী উৎফুল্ল হয়ে উঠে।

কাজে কাজেই অতদিন যে সময়ে একটা কাজ সম্পন্ন হত, সেদিন তার চেয়ে অল্প সময়ে সে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ব্যায়াম করার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের শক্তি ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, অলসতা দূরে যায়। কাজেকাজেই সকল কাজ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সুচারুরূপে সম্পাদিত হতে পারে। শরীর সহজে অবসন্ন হয় না, কর্ম্মে একটা প্রবৃত্তি জন্মে—যেখে কর্ম্মপ্রবণতা আসে আর শক্তিও উত্তেজনার অভাব ঘটে না।

স্কুল কলেজের ছাত্র যারা, পড়ার ক্ষতি হবার ভয়ে এই ব্যায়ামে সময় নষ্ট করতে অনিচ্ছুক, তারা যদি নিয়মিতভাবে ব্যায়াম অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে তারা নিজেরাই বেশ বুঝতে পারবে যে, সকালে বা সন্ধ্যায় এক আধঘণ্টা সময় ব্যায়ামে নিয়োজিত করলে, পড়ার ব্যাঘাত মোটেই ঘটে না। সুস্থদেহে বুদ্ধিবৃত্তি আর চিন্তাশক্তি যে বৃদ্ধি পায় একথা আর কাকেও বুঝাতে হয় না। অসুস্থ দেহ পড়াশুনার কিরূপ বিঘ্ন তা' ভুক্তভোগী মাত্রেই বিশেষভাবে জানে। শরীরের শক্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রিক ও দুর্ব্বল হয় আর বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তাশক্তি সেরূপ প্রখর থাকে না। ব্যায়াম অভ্যাসের ফলে ছাত্রদের শক্তি-উৎসাহ বা উত্তেজনার অভাব থাকে না। কাজেকাজেই ব্যায়াম পাঠের অন্তরায় হতে পারে না। আর একদিকে তারা বিশেষ উপকার লাভ করতে সক্ষম হয়। স্কুল কলেজে দেখা যায় যে বৎসরের মধ্যে কয়েকদিন, অনেক ছাত্র শারীরিক অসুস্থতার জন্য নানা-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহার ফলে অনেকদিন পর্য্যন্ত তাদের সেই ক্ষতিপূরণের জের টানতে হয়। এই সব ছাত্রেরা যদি ব্যায়াম অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে শারীরিক অসুস্থতা, বা জ্বর কিম্বা অন্য ব্যাধি তাদের আক্রমণ করতে পারে না। যে সব ছেলেরা প্রায়ই রোগের আক্রমণে জর্জ্জরিত হয়, তারা ক্রমে সুস্থ নীরোগ সবল হতে পারে। ব্যায়ামের ফলে যখন অটুট স্বাস্থ্য সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়, তখন সময় অভাবের ছলে ব্যায়ামে প্রবৃত্ত না হওয়া অবিবেচক, অবুদ্ধিমানের কাজ বলেই স্বীকার করে নিতে হবে।

অশ্বারোহণ, সন্তরণ, ভ্রমণ প্রভৃতি ব্যায়ামের পর্য্যায়-ভুক্ত। ঘাড় টানাও একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। কিন্তু এসব ব্যায়াম (একমাত্র ভ্রমণ ছাড়া) সকলের পক্ষে নানা কারণে বিশেষ সুবিধাজনক নয়। সেইজন্য গ্রীণ্ ভাবেল, চেষ্ট এক্সপ্যানডার—প্যারালেল বার—বা অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে অল্পায়াসেই সকলে নিজের জন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম, সাধারণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। জিমন্যাষ্টিক, কুস্তী ওকেন ভাল ব্যায়াম কিন্তু এসব ব্যায়ামে উপযুক্ত শিক্ষক আর একাধিক লোকের প্রয়োজন। ডাম্বেল, এক্সপ্যানডার, ডেভেলপার প্রভৃতি ব্যায়াম অনুশীলন করতে অপর কারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। ডাম্বেল প্রভৃতি ভিন্ন ও ব্যায়াম চর্চ্চা করা যায়। ডন দেওয়া, বৈঠক দেওয়া ও কোন রকম জিনিষ না নিয়েও বেশ হতে পারে—কিন্তু সে ভাবে ব্যায়াম প্রীতিকর হয় না। একটা কিছু উপলক্ষ হাতে থাকলে, ব্যায়ামের দিকে বেশ মন নিবিষ্ট হয়। নানা ভাবের ব্যায়ামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর মধ্যে সাধারণত যে যা ইচ্ছা করতে সক্ষম। ভাল পুকুরটী বা নদী থাকলে সাঁতার দেওয়া স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতিসাধন করে। ঘোড়ায় চড়া, নৌকায় দাঁড় টানার সুযোগ খুব কম লোকেরই ঘটে থাকে। কাজেকাজেই সাধারণ লোকের ডাম্বেল প্রভৃতির সাহায্যে ব্যায়াম করাই সুবিধাজনক। ভ্রমণ ব্যায়ামের অঙ্গীভূত হলেও, আমরা যে ভাবে ভ্রমণ করি তাকে ব্যায়াম বলা চলে না। অনেকে খুলা ওয়া রাস্তায় বা পার্কে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া, ভ্রমণ করিয়া ব্যায়াম করিলাম বলিয়া ভ্রান্তধারণা পোষণ করেন। ছাত্রদের মধ্যে যারা কোন রকম ক্রীড়ায় যোগদান করে না, তাদের মধ্যে অনেকেই এই ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী। প্রায়ই দেখা যায়, স্কুল কলেজের ছাত্রেরা কলেজকোয়ার বা কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ব্যায়াম অনুশীলনের তৃপ্তি অনুভব করে। ষ্টডিচার্চ্চেস কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ Dr. Watt সাহেব এই ব্যাপার লক্ষ্য করে একদিন কলেজের কোনও এক ক্লাসে বলেছিলেন—আমি দেখতে পাই যে তোমাদের অনেকে সামনের পার্কে ঘুরে বেড়াও আর ভাব যে Exercise করছি কিন্তু সেটা মহা ভুল। ওতে ওখানকার বৃক্ষদের বেড়ানর বাধা সৃষ্টি হয়—ওরকম বেড়ান তোমাদের জন্য নয়,—ওভাবে বেড়ান বৃক্ষদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন। তারপর তিনি বলেন যে একদিন তিনি একটি ছাত্রের সঙ্গে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়ে আসছিলেন তাঁর বৃদ্ধ বয়সে তিনি যে রকম জোরে চল-ছিলেন, তরুণ বয়স্ক ছাত্রটি তার সঙ্গে পাল্লা দিতে অক্ষম হয়ে বলে উঠল—অত জোর হাটলে আপনার অনিষ্ট হতে পারে। তিনি শুধু হেসে বললেন যে, হাঁটতে হলে এই হাঁটা দরকার—এটা Exerciseএর কাজ করে—শরীর রক্ষার পক্ষে এ বিশেষ অনুকূল। তিনি শেষে যা বলেন তার সার কথা হচ্ছে যে নৌকান যুবকের পক্ষে Exercise হতে পারে কিন্তু বেড়ান মোটেই নয়। বাস্তবিকই এক মাইল বা আধ মাইল ঘুরে বেড়ানকে Exercise বলা চলে না। শ্রান্তি দূর করবার জন্য—একটু হাওয়া খাওয়ার জন্য এরকম বেড়ান ভাল হতে পারে কিন্তু এ বেড়ানকে ব্যায়ামের মধ্যে কিছুতেই ফেলা যায় না। কি ভাবে ব্যায়াম করা দরকার সে সম্বন্ধে এর পরে বলা হবে।

স্বর্গ।

২

ঘোড়া-ঘোড়া

মা ও ছা

"ছেই-ছেই-দাদা, টে-টে"

মেঘ ও রৌদ্র

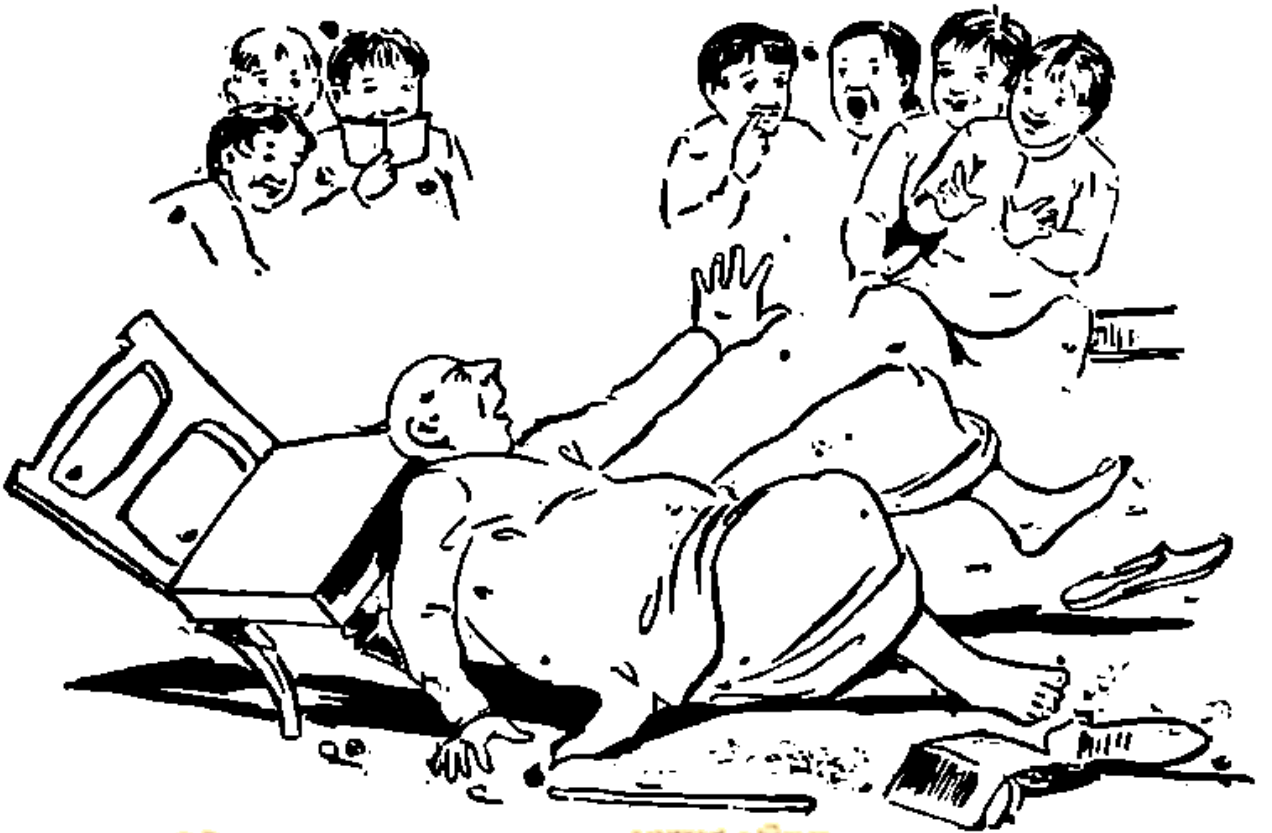

"পৃথিবী গোলাকার"...থোকারা। সাবধান সর্বভারতীয় ভিত্তিক কোনো বলে থেকে বাস করা।

—"লজ্জা কি মা, মুখটি তোল ত দেখি, বাঃ !"

বেতার টেলিগ্রাফ
(নয়নে ও বসনে)

মারকণিও হারমানে

না না মাইরি ! কি যে মুস্কিলে পড়া গেছে ! মানুষ, আর পশুতে তবে তফাৎ রইল কোথায় ? দম বোতাম যা ওপরে পাবেন, আর আমার ওপরে পশুটা—ছি—মাইরি !

ও আর বেরে না, বা বাবা ! বেরে বৈ-কি !

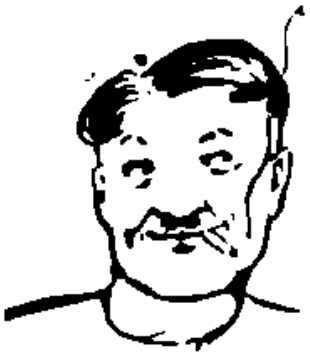

বাসায় গিয়ে বুঝি মরে থাকে।

কা। খুব হুকথা মনে পড়ে গেল ত কেন। আসবৎ মরে যা।

হাসতে গিয়ে বাছা কেঁদে কেঁদে !!

ঘোর কি।

ঘর যদি মরক। আমার তাতে কি।

A Good metal, no doubt

('উত্তম ধাতু, সন্দেহ নাই')

বড় কথাই বেরিয়েছে উহারে—

খাব, খাব, আর কিছু নয়, শুধু—খাব।

বৃদ্ধিমা আহারে পড়িছে মনে—

অন্ধের দৃষ্টি

[শ্রীগিরিবালা দেবী]

(৩)

রাগে দিশেহারা হইয়া সুনীল আপনার মনেই খানিক কত বলিয়া বলিয়া একটু শান্ত হইল; আজিকার আনন্দ—উৎসবের প্রারম্ভেই এমন বিবাদে তাহার কোভের সীমা রহিল না। হৃদয় নদী ছাপাইয়া দুঃখের বান যেন উছলিয়া উঠিতেছিল। অথচ স্ত্রীকে অপরাধিনী ভাবিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিবার শক্তিও তাহার ছিল না। সুনীল মহামায়াকে অত্যন্ত ভাল বাসিত; তাহার কোনরূপ কষ্টই তাহার সহিত না। মহামায়া যে বিপুল ব্যথার ভার বক্ষে লুকাইয়া নির্জ্জনে অশ্রুবরণ করিতেছে এটা ভাবিতেই তাহার অন্তঃকরণ পীড়িত হইতেছিল। তাহার বিচারে স্ত্রীর অপরাধই প্রধান! সে কেন তাহার আদরের মূল্যবান উপহার এমন করিয়া অবজ্ঞার সহিত অযথানে দুয়ানে নিক্ষেপ করিল! তাহার সাধের মহামায়া না জানিয়া তাহার অপরাধের মাত্রা আরও বাড়াইয়া ফেলিয়াছে। এ অবস্থায় সুনীলেরই অভিমান করিবার কথা—কিন্তু প্রেমিক যুবকের অভিমান করা হইল না। বন্ধু মহলে তাস, পাশা খেলিয়া, হাসি গল্প করিয়া সন্ধ্যার রজনীতে বিষণ্ণ বদনে বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীর অবাধ্যতার প্রতিশোধ নেওয়া হইল না। সুনীল হাতে ঘড়িটির পানে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল পাঁচটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী, এখনও সময় আছে। সেখানে মুক্ত গবাক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া মহামায়া বাহিরের রাস্তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া লোক চলাচল দেখিতেছিল, সেইখানে—ধীরে ধীরে উপনীত হইয়া সুনীল বলিল—"শুনি, এখনো সময় আছে; যাবার ইচ্ছে থাকলে এখনো কাপড় খানা বদলে এস, কথা না শুনে এমন ক'রে আমায় কষ্ট দিও না।" বলিতে বলিতে সুনীলের কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল; চক্ষু ছলছলে নিবদ্ধ হইল। মহামায়া সাগ্রহে স্বামীর হাত স্পর্শ করিয়া কাতর স্বরে বলিল "আমি তোমায় কষ্ট দিতে চাই না; কি করলে তুমি সুখী হ'বে বল আমায়?" কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যে কণ্ঠস্বর কঠিন কঠোর হইয়াছিল,—সেই স্বরে আবার এত মধু কি আছে? সুনীল বিস্মিত হইয়া নিমেষ হারা চক্ষে মহামায়ার সৌম্য সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত চিত্ত-ক্ষোভ জুড়াইয়া গেল।

বস্ত্রের পরিবর্ত্তন করিয়া মহামায়া একখানি গরদের শাড়ী পরিধান করিয়া নিকটে আসিতেই সুনীল সোৎসাহে বলিল "বেশ হ'য়েছে গুলি, এতক্ষণে মানিয়েছে। তা গা-টা খালি রেখেছ কেন? দিল্লী থেকে আমি যে তোমার জন্যে সেটা এনে দিয়েছি সেইটে প'রে এস।" মহামায়া বিপন্ন ভাবে একবার স্বামীর পানে চাহিল, একবার দ্বিধা করিল—কিন্তু সুনীলকে পুনরায় আঘাত করিতে পারিল না। সেও যে তাহাকে ভালবাসে, বড় ভালবাসে, বার বার একই কারণে তাহার প্রিয়তমকে ব্যথা দিতে তাহার হৃৎপিণ্ড যে বক্ষের মধ্যে হাহাকার করিতে থাকে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর মনের মতন বেশে সজ্জিত হইয়া মহামায়া বেড়াইতে গেল।

বিলেস চাটার্জ্জীর সহিত আলাপ করিয়া বারস্কোপ দেখিয়া মহামায়া সুনীলের সহিত যখন বাড়ী ফিরিল,—তখন রাত হইয়া গিয়াছিল। উপরে উন্মুক্ত আকাশের অপর্য্যাপ্ত জ্যোৎস্না নিম্নের পাথারাজ্যে নিবদ্ধ তরুশ্রেণীর উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল। মর্ম্মরিত মন পবনের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বালিশগুলির কুসুমিত আতটি বোমে বোমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

আহারাদির পর পর্য্যাতলে আশ্রয় লইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই সুনীল ঘুমাইয়া পড়িল। মহামায়ার চক্ষে ঘুম আসিতেছিল না। কত চিন্তা মনোমণ্ডলে আলুলিত হইয়া পাখা প্রসারিত করিতে লাগিল। সে যে বড় আশা করিয়াই এখানে আসিয়াছিল—সে আশা কি তাহার নিতান্তই দুরাশায় পরিণত হইবে! না না,—না, এ চিন্তা অশুভ। এ অবস্থা হইতে, বিলাসের পথ হইতে তাহার

প্রিয়তমকে সে উদ্ধার করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখের কূলে শান্তির ক্রোড়ে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। এ সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে সে আপনাকে ভাসাইবে না, অন্ধকারে পথ হারা হইবে না। আঁধারের যাত্রীর চক্ষের নিকটে মুক্তির আলো—সত্যের প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া তাহাকে আনন্দের পথে লইয়া চলিবে। শত বাধা আসিবে, বিঘ্ন আসিবে, কিন্তু তাহার বিচলিত হইয়া স্বামীর পথে চলিলে চলিবে না। তাহাকে কঠিন হইতে হইবে। কঠোর হইতে হইবে। অন্ধকারে বসিয়া মহামায়া দুই হাত যোড় করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। মনে মনে বলিল—"তুমি আমার সহায় হইও ভগবান, তুমি আমাকে বল দিও। আমি যেন গৃহধর্ম্মীর কাজ করিতে পারি।"

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, মহামায়া উঠিল না। স্তব্ধ মূর্ত্তির মত অন্ধকার কক্ষে বসিয়া ভগবানের চরণে স্বামীর মঙ্গল কামনা—করিতে লাগিল। বাহিরে নিশীথিনীর স্তব্ধ নীরবতা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া আসিতেছিল—জগৎ মহাসুপ্তিতে মগ্ন, কোথাও কোলাহল নাই, কালিমা নাই, অনির্ব্বচনীয় শান্তির প্লাবন সুন্দর রজতময়ী বিশ্বের বুকে যেন বহিয়া যাইতেছে। এই শান্তিময়ের শান্তির রাজ্যে মহামায়ার বুকে এ অশান্তি কেন? তাহাকে শান্তি দাও প্রভু, মরমের জ্বালা মরমে লুকাইয়া স্বামীর মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সে যে আর পারে না। কিয়ৎক্ষণ পর পাশ পরিবর্ত্তন করিয়া সুনীল জড়িত কণ্ঠে ডাকিল "তলি, কোথায় তুমি, এস, এস।" মহামায়া ধীরে স্বামীর বাহু বেষ্টনে ধরা দিয়া বলিল "আমি তোমার জন্যই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলাম। তোমার ভাল হবে। তিনি তোমার ভাল করবেন!" "আমার তো অসুখ কিছু হয় নি তলি, আমি খুব সুখী; তোমায় সুখী করতে পারলে আরও সুখী হব। বল তলি কিসে তুমি সুখী হ'বে।" বলিতে বলিতে নিদ্রালস নয়নে সুনীল ঘুমঘোরে নিদ্রিত হইল। মহামায়ার অন্তরের কথা আজও স্বামীকে জানান হইল না।

(৩)

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। মাসের পর মাস ঘুরাইল। কতজনের মুমূর্ষিত আশালতা সংসার তাপে শুকাইয়া গেল। আবার কতজনের কটিকাঙ্কর হৃদয়ে গোলাপের পুষ্পকলি মুকুরিয়া উঠিল। সুনীল ও মহামায়ার শুভ্র সুন্দর অন্তরাকাশে কোন অজানিত বেদনার কাল মেঘে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। কিসের বেদনা তাহা কেহ ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু এ ব্যবধানের ক্ষুদ্র বালির বাঁধটুকু ভাঙ্গিয়া দুইটি উচ্ছ্বসিত হৃদয় নদী কিছুতেই অনুকূল পবনে তরঙ্গিত হইয়া উঠে না। পতিগত প্রাণা মহামায়ার স্নেহে, মমতায়, হাসি গানে, সুনীল তৃপ্ত হইতে পারে না, সবই যেন বাহিরের দ্রব্য, রহস্যময়ী নারীর কোন গোপন ভাণ্ডারের দ্বার যেন সুনীলের নিকট রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। খুলি খুলি করিয়াও সে দ্বার খোলা যাইতেছে না। সুনীল মর্ম্মে মর্ম্মে মহামায়ার প্রচ্ছন্ন ব্যথা অনুভব করে, কিন্তু কিসের সে ব্যথা তাহা জানে না। তাই স্ত্রীর চিত্ত বিনোদনের জন্য বিলাসের দ্রব্য সম্ভারে গৃহ ভরিয়া ফেলে। নিত্য নূতন গহনার আমদানী হয়। মহামায়ার যেখানে ব্যথা না জানিয়া না বুঝিয়া সুনীল সেই মর্ম্মেই বার বার আঘাত করিয়া থাকে। তাই মহামায়া সুখী হইতে পারে না। স্বামীর আদরে স্বামীর সোহাগে তাহার বিক্ষিপ্ত অন্তর শান্ত হয় না।

সেদিন অপরাহ্নে অফিস হইতে ফিরিয়াই সুনীল ডাকিল—"তলি!" আনন্দে তাহার মুখ খানি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। হাতের কাজ ফেলিয়া প্রীতিভুল্ল বদনে মহামায়া স্বামীর কাছে আসিতেই হর্ষাবেগে সুনীল স্ত্রীর কটিদেশ বাহুবেষ্টনে বাঁধিয়া অধর দ্বারা তাহার আরক্ত অধরের সুধা পান করিয়া কহিল "আজ একটা শুভ সংবাদ আছে তলি, আমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে বেড়ে গেছে। পূজোর ছুটির সঙ্গে অতিরিক্ত ছুটি একমাসের জন্যে চেয়েছিলাম, তাও মঞ্জুর হয়েছে, এইবার সিমলা কিংবা দার্জ্জিলিং যেখানে তোমার ভাল লাগে বেরিয়ে পড়া যাবে। আজকার খবরটা সুখবর কিনা বল তলি?" মহামায়া স্বামীর আনন্দে যোগ দিতে চেষ্টা করিয়া ও পারিল না। একি সুখবর? হতভাগ্য লোকের অভাবের বিনিময়ে তাহার স্বামী পঞ্চাশ টাকা মাসের অধিকারী হইয়াছেন! অর্থই কি সংসারের সব, এখানে ভাল মন্দের বিচার নাই?

হা ভগবান, সে কেমন করিয়া ইহা সহিবে? তাহার চিরবাঞ্ছিতের তাহার প্রিয়ের এ পতন তাহার যে সহে না। সে পারে না, পারে না, আর পারে না! সকরুণ-কণ্ঠে মহামায়া কহিল "এ আমার সুখবর নয় গো; আজ যদি তুমি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এসে আমায় খবর দিতে সেইটেই যে সকলের চেয়ে আমার বড় সুখবর হত। আমি এমন ক'রে যে আর পারি না; এমন হ'লে বাঁচ্‌ব না।" বলিতে বলিতে মহামায়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সুনীলের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। সহসা ভরা পালের নৌকা যেন চড়ায় ঠেকিল; সুনীল হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। কাহার জন্য তাহার অর্থ উপার্জ্জন? কাহার জন্য তাহার অর্থের প্রত্যাশা? যাহার নিমিত্ত সব, সে যদি না বাঁচে, সে যদি মনের কষ্টে তিল তিল করিয়া ক্ষয়ের পথে যায়, তা হইলে তাহার ঐশ্বর্য্যে কি প্রয়োজন? মহামায়া যদি না বাঁচে! এই কথা ভাবিতেই সুনীলের আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল। সুনীল সভয়ে পত্নীর পানে চাহিয়া দেখিল, সত্যই মহামায়া কেমন যেন দুর্ব্বল ও মলিন হইয়া গিয়াছে। সে এতদিন লক্ষ্য করে নাই তাই মহামায়ার শুষ্ক মুখ আজ তাহার প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিল। উৎকণ্ঠিত সুনীল মৃদু-স্বরে কহিল "ভলি; আমি এ চাকুরী করি বলেই কি তোমার এত মনোকষ্ট, বল, আমায় গোপন ক'রো না! চাকুরী করা তো অপরাধ নয়, সংসারে থাকতে হলে খাওয়া পরা বলে একটা জিনিষ আছে; যা টাকা না হলে উদরপূর্ত্তও চলে না। ধর—আজ যদি চাকুরী না করি তা'হলে খাব কি?" "তোমার আবার খাবার দুঃখ। বাড়ী ঘর রয়েছে, চাষ আবাদ বিনে কত সোণা ফলানো জমি পড়ান হ'য়ে প'ড়ে আছে; তুমি ভাতের কাঙ্গাল!" মহামায়ার অধরে ক্ষোভের হাসি ফুটিয়া উঠিল। চিন্তামগ্ন সুনীল কেদারায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না।। মহামায়া এতক্ষণ ঝঞ্ঝাবিহীর মত স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়াছিল,—হঠাৎ সুনীলের পা দুটি দুই হাতে চাপিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল "ওগো, অত ভাব্‌তে হবে না, চল, ঘরে ফিরে যাই। তাই হবে ভাইয়ের অনিষ্ট ক'রে এ টাকায় আমাদের কি হবে? দেশে গিয়ে চাষ ক'রে—চরকা কেটে খাড়ীতে তাঁতে কাপড় বুনে আমাদের কত সুখে কত শান্তিতে জীবন কাটবে! চল দেশের মুখে—মার কোলে আমরা ফিরে যাই! দুঃখিনী মা আমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন।" মুক্তাফলের মত কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু সুনীলের পায়ের উপর ঝরিয়া পড়িল। মহামায়ার অশ্রুজল সুনীলের নিকটে অশ্রু বলিয়া মনে হইল না; মনে হইল এ অশ্রুকণা যেন তাহারই বুকের রক্তোচ্ছ্বাস। তাহার আদরের ডলি বীণা ছিন্নবিহীর মত তাহারই পদপ্রান্তে বসিয়া নয়ননীরে বক্ষ ভাসাইতেছে, প্রতীকার তাহারই হস্তে—সে কি নীরবে এ দুঃখ দেখিবে? ডলি যাহা চায়—তাহা কি একবারও তাহার হৃদয় বীণায় ঝঙ্কৃত হয় না? হয় বৈকি! কিন্তু বড় ধীর, মৃদু মৃদু সুরে, প্রাণের তারে যা দিয়া তখনই মিলাইয়া যায়। আজ মহামায়ার কাতর মিনতিতে সুনীলের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল; বিস্মৃতির যবনিকার অন্তরাল হইতে জীবন প্রভাতের হাস্যভরা মুখ স্মৃতি ধীরে উঁকি দিতে লাগিল। মনে পড়িল—পূর্ব্ব পুরুষগণের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত আম্র কাননের ছায়া নিবিড় গৃহাঙ্গন—পিতার শেষ বিদায়; মাতার অন্তিম আশীর্ব্বাদ "বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে দেশের কুকুর হয়ে থাকা যে অনেক ভাল সুনীল; তুই গোলামী না করে আপনার ক্ষেতের ধান চাল নেড়েই সুখে জীবন কাটাতে পারবি—।" হায় সে আশীর্ব্বাদ বাণী সে যে ভুলিয়া গিয়াছিল,—সলিল বিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী বৈকতে বসিয়া পরপারের ভাবাবেশময় লহরীলীলা দেখিতে দেখিতে মনে মনে 'ধনক্ষ ঘটের' 'সন্তান' হইবার অপূর্ব্ব কল্পনা করিতেছিল তাহাও সে আজিকার মত এমন করিয়া আর একটি দিনও স্মরণ হয় নাই। সুনীল সব ভুলিয়াছিল—তাহার শান্তিময় গৃহ, স্বর্ণপ্রসূত ক্ষেত্র, ফল ফুলের বাগান সর্ব্বোপরি আপনার অস্তিত্বও তাহার স্মরণ হইত না। অর্থের লালসা ও পদগৌরব তাহার চক্ষের সম্মুখে স্বর্ণমরীচিকা দেখাইয়া কেবল আকর্ষণ করিত—কিন্তু শান্তি দিত না।

সেই চির অন্ধকারের আবৃত হৃদয়ে কে আজ জ্ঞানের স্নিগ্ধ আলো জ্বালিয়া, শান্তির উপবনে তাহাকে লইয়া

যাইতে আসিয়াছে। এ আহ্বান সে হেলায় হারাইবে না, ফিরিবে—ওই কুলুষিতা অশ্রুলোচনা দেবীর হস্ত ধরিয়া এ প্রলোভন সে জয় করিবে!

সুনীল পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সযত্নে সস্নেহে মহামায়ার অশ্রুসিক্ত মুখখানি মুছাইতে মুছাইতে কহিল "আমি চাকরী ছেড়ে দেব ডলি; আমার জন্যে আমি ভাবি না; আমার ভাবনা তোমারি জন্যে। তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব; তোমার হাত কাপড়ের কষ্ট আমি কিছুতেই সইতে পারব না। এসব ভেবে দেখ; মেয়েকের মাথায় চির দরিদ্রতা বরণ করে নেওয়া কাজের কথা নয়।" "অনেকদিন ধরে খুব ভাল করেই ভেবে রেখেছি। এ আমার একদিনের খেয়াল নয় গো। আপনার ভিটেয় বসে দিনান্তে আপনার ক্ষেতের শাক ভাত খেয়ে দিন কাটাতে পারলেই আমি নিজেকে পৃথিবীর সকলের চেয়ে বেশী সৌভাগ্যবতী মনে করবো।" "তবে তাই হবে, আমি কালই আফিসে গিয়ে ত্যাগ পত্র দিয়ে একমাসের মধ্যে কাজ ছেড়ে দেব। আজ আমার নূতন জীবনের সূচনা; ডলি, না, না মহামায়া, অতীতের দৃষ্টি, এস আমার কাছে এস। আজ তুমি ডলি নয়, তুমি দেবী, তুমি মহামায়া; তুমি পথহারাকে পথ দেখিয়েছ,—অশান্তকে শান্ত করেছ। অমন দূরে নয়—এইবার প্রাণে এস।" বলিতে বলিতে সুনীল দুই বাহু প্রসারিত করিয়া মহামায়াকে বক্ষে টানিয়া লইল। সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া আসিল। বাবুদের বাগান বাড়ী হইতে প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল। ভগবানের শুভ আশীর্ব্বাদের মত গন্ধপূর্ণ সমীরণ দুইজনের মস্তক স্পর্শ করিয়া নীরবে বহিয়া গেল। আজ তাহাদের মিলন সম্পূর্ণ হইল।

হাসি ও অশ্রু

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী।]

(১)

কহে হাসি গরবিনী উঁচু করি শির,
"মোর কাছে প্রিয় বড় পরাণ সুধীর।
শুধু দাতা পুণ্যময় যাদের হৃদয়,
শুধুই তাদের আমি প্রধানি আশ্রয়,
আমি পূত নিরমল, নিরমলে বাসি।
জগতে সবাই জানি আমি 'হাসি' হাসি॥"

(২)

অশ্রু কহে বিনয়েতে আনত নয়নে,
"জগতে দুখীরে আমি কোলে লই টেনে।
পাপী, তাপী, শোকাতুরে বাসিগো সকলে,
বেদনা কালিমা দিই মুছায়ে আঁচলে।
ঘুচেছি' পরাণ হতে যত মলারাশী।
নয়নে ফুটায়ে তুলি জগতের হাসি॥"

গ্রীষ্মের দিনে

স্নানের আরাম পাইতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে, আমাদের আইডিয়াল্ প্রীসেরিন্ এবং মেসিনে প্রস্তুত :—চুন্দন, রয়েলবকুল স্নাথ ও ভায়লেট সাবান ব্যবহার করুন।

ইণ্ডিয়ান্ সোপ কোম্পানী

৮৪।১এ বেচুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪৯৬

স্মৃতি মন্দির

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

স্পর্শ

"দেখিস মা, ভুল করিস নে যেন!"

এই অতি সামান্য কথাটাই কামনার অন্তর মধ্যে এমন এক পুলকের প্রবাহ তুলিতেছিল যে কামনা ইহার অর্থ করিতে গিয়া বিস্ময়-আনন্দে হতবাক্ হইয়া গেল। যত ভাবে ততই মনে হয় এই সামান্য কথাটার মধ্য দিয়া পিতা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে চাহিয়াছেন; ভাবী জীবনের দিক চাহিয়াই এমন এক গূঢ় ইঙ্গিত করিয়াছেন যাহা কামনা নিজের মনেও সাহস করিয়া ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই, পিতা তাহার সেই অভিনব কাম্য ইঙ্গিত পথেরই নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

যত ভাবে কামনা ততই বিস্মিত হয় এত বিরুদ্ধ তর্ক আন্দোলনের মধ্যে পিতা কেমন করিয়া তাহার মনের নিভৃততম প্রদেশের বাসনাটি জানিতে পারিলেন! কামনা নিজেই যে সেটিকে জানিতে পারে নাই। আরও বিস্ময়ের বস্তু এই যে পিতা এখানে ছিলেন না, দেশে ফিরিয়াই যে সমস্ত অভিযোগ শুনিয়াছিলেন, তাহাতে কামনা আপন অন্তরেও যেমন শঙ্কিত হইয়াছিল, পিতার হৃদয়ের ভাব যে তাহার চেয়ে একটু কম শঙ্কাকুলও হইতে পারে—তাহা সে একেবারেই ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু পিতার যে সহাস-প্রফুল্ল অন্তরটি এই কিছুক্ষণ পূর্বে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহাতে কামনার মত পিতাপ্রাণা মেয়েও বিস্মিত না হইয়া পারিল না।

অথচ এই যে মূর্তি সে কিছুক্ষণ আগে দেখিয়াছে, ইহা তাহার পিতার চিরদিনের চির পরিচিত মূর্তি! জ্ঞান হওয়াবধি সে এই পরিচয়ই পাইয়া আসিয়াছে। তবুও কামনার মনে হইতেছিল, তাহার বড় দুঃখের, বড় বিপদের সময় বলিয়াই পিতার এমন আনন্দময় অভয় চিত্ত সে দেখিতে পাইয়াছে। চিরদিন পিতা তাহাকে সর্ব কর্মে, সর্ব চিন্তায় স্বাধীনতা দিয়া আসিয়াছেন, কখনও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, চিন্তার বিরুদ্ধে একটি অঙ্গুলিও উত্তোলিত করেন নাই, তবু কামনার মনে হয়, আজিকার অভয়-বাণী পিতাকে পিতৃত্বের সর্বোচ্চ সোপানে উন্নীত করিয়াছে! চির কাল যে স্বাধীনতা সে ঘরে ও পরে, অন্তরে ও বাহিরে অনুভব করিয়া আসিয়াছে, পরম পরিতৃপ্তির সহিত উপভোগ করিয়া আসিয়াছে, কামনা তাহা পাইয়া কোনদিনই চিন্তায় পড়ে নাই। সে জানে না কেমন করিয়া এই ধারণা তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, যাহা সে এতদিন পাইয়া আসিয়াছে, তাহাই তাহার প্রাপ্য। পিতার কাছে কন্যা যাহা পাইয়াছে তাহা তাহার নিজস্ব অধিকার। এই পাওয়াই স্বাভাবিক, না পাইলেই অস্বাভাবিক হইত।

কিন্তু আজ যে স্বাধীনতা দিয়া, পিতা তাহাকে এত সুখী করিতে পারিয়াছেন কামনার মনে হইল, ইহা তাহার প্রাপ্যের চেয়ে অনেক—অনেক বেশী; এতখানির আশা করিবারই অধিকার তাহার ছিল না, কোন মেয়েরই থাকে না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বস্তু পাওয়ার যে আনন্দ, আজ কামনা সেই আনন্দই পাইয়াছিল। এতদিনে প্রাণ সমস্ত প্রাণ শক্তি দিয়া যে অপ্রাপ্য বস্তুর সাধনায় মগ্ন ছিল, কামনা জানিত, সে তাহা পাইবে না, যে কারণেই হোক, কোন দিন তাহার সে স্বপ্ন সফল হইবে না, তাই আজ যখন পিতা পত্র করিয়াই বলিয়া দিলেন, কামনার ইচ্ছার উপরে তাঁহার কোন ইচ্ছা নাই বা থাকিতে পারে না, তখনই কামনার মনের ভিতর সোণার স্বপ্ন ভাসিয়া উঠিল।

মনেরও এমনি বিকার, কামনা যার তাহাকে স্বপ্ন বলিয়া তাহাকে [illegible] এতদিন অদৃষ্ট পূর্ব সুখ যার তাহিতেও তাহার সাধনে ফুলাইত না, আজ তাহাই সত্যের রূপে, সত্যের রূপে কামনার চিত্তমধ্যে অনন্ত সুখ-সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া বসিয়া পড়িল।

তবু সে স্বপ্ন! কবে, কোন্ দুর্যোগের কোলে শায়িত থাকিয়া তাহার সুপ্ত নয়ন-সমক্ষে সেই সোণার স্বপন ভাসিয়া তাহাকে সোণার শিখরে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, কামনার তাহা মনে নাই; কবে, কোন্ ক্ষণে যে দুরাশার সোপান-লতাটি তাহার মনের উদ্যানে লতাইয়া উঠিয়াছিল, কবে সেই লতাটির গায়ে গায়ে ফুল্কো ফুল্কো সোণালি ফুল ফুটিয়া সৌরভ বিলাইতেছিল, কামনার মনে নাই। আজ চিত্ত অন্তর আলোড়িত করিয়াও কোন কথাই সে স্মরণে আনিতে পারে না। কেবল নিশীথ রাতে বহু ঘুমন্ত বন্দী ধ্বনির মধ্যে কোন্ একটা অজানা পুলক-রাগিণীর মতই একটা সুখ স্বর তাহার কাণের মাঝে থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল; কোন্ নীল সাগরের নীল বারি তাহার অন্তর-দৃষ্টির সম্মুখে দুলিয়া দুলিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। কামনার মনে হয় অন্ধ-অন্ধ করিয়া সে সেই কল্লোল শুনিয়া আসিতেছে, ফুল-ফুলার ধরিয়া নীল বারি তাহার নয়নে প্রতিফলিত হইয়া চলিয়াছে, এতদিন সে উন্মনা ছিল, দৃষ্টিহীন ছিল, শুনিবার দেখিবার সুযোগ মিলে নাই।

মনের ভিতরে তাহার যখন এমনই কাব্য সৃষ্টি হইতেছিল, তখন এই মেয়েটি যে একেবারেই বাস্তব ছাড়িয়া অ-বাস্তবের রাজ্যে উপনীত হইয়াছিল তা নয়। এই সংসারটাকে—যেখানে সে এত বড়টি হইয়াছে—কোন মতেই ভুলিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। কল্পনার নীল আকাশে বিচরণ করিতে হইলেও ভূ-পৃষ্ঠে পা রাখিতে হয়। কামনার প্রধান চিন্তা হইয়াছিল, এই যে সুখ-মহিমা-পূর্ণ পাত্র তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সত্যই সে ইহা পান করিতে সে পারিবে কি না, সংসার সুখের যে অভ্রান্ত চিত্র এই মুহূর্তে তাহার মানস-পটে বিভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, সে চিত্র তাহারই উপভোগ্য কি না, ভাবিতে ভাবিতে কামনা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

মানুষের জীবনটাকে যে দিনের পর দিন কেবলই অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিতে হয়, তাহার যে এখনও কোথাও স্থিরতা নাই, এ তথ্য কামনার জানা ছিল না। চলচ্ছক্তিহীন জীবন শকটটিকে যে আপন-আপন শক্তি বলেই দূর হইতে সুদূরের টানিয়া লইয়া যাইতে হয়, তাহার নিজের যে এক পা চলিবার সামর্থ্য নাই—কামনা তাহা জানিত না। তাহার চিরদিনের এই ধারণা, জীবনের চলিবার একটি ধারা আছে, একটি নির্দেশ রেখা আছে সেই-টি ধরিয়াই সে উত্তরোত্তর চলিয়া থাকে, মানুষ তাহারই চাকার মত কেবলমাত্র গড়াইয়া যায়! তাহার নিজের ইচ্ছাশক্তিটুকুও প্রয়োগ করিবার উপায় নাই। এ ধারণা আজ কামনার ভাঙিয়া গিয়াছিল; পিতা স্কুল ভাঙিয়া কন্যাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন, এই জীবনটিকে বাহিবার, চালিত করিবার পক্ষে তাহার শক্তি, তাহার ইচ্ছা-ই প্রধান! যে পথে চালাইবে, যেমন করিয়া চালাইবে, সেই পথে ও সেই ভাবেই চলিবে। এত দিনের বদ্ধমূল ধারণা ভাঙিয়া যাওয়ায় কামনা দুঃখিত হয় নাই, অপিচ আনন্দে আত্মহারাই হইয়াছিল। বহুদিনের রুদ্ধ স্রোত একবার পাষাণ মুক্ত হইলে যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ছুটিয়া চলে, কামনার হৃদয়-উৎস তেমনি কল্লোলে ছুটিয়া চলিতেছিল।

ভবিষ্য-জীবনের কোন চিন্তাই কোনদিন সে করে নাই; করিবার তাহার আবশ্যকতা ছিল না। সাধারণ মেয়ের মতই সে জানিত, এ ভাবনা ভাবিবার ভার তাহার নয়, পিতা ভাবিতেছেন। কিন্তু যে মুহূর্তে পিতা তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ ভার তাহারই পরে ন্যস্ত করিয়া দিলেন, কামনার মনে হইল, সে ইহাই চাহিয়াছিল। একদিন দুইদিন নহে, বহুদিন, বহুকাল ধরিয়া সে ভাবিয়া আসিয়াছে। কখন ভাবিয়াছে, কি ভাবিয়াছে, কেন ভাবিয়াছে জানে না, কেবল জানে, ভাবিয়াছে। তাহার ভবিষ্যতের চিত্র সে নিজেই বহুপূর্ব হইতে আঁকিয়া রাখিয়াছে।

অনেকদিনের লুপ্তপ্রায় স্মৃতিটা যেমন যে কোন মুহূর্তে নূতন হইয়া মানুষের মনে অক্ষয় অব্যয় রূপে ভাসিয়া উঠিতে পারে, আপন অন্তরে আপনার ভবিষ্যতের যে চিত্র

কামনা আপনার অজ্ঞাতে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও এই সময়ে তাহার মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সেই চিত্রখানার সম্মুখে বসিয়া দেখিতে দেখিতে কামনার অন্তঃস্থল কম্পিত হইতে লাগিল। কামনা চক্ষু মার্জনা করিয়া দেখিতে গিয়া দেখে, চিত্র মধ্য হইতে এক অত্যাশ্চর্য্যকর দ্যুতি বাহির হইয়া তাহার চক্ষু দু'টিকে ঝলসাইয়া দিতেছে।

আপন-জীবনের ভবিষ্যৎ চিত্র দেখিতে বসিয়া কামনা প্রথমেই দেখিল তাহাকে, যাহাকে জীবনের সাথীরূপে পাওয়ার আনন্দ সব চেয়ে বেশী হইলেও সাংসারিক মূল্য যাহার সবার চেয়ে কম! দেখিলে তাহাকেই, যাহাকে জীবনের কোনদিন জীবনের সহিত সংযুক্ত দেখিবার দুঃসাহস তাহার হয় নাই।

তবে ইহাও সত্য সংবাদ যে কামনা তাহাকে ভাল বাসিয়াছিল। তাহাতে শুধু নয়, তাহার দারিদ্রটুকুকে পর্য্যন্ত কামনা বুকের মধ্যে জড়াইয়া লইয়াছিল। দারিদ্রে যে এত মাধুরীও মিশাইয়া থাকিতে পারে, সেদিন কামনা তাহাকে ভালবাসে নাই, সেদিন কল্পনাতেও আনিতে পারিত না। দারিদ্রে যে এত তৃপ্তিও নিহিত থাকিতে পারে, কামনার তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। দরিদ্র কোনদিনই তাহার উপেক্ষার পাত্র ছিল না, দরিদ্রের দুঃখ দূর করিতে, তাহাকে সুখী করিতে কামনার কোমল অন্তঃকরণ চিরদিন উৎসুক হইয়া থাকিত; দরিদ্রকে 'মানুষ' বলিয়া দেখিবার শিক্ষা তাহার ছিল—কিন্তু সেটুকুকে অনুকম্পা ছাড়া কামনা আর কিছু বলিয়া জানিত না; দরিদ্রের প্রতি কর্ত্তব্য, সহানুভূতি এই শিক্ষাই সে পিতার নিকটে পাইয়া ছিল কিন্তু যে শিক্ষা কেহ দেয় নাই, আত্মীয় স্বজন কেহ দুঃস্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, তাহাই যে কামনার হৃদয়ক্ষেত্রে মূল বিস্তার করিয়া, অন্তরের অণু-পরমাণু গ্রাস করিয়া এত বড় টি হইয়াছে, তাহা কে-ই বা জানিত; কে-ই বা কল্পনা করিতে পারিত!

এতদিন নিজেই কে-সে পারে নাই। ভাল বাসিয়াছিল, কিন্তু জীবনে তাহাকে পাইবার উগ্র, আকাঙ্ক্ষা যে এমন করিয়া নির্ম্মম নাগপাশে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল তাহা কামনাও যে জানিতে পারে নাই। ভাল বাসিয়াছে, বলিয়া ভালবাসে নাই, ভালবাসিতে হয় বলিয়াও বাসে নাই, পুরুষের প্রতি চিরন্তনকালের আকর্ষণেও ভালবাসে নাই—তবু ভাল বাসিয়াছে! প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছে, তৃপ্তি দিয়া, মোহ দিয়া, ভাল বাসিয়াছে। ভালবাসা ছাড়া যেন আর কিছু দিবার তাহার ছিল না। স্থির হইয়াই তাহাকে ভাল বাসিয়াছিল, আপনাকে আপনার অজ্ঞাতসারে নিঃশেষ করিয়া দিয়া ভাল বাসিয়াছিল।

সে কবে? কবে তাহার নারী হৃদয়ের ভালবাসা সেই দীন দরিদ্রের পানে প্রথম প্রবাহিত হইয়াছিল? কোন্ নদীর সে বারি—কবে তাহার পাড় ভাঙ্গিয়া খাল কাটিয়া নূতন পথ গ্রহণ করিয়াছিল? কবে শৈলশিখর-দ্বিজা-নির্ঝরিণী শৈল বাহিয়া শুভ্র ফেনোজ্জ্বল তুলিয়া মর্ত্তের পথে নামিয়া আসিয়াছিল, কামনার তাহা মনে নাই। আজ সহস্র চিন্তাতেও সেই দিনটি, সেই ক্ষণটি সে স্মরণ করিতে পারিল না।

শুধু মনে হইল, ভালবাসিয়াছে। স্বপ্নে নয়, জাগ্রতে ভালবাসিয়াছে, কল্পনায় নয়, প্রত্যক্ষে ভালবাসিয়াছে! যেন তাহার জন্মান্তরের অর্জ্জিত প্রণয় সে, বহুকাল হইতেই ভালবাসিয়াছে। ধনীর কন্যা সে, বিলাস বাসনে জীবন ব্যয় করিয়া আসিয়া—পথের ধূলার মাঝারে তাই সে আপনার মনটিকে বিলাইয়া দিয়াছে। জন্মান্তরের স্মৃতি তাহাকে সকল প্রলোভন-মুক্ত করিয়া তাহার প্রকৃতির অঞ্চল-ছায়েই তাহাকে সমর্পণ করিয়াছে। আজকে সে শুধু এ জন্মে পায় নাই, মনে হয় পূর্ব জন্মেও পাইয়াছিল। পাইয়া এত তৃপ্ত সে হইয়াছিল, সেই তৃপ্তির আস্বাদই তাহার এ জন্মের বাসনাও মিটাইয়াছে। তাহার পূর্ব জন্মের ঐকান্তিকতাই তাহাকে এ জন্মেও টানিয়া আনিয়াছে।

কামনা পুলক-আবেশে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া পড়িল। খোলা জানালা দিয়া রূপালি রঙের জ্যোৎস্না ঘরের ভিতর আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কামনার মুখে, বক্ষে, শয্যার চারিভিতে শুভ্র জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্য শতধারে বিকীর্ণ হইতেছিল, চক্ষু মুদিয়াও কামনা সে স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করিতে পারিতেছিল; মনে

হইতেছিল কে যেন পরমস্নেহে মায়ের মতন ভালবাসিয়া তাহার মুখের উপর চুম্বন-অমৃত ঢালিয়া দিতেছে, কি সে অধর দু'টির শীতলতা, কোমলতা, কি মধুর আবেশ মিশ্রিত তার! মা যেমন নিদ্রিত সন্তানের মুখের উপর মুখ রাখিয়া অতি সন্তর্পণে তাহাকে জাগাইতে চান, কামনার মুখের উপর মুখ রাখিয়া স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না যেন তেমনি করিয়া তাহাকে জাগিবার আহ্বান দিতেছিল, অতি মৃদু, মধুর কোমলতার আহ্বান স্পর্শ, অতি নরম স্নেহ-স্নিগ্ধ তার আকুলতা। কিন্তু কামনা চক্ষু মেলিয়া তাহাকে দেখিতে পারিল না। যে তাহাকে ডাক দিতেছে, এত কোমল পেলব যাহার স্পর্শ তাহাকে দেখিবার সাধই অবশ্য হইয়া উঠিতেছিল, তবু যে-সে তাহাকে দেখিল না, চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল, তাহার একমাত্র কারণ তাহার অন্তরের মধ্যেও শান্ত তাহাকে দুই বাহুর বেষ্টনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল; অন্তর-দ্বারা অন্তরের উপর কামনার এতটুকু জোর ছিল না যে তাহাকে জাগাইয়া দেয়!

এমন অবস্থা কাহারো হয় কি হয় না তাহা লইয়া বিচার করিতে আমরা আসি নাই। কামনার হইয়াছিল; এইটুকু নয়, ইহার বেশী-ই হইয়াছিল, নহিলে যে শান্ত বন্ধুর বেশে অবস্থান করিতেছে, বিদায়কালে সে এক রকম চিরবিদায়ই জানাইয়া গেছে, নারী হইয়া এত বড় কথাটা কামনা ভুলিবে কেন? সে যেখানে এখন অবস্থান করিতেছে, সেখানে হয়ত সে অন্যের হইয়াই অবস্থান করিতেছে, যাইবার সময় যে মর্মভেদী কথাটা কামনাকে বলিয়া গিয়াছিল, তাহা কামনা বিস্মৃত হইবে কেন? কামনার অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল জানি না, এইটুকু বলিতে পারি যে শান্তকে তাহার ছাড়া বিশ্বের আর কাহারো কল্পনাটুকু করিবার কথা মুহূর্তেরও তাহার মনে হয় নাই। তা যদি হইত, নারী কখনও মনের সিংহাসনে সযতনে তাহাকেই বসাইয়া হৃদয়ের অর্ঘ্য দিয়া মুহূর্তের করিতে পারিত না। বিশ্বে আজ পর্যন্ত কেহ পারে নাই, কস্মিন্‌কালে কেহ পারিবে কি না তাহাও সন্দেহ।

শান্ত তাহার, একান্ত তাহারই। মুখে নয়, অন্তরে, একান্ত তাহার! কামনা বিছানায় পড়িয়া তাহারই অনুভূতির সঙ্গে চেতনা হারাইয়া ফেলিতেছিল—পিতা ডাকিলেন—কামনা!

কামনা শয্যা ছাড়িয়া উঠিল; সাড়া দিতে পারিল না। হঠাৎ পিতার স্নেহ স্বরের সংস্পর্শে তাহার মানস-চিন্তা ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহারই বেদনা কামনার কণ্ঠ মধ্যে বাষ্পের আকারে ঘনাইয়া উঠিতেছিল, সে অধরোষ্ঠ বন্ধ করিয়া নিঃশ্বাস রোধ করিতেছিল, সাড়া দিতে পারিল না।

পিতা অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনশ্চ ডাকিলেন—কামনা! ঘুমুলি মা!

কামনার মনে পড়িল, পিতার আহারের সময় হইয়াছে, তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে নামিতে নামিতে বলিল—যাই বাবা!

পিতা বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, কামনা বেশ বাস সংযত করিয়া বাহিরে আসিতেই, পিতা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া, দুঃখের সহিত বলিয়া উঠিলেন—ঘুম এসেছিল?

না বাবা! তুমি খাবে চল।

রাজেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—আজ খেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না!

কামনা ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল—কেন বাবা—খিদে নেই?

খিদে আছে মা।

তবে?

আজ ত আমার মা আমার খাবার তত্ত্বাবধান করে নি!

কামনা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

চলো—দেখি গে! (ক্রমশঃ)

মরণ

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

আমার প্রিয়,

ভেবেছিলুম, তোমায় কোন কথা জানাব না, কোন কথা—আমার বুকের মধ্যে যা এ যাবৎ পুঞ্জীভূত হয়েছে তা তোমার কাছে বলব না। কিন্তু আজ ভেবে দেখছি তোমায় সব কথা জানাতেই হবে। জগতের চোখে আমি চিরলুপ্ত থাকলেও তোমার কাছে আমার নিজেকে প্রকাশ করে ফেলতেই হবে। ছদ্মবেশের আবরণে মানুষ দিনরাত কখনও থাকতে পারে? তাকে কখনও না কখনও তা খুলতেই হয়। অন্ততঃ একটা মানুষ ও এমনতর চাই যার কাছে সে অনায়াসে হৃদয়ের গোপন কথাটা উন্মুক্ত করে বলতে পারে। আমি কতক্ষণ এ ছদ্মবেশ পরে থাকব? আমার গোপন হৃদয়ের মধ্যে যে কেটে যাচ্ছে সে কেবল আঘাত করছে। আমায় ধূলায় পরিণত করবার চেষ্টা তার, আমি দেখছি হয় তো তার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, হয় তো সে-ই ব্যথাটাই অচীরাৎ শান্ত করবে।

আচ্ছা, কেন, ব্যথাটা চাপা দিতে গেলে সমস্ত বুকটা এমন আড়ষ্ট হয়ে ওঠে কেন, মাথার মধ্যে এমন ঘুরে ওঠে কেন? আমার মনে হয় সারা জগৎ আমার চোখের সামনে কালো হয়ে আসে। সে কি কালো—কিছুতেই তার মধ্যে দিয়ে একটু আলোর রেখা দেখবার যো নেই। দুহাত দিয়ে প্রাণপণে ঠেলে ও সে অন্ধকারের জাল আমি ছিঁড়তে পারিনে। আর্ত হয়ে কেঁদে উঠি—বলি, এই কি আমার ভবিষ্যৎ? আমার ভবিষ্যৎ এমন নিবিড় নিকষ কালো অন্ধকারে ছাওয়া?

তাই বই কি? ভাল করে চেয়ে দেখলেই দেখা যাবে সে তাই, ভাবতে গেলে ও মনে হবে সে তাই। অন্ধকারই মানুষের জীবনে বেশী, কিন্তু আলো ও কি তারা পায় না? আলো পায় কিন্তু আমার জীবন—উঃ, সে শুধু অন্ধকারেই ছাওয়া, অন্ধকারে ঢেকা, অন্ধকারে ঘেরা।

লোকে বলছে—আমার মাথা খারাপ হয়ে গ্যাছে, আমি কি বলি কি করি তার কিছু ঠিক নেই। কেন যে মাথা খারাপ হলে তার কারণ তারা ঠিক করতে পারছে না, তারা ডাক্তার কবিরাজ এনে দেখাচ্ছে।

হাসি পায় মাথা খারাপ, তাই কি সত্য? আমার মাথা ঠিকই আছে, আমি ঠিকই কাজ করি, ঠিকই কথা বলি। তারা আমায় যে ভাবে দেখত ঠিক তার বিপরীত দেখছে বলেই জানছে—বলছে আমার মাথা খারাপ হয়ে গ্যাছে।

কিন্তু তুমি, তুমি ও কি বিশ্বাস করবে তাই, আমার মাথা খারাপ হয়ে গ্যাছে, না, আমি বলছি, আমি ঠিকই আছি, কিন্তু তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে আমার সমস্ত হৃদয় খানা বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেছে, অন্ধকারের ঢেউ গুলো অন্ধকার হতে বার হয়ে আমায় একেবারে প্লাবিত করে গ্যাছে।

দেখ আমি আজ ও ভেবে ঠিক করতে পারছিনে কবে তুমি এসে ছিলে? তবে যখন এসেছিলে সে সময়টার কথা বেশ মনে পড়ছে। আচ্ছা, সে সময়টার বর্ণনা করছি দেখতো, ঠিক হয় কিনা? আকাশটা ছিল আধ মেঘ আধ রোদে ছাওয়া, একবার মেঘ একবার রোদ পৃথিবীর বুকে খেলে চলে যাচ্ছে। বাতাসটা ও বড্ড মৃদু, আর বড় ঠাণ্ডা। আর মনে পড়ে কি—সেই আমাদের রাজচিতা দিয়া ঘেরা বাগানখানির পাশে যে বড় বড় বাঁশের ঝাড়টি ছিল, তারই পরে বসে একটা পাপিয়া ডাকছিল—চোখ গেল—ওগো আমার চোখ গেল।

হাসছিলুম—দূর, পাখী আবার কি বলে? এমন কি আছে যা দেখে জীব নয়ন অমন করে বলতে যায়, আর সে সারা জীবনটা ধরে আর্তভাবে কেঁদে বলে চোখ গেল—ওগো চোখ গেল!

কিন্তু আছে—যথার্থই আছে তা, যাতে শুধু বাইরের এই দুটো চোখ নয় মনের চোখটাকেও আলো দেখার আবার সে আলো নিভিয়ে দিয়ে একেবারে যখন অন্ধকার

এসে জড়িয়ে ধরে তখন সে ওই পাখীটার মতই আর্ত-কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে—চোখ গেল—ওগো চোখ গেল!

চোখ গেল—হাঁ অন্ধই তো বটে। বাইরের চোখ শুধু নয়, আমার অন্তরের চোখ ও যে অন্ধ হয়ে গ্যাছে। কই, আমার সামনে জগৎতো তেমনি করে আলোর মালা হয়ে ভেসে ওঠে না, সে সৌন্দর্য্য তার কোথায় গেল? তোমার আসার সঙ্গে সে এসেছিল, তোমার যাওয়ার সঙ্গে সে চলে গ্যাছে।

কি জানি কেন তোমায় এত ভালবাসলুম। মুহূর্ত্তের দেখা যে জন্মের মতই হৃদয়ে স্থায়ী হয়ে যাবে তা কে জানত প্রিয়!

তারপর কত ঝড়, কত বৃষ্টি, কত তুফান। অধীর হইনি, ভেঙে পড়িনি, কারণ যথার্থ আমি তোমায় আত্ম-নিবেদন করে দিতে পেরেছিলুম। আমায় তুমি বুঝালে জগতে কেউ ওপর ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে না; পরস্পর হয়ে অতি দূরেই থাকতে হবে আমাদের। আমাদের মিলন পরপারে, এ পারে হবে না।

তাই আমি মেনে নিলুম। সত্য, তোমার কথাই সত্য। তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা যুক্ত হয়ে গেল। আমরা দূর হয়ে পরস্পরের উন্নতির চেষ্টা করছিলুম, আমরা দৃষ্টি রাখলুম, পরস্পরের দিকে। একদিন ডাক আসবে, সেদিন সেখানে যদি তুমি আগে যাও, অপেক্ষা করবে যদি আমি আগে যাই অপেক্ষা করব, একদিন আমাদের মিলন হবে, আমরা দুজনেই দুজনকে পাব।

কি ভুল। এতে যে পরম দুঃখ, পরম তৃপ্তি, তা যে কেউই বুঝতে পারলে না। ওগো অপনীত, ওগো লাঞ্ছিত আমার কাছে না এসে ও আমারি জন্যে এত বড় কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলে নিলে তুমি।

সহ্য করলে—কিন্তু আমি যে পারছিনে। একি গভীর অতৃপ্তি, এ কি চিন্তায় আমার সারা বুকখানা ভরে উঠেছে প্রিয়, আমি যে আর সইতে পারছিনে, আমার বুক যে ফেটে যায়।

তারা তোমায় সকলের মন হতে বিতাড়িত করেছে আমার মন হতেও তোমায় তারা তাড়াতে চায়। তারা তোমায় কত না বীভৎস করে আঁকছে, আমি শুধু দেখছি, আমি শুধু শুনছি।

এও কি সত্য? আমি যে ভাবিতে পারি নে তুমি তাই? আমার মন দুলে উঠছে, আমার মাথা ঘুরে উঠছে, আমার বুক কাঁপছে।

না, তুমি তা নও। তুমি তা হতে পার না। আমি তোমায় ভুলব না, আমি তোমায় স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দেব না। তুমি জেনো তোমার একটী আসন আছে, সে আসন আমার হৃদয়ে।

আমি মরব, আমি নিশ্চয়ই মরব। আমার মরণান্ত-কালে—হে আমার প্রিয়তম, তুমি এমনই আমার বুকের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে। আমি এই অন্ধকারে পড়ে আছি, তুমি যে চলে গ্যাছ।

আর না, আর আমি একটা কথা বলব না, শেষ কথা বলে দিচ্ছি, আমি মরব। আমার বাঁচা আর অসম্ভব। মনে করো—তুমি যেখানে থাক, মনে করো আমার কথা। মুহূর্ত্তের পরিচিত বন্ধু, জন্মের মতই বিদায়, আমি আর তোমার সামনে বার হব না, তোমায় পত্র দেব না। বিদায়, আমার বড় আদরের, বড় ভালবাসার চির-কাঙ্ক্ষিত গো, বিদায়।

(তোমার দুঃখী)

জীবন রাখতে হলে

জীবন-রসায়ন

ইহা শরীরের রক্ত মাংস ও স্নায়ুর ক্ষতিপূরণ করে থাকে অথচ উত্তেজক নয়।

—তথ্য লউন—শ্যামাদাস ঔষধালয়—৬৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্লোক—ষোড়শী

[শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ]

সুখ যদি পেতে চাও সুখী কর সবে,
দুঃখের মতন সুখী কে আছে এ ভবে ?

•

যে শুধু পরের ত্রুটী খুঁজিয়া বেড়ায়,
সে শুধু হীনতা জালে নিজেরে জড়ায়।

•

পরেরে করিয়া ছোট নিজে বড় হবে ?
প্রদীপ নিবায়ে আলো কে দেখেছ কবে ?

• •

পক্ষ পেয়ে পিপীলিকা আত্ম করে দান,
অহমিকা মানুষের পাখার সমান।

•

যে জন সবারে মানে সবে মানে তায়,
মানীদের দলপতি হওয়া বড় দায়।

•

সংসারে সবার চেয়ে হবে যদি বড়—
সর্ব্ববিধ অহঙ্কার পরিহার কর।

•

রাজা ধন আছে যার সেও সুখী নয়,
অসংখ্য অশান্তি তারে নিত্য ঘিরে রয়।

•

পরাধীন জীবনের লাঞ্ছনা অশেষ,
খাঁচার পাখীর চায় নাহি সুখলেশ।

•

৯ । সসম্মানে বেঁচে থাকা ধর্ম্ম যদি তারে,
দুর্ব্বল মরিছে নিত্য অধর্ম্মের ভারে।

• • •

১০ । মানুষের সাধ্যাতীত কিছু নাই ভবে,
তুমি শুধু চিরদিন পরাধীন হবে।

•

অসীম শকতি আছে মানবের মাঝে,
যেমন গোপনে বহ্নি কাঁঠেতে বিরাজে ?

•

নিজেরে ভাবিলে হীন হীনতাই যাচে,
"আমি বড়, আমি বীর" ভাব আপনারে।

•

মোহজালে বদ্ধ নর মধুপ সমান,
রয়েছে জানাখুনিবি—নাহি তার জ্ঞান।

• •

১৪ । অজ্ঞান আঁধার ঘুচে জ্ঞানালোক জ্বাল,
ফলে আশ যদি, তবে মূলে জল ঢাল।

• •

অন্তর প্রশান্ত যা'র দৃঢ় যা'র মন,
তার কাছে শ্রদ্ধানত সর্ব্ববিশ্বজন।

• •

১৬ । বিশ্বজয়—প্রেম ছাড়া আর কিছু নাই,
নির্ব্বিচারে সর্ব্বজীবে প্রেম দেওয়া চাই।

৪৷৷ ফটো এনলার্জ
ফটো সহ অগ্রীম সিকি মূল্য পাঠান
৩৬নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

একখানি চিঠি

মাননীয়

"বাসন্তী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩ শে মে তারিখের "বাসন্তী" পত্রিকায় বরিশালে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া যে মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হইলাম। আমরা "বাসন্তী"র অনুরাগী—সেজন্য এই পত্রখানি লিখিলাম—আশা করি আগামী সপ্তাহে পত্রখানি প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। আমি নিজে বরিশালে দেশবন্ধুর সঙ্গে গিয়াছিলাম এবং সভায় উপস্থিত ছিলাম।

"শনিবারের সভায় দেশবন্ধু সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকে বলিয়াছেন যে, আইন জ্ঞান তাঁহার খুবই কম। ইহার উত্তরে শ্যামবাবুর বলা উচিত ছিল যে, পদার্থ-বিদ্যায় চিত্তরঞ্জনের জ্ঞান অতি অল্প, তেঁহি স্বর্গে গিয়াও ধান ভানে। চিত্তরঞ্জন যে বড় আইনজীবী, সে কথাটা দেশ উদ্ধারের কার্য্যেও সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণ আছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন সভাপতির ব্যবহারের নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব পেশ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই।"

প্রথম কথা দেশবন্ধু শ্যামবাবুর আইন জ্ঞান নাই একথা বলেন নাই। তবে শ্যামবাবু নিজে উঠিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহার আইন জ্ঞান না থাকিতে পারে কিন্তু common sense আছে। শ্যামবাবুর আইন জ্ঞান যে নাই এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের দলের লোক পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ। চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাব তিনি বিধিবহির্ভূত করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে অনিলবাবু যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন—শ্যামবাবুর মতে তাহাও বিধিবহির্ভূত হইল। এমন কি চিত্তরঞ্জন কর্ত্তৃক সভাপতির প্রস্তাব—যাহা কোনও কালে কোনও দেশে কোনও আইনে বিধিবহির্ভূত হইতে পারে না—তাহাও বাতিল করিয়া দিলেন।

আদালতের আইন তো দেশের কথা তো হয় নাই কংগ্রেস নিজে যে আইন করিয়াছেন বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হইয়া সেগুলি না জানিলে তাঁহার যারা অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অনেকে কেবল দুঃখ করিয়াছিলেন যে তিনি বেণা বনে মুক্তা ছড়াইতেছিলেন। বোম্বাইয়ে একবার নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে তাঁহার অনুরূপ যুক্তি তর্ক শুনিয়া মহাত্মা পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং প্রকাশ্যে তাঁহার পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং যেখানে কংগ্রেসের আইনের কথা তাহা লইয়া যুক্তিতর্ক করিলে অশোভন কিনা হয়, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। এজন্য মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জনের উপর আইন জ্ঞানের কথা বলিয়া যে কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, তাহা কি ন্যায় সঙ্গত? সভাপতির ব্যবহার যে অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়াছিল তাহা উভয় পক্ষের লোকই স্বীকার করেন—কারণ সভা সমিতির যাহা fundamental rights সেগুলি অগ্রাহ্য করা কি জনসাধারণের প্রতিনিধি বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতির উচিত? চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাব সভা হইতে অগ্রাহ্য হয় নাই, হইলে কোন গোলই থাকিত না। সভাপতি মহাশয় নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সমবেত বিচার বুদ্ধিকে নিজে অতিক্রম করিয়া সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। সভাসমিতির প্রস্তাবও যে সভাপতি অগ্রাহ্য করিতে পারেন, তিনি তো আইনকানুনের ধারই ধারেন না। জোর করিয়া চেয়ারে বসিয়া সভাপতি হইয়া থাকিলে অবশ্য এই অহিংস নীতির দিনে সকলেই নিরুপায়। কিন্তু সভাপতির নিজের তো একটা কর্ত্তব্য বোধ আছে—গায়ে না মানিলে আপনি মোড়ল সাজা কি যুক্তি সঙ্গত? বরিশালের সভা সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে—সাধারণে আগে একদিক শুনিয়াছেন এখন আর একদিক শুনিয়া আশা করি ন্যায় বিচারই করিবেন। দেশের জন্য ৫০ হাজার টাকা মাসিক আয়ের আইন ব্যবসা ছাড়িয়াছেন বলিয়াই কি দেশবন্ধু এমন স্নেহপূর্ণ কটাক্ষের ভাগী?*

ইতি

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

---

*এই চিঠির সঙ্গে-বিশেষ মন্তব্য যে মন্তব্য "বাসন্তীতে" ছাপা হইয়াছিল, তাহা দৈনিক "হিন্দুস্থান" হইতে উদ্ধৃত। যাই হোক দুই পক্ষের কথাই

লক্ষ্মীছাড়ার পাঠশালা

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।]

আয় কে তোরা ভর্ত্তি হবি লক্ষ্মীছাড়ার পাঠশালায়,
শীতকালেতে লোক সেখানে জ্বালবে কেন কাঠ আলায় !
মাষ্টারেরা বেহদ্দ পড়া, উল্টে করে চট্টগোল,
লক্ষ্মীপ্যাঁচা উড়িয়ে দিয়ে আবুথুটেদের অষ্টরোল !
নেইকো পুঁথির আলাই বালাই,
মন করেনা পালাই-পালাই,
লম্বা কথার আচ্ছা সেটা,—কেউ বলেনা ছোট্ট বোল !

• •

তাইন মুখো ঘুসির নেশায় মত্ত হয়ে নৃত্য কর্ !
শ্মশান-পতির সঙ্গ-গাহনে নির্ভয়ে সব চিত্ত ভর্ !
অযাত্রাকে সঙ্গ ক'রে ঘর ছেড়ে চল্ ঘর-বেলায়,
ঘোট্ পাকালে মিল্ মেলিয়ে চার-জাতের ঐ চার চেলায় ?
জাত-বিচারে হয় কে মানুষ ?
মিথ্যে ভাবের তুচ্ছ কাছুন ?
উর্দ্ধপথে উড়্‌লে ফিরে স্বর্গ নরক তার চেলায় ?

• • •

শ্রী-শীতলার বাহন ধ'রে পৈতে বাঁধো তার গলায়,
গন্ধ গোদের চেরু যে তুল্যাং পক্ষী এবং আসে তাড়ায় !
অন্নপূর্ণে হয় কে মানুন ? চার প্রণামী কর্ম্মীবাজ ?
নেই আমাদের ঔদার্য্যি আর
শাস্ত্র গাঁথির কুব্যাধি-ভার,
উল্টো-পথে জেদ্ী ছোটাই,—উল্কা সাথে গতি আমার !

•

পড়ার বহর ভাংপিটেরা নাম লেখে যে ইস্কুলে,
সেইখানেতে ঘোর-মেজাজ বয়া মনের দিল্ খুলে !
অলক্ষীকে রক্ষী যারা, মরুর বুকে খাল কাটায়,
শাস্ত্র তাদের বিষধরী—নয় লেখা সে তাল-পাতায় !
বুঝচে তারা শিখ্‌চে যাসা,
তরুণ যুগের উদার ভাষা—
উদয়-লোকের কাব্য যখন ফুটচে মেঘের হাল-খাতায় !

• • • •

লক্ষ্মীপুজোর দিন কাটিয়ে কর্‌লে তো ঢের অধ্যয়ন,
বুঝলে তো ভাই, লক্ষ্মী কারুর উন্নতিতে ব্যস্ত নন।
ভোরবেলাতে প্যাঁচার সেবায় মিথ্যে কেন খাও ধোকা ?
চাট্‌কা রোদের খাও নিবি তো ওখার থেকে আয় বোকা !
অন্ধ গুহার গর্ত্ত ছেড়ে,
শ্রদ্ধা যখন বেরোয় ভেড়ে,—
মন্ত্র এবং তন্ত্র দিয়ে আর কি তারে যায় রোখা ?

• • • •

মন্ত্র-জপার ফল গিয়েচে, হয়না কিছু বাড় কুঁকে।
বিমল উষা সইবে না আর তিমির-রাতের তার বুকে।
নির্য্যাতিতের রক্তে রাঙা পূর্ব্বে প্রাতঃসন্ধ্যাতে
সূর্য্য করের তূর্য্য বাজে, মূর্চ্ছনাতে মন মাতে।
বন্যা জাগে বিশ্ব-প্রাণে,
নিদ্রা-হরণ দৃশ্য আনে,—
লক্ষ্মীছাড়া। বিদ্রোহী হও,—তীব্র জ্যোতির বজ্রাঘাতে !

প্রাপ্ত পত্র

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত 'বাসন্তী' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

কলিকাতা অঞ্চলে অধুনা একশ্রেণীর জুয়াচোরগণের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যাহা সাধারণ ভদ্রলোকগণের পক্ষে যে একান্তই ভীতিপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের কৌশল জাল এতদূর সুদৃঢ় ও চাতুর্য্যের সহিত বিস্তৃত যে সাধারণের পক্ষে সে রহস্য ভেদ করা একেবারে অসম্ভব বলিলেও চলে। অথচ প্রতিদিন কতলোক যে তাহাদের কবলে পড়িয়া সর্ব্বান্ত হইতেছেন তার সংখ্যা করা যায় না। আমার জানিত কয়েকজন ভদ্রলোক ও এইরূপে বিশেষ প্রতারিত হইয়াছেন। আশাকরি মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বিষয়টী আপনার সদ্য প্রতিষ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত ও সাধারণকে উপকৃত করিবেন।

এই সমস্ত জুয়াচোর গণের নিযুক্ত অনেক দালাল কলিকাতার সকল স্থানে দলে দলে ঘুরিয়া বেড়ায়। সহরের ছোট খাট ব্যবসাদারগণ তাহাদের প্রধান শীকার। দালাল ইহাদের নিকট যাইয়া, যিনি যে প্রকার জিনিসের ব্যবসা করেন, তাঁহার নিকট হইতে, সেই জিনিষ ক্রয় করিবে বলিয়া অনেক প্রকার লোভ দেখায়, ও তাহার জানিত মহাজনের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার ব্যবসার বিশেষ সুবিধা করিয়া দিবে এইরূপ ভাব প্রকাশ করে। অবশেষে তাহারা ভদ্রলোকগণকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহাদের কল্পিত মহাজনের নিকট লইয়া যায়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই সমস্ত কল্পিত "মহাজন জুয়াচোর" গণের মধ্যে প্রায় সকলেই অবস্থাপন্ন ও সংবংশ জাত ও ইহাদের বাসভবন সহরের বিখ্যাত রাজপথ সমূহের উপর স্থাপিত। তৎপরে এই ধনী "মহাজনগণ" উক্ত ব্যবসায়ীর সম্মুখে এক প্রকার জুয়াখেলায় অবতারণা করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া স্বীয় নামের যার্থিকতা রক্ষা করে। এইখেলা সাধারণতঃ ছোট এলাচ কিম্বা একপ্রকার হাড়ের বোতাম লইয়া হইয়া থাকে। সহরের বুকের উপর এই প্রকার জুয়াখেলা ও প্রবঞ্চনা যে বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহা বলা বাহুল্য। অথচ এতদিন পর্য্যন্ত স্থানীয় পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কেন যে সে দিকে আকর্ষিত হয় নাই তাহা বলিতে পারিনা। যাহা হউক পরিশেষে সহরের ভদ্রলোকগণের নিকট এই অনুরোধ যে তাঁহারা যেন বিশেষ না জানিয়া কেবল কথায় বিশ্বাস করিয়া কোন ব্যক্তির সহিত কার্য্য করিতে বা কোন দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে না যান।

নিবেদক—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাঁহারা এলাচিয়া খেলায় প্রতারিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, পুলিশকে ঐ সমস্ত আড্ডার সন্ধান দেওয়া; পুলিশ সর্ব্বজ্ঞ নহে, সন্ধান পাইলে তাহাদের কর্ত্তব্য করিতে পারে। আমরা দু'একজন ভদ্রলোকের নিকট প্রবঞ্চিত হওয়ার কথা শুনিয়াছি, তাঁহারা কেন যে দস্যুদের পুলিশে ধরাইয়া দিবার সহায়তা করিতে বিরত থাকেন, তাহা বুঝি না!—সম্পাদক বাঃ।

শিক্ষকের ব্যতিরেকে

সেতার শিক্ষা

৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১৷৹

সেতারের অতিরিক্ত গত ,, ৷৹

প্রকাশক :—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

৪১।১এ সেন লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা

এবং গুরুদাস লাইব্রেরী ও

ডোয়ারকিন কোংর নিকট প্রাপ্তব্য।

জুনী ও নির্ঝর

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

গরব করে বলছে 'জুনী'
বর্ণা গরিব বলতো রে,
দীর্ণ অতি তোর বুকেতে
কয়টা কৌটা জল ঝরে।
লোকে বলে উৎস রে
কথাটা বীভৎসরে,
তোর ও ধারার শেষটা কোথায়
দেখেই আসি চলতো রে।

২

বর্ণা বলে ধিরাট জুনী
আপনি সবার উচ্চ গো
মাথায় থাকো অভ্র-মুনি
তোমার কাছে তুচ্ছ গো।
সাগর তুমি ভরতে পারো
পদ্মবেতে গঙ্গা মারো,
দুষ্ট লোকে কই হরে
রটায় তোমায় 'তুচ্ছ' গো।

৩

বর্ণা বলে আষাঢ় নামাই
আমি দারুণ চৈতে রে,
খেতে কে চাষাই আমার আসাই—
সৌরভ তার চৈতে রে।
শুকিয়ে দিই পুকুর ডোবা
পদ্ম তাহার হারায় শোভা
মুনি ঋষির কামটা করি
মাইক গঙ্গীর পৈতে রে

৪

বর্ণা বলে মহান্ জুনী
কি আর অধিক কইব গো!
শিবের বড় অশিব তুমি
আমি নেহাৎ দৈব গো।
ভগীরথ আজ শক্তি হারা
আনছো তুমি সলিল ধারা
শঙ্খ তোমার নেয়নি আহা
বড়ই দারুণ দৈব গো।

৫

জুনী তোমার বিপুল এ তেজ
কোন শমীতে রাখ্‌বে, হে
ভাবছি আমি বাঁশের আধার
কেমন করে থাকবে হে।
নমস্কার হে জুনী বর্ণার
হেলোনা এ হীনের কথায়,
ভাব্‌ছে যে উই তোমার বুকের
কোন খানেতে লাগ্‌বে হে।

দেশ বিদেশ

"হাল্লিম্যান" পত্রিকার লণ্ডন সহরের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, ইংলণ্ড-অব-ইয়র্কের ডিউক বসন্ত হইয়াছে। অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পূর্ণ বিশ্রাম লাভিবার জন্য তিনি চিকিৎসকগণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন। সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে আট কি নয় সপ্তাহ লাগিতে পারে।

এ বৎসরে বাঁচাল পাড়ায় বর্তমান সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। কিন্তু এ সম্মিলনের সার্থকতা কি? যদি বলেন, এখানে নানাদেশের সাহিত্যিকেরা পরস্পরের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগ পান, তবে সেটা ভুল কথা। কারণ, আমরা বারম্বারের সম্মেলনে দেখা গিয়াছি, সাহিত্যিকদের মধ্যে মেলা-মেশা যা কুলাকুলি হয় খুবই কম, বসাবসি অবশ্য খানাখানি চলে ভাল রকম বেশী। যদি বলেন, এখানকার আলোচনায় সাহিত্যের উন্নতি হয়, তবে জিজ্ঞাস্য অধিক, এতবারের সম্মিলনের ফলে বঙ্গসাহিত্য কি এক ইঞ্চি অগ্রসর হইতে পারিয়াছে? তবু এ সম্মিলনের প্রয়োজন কেন? "শুধু অকারণ পুলকে"! (বিদূষক)

"বঙ্গে ক্রিকেট" সংবাদ বিভাগের যে, ত্রিবাঙ্কুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে চাঃ বরদারাজুলু নাইডু যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে অনেক রাজনৈতিক-সূক্ষ্ম টীকা আছে বলিয়া তাঁহার উপর পোলিশ বিভাগ তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পুলিশের ব্যয়।—১৯২১ সন হইতে ১৯২২ সন পর্যন্ত ১২ বৎসরের মধ্যে পুলিশ-বিভাগের ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে! বৎসরওয়ারি ব্যয়ের কি আঁক এই সঙ্গে বাড়িয়া চলিয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন:—১৯১২ হইতে ১৯২০ সন পর্যন্ত প্রতি বৎসরে পুলিশের ব্যয় এইরূপ:—

১৯১২—৪-৩৭৪৮৯৲ ;	১৯১৩—৭৫৩৯৩২৲ ;
১৯১৪—৮০৩৪৯২৲ ;	১৯১৫—৮৭৮৩৫১৲ ;
১৯১৬—৯৩৩১৫৩৲ ;	১৯১৭—৯২২৬৪২৲ ;
১৯১৮—১০৪১৯২৲ ;	১৯১৯—১১৪৯১৭৪৲ ;
১৯২০—১০১৩৪৮০৲ ।	অতঃপর ১৯২১—২২ ২৩

সনে এই খরচের পরিমাণ আরও ৪০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।
(সম্মিলনী)

বিলাতে আবার গুজব রটিয়াছিল যে, মার্ক রেডিং পদত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। 'গাতে, টাইম্‌স্' প্রভৃতি পত্রিকাতেই এ সংবাদ প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি এসোসিয়েটেড প্রেস তাহা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছে যে, গুজবটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিলাতের বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ কোনরূপ মতবিরোধ নাই।

ত্রীপুরুষে এক বৎসর কথা না হওয়া।—পাকাত্য জগতে ইহাও নাকি এক আশ্চর্য ব্যাপার, সুতরাং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের অধিক সভ্য নিম্নে প্রোক্ত এক বৎসর কাল পরস্পরে কোন কথা কহা আবশ্যক মাই বলিয়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাইয়াছেন। কিন্তু সে কথা এরূপ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা কিরূপে হয়?

আমাদের সম্রাটের মধ্যম পুত্র ডিউক অব য়র্কের বার্ষিক যে ১০ হাজার পাউণ্ড অথবা দেড় লক্ষ টাকা, বৃত্তি ধার্য আছে, তাহা বর্তমান মাসে তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে বর্দ্ধিত হইয়া ২৫ হাজার পাউণ্ড অথবা তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা হইয়াছে। ইহাতে বিলাতের অর্থনীতিজ্ঞ বড়ই অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। সম্রাট ও আমাদের রাজ পরিবারের এক্ষণে যত বৃত্তি পাইয়া থাকেন তাহা আমরা নিম্নে তালিকা দিলাম:—

সম্রাট ৯,১০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ সত্তর লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা। (এই টাকার মধ্যে তাঁহার নিজ খরচের জন্য সাড়ে বোল লক্ষ টাকা, তাঁহার খরচ, অবশিষ্ট টাকা তাঁহার নিজের দাসদাসী কর্মচারী গাড়ী ঘোড়ার ও দান খয়রাত ইত্যাদি বাবদ) মহারাণী আলেকজেন্দ্রিয়া (সম্রাটের মাতা) ১০,০০০ পাউণ্ড, ডিউক অব য়র্ক (সম্রাটের পুত্রে) ২৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ তিনলক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা প্রিন্স অব ওয়েলসের (সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও ভাবী সম্রাটের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত নাই, কর্ণওয়াল প্রভৃতি স্থানে যে সম্পত্তি আছে তাহা হইতে ইহার বাৎসরিক আয় অনেক টাকা হয়। গত ১৯২০ সালে সম্পত্তির আয় হইতে তিনি ৩৩৭৩৬ পাউণ্ড পাইয়াছিলেন।) অন্যান্য সম্রাট কুমার ডিউক অব য়র্কের স্থান ১০,০০০ পাউণ্ড বা দেড় লক্ষ টাকা ও বিবাহের পর তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা পাইয়া থাকেন। সম্রাটের ছোট কন্যা প্রিন্সেস মেরী তার হাজার পাউণ্ড বা ৪০ হাজার টাকা পান। সম্রাটপত্নী যদি বিধবা হন তবে তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার খাওড়ীর ন্যায় তিনিও বার্ষিক দশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা পাইবেন। ইহা ব্যতীত প্রিন্সেস ফ্রিডিয়ান, প্রিন্সেস লুই ও প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়ার প্রত্যেকে বার্ষিক ২০ হাজার টাকা করিয়া পান (ইহারা ও জর্জের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কন্যা (সুতরাং আমাদের সম্রাট মহোদয়ের পিসি) সম্রাট এডওয়ার্ডের কন্যারাও (আমাদের সম্রাটের ভগিনী) সকলে মিলিয়া বার্ষিক দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা অর্থাৎ প্রত্যেকে সওয়া হাজার টাকা করিয়া পাইয়া থাকেন।
(সম্মিলনী)

শিবধর্মের অনুশাসন; শিবকে কৃপাণ বহিতে হয়। শিবগণ এই অনুশাসন অনুসারেই কৃপাণ ধারণ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কৃপাণের মাপ লইয়া শিখ ও সরকারের মধ্যে গোল বাঁধিয়াছে। একজন আকালী কৃপাণধারণ অপরাধে কলিকাতায় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক দণ্ডিত হন। আকালী হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিলেন, হাইকোর্টের জজেরা আপীল ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন। তাহা হইলে এখন হইতে কি এই বুঝিতে হইবে যে আকালীরা কৃপাণ ধারণ করিলে এইরূপ দণ্ডিত হইবেন? তা যদি হয়, তাহার উপায় দেখি! একদিকে ধর্ম, অন্যদিকে দণ্ড! আকালীরা কোন্‌টা হাড়িয়া কোন্‌টা রাখিবেন, তাহা করিবার বিষয় বটে কি।

আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের ধর্মের অনুশাসনে এমন কথা কোথাও নাই যাহাতে আমরা এক গাছা লাঠিও হাতে রাখিতে পারি। কাজেই যে মুহূর্তে আমাদের লাঠি হাড়িতে বলা হইয়াছে সেই মুহূর্তেই আমরা বিনা দ্বিধায় 'রিফ্‌ট হস্ত' হইয়া পড়িয়াছি। একেই বলে ধর্ম। উঃ, অদ্ভুতাচার, নির্বিবাদী।

শুধু কি তাই? আমাদের ধর্মের অনেক সুবিধা। রোজ 'সেবেজ' পড়িতে হয় না, ইচ্ছা হইলে পূজা পার্বণটা চালাইতে পারিলেই হয়, টিকি রাখ বা রাখ, দিলা কেহ করিবে না, আসল গলাই কিছুই নাই। কিন্তু এই সব ধর্মের দায়টি কি ভীষণ রেখে ত একবার। শিবদের ধর্মের অনুশাসনে—কেশ ধরা করিতে হয়, মুক্ত কচ্ছ হইয়া থাকিতে হয়, বেশে কাছা বা ধরণ পরিতে হয়, চিরুণী অথবা কাঙ্গি ব্যবহার করিতে হয় এবং পরিবেশে—কৃপাণ বহিতে হয়। অন্য চারটার না-হয় কোন বিশেষ গলাই নাই, কিন্তু খেয়েছে-টি: খুর্পা বলে কৃপাণ খরা, মাথার মনে পড়ে? মাথা ও ধর্মের লড়াইয়ের মাঝখানে বেচারা ইসু থাকবে!—আকালীরা না মরিলেই বাঁচি।
(পিশিম)

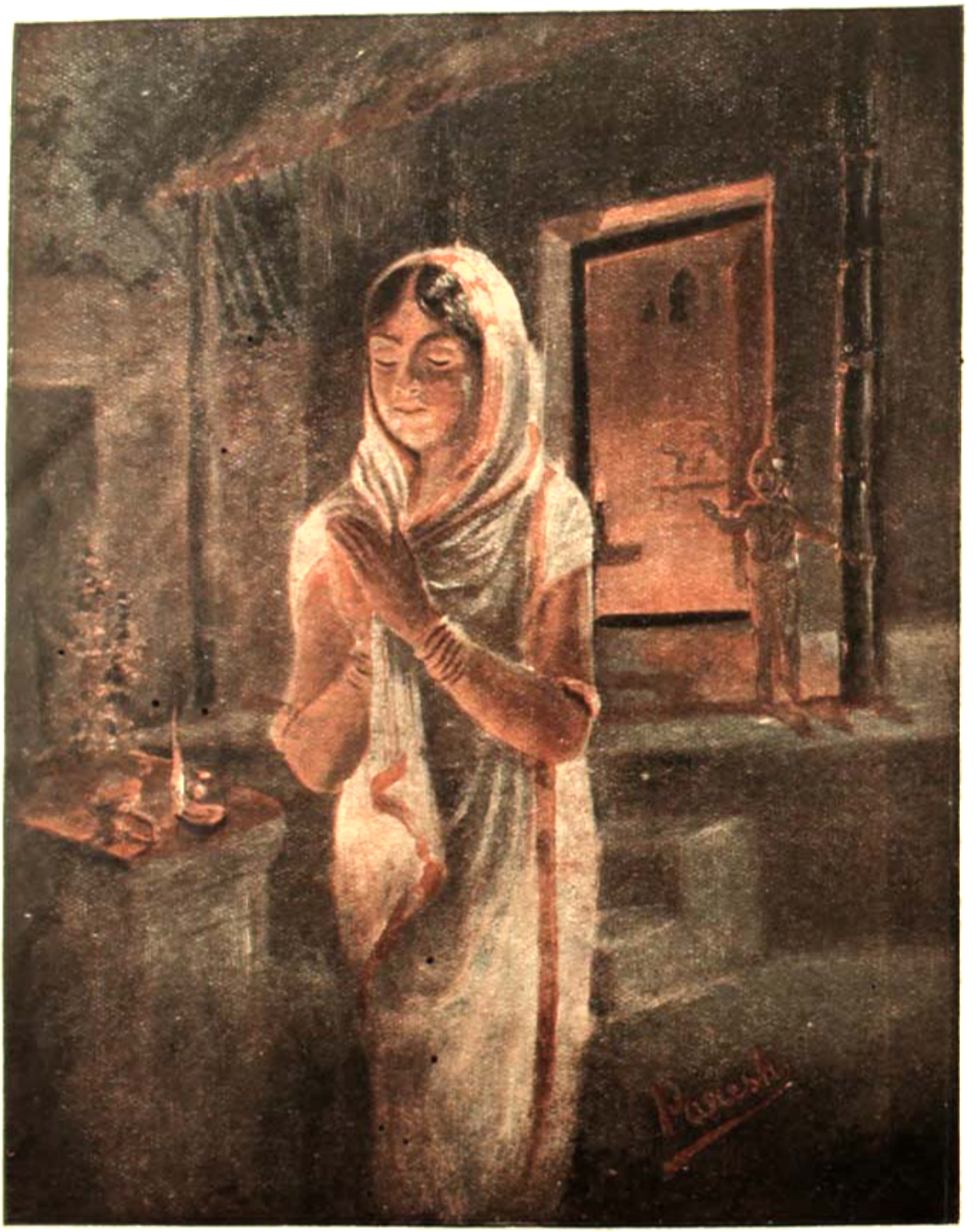

সন্ধ্যা-প্রদীপ

শিল্পী—পরেশচন্দ্র বসু

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ২৬শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩০, ইং ৯ই জুন। [৪৫শ সংখ্যা

কারাদণ্ডে দণ্ডিত আলি-ভ্রাতৃদ্বয়

[হিন্দু মুসলমানের বিরোধের দিনে এই দুই ভায়ের দৃষ্টান্ত ভারতবাসীকে অহরহ স্মরণ করিতে বলি]

বাসন্তীর—২য় বর্ষ

"বাসন্তী" বর্ষ দোষ ত্রুটী সত্ত্বেও বঙ্গীয় জনসাধারণের মনস্তুষ্টি করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিতেছে। আগামী ১০ই আষাঢ় ১৩৩০ শনিবার ২য় বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা প্রথম বর্ষের বাসন্তীর গ্রাহক গ্রাহিকা ছিলেন, ২য় বর্ষে তাঁহাদের যে আমরা গ্রাহক গ্রাহিকারূপে পাইবে তাহাতে আমাদের আদৌ সন্দেহ নাই; যাঁহারা কলিকাতা সহরে প্রতি শনিবার নগদ [illegible] তাঁহারাও যে বাসন্তীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিতে বিরত হইবেন না, ইহাও আমরা খুব আশা করি। [illegible] আমরা জানি, প্রথম বৎসরের বাসন্তী সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছে। বাসন্তীর গল্প, উপন্যাস, নিবন্ধ পত্র সমালোচনা পাঠক-পাঠিকাগণকে আনন্দ দান করিয়াছে। বাসন্তীর রঙীন চিত্রগুলির প্রশংসা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। বাসন্তীর বাল্য চিত্র, কার্টুন প্রভৃতি জনসাধারণকে যেমন আনন্দ দিয়াছে, তেমনি তাহাদের [illegible] বাসন্তীর তেড়ি কলমক্রম, বাসন্তীর নিখিল-বিশ্ব-গুপ্ত প্রদর্শনী, লাফিং গ্যাস প্রভৃতির কথা বঙ্গের সর্ব্বস্থানে প্রবচনের মতই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

২য় বর্ষের বাসন্তীতে এ সকল ত থাকিবেই, চিত্রসংখ্যা যাহাতে আরও বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহারই চেষ্টা করিতেছি।

১ম বর্ষের বাসন্তীতে যে সকল খ্যাতনামা সুধী লেখক লেখিকাবৃন্দ লিখিয়াছেন, তাঁহারা ত লিখিবেনই তাঁহা ব্যতীত আরও কয়েকজন প্রতিভাবান লেখক লেখিকার রচনা-সম্ভারে বাসন্তী সমৃদ্ধ হইবে। বিপ্লব-আন্দোলন কথা, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্-এ ডি-এল মহাশয়ের ছোট গল্প-ও বাসন্তীতে প্রকাশিত হইবে। সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প—প্রথম সংখ্যা হইতেই বাহির হইবে। বাঙ্গালীর ঘরের নিখুঁত ছবি আঁকিতে সিদ্ধহস্তা সুলেখিকা শ্রীমতী সরসীবালা বসুর একখানি সুন্দর উপন্যাস ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে আরম্ভ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বে 'বাঙ্গলার কথা'—সম্পাদক বেদপ্রাণ গুপ্তাচন্দ্র, হেমন্তকুমার প্রভৃতি তরুণ লেখকগণের রচনাও বাসন্তীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে। ভারতী-সম্পাদক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্ ও ঔপন্যাসিক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা ও গল্প বাসন্তীতে প্রকাশিত হইবে। চিন্তাশীল লেখক যমুনা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্-এ বি-এল ও প্রথিতযশা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের লেখা-ও বাসন্তীর সম্পদরূপে দেখা দিবে। বাসন্তী সম্পাদক খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার মহাশয়ের গল্পগুলি অতঃপর বাসন্তীতেই প্রকাশিত হইবে।

আগামী ২য় বর্ষ হইতে প্রতি সপ্তাহের বাসন্তীতে বাঙ্গলার মেয়েদের জন্য বর্ণিকা একটি বিভাগ থাকিবে। ইহাতে বাঙ্গলার মেয়েরা তাঁহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির বিষয়ে আলোচনা করিবেন। বাঙ্গলার মেয়ে বিভাগে মেয়েদের জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার আছে, তাহা আগামী সংখ্যার বাসন্তীতে ঘোষণা করা যাইবে।

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় বাসন্তীর রঙীন চিত্র-বিভাগের ভার লইয়াছেন।

আমরা আশা করি ১ম বর্ষের গ্রাহকগ্রাহিকাগণ যাঁহাদের ৪৮শ সংখ্যা পত্রিকা (যাহা ৮ই আষাঢ় শনিবার প্রকাশিত হইবে) প্রাপ্তিতেই বর্ষ পূর্ণ হইবে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া ৮ই আষাঢ়ের মধ্যে গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা করিলে টাকা মণিঅর্ডার করিবেন, যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা ঐ তারিখের মধ্যেই একখানা কার্ডে সে কথা জানাইয়া দিবেন। যাঁহাদের মণিঅর্ডার অথবা নিষেধপত্র আমরা ১৫ই আষাঢ়ের পূর্ব্বে পাইব না, তাঁহার নামে বার্ষিক মূল্য চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিতে ১৫ই আষাঢ়ের সংখ্যা ডাকে পাঠাইব। ভিঃ পিতে গ্রাহকদের কিঞ্চিৎ বেশী খরচ পড়িবে এবং ভিঃ পি ফিরিলে, আমাদের অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। অনর্থক কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্থ করিতে কেহই ইচ্ছুক নহেন, আমরা জানি।

তাই বিশেষ অনুরোধ, গ্রাহক গ্রাহিকারা তাঁহাদের অভিপ্রায়মত কার্য্য যেন ৮ই অথবা ১০ই আষাঢ়ের মধ্যেই করিয়া ফেলেন, কারণ সাপ্তাহিকপত্র প্রতি সপ্তাহেই বাহির হয়, এক সপ্তাহ দেরী হইলে কাগজ পাইতে অনেক গোল ঘটিতে পারে।

স্মরণ রাখিবেন—১ম বর্ষের শেষ সংখ্যা ৮ই আষাঢ় ১৩৩০।

স্মরণ রাখিবেন—২য় বর্ষের প্রথম সংখ্যা ১০ই আষাঢ় ১৩৩০।

পত্রাদি ও টাকাকড়ি আমার নামে পাঠাইবেন :—

—শ্রীসন্তোষচন্দ্র মিত্র, পরিচালক, বাসন্তী
১৪ নং অম্বারাম ঘোষের লেন,
সিমলা, কলিকাতা।

কেরামতি

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

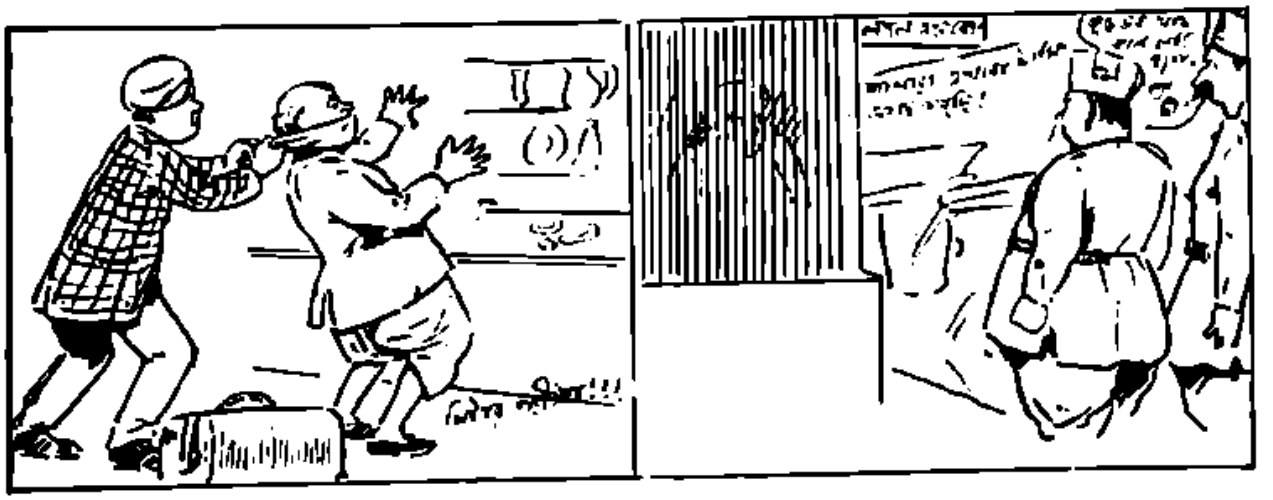

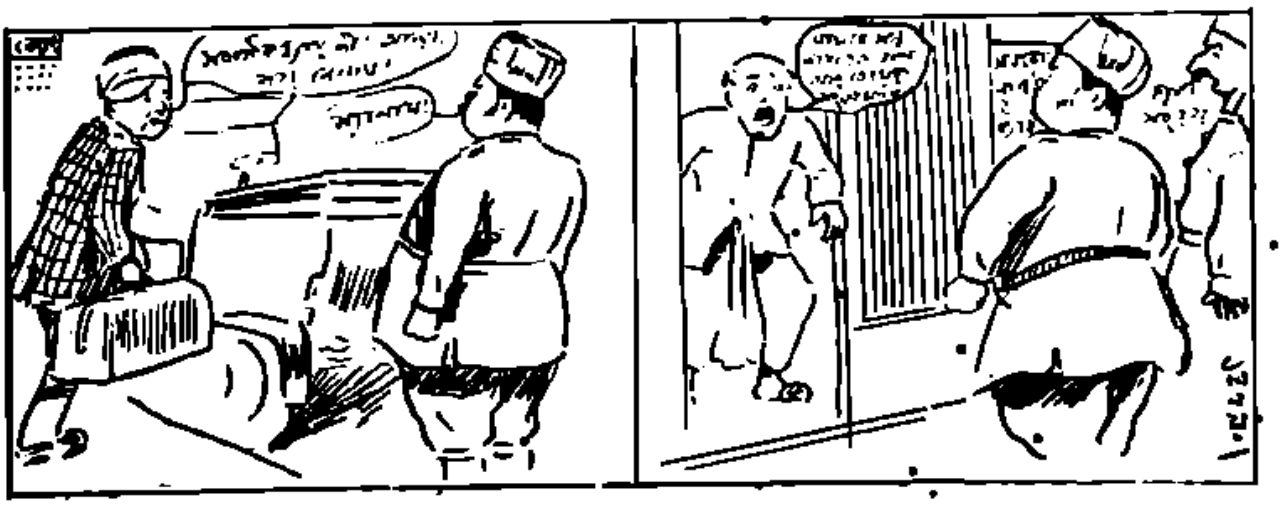

(ক্রমশ:)

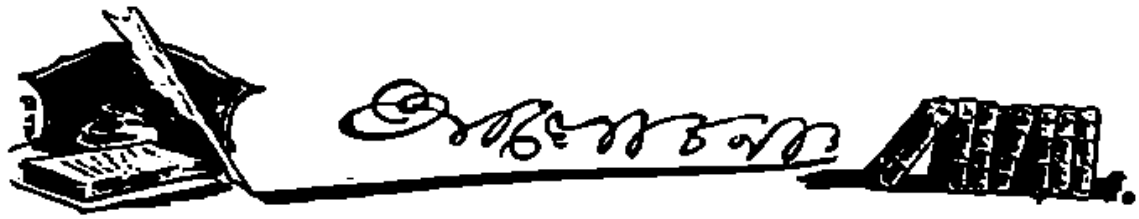

মহাত্মা গান্ধী যখন দীর্ঘ ছয় বৎসরের কারাজ্ঞা লাভ করিয়া কারাগারে গমন করেন তখন মহাত্মার সঙ্গে কারাগারে কয়েকজন ভক্ত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহাত্মা তাঁহার অনুগামী-ভক্তদের হাসিমুখে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। গান্ধী-ভক্তদের মধ্যে বাংলার মেয়ে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুও কারাগারে মহাত্মার অনুগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় মহাত্মার সঙ্গে কারাগারে শেষ সাক্ষাতের কিছু বিবরণ দিয়াছেন। এই বিবরণে দু' একটি নূতন কথা আছে। শ্রীমতী সরোজিনী বলিতেছেন :—

'১৮ই মার্চ্চ তারিখে মহাত্মা গান্ধী ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, মহাত্মাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য দেশের অনেকেই তখন বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহাত্মা দেশকর্ম্মীদের সময়োপযোগী নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই জনতার মধ্যে মহাত্মা আমাকে কোন কথা বলেন নাই। পরে আমি মহাত্মার পরিবারের লোকদের সঙ্গে জেলের কক্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করি। কারাকক্ষে প্রবেশ করিতে আমাদের সকলের চোখেই জল আসিতেছিল। কিন্তু মহাত্মা খুব প্রফুল্ল ছিলেন—তিনি হাসিতেছিলেন। আমরা কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় মহাত্মা আমাকে বলিলেন 'আমি তোমার উপর ভারতে ঐক্য স্থাপনের ভার দিলাম।' মহাত্মাজীর কথা অনুযায়ী শ্রীমতী সরোজিনী ভারতীয়দিগের মধ্যে যাহাতে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়—সেই চেষ্টায় সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

• • • •

শ্রীমতী সরোজিনী বলেন এই সময়ে মহাত্মাজী তাঁহার পত্নীর পানে চাহিয়া করুণভাবে বলিয়াছিলেন 'তুমি কোন দুঃখ করিও না—আমি স্বাধীন ভারতে ফিরিয়া আসিব।'

• • • •

মহাত্মা গান্ধীর আগেও কবে ভারত নূতন আশা, নূতন প্রাণ শক্তি লাভ করিয়াছিল! মহাত্মার সময়কার প্রবুদ্ধ ভারত আজ আবার প্রাণের প্রেরণা হারাইয়া ম্রিয়মাণ—অসাড়—লক্ষ্যহারা, অবশ। ভারতের নবপ্রাণ প্রতিষ্ঠার বন্দী পুরুষসিংহের এই আশার বাণী কি আবার ভারতে প্রাণের প্রেরণা, চঞ্চলতা দিতে পারিবে? ভারত কি আবার তাহার বন্দীদেবতার প্রাণের আশা পূর্ণ করিবার জন্য এক-প্রাণ এক-লক্ষ্য হইবে?

• • • •

একদিকে মহাত্মার আশার বাণী ভারতীয়দিগের হৃদয়ে যেমন আশার সঞ্চার করিতেছে, অপর দিকে ভারতীয়দিগের মধ্যে নানা মতভেদ মত বিবাদ দেখিয়া তাহারা নিরাশ হইতেছে। আজ এই আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া ভারত কোন কূলে পাড়ি জমাইতে পারিবে, কে জানে?

• • • • •

ব্যবস্থাপক সভায় যাওয়া হইবে কি হইবে না ইহা লইয়া কংগ্রেসে দুই দল হইয়াছে—এখনও দুই দলে ইহা লইয়া নানা বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতিতে প্রবেশের ইচ্ছুক তাঁহাদের মধ্যেও কেহ মন্ত্রীত্ব চাহিতেছেন, কেহ বা ঐ সব সভায় ঢুকিয়া গভর্ণমেণ্টের কাজে বাধা দিতে চাহিতেছেন। সুতরাং আশা করা যাইতে পারে আজ যাঁহারা ঐসব স্থানে প্রবেশের পক্ষপাতী, পরে তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ ও দলভেদ হইবে। এইরূপে নিজেদের মধ্যে মতভেদ ও দলভেদ যত বেশী বাড়িবে প্রকৃত দেশের কাজ ততটা কোন দিক

দিয়াই অগ্রসর হইতে পারিবে কিনা তাহা বোঝা যাইতেছে না। ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতিতে প্রবেশের জন্য যত অপ্রিয় ব্যাপার চলিতেছে—সভার ভোটদাতা সাধারণকে ব্যাপারটি বুঝাইবার জন্য তেমন চেষ্টা কিছুই চলিতেছে না। ভোটার-সাধারণ ভোট ব্যবস্থা সম্বন্ধে—নিজেদের অধিকার অ-অধিকার সম্বন্ধে পূর্ব্বেও যেমন অজ্ঞ ছিল এখনও তাহাই আছে। এ বিষয়ে কোন পক্ষ হইতেই তাহাদের উন্নত করিবার কোন চেষ্টা করা হইতেছে না।

• • • • •

অবস্থাভেদে চলিত নীতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা ভাল বটে। কিন্তু পরিবর্ত্তন যেখায় শুধু আত্ম-কলহ ও ভেদ বিবাদেই পরিসমাপ্তি হয় সে পরিবর্ত্তনের গৌরবকতা কোন দিক দিয়াই করা গৌরবের নহে। যে একতা হারাইয়াই আজ আমাদের এই হীন দশা, সেই একতার বন্ধনে একবার বদ্ধ হইয়াও আজ আবার আমরা কি করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলাম তাহা ভাবিয়া বিস্ময় আসে! মুখে আমরা বলি—একতা আমরা মনকে আঁখি ঠারিয়া লাভ করিয়াছিলাম, সত্য একতা নাকি আমাদের মধ্যে কিছুমাত্রও আসে নাই। তবে কি বুঝিতে হইবে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের সময়ে এই যে হিন্দু মুসলমানে গলাগলি, এই যে এক মহা স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এক দেশবাসী দুইটি বিশাল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের একাত্মা মিলিত ভাব—তাহার সবই মিথ্যা!

• • • •

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলনের ঢেউ এত দিন পরে পূর্ব্ববঙ্গেও চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের ওভাবে হিন্দু করিবার চেষ্টা বা ওভাবের কোনরূপ শুদ্ধিকার্য্য এখনও আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান সভা সমিতি করিয়া পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুদিগের বিপক্ষে অভিযোগ করিয়া মুসলমানদের শুদ্ধির কবল হইতে মুক্ত রাখিতে চাহিতেছেন। ধর্ম্মপ্রাণতা অবশ্যই ভাল জিনিস—নিজ-ধর্ম্মী বিধর্ম্মীর কবলে পড়িয়া ধর্ম্ম না হারায় সে চেষ্টাও ভাল। কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া দুই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যদি একটা মারা-মারি, কাটা-কাটি চলে, বিপক্ষের কোন কারণ না আসিতেই তাহা লইয়া যদি নিজেদের মধ্যে একটা বিষম বিক্ষোভের আরম্ভ হয় তবে অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইবে।

• • •

যে মালকানা রাজপুতেরা শুদ্ধি প্রথায় মুসলমান ধর্ম্ম হইতে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে আসিয়াছে তাহারা নিজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করে:—মালকানারা নিজেরা ষোল আনা হিন্দু বলিয়া স্বীকার করে। তাহারা বলে, মোগল শাসনকালে তাহাদের জোরপূর্ব্বক মুসলমান করা হয়। তাহারা হিন্দু আচার পদ্ধতিই বেশীর ভাগ পালন করে। মাথায় টিকি রাখে, ছেলেমেয়েদের হিন্দু নাম রাখে। ইহারা মুসলমানদের সঙ্গে খায় না—তাহাদের ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত পান করে না। ইহাদের অনেকের নাম হিন্দু দেব দেবীর নাম—যেমন তুলসীরাম, রঘুবীর, রামসিং ইত্যাদি। যাহাই হউক এই সমস্ত মালকানাগণ স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম্মে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে চাহিতেছে। হিন্দুগণ নিজেদের অনুদারতার জন্য এতকাল ইহাদের সমাজের বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছে, এইবার যদি উদারতা দেখাইয়া ভিতরে গ্রহণ করে তবে ইহাতে দোষের কারণ কি? ইহাতে জোর জবরদস্তির কোন ব্যাপারই নাই—দু' সমাজে এতটা বিক্ষোভের সূচনাও ইহাতে নাই। ইহা লইয়া যদি কৃত্রিম বিক্ষোভের সূচনা করিয়া আমরা আবার নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করিয়া বসি, তবে সে আমাদের দুর্ভাগ্য। এ বিবাদে আমরা ক্রমেই শক্তিহীন হইয়া পড়িব। আর কোনপ্রকার লাভ কিছুমাত্র হইবে না, হইতে পারে না।

• • • • •

রুহ্‌র ফরাসীদের যথেচ্ছাচার ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। জার্ম্মেন সামরিক শক্তি আজ ফরাসীর কাছে ম্লান নিষ্প্রভ। জার্ম্মেন মানীর মান, ধনীর ধন আজ সব নবজয়ী ফ্রান্সের করতলগত। হাতে পাইয়া ফ্রান্স আজ এমন ক্ষমতাশালী জার্ম্মেনকে লইয়া যা তা করিতেছে। জার্ম্মেনীর এই অপমানের অবস্থা দেখিয়া এতদিন পর জার্ম্মেন বীর হিণ্ডেনবার্গ বলিয়াছেন

'আরও শতবর্ষ যদি অপেক্ষা করিতে হয়, সহিয়া থাকিতে হয় তাহাও থাকিব—কিন্তু এ অপমানের প্রতিশোধ আমরা লইবই। আবার লড়াই হইবে—রণক্ষেত্রে আবার জয় পরাজয় নির্ণয় হইবে।—স্বেচ্ছাচার, যথেচ্ছার জগত যতদিন থাকিবে ততদিন চলিবেই। ইহার প্রতিকার রণক্ষেত্রের তপ্ত রক্তে হওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ে হওয়ার সম্ভাবনা নাই কি?

• • • •

মহা যুদ্ধের পর হইতে, চারিদিকে শক্তিবর্গের কত সালিসী আদালত হইল, কত বড় বড় বৈঠক বসিল কিন্তু তাহার ফল এ পর্য্যন্ত কি হইল? শক্তিমান নিজ শক্তিতে উল্লসিত হইয়া তাহার যথেচ্ছ ব্যবহারে পরকে উত্যক্ত করিতেছে—তাহাকে বারণ করিবার সংযত করিবার কেহ নাই। সালিসীতে নিষ্পত্তি হইলেও শক্তিমানেরই জয় হয়। সালিসী মধ্যস্থেরাও শক্তিমানের দিকেই হেলিয়া পড়েন। জগত জোড়া এই নীতি ব্যবস্থা!

• • • •

মিঃ বোনার ল'র পুত্র মিঃ বলডুইন ইংলণ্ডের প্রধান হইয়াছেন। এখনকার বিলেতী মহাসভায় দেখিতেছি দেশের করতার কথাইবার যাহারা প্রধান উদ্যোগী তাঁহারাই উচ্চ উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। দেশবাসী দেশের মহাসভার নেতাদের নিকট হইতে বুঝি এইরূপ যোগ্যতারই পরিচয় চাহে। পররাষ্ট্র জয়, বিচক্ষণ বুদ্ধি, সুগভীর বক্তৃতা শক্তি এ সবের চেয়ে লোকে বোধহয় এখন হাতে হাতে করতারের হ্রাস ব্যাপারটাই পছন্দ করে।

• • • •

বাংলার রাজধানী কলিকাতা সহরের উপর গুণ্ডামী ও রাহাজানী ক্রমশঃ দিনের দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। ইহা লইয়া অনেক লেখালেখি হইয়াছে, নূতন আইন পর্য্যন্ত বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু গুণ্ডামী রাহাজানী বিন্দুমাত্রও কমে নাই। বরঞ্চ এখন আরো নূতন নূতন উপায়ে রাহাজানীর উদ্ভব হইতেছে। দিন দু'পুরে অপরাহ্ণকালে কলিকাতার সহরতলীর সরকারী পোষ্টাফিস হইতে দুইজনমাত্র লোক পিস্তল দুইয়া আসিয়া বন্দুক ধরিয়া চলিয়া গেল—কেহ তাহাদের ধরিতে পারিল না, বাধা দিতে পারিল না। সরকারী আস্তানায় এইভাবে যাহারা হানা দিতে সাহস পায় সাধারণ অনুরেখযোগ্য লোকের বাড়ীতে তাহারা যে কি ভাবে হানা দেয় তাহা বলাই বাহুল্য। সন্ধ্যার পর কলিকাতার কোন রাস্তায় চলাই এখন আর নিরাপদ নহে। গুণ্ডারা পথচারী লোকদের উপর যথেচ্ছ রাহাজানী তো করেই তাছাড়া গাড়ীতে মেয়েদের দেখিলে তাহারা গাড়ী চড়াও হইয়া মেয়েদের গা হইতে অলঙ্কার ছিনাইয়া লয়। এমন ঘটনা আজকাল প্রচুর ঘটিতেছে। গুণ্ডাদের নিঃশঙ্ক প্রতাপ প্রতিপত্তি দেখিয়া মনে হয় ইহারা কাহারও তোয়াক্কা করে না—কাহারও ভয় রাখে না। কলিকাতায় অবশ্যন্ত নামওয়ালা পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট আসিবার পর অনেকেই মনে করিয়াছিল, ইহার সময়ে পুলিশের সুব্যবস্থায় গুণ্ডার প্রভাব কমিবে। কিন্তু এপর্য্যন্ত সেদিকেও কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আমাদের মনে হয় পুলিশ তেমন দক্ষ হইলে, কর্ম্মক্ষম হইলে গুণ্ডার উপদ্রব সহজেই নিবারিত হইতে পারে। কলিকাতায় পুলিশ কর্ম্মচারীর সংখ্যা কম নহে। ইহাদের জন্য সরকার হইতে অর্থও কম ব্যয়িত হয় না। ছদ্মবেশে পিস্তল লইয়া যদি ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাধারণ পথচারীদের মত গুণ্ডা উপদ্রবিত স্থান দিয়া চলাচল করেন, তবে তাঁহাদের গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা যদি আগ্নেয়াস্ত্র সাহায্যে দু'দশজন গুণ্ডাকে ধরিতে পারেন বা জখম করিতে পারেন, তবে সেই দু'দশজন হইতেই বলকে বল গুণ্ডা ধরা পড়িতে পারে। ত্রাসে সেই নিঃশঙ্কবিহারী গুণ্ডারাও উপদ্রব প্রশমিত করিতে পারে। এসব উপায় পুলিশের কর্ত্তারাও যথেষ্টই জানেন বলিয়া লোকের ধারণা। কিন্তু ইহারা এরূপ কোন উপায়ই এতদিন পর্য্যন্ত কেন যে অবলম্বন করিতেছেন না তাহাই সাধারণে সহজে বুঝিতে পারে না। কলিকাতার পুলিশ বিভাগ কি এখনও মনে করেন যে গুণ্ডা উপদ্রব প্রশমনের উপযুক্ত সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই! যদি তাহা মনে করেন তবে সে আলাদা কথা। আর যদি তাহা মনে না করেন তবে

সাধারণ লোক যাহারা নিত্য গুণ্ডার উপদ্রবে সন্ত্রস্ত তাহারা অবশ্যই বলিবে যে পুলিশ বিভাগ মোটেই কর্ম্মক্ষম নহে। এবং দেশবাসী শান্তি পাইবার জন্য, অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এ বিভাগেরও পরিবর্ত্তন চাহিবেই।

* * * * *

কলিকাতা সহরের এই অবস্থা। এদিকে বাংলার পল্লিগুলিতেও চোর ডাকাতের উপদ্রব দিনে দিনেই বাড়িয়া চলিতেছে। দেশের লোকের এমন ক্ষমতা নাই যে চোর ডাকাতদের বাধা দিতে পারে। আজকাল সামান্য ধরণের চোর ছাড়া একটু উঁচুদরের চোর বা ডাকাত যাহারা তাহারা প্রায়ই আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসে। একটি বা দুইটি লোক বন্দুক বা পিস্তল লইয়া আসিলে শত শত গ্রামবাসীরও এমন সাধ্য থাকে না যে তাহাদের বাধা দিতে পারে? কারণ আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে তাহে সকলকেই নীরব থাকিতে হয়। কিন্তু দু' দশখানা পল্লি খুঁজিলেও কাহারো ঘর হইতে একটি বন্দুক বা পিস্তল পাওয়া যায় না। তাই হিংস্র জন্তুর হাতে, চোর ডাকাতের হাতে পল্লিবাসীদের প্রাণ দিতে হয়। এদেশী লোকের হাতে অস্ত্র দিতে দেশের সরকার নারাজ—অথচ অস্ত্র না থাকার দরুণ দেশবাসীর ধন প্রাণ মর্য্যাদা নানা ভাবেই লাঞ্ছিত—বিপদসঙ্কুল। দেশবাসীকে আগ্নেয়াস্ত্রের অধিকার দিলে দেশের অনেক বিপদ দূর হইতে পারে। কিন্তু দেশবাসী এই অধিকার পাইবার জন্য আবেদন নিবেদন ত কতকাল হইতে করিয়া আসিতেছে, এপর্য্যন্ত তাহাদের এ অধিকারের কোন ব্যবস্থাই হইল না। কখনও হইবে কি-না, তাহাও সন্দেহ!

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালী মেয়েদের উপযোগী হু-পাঠ্য ও পরীক্ষিত উপায় সম্বলিত গৃহ শিল্প-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ "বাসন্তী"তে প্রকাশার্থ প্রয়োজন আছে। কেবলমাত্র মহিলারাই লিখিতে পারিবেন। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধটির লেখিকাকে ১০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধ সরস ও আস্বাদ্য মধ্যে আমাদের হওয়া চাই। প্রবন্ধ "বাসন্তী" সম্পাদকের নামে, খামের উপরে "শিল্পপ্রতিযোগিতা" লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখিকার নাম, ঠিকানা (প্রকাশ না করিতে ইচ্ছা করিলে গোপনই থাকিবে) প্রবন্ধের নিম্নে লিখিত না থাকিলে রচনা প্রতিযোগিতার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধটী পুরস্কৃত হইলেও, ২য় ও ৩য় প্রবন্ধ দুইটি "বাসন্তী"তে প্রকাশ করা যাইবে। প্রত্যেক লেখিকাকেই প্রবন্ধসহ পত্রে "বাসন্তীর জন্য" লিখিয়া দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। ইতি—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, পরিচালক বাসন্তী।

আমাদের বিজ্ঞাপনের ফলাই চলনম।

বিবাহে পণ প্রথা।

[শ্রীঅমূল্যচরণ মিত্র]

হিন্দু বাঙ্গালীর কন্যার বিবাহে পণ বা যৌতুক রূপেই যেন জাতির সর্ব্বনাশ হইয়া আসিতেছে। কুমারী মেহেলতার মৃত্যুর পর হইতে সকলের মনে হচ্ছে এই দুরবস্থা নিবারণের সভা সমিতি ও বক্তৃতা প্রভৃতি কত যে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু হৈ, পণ প্রথা কি পূর্ব্বাপেক্ষা একটুও কমিয়াছে! আমার মনে হয় তাহা হ্রাস পাওয়া দূরে থাক্, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। বাঙ্গালি, তুমি সরকার পাইবার জন্য আকাশ পাতাল চেষ্টা করিতেছ; বিদেশের সামাজিক কুসংস্কার এবং অত্যাচার নিবার করিবার জন্য কি একটু চেষ্টাও করিয়াছ? আগে বহু সাধনায়—পরে দীর্ঘ সাধনার উন্নতি সাধনের চেষ্টা কর, তাহাতে সাফল্য লাভ করিলে, দেশের কাজে হাত দাও। নতুবা বৃথা চেষ্টা। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে যে ব্যক্তি কেরাণি বা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতে এক কন্যার বিবাহ দিতে হইবে তাহার শেষ পরিণাম কি? উঃ একথা স্মরণ করিলে বুক কাঁপিয়া যায়। যেমন তেমন অকাল কুষ্মাণ্ডবৎ একটী মূলধনশক্তি-হীন, চাকুরীহীন অল্প-মাতৃভূমসা-শোভার বাজার দর নূন্যকল্পে ১০০০৲ এক হাজার টাকা; পাশকরা কন্যার রূপের কথা আর কি বলিব? তবে অবস্থা হিসাবে যেরূপ দরের যে বাজার দর দাঁড়াইয়াছে তাহার একটী মোটা মুটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

Matric indigent 1500/-	Matric well to do 2500/-	I.A., I.sc indigent 2500/-	I.A.,Isc. well to do 3500/-
B.A. B.sc indigent 3500/-	B.A. B.sc well to do 5000/-		M.A. M.sc. indigent 5000/-
M.a.Msc well to do 10,000/-	M.A.B.L Msc B.L. indigent 10000/-		M.A.B.L.Msc.B.L well to do 15000/20000/-
Engineer B.E. 20,000/-			Over See. 40000/-
Campbell 5000/-			Medical Graduate M. B. 20,000/-
England Returned Baristers. 20,000/- to 50,000 & more.			Doctors, Engineers.

আজকাল সংবাদ পত্রের স্তম্ভে অনেক বিবাহ সমিতির নাম দেখিতে পাই এই সকল "Marriage securing agency," "Matimonial Bureau, বিবাহ সমিতি ইংরেজের ন্যায় কার্য্য করিতেছে, ইহাতে ইহারা বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেছে। যাহবা। যেন: বলিয়াছি যাই পণ প্রথাকে। ছেলের বাপ মুক ফুলাইয়া গাঁট হইয়া বসিয়া আছেন, আর মেয়েরা যে কি দুঃখের মত মেয়ে ঘুরিয়া ঘর বাড়াই ফিরিয়া বেড়াইতেছেন। হায় হতভাগিনী বাঙ্গালীর মেয়ে। তোমার দুর্দ্দশা আর ঘুচিল না। উদ্বিগ্নিত মূল্য দিয়া বর ক্রয় করিতে হইলে কয়টী মধ্যবিত্ত পরিবার সংসার থাকিতে পারে? যদি অভিভাবকদের কন্যা আদি-পরিত্যাগি না, তাহাদের পণ বিপদাপন্ন আসিলে, বা মেয়েকে অতি নাই উপায় কি জামাইকে বশ ইচ্ছা দিব না, তাহাতে কাহার কি বলিবার থাকিতে পারে। কিন্তু কন্যার বাপটা পরলোকে বি, এ বা এম্ এ পাশ করিয়াছে বলিয়া কোন্ হিসাবে সে ৫০০০৲ হাজার টাকার মূল্যবান পণ প্রদান করার পিতার নিকট হইতে দাবী করে? এক সময়ে বিএ এমএর কদর ছিল। কিন্তু আজকাল 2nd class 3rd class এম্ এ পাশ ওয়ালাদের বাজার দর মাসিক ৩০।৪০৲ টাকার বেশী নয়। বি-এ পাশের কথা ত দূরে থাক্। অবশ্য অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্তবংশের ছেলেদের অভিভাবকগণ কোনও ক্রমেই পণ লইয়া এত কড়াকড়ি করেন নাই, বর্ত্তমানের উচ্চ শিক্ষার বলিয়াছি বংশের পণের একটা মূলত নাই—যত মূলধন অভাবের মূলত শ্রেণীর মধ্যবিত্ত আবুদিকদিগের বলেই। পুত্র বিক্রয় পিতার পণ গ্রহণে মনুষ্যত্বাভাবের করিয়া পরিচিত হইবার জন্য বাপটী মারিয়া বসিয়া আছেন। তবেত দুনিয়া কোপ মারিতে পারেন। তাঁহারা কলিকাতায় বিলকতকের জন্য একখানি ছোট খাট বাড়ী ভাড়া করিয়া কি চাকরী

বৈজ্ঞানিক উপায়ে

সেতার শিক্ষা

৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১৷৷০

সেতারের অতিরিক্ত গত ৷৷০

প্রকাশক :—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

৪১।এ সেন লেন, শোভাবাজার, কলিকাতা।

এবং গুরুদাস লাইব্রেরী ও

ডোয়ারকিন কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

রাখিয়া যত মানুষগুলো দেখাইয়া মেয়েকে ভুলাইতে চাহেন। কলিকাতায় কে কোথায় গেছে খবর লইয়া কন্যার পিতা ১৮।১৯ বৎসরের কুমারীকে বিদায় করিতে পারিলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন; অনেক অবিবেচক লোক অন্যপক্ষে না করিয়া কোনও বিশেষরূপ অনুসন্ধান না করিয়াও প্রতারিত হইতেছেন। পণ প্রথা পূর্বাঞ্চলে যতদূরের সর্বত্রই পূর্ববাত্রার অনুসরণ চলিতেছে,—ইহার ফলে অনেক মধ্যবিত্ত দরিদ্র পিতা অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা—বিশেষতঃ পিতৃমাতৃহীন অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক—কন্যাদায়ের হাত এড়াইতেছে! আবার অনেক দরিদ্র পিতা ৫০ হইতে ৭০বৎসরের তেজ বয়ে বুড়োকে কন্যাদান করিয়া কন্যার আইবুড়ো নাম ঘুচাইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছে। অন্যপক্ষে অনেক অবলা কুমারী আত্মহত্যা করিয়া পিতা মাতার দুঃখ মোচন করিতেছে। বাঙালি! এ পাপ তোমার প্রাণিবে? এখনও সময় আছে, সাবধান হও।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ জাতির মধ্যে অথবা বৈদ্য জাতির ভিতর এই প্রথা অনেক কম বলিয়া মনে হইতেছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থদের অধিকাংশই চাকুরি জীবি, এই পণ প্রথার ভয় বরের এমন একটি মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ পরিবার নাই যে এক কন্যাদায়ের প্রভাবেই নিম্ন না হইয়াছেন। অনেকে আবার ঘুষুরো লাগের কাজও করিতে-ছেন—তিনি কন্যাকর্তার নিকটও আবার বরকর্তার ঘটক। বাঙালী কোনও কীর্তি ভুলে নাই; নিজের আত্মীয় স্বজনকে বাঙালী পরম পক্ষ বলিয়া মনে করে, সে দোষ তাহাদের নিজেরই। সেজন্যই আমাদের শতকরা ৮০টী ব্যবসায় বাঙ্গ প্রতিষ্ঠানী—জাতি পক্ষ। বাঙালি! তোমার এই কালিমা কবে ঘুচিবে?

আইনটি একটা সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করা হইত। সহরে—সমাজ বলিয়া কোনও জিনিষ আজকাল নাই। তবে পল্লীগ্রামে আর কিছু থাক আর নাই থাক, অন্ততঃ লোকদিগের মধ্যে যে টৈতন্য স্বভাবটী এখন পূর্ববাত্রায় বিরাজমান, সমাজ এখনও সেখানে আছে কথাটা প্রভৃতি বিদ্রূপের ভয়ে লোকদিগের মধ্যে যে টৈতন্য স্বভাবটী এখন পূর্ববাত্রায় বিরাজমান, সমাজ এখনও সেখানে আছে কথাটা প্রভৃতি বিদ্রূপের ভয়ে কার্য্য করিতে সমাজের সকলেই তৎপর। ইহার প্রধান ভার পল্লীর শিক্ষিত যুবকগুলী বিশেষ! পল্লী সমাজে পণপ্রথার বিরুদ্ধে বিধি ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বৃদ্ধদের নিকট হইতে এসম্বন্ধে অধিক কিছু আশা করিতে পারি না। যদিও শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে বলি, তাই সকল তোমরা এবিষয়ে বদ্ধ পরিকর না হইলে বাঙালীর ভগ্ন পরিবার কদাচার রূপ বিষম সমস্যা হইতে রক্ষা পাইবে না। কি উপায় অবলম্বন করিলে এই কুপ্রথা সমাজের বক্ষ হইতে অপসারিত হইবে, তাহা আমি যথাস্থানে "বাসন্তীতে" লিখিতে পারিব।—

ভূষণ

[শ্রীলীলা দেবী]

সোণার নূপুর রতন কেয়ূর
এ সব তোরা নেরে নে
ফুলের মালা ডালিম বালা
আমায় গাঁথা দেরে নে!
চূর্ণ কেশের এই নে লো বন্ধু
চন্দন আর কণ্ঠ হার
সুরমা কাজল বাদলা আঁচল
রঙিন্ বসন ফুলঝুরী!
এই নে লো সই সোণার কাঁকই
চূর্ণীর সিঁথী—কটি চুল্
কর্পূর দীপ পাঁচ রঙা টীপ
এই নে হীরের খোঁপার ফুল।
বরিষনে তব ভাবি যে হয়
তাঁর অশুভ হবেই না
হাতের নোয়া না যায় ধোয়া
বেঁচেই আছি তবেই না?
তারই গভীর প্রেমের কাজল
সেই অনুরাগ আলতাতে
তারই সোহাগ সিন্দূরেতে
সেজেছি সই কাল রাতে।
কি হবে বোন্ এ প্রসাধন
সুন্দর আজ নয়নে
প্রণয়ই তার ভূষণ আমার
স্বপ্নে জাগায় শয়নে।
নাই যদিও সজ্জা শোভা
নয় বেশী রূপ আজকে কি?
বল্ দেখি সই সত্যি ক'রে
হাসবে কি সে সাজ দেখি?
অবাক্ হ'য়ে রইলি কৈন
এ সব তোরা নেরে নে
যুঁথির মুকুল বকুল পারুল
আমায় গাঁথা দেরে নে।

রকমারী

[শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রণীত]

মিনার্ভা থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত একখানি গীতিবহুল নাটিকা। ইহার অভিনয় দেখিলাম, "রকমারী"ই বটে! গবর্ণমেণ্টের ধামা-ধরা মা-সরস্বতীর কুলীন-পুত্র 'খাঁ বাহাদুর' বৃদ্ধবয়সে 'রকমারী' হইবার বাসনায় কার্টবুক অব রেডিং ধরিলেন। জাগরণে—কার্টবুক, স্বপনে-স্বপনেও কার্টবুক (বহিটি শেষ হইয়াছিল কি-না জানা যায় নাই, এ ক্যাট্ র‍্যাট্, একটি মোটা ইন্দুর হইতে হইতেই যবনিকা পতন) নহিলে সাহেবদের কাছে মান থাকে না, অন্যথা হইতে হয়—বৃদ্ধের লেখাপড়ার সে কি চাড়! ভবঘুরে দুনিয়ায় একটি 'নিশ্চয়তা'র আশায় ঘুরিতে ঘুরিতে সত্য-সত্যই একটা আস্তানা গাড়িয়া ফেলিল! ধনীর দুলাল ব্রিফ্‌লেস্ ব্যারিষ্টারের পিছু-আর ধ্বংস ও বংশবৃদ্ধির যুক্ত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা (এ কার্য্যে উৎসাহের অভাব যদিও শতকরা একজনেরও দেখা যায় না) যথার্থই হাস্যকর। সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষের পর বিরহিনীর (যিনি পিরীতের গোড়ায় দিয়াশলাই জ্বালিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন) প্রণয়ী সম্মেলন—উপভোগ্য ছাড়া আর কি বলিব? বিশেষ করিয়া মমতা.....চরিত্রে সুধা-সিনীর অভিনয় (সঙ্গীত সহ) অতি মনোরম। 'রকমারীর' নৃত্য-গীতেও যথেষ্ট রকমারী দেখানো হইয়াছে।

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!!

বঙ্গদেশবাসী নাট্যামোদীগণ অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন :—

আইডিয়েল থিয়েটারের মুকুটমণি রামদত্ত প্রণেতা বঙ্গ নাট্যতরুর শাখামৃগ, নাট্যধুরন্ধর নাট্য-নিজাম, খাঁ-খানান, বিদ্যারত্ন চূড়ামণি পণ্ডিত মধুরামোহন দি গ্রেট মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষে সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন!!!

গতকল্য রাত্রি দ্বিপ্রহরে নাট্য-নিজামের কাণে তেতার টেলিগ্রাফে খবর পৌঁছিয়াছে! নাট্যনিজাম মহাশয় বাঙ্গালী-জাতীর মুখরক্ষা করিয়াছেন, ("রবিবাবু বাঙ্গালী নহেন, তিনি বিশ্বী"—মধুরামোহন) বাঙ্গালী যে আজ নাট্য পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন, তাহা নাট্য-নিজাম মধুরামোহনের জন্যই! বঙ্গমাতা এ হেন রত্ন গর্ভে ধরিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছেন। ভারত বাঙ্গালার অন্তর্গত (!) ভাবিয়া আপনাকে ধন্যা জ্ঞান করিতেছেন। আজি গগনে, পবনে, স্থলে, জলে সর্ব্বত্র মধুরামোহন কী জয় উচ্চারিত হইতেছে! জয় মধুরামোহন-দি-গ্রেট-কী জয়!

Please note :—মধুরামোহনের নূতন গীতিনাট্য সত্বরই "শশি-পতি"র রিহার্সাল মহাসমারোহে চলিতেছে।

——আইডিয়েলস্ কম্পিরাইট্।

ইস্তফা

[শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়]

এক

পুরাতন ম্যানেজারের তবাব হইয়া গেলে, রামনবাস বাবুর তোমুরনা কয়লা-কুঠিতে একজন ছোকরা বয়সের নূতন সাহেব ম্যানেজার বহাল হইয়া আসিলেন।

প্রথমে কুঠিতে আসিয়াই সাহেব বড়বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নূতন ম্যানেজার আসিবে জানিয়া, বড়বাবু তখন নিবিষ্ট মনে শেষদি কাজ সারিয়া লইতেছিল। বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিতেই, তাড়াতাড়ি কলমটা কাণে গুঁজিয়া, চটি চট্‌পটাইয়া সাহেবের নিকট আসিয়া এক সালাম ঠুকিয়া, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইংরাজীতে সে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিত না, অধিকন্তু তাহার মাইনর স্কুলের ফার্ষ্টক্লাস পর্য্যন্ত বিদ্যায় সেটা একপ্রকার অসম্ভবও ছিল, কাজেই তাহার চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না।

বড়বাবুর চেহারাখানি বেশ নাদুস-নুদুস,—বর্ণ বৃদ্ধ, বাঙালী ভদ্রলোক। মাথার চুল ছোট করিয়া কাটা, গোঁফ জোড়াটি কৃতলিকৃত হইয়া মুখের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে, উপরের পাটির দাঁত একটিও নাই। চশমা-খানা কপালের উপর তখনও তোলা রহিয়াছে, তাড়া-তাড়িতে সেটা নামাইয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

সাহেব বেশ ভালো বাঙলা জানিতেন; তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন,—বসো বাবু, বসো।

বড়বাবু বসিলে, সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমিই বড়বাবু? আচ্ছা, কুঠির অবস্থা কি, আমায় সব কথা বল দেখি।

বড়বাবুর এক যুবক পুত্র আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া গ্রামের যত সব বয়াটে ছেলেদের সঙ্গে বোম্বেটেগিরি করিয়া, মদ গাঁজা খাইয়া, যাত্রার দলে বক্তৃতা করিয়া এমনি আরও সব কত কি করিয়া, পিতার বদন মধু করিতেছিল; তাই বড়-বাবু বহুদিন হইতে মনে করিয়া-ছিল, কোনপ্রকারে কুঠির কোন একটা বাবুকে তাড়াইয়া তাহার স্থানে পুত্রবরকে বহাল করিয়া দিতে পারিলেও বা কোন রকমে ছেলেটা মানুষ হইয়া যায়, কিন্তু পুরাতন ম্যানেজারের আমলে সে সুবিধাটুকু ঘটিয়া উঠে নাই এবং সেইজন্য আজ কার্য্যারম্ভের প্রথমেই ম্যানেজার সাহেবের নিকট গৌর-চন্দ্রিকা করিয়া রাখিল,—কুঠির অন্যান্য অবস্থা বিশেষ মন্দ নয় সাহেব, কিন্তু গুদামের অবস্থা তেমন সুবিধা নয়। গুদামবাবু কারও কথা শুনে না,—'চৌরের' জিনিস বেপরোয়া চুরি করে' করে'* গুদামটা প্রায় সাবাড় হতে চলেছে। সুতরাং পুরাতন 'ষ্টকের' সঙ্গে present stockটা একবার 'চেক্' করে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

—তা বেশ, তারপর—অফিস?

—হুজুর, অফিসের খাতা-পত্র সব দুরস্ত আছে।

—'রেজিং' কত?

—মাসে চার-হাজার, সাড়ে চার হাজার।

সাহেব অফিসের খাতাপত্র একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া 'খাসে' নামিবার পূর্ব্বে বড়বাবুর কথামত গুদামবাবু নরেশকে একবার ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নরেশ নেহাৎ নিরীহ গো-বেচারা। ভীতচকিত কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বড়বাবু ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, ওহে শুনছো নরেশ, সাহেব কি বল্‌ছেন একবার ভাল করে শোন।

সাহেব নরেশের মুখের পানে তাকাইয়া কহিলেন—তোমার 'ষ্টোরে' সব জিনিস আছে?

নরেশ ভয়ে-ভয়ে হাত জোড় করিয়া বলিল,—আজ্ঞে হাঁ, আছে।

সাহেব বলিলেন, allright তোমাকে একটা present stock list করে' দিতে হবে।...Mind that—দু এক-দিনের মধ্যেই।... বড়বাবুর কাছে দিও। যাও।

নরেশ চলিয়া যাইতেছিল, বড়বাবু হাতের ইসারা করিয়া বলিল, শুনলে হে নরেশ? শুনলে—কোথায় submit করতে হবে শুনলে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বলিয়া নরেশ চলিয়া গেল।

দুই

নরেশকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত গুদামে অন্য কোন কর্মচারী ছিল না, কাজেই কুলি-কামিনদিগকে কেরোসিন তেল মাপিয়া দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় কাজ তাহাকে একা করিতে হইত। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়াও সে দিনের কাজ শেষ করিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার উপর একটি-একটি করিয়া গুদামের প্রত্যেক জিনিসের তালিকা করিবার ভার তাহারই উপর পড়ায়, সে বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বড়বাবু প্রত্যহ দিন তাহাকে তাড়াহুড়া দিতে আরম্ভ করিল। সাহেব কিছুই বলিত না, অথচ বড়বাবুর নিকট তাড়া খাইয়া সে একদিন বলিয়া বসিল,—আমি এই কাজটাই একজন 'এসিষ্টেন্ট' ভিন্ন পেরে' উঠ্‌ছি না, তার উপর Stock list তৈরী কখন করি, বলুন তো? আমাকে দয়া করে একটি হপ্তার সময় দিন, আমি Stock list দিয়ে কাজে ইস্তফা দিব।

বড়বাবু বলিল—তার মানে?

—আজ্ঞে আমি জবাব দিতে চাই—আর পারছি না।

—তবে তাই যাও না হে!...এসো তুমি সাহেবের কাছে, আমার কাছে বললে কি হবে বাপু—বলিয়া বড়বাবু তাহাকে একপ্রকার টানিতে টানিতে সাহেবের নিকট লইয়া হাজির করিল।

সাহেব মুখ তুলিয়া বলিলেন—কি?

নরেশ বলিল,—আমার এক হপ্তার সময়.....

বড়বাবু বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আসল কথাটাই বল না হে, কি বলছিলে। অমন চাক-চাক গুড়-গুড় কেন?

নরেশ শঙ্কিত হইয়া বলিল, বলছিলুম, আমার একজন 'এসিষ্টেন্ট' না হলে—

বড়বাবু মুখ বিকৃতি করিয়া বলিয়া উঠিল, এঃ, ওঁর আবার এসিষ্টেন্ট না আবো কিছু! লাট-সাহেব এলেন আর কি!...সাহেবের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—এই যে আমাদের সাহেব, ওঁকে একা এই কলিয়া-রীর সব কাজ দেখতে হয় জান তো? তোমার চেয়ে ওঁর বয়স তো কম বই বেশী নয়।.....আমাদের বাঙালী জাতটাই এম্‌নি আলসে কুঁড়ে, খেতে পেলে শুতে চায়।...বুঝলে সাহেব?

সাহেব কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এদিকে, বাহিরে কতকগুলা কুলি তেল লইবার জন্য গুদামের উঠানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, বাইরে কিসের হল্লা হচ্ছে?

বড়বাবু বলিল, ও দেখ্‌ছেন কি, কুলিরা চেঁচাচ্ছে তেল নেবার জন্যে।

সাহেব নরেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন—এখন যাও কাজ করগে, এর পর consider করা যাবে।

নরেশ চলিয়া গেলে, বড়বাবু সাহেবকে বলিল, এই হচ্ছে পাকা শয়তান! Stock চেক করতে গেলেই ধরা পড়বে কি না তাই ইচ্ছা করেই দেরী করছে সাহেব। ওকে জবাব দেওয়াই উচিত।

সাহেব বলিলেন—ওটা যদি তোমাদের ভুল সন্দেহ হয়। ও যদি চুরি না করে থাকে? আর জবাব দিলেই বা তুমি এখনই গুদামে লোক কোথা পাবে বড়বাবু?

বড়বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, লোকের ভাবনা সাহেব? আজই বলুন, কত গণ্ডা পাকা চোর-ছিপার চাই। আমি Guarantee দিচ্ছি, সাহেব। আমার একজন চেনা লোক আছে এইখানে কোথা এক কোম্পানীর ঘরে কাজ করে, Expert man বলেন তা সন্ধান করে তাকেই খানিয়ে দি।

সাহেব বলিলেন, তা বেশ। তোমার করদার stock বুক খান up to date করে রেখেছ তো বাবু?

বড়বাবু সাহেবের একটু কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, সব complete,—বাকী শুধু

March. ছিপো . লরকারের কাছ থেকে একবার Balance পেয়েছি কি মেরে দিয়েছি! তবে কাল পাবে না সাহেব, এ কথা ঠিক। আজ office hour এর পর আমাকে একবার বাড়ী যেতে হবে, সত্য নারায়ণের পূজো আছে। দেখ না সাহেব আমাদের বাপ্ চোদ্দ পুরুষের কাজ দেখ না। বার মাসে তের পুজণে সাঁইত্রিশটা ceremony। বাড়ী আমাদের খুবই কাছে সাহেব। within two miles.

সাহেব চুপ করিয়া খাতায় কি লিখিতে আরম্ভ করিলেন।' বড়বাবু প্রসন্নচিত্তে বাহির হইয়া আসিল।

।তন

ওদামবাবুকে তাড়াইবার জন্য বড় বাবুকে আর বেশী কিছু কষ্ট পাইতে হইল না। শনিবার দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে ওদামের সমস্ত কাজ সারিয়া রবিবার সে বাড়ী গিয়াছিল। সোমবার সকালে বড়বাবু কাজে আসিয়া দেখিল, ওদাম তখনও বন্ধ, ওদামবাবু কাজে আসে নাই। ওদামের উঠানে দাঁড়াইয়া খুলি কামিনগণ গাঁইতি সাবল লইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে।

বড়বাবু সুযোগ বুঝিয়া সাহেবের নিকট নালিশ করিল, দেখছ সাহেব বেলা ৯টা বাজতে যাচ্ছে এখনও তোমার ওদাম বাবুর দেখা নাই। এরকম unpunctual লোক নিয়ে কাঁহাতক কাজ চলে বল ত? আর সেই stock list সে আজ সপ্তাহ খানেক···ও কে? ডাক্তারবাবু? আসুন।

ডাক্তারবাবুকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বড়বাবু চুপ করিল। ডাক্তারবাবু আসিয়া জানাইলেন গত শনিবার প্রাতে ওদামবাবুর কলেরা হইয়াছিল, রাত্রি সাড়ে দশটার সময় সে মারা গিয়াছে।

বড়বাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—অ্যাঁ মারা গেছে? বল কি ডাক্তার?

সাহেবের এই আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে তরুণ যুবকটা কে যেন সজোর নাড়িয়া দিল। সাহেব হতবুদ্ধির মত নির্ব্বাকভাবে কিছুক্ষণ ডাক্তারের মুখের পানে চাহিয়া রহিয়া রহিল।

চাপরাশীর নিকট চাবি লইয়া সাহেব নিজে ওদামঘর খুলিয়া দিয়া বড়বাবুকে বলিলেন,—আজকার মত তোমাকেই কাজটা চালিয়ে নিতে হবে বড়বাবু। কি করবে বড়বাবু আর তো spare লোক দেখ্‌ছি না।

বড়বাবু মহাবিপদে পড়িল। ওদামে কার কতিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না অথচ শুনিতেছে সে নাকি কলেরায় মারা গেছে। কাজ কি বাপু! তার জায়গায় বসে কাজ করতে গিয়ে তারও যদি অমনি একটা কিছু।—

বড়বাবু আর ভাবিতে পারিল না। মনিবকে ফাঁকি দিয়া সে আজ পচিশ বৎসর কাজ করিতেছিল এবং তাহার এই বহুদিন ব্যাপী গোলামীর কল্যাণে সে আর কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করুক আর নাই করুক, উপস্থিতবুদ্ধিটুকু যথেষ্ট জন্মিয়াছিল। চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, সাহেব এখনো আমার ঢের কাজ বাকী। তার চেয়ে এক কাজ কর। Wagon supply বন্ধ বলে আমার ক্লেম্‌স্‌ক্লার্ক হরেন ছোকরা আজ ক'দিন ধরে বসে আছে। তাকেই দি এখানে, আজকার মত চালিয়ে নিক! তারপর অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।

অফিসের কোন বাবুর সহিত বড়বাবুর মনের মিল ছিল না, তবে এই হরেন ছোকরার সহিত যেন একটু বেশী রকমের অসদ্ভাব,—উভয়ে ঝগড়া ফাঁটি প্রায় প্রত্যহই হইত। এবং হরেনকে তাড়াইবার চেষ্টাও সে সাধ্য পক্ষে কম করে নাই তবে আজ পর্য্যন্ত তাহার চাকরীর মস্তকটী ভক্ষণ করিবার সুযোগ মিলে নাই বলিয়াই সে কোনরকমে টেঁকিয়াছিল। ইহাদের উভয়ের মনোমালিন্যের একটু কারণও আছে। অফিসের কাগজ কলম পেন্সিল ডাক টিকিট ইত্যাদি থাকিত হরেনের' জিম্মায়। বড়বাবুর দুইটী ছোট ছেলে ইস্কুলে পড়িত, তাই সময় সময় পেন্সিল কাগজ ইত্যাদি ফাঁক পাইলেই নির্ব্বিচারে সে বাড়ী লইয়া যাইত। প্রথম হরেন আপত্তি করিয়া বড় একটা কিছু বলিত না, পরে যখন মাত্রা অতিরিক্ত হইয়া গেল সে আর না বলিয়া থাকিতে পারিল না।

একদিন শীতের সন্ধ্যায় অন্ধকারে গা ঢাকিয়া, গায়ের কাপড়ের নীচে দিয়া পাঁচ ছয় কাগজ লুকাইয়া লইয়া

বাড়ী যাইতেছিল। পথে দেখা হইল, হরেনের সঙ্গে। একটা সঙ্কীর্ণ রাস্তার মধ্যে উভয়ে চলিতেছিল, কাজেই হরেনের গায়ের ধাক্কা লাগিয়া কাগজগুলা অনায়াস হইয়া কাপড়ের নীচে হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। হরেন বুঝিতে পারিয়া বলিল, এগুলো কি বড়বাবু,—এ যে অফিসের কাগজ।

বড়বাবু পুনরায় সেগুলা তুলিয়া লইয়া বলিল,—হ্যাঁ, যাবে তুমি, তোমার বাবার।

হরেন আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিল না, মুহূর্ত্তেই রাগিয়া উঠিয়া বলিল,—খবরদার বলছি বড়বাবু, মুখ সামলে কথা বলবেন। আমি জানি, আপনি রোজ রোজ এমনি করে অফিসের জিনিস চুরি করে' নিয়ে যান। আমি আজ সাহেবকে না বলি, ত'—

ঝগড়া করিবে কি, বড়বাবু তখন চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে।

—বলে' তুমি আমার যা করে' নিতে পার, করো।—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি পলায়ন করিল।

কথাটা হরেন অফিসময় রাষ্ট্র করিয়া দিতে ছাড়িল না। সেইদিন হইতে হরেনের সহিত বড়বাবুর ঝগড়া খিচ্‌মিচি বাড়িয়াই চলিল। আজ সুযোগ বুঝিয়া সেইজন্য গুদামের কাজ করিতে হরেনের স্থানে তাহাকেই পাঠাইবার জন্য সাহেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিল। সে ভাবিল, ঘদি মরে তো সেই মরুক!

সাহেবের আদেশমত হরেন গুদামে কাজ করিতে গেল। সন্ধ্যায় সাহেব বলিলেন, বড়বাবু, সেই যে তুমি যে একজন Expert গুদামবাবুর কথা বলেছিলে, তাকে এনে দিতে পার না?

বড়বাবুর এই Expert গুদামবাবুটি আর কেহই নয় তাঁর সেই বোয়াটে পুত্র-রত্ন। এই অজ্ঞাত স্থানে ছেলেকে সে পাঠায় কেমন করিয়া? বলিল—আমি তার সন্ধান নিয়েছিলুম সাহেব, কিন্তু তার অসুখ হয়েছে, দিনকতক পরে আসবে।.....

হরেন বেশ চালাক ছোকরা। গুদামবাবুর কাজ সে বেশ চালাইতেছে দেখিয়া একদিন সাহেব বলিলেন, তোমার Despatch Clerk তো গুদামের কাজ বেশ চালাচ্ছে, এইবার একটা Despatch Clerk দেখ।

বড়বাবু মহা আনন্দিত হইয়া বলিল,—কালই নিয়ে আস্‌ছি সাহেব, লোকের ভাবনা কি?

ছয়

পরদিন বড়বাবু তাহার পুত্র রাখহরিকে লইয়া আসিয়া সাহেবকে বলিল, সাহেব! এই নাও তোমার লোক—যার কথা বলেছিলুম, ডেস্‌পেচের কাজ ও বেশ্ ভালো জানে।

রাখহরি ডেস্‌পেচের কাজে ভর্ত্তি হইল।

কয়েকদিন পরে, কি একটা কাজের জন্য রাখহরি সাহেবের নিকট গিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার নাম কি Despatch babu?

—আমার নাম রাখহরি ব্যানার্জ্জি।

—আমাদের বড়বাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কেমন করে?

—আজ্ঞে, আমি তাঁরই ছেলে।

সাহেব সে-কথা জানিতেন না এবং বড়বাবুও সে সময় তাঁহার নিকট গোপন করিয়া, কোন এক পরিচিত ভদ্রলোক বলিয়াই তাহার পরিচয় দিয়াছিল। এতক্ষণে সাহেব ভিতরের ব্যাপার সবই বুঝিতে পারিলেন।

.....সেদিন কথায় কথায় সাহেব বড়বাবুকে বলিয়া ফেলিলেন, রাখহরি তোমার ছেলে,—কই, সে-কথা তো আমায় কোনদিন বল নাই?

বড়বাবু পুত্রকে মনে মনে গালাগালি দিয়া বেশ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া ফেলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তার Step father.

সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, সে আবার কি? হিঁদুর মেয়েদের তো দুবার বিয়ে হয় না!

এতক্ষণে বড়বাবুর স্মরণ হইল যে, সে ইংরাজী কথাটা ভুল বলিয়া ফেলিয়াছে। বলিল,—না, না, সাহেব! mistake, সে আমার Second wife এর Son.

সাহেব না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। মুখে

হাসিলেন বটে, কিন্তু বড়বাবুর এই মিথ্যা চাতুরীর জন্য মনে মনে বেশ একটু অসন্তুষ্ট হইলেন।

যাহাহউক, ডেস্‌পেচের কাজ অপেক্ষা গুদামের কাজ অধিক লাভবান হইলেও বড়বাবু রাখহরিকে ডেস্‌পেচের কাজেই রাখিল, কারণ সে মনে মনে আঁচিয়া রাখিয়াছিল, যে গুদামবাবুর কাছে যে ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছে, সে নিশ্চয়ই মারা যাইবে।

.....দিন পনর পরে, এক অদ্ভুত ঘটনা শুনিতে পাওয়া গেল। বড়বাবু সেদিন কাঁদিতে কাঁদিতে প্রায় উন্মত্তের মত আফিসে প্রবেশ করিয়া সাহেবকে জানাইল, যে তাহার পুত্র রাখহরির সর্পদংশনে হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে।

পুত্র শোকাতুর বড়বাবুর নিকট এই ঘটনাটা যেমন আকস্মিক, তেমনি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে হরেনকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়া পুত্রকে সে বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছে এবং প্রতিনিয়তই সে তাহার শত্রুরূপী হরেনের মৃত্যুসংবাদ শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াই থাকিত এমন সময় যে তাহার বিপরীত ঘটনা ঘটিতে পারে, এ বিশ্বাস তাহার মোটেই ছিল না।

পুত্রের মৃত্যুর জন্য দিনকতক অফিস কামাই করিয়া, বড়বাবু পুনরায় কাজে আসিয়া দেখিল, হরেন গুদামের চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্টমনে কাজ করিতেছে। তাহার মুখের পানে বড়বাবু তাকাইতে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, হরেনই তাহার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে।

বড়বাবু একদিন সাহেবের নিকট একখানা দরখাস্ত পেশ করিল। সাহেব দেখিলেন, বড়বাবু চাকরীতে ইস্তফা দিতে চায়। অনেক ভাবিয়া সাহেব দরখাস্তটা না-মঞ্জুর করিয়া ফেরত পাঠাইলেন।

বড়বাবু বসিয়া বসিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছিল, ভগবানের এ কি অন্যায় বিচার!.....পুত্রের চেয়ারখানা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহার বুকখানা হা হা করিয়া উঠিতেছিল।

সাহেব হরেনকে বলিলেন, তুমি গুদামের কাজ ছেড়ে Despatch এর কাজে যাও। আমি গুদামবাবুর জন্য advertise করে দিচ্ছি।

বড়বাবু ও ডেস্‌পেচবাবু একটা ঘরের দুইটা কামরায় পৃথক পৃথক ভাবে বসিয়া কাজ করিত। সাহেব হুকুম দিলেন, পাশাপাশি দুইখানা টেবিল দিয়া এখন হইতে তাহারা মুখোমুখি বসিয়া কাজ করিবে।

বড়বাবু প্রমাদ গণিল। এ যে আরও বেশী ভয়াবহ। পুত্রের মুখের পরিবর্ত্তে অনুক্ষণ তাহাকে শত্রুর মুখখানাই —না, না, সে পারিবে না!

পুরাতন কাগজপত্র উল্টাইতে গিয়া রাখহরির হাতের লেখা ও সহিগুলা দেখিয়া বড়বাবুর চোখমুখ লাল হইয়া উঠিল—বেদনার্ত্ত বুকখানা হাহাকার করিতে লাগিল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া সাহেবের নিকট বলিল,—না সাহেব, আমি আর কাজ কর্‌তে পার্‌ব না। আমায় জবাব দাও।

সাহেব বলিলেন, পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি তোমার। তোমায় ওই কাজেই থাক্‌তে হবে বাবু।

বড়বাবু ভাবিল, সাহেব তাহার একান্ত হিতৈষী। তাহা হইলে কি হয়, এযে তাহার মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক!

সাহেব মনে মনে বলিল,—এতদিনেও তোমাদের যদি না চিনিতে পারিয়া থাকি তবে আমার এতকাল ভূতত্ত্ববিদে থাকাই বৃথা হইয়াছে। ইহাই তোমার উপযুক্ত শাস্তি, শয়তান!

গ্রীষ্মের দিনে

স্নানের আরাম পাইতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে, আমাদের আইডিয়াল্ গ্রীসেরিন্ এবং মেসিনে প্রস্তুত :—চন্দন, গরেনবকুল ঘাস ও জবাসেট সাবান ব্যবহার করুন।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী

৬৪।১এ বেচুরা বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।　　টেলিফোন ২৪২৬

সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি

[শ্রীকুমুদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

সাহিত্য জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি। জাতীয় জীবনীশক্তি সাহিত্যে অনুরিত, বিকশিত ও পল্লবিত হয়। জাতি জীবনের সাড়া হারাইয়া না ফেলিলে তাহার কর্ম প্রচেষ্টার প্রতিধ্বনি সাহিত্যে মিলিবেই। জাতির বিকাশের স্তরগুলি সাহিত্যে সুপরিস্ফুট রেখাপাত করিয়া যায়। পরাধীন দেশে প্রাণের অনেক উক্তি সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে না, কেবল বিপর্যস্ত উদ্ধার মত ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক দিয়া আত্ম রহিতে বাধ্য হয়। সেইজন্যই যে জাতি পরাধীন তাহার প্রাণের সকল স্বপ্নের ইতিহাস সাহিত্যে পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে না। আমাদের স্বদেশী যুগে অগ্নিক্রীড়ার নির্ভীক আলেখ্য চিত্রিত করিয়া কয়খানি ইতিহাস রচিত হইয়াছে? আমাদের প্রাণের বিদ্রোহ চিন্তাগুলি অতি দুর্গম মনোবনবাসে ছদ্মবাসে মৃত্যু লাভ করিয়াছেন কি?

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি পর্যালোচনা করিয়া ধর্মপ্রচারই ইহার বিশেষত্ব বলিয়া জানা যায়। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি হইতে ভক্তির যে ফল্গুধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল, তাহা ক্রমেই বাঙ্গালার পথ ঘাট অভিষিক্ত করিয়া দিল। চৈতন্য পরিকরের অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য জনসাধারণের চিত্ত জয়ীভূত করিল। রামায়ণ, মহাভারতের ভাবানুবাদ গীত হইতে লাগিল। মঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হইয়া রাগ রাগিনীর সাহায্যে নানা পালার আকারে আসর জমাইতে লাগিল। এইরূপে কাব্য ধর্মের সহিত জনগণের চিত্ত প্রথিত হইয়া তাহাদিগকে অপার আনন্দ দিতে লাগিল।

প্রাচীন যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাব গাম্ভীর্য যতই থাকুক ইহার ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। বিশেষ এক দেবতার পূজা প্রচার ও তাহার মাহাত্ম্যকীর্তনে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যুগেই ঐগুলি থাকিত তবে সাহিত্য কাহারও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত কিনা সন্দেহ। প্রাচীন বাঙ্গালা জাতীয়জীবনে ধর্মানুরাগ প্রবেশ করাইয়াছে বলিয়াই বরণীয় নয়, তাহার বিশেষত্ব তাহার সৃষ্টি চাতুর্য্যে ও তাহার কবিত্ব মাধুর্য্যে। জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধনের চেষ্টা কবিকঙ্কণের কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না, বরং কবিকে অবলম্বন করিয়া জাতীয় দুর্বলতাগুলি নির্বিকারভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সাহিত্যে দেশের সর্বশ্রেণীর কামনা ফুটিয়া উঠিলেও সাহিত্য বিশেষ করিয়া অক্ষরজ্ঞেরই উপভোগ্য। অতি সামান্য লেখাপড়া জানা লোক ধর্মের ভাবে প্রাণোদিত হইয়া রামায়ণ, মহাভারতের গঠন, পাঠন করিয়া থাকে। কথকতা দ্বারা অনেক সুন্দর সুন্দর ভাবও ধর্মোপদেশ লোক সমাজে প্রচারিত হয়। যাত্রা নাটক ইত্যাদির অভিনয় দর্শনেও লোকে বিভিন্ন চরিত্র ও ভাবৈশ্বর্য্যের সম্ভোগ লাভ করে। কিন্তু লেখক যদি অভিনয় উদ্দেশ্যেই কিম্বা লোকশিক্ষার নিমিত্ত পুস্তক লিখিতে প্রাণোদিত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিভা সম্যক বিকাশ হইতে পারে কিনা তাহাও বিবেচ্য। যাত্রার এমন অনেক পালা আছে যাহা লোকশিক্ষার উপযোগী, কিন্তু তাহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের নিদর্শন নয়—একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর রচনা। সতী লক্ষ্মী সুশীল সুবোধের চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়াই সাহিত্য সার্থকতা লাভ করে না। শরৎচন্দ্র আদর্শ পুরুষ কমই আঁকিয়াছেন এবং "কিরণময়ী" "অচলা"র নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক কটূক্তি শুনিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি অবাধে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—শিল্প গড়িয়াই তুলিয়াছেন, তাঁহার বই পড়িয়া লোক কেমন হইবে বা না হইবে সে দুর্ভাবনা তাঁহাকে ভাবিতে হয় নাই। এসব সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে গৌরবের আসন অধিকার করিতে দিতে কেহও ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই।

আজ যদি আমাদের সাহিত্য সত্যই সর্বসাধারণের আপত্তি হইতে না পারিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য যাহা সকলে সহজে বোঝে এমন সব কথা লইয়া—যেমন মঙ্গল-

চণ্ডী, মনসার ভাসান, রাধাকৃষ্ণের প্রেম—তাহাকে তন্ময় থাকিতে হইবে এমন নয়। যাত্রাতে আমাদের দেশের প্রতিভাশালীদের চিন্তাধারা আমাদের জ্ঞাত অধিগত করিতে পারে এমন করিয়া তাহাদের গড়িতে হইবে। সেজন্য শিক্ষাবিস্তার ও তাহার আনুসঙ্গিক উদ্যোগ, আয়োজন করিতে হইবে। যদি কোনও জাতি পশু, অবসাদগ্রস্ত, নিরক্ষর ও সভ্যতা বিবর্জিত রহে এবং তাহার মধ্যে কোনও প্রতিভাবান পুরুষ জন্মিয়া যদি এমন সাহিত্যের সৃজন করিয়া যায় যাহা তাহার দেশবাসীর মস্তকে ঢোকে না, তখন সেই সাহিত্যকে নিন্দা করা অর্বাচীনতা প্রকাশ করিবে না কি? সকলেই বুঝিতে পারে এমন করিয়া সাহিত্য চালাইতে হইলে কখনও উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। "ত্রিলক্ষ্মর স্বর্গ লাভে" জনতা যেমন মাতিয়া উঠে, মাইকেলের "মেঘনাদবধে" সেইরূপ না হইবারই কথা।

জগতের বিবিধ ভাবধারা আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া ভীত হইবার কোন কারণ নাই। তাহার মাঝে চিরদিনের কিছু না থাকিলে তাহা জলবুদ্বুদের মত আসিয়াই লয় পাইবে। আমরা কি এমনই নাবালক যে বার্ণার্ড শ ইবসনের একটা ধাক্কাতেই বিবেচনাহীনের ন্যায় তলাইয়া যাইব? সাহিত্য সমালোচক কি লেখকের ভাব, কল্পনা, সৃষ্টি প্রভৃতির কথা ফেলিয়া সমাজ সংরক্ষণে সমাজের সনাতন আদর্শ বজায় রাখিতে, তাহার উপযোগীতা অনুপযোগীতার কথা ভাবিয়া সেই মানদণ্ডের সাহায্যেই শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট সাহিত্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবে? মোট কথা সাহিত্য কি সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া জাক্কারিতে হাত দিবে? আজ বাঙ্গালার সাহিত্যিকদিগকে বুঝি দিতে হইবে দেশে প্রকৃত উচ্চস্তরের সাহিত্য সৃষ্টি হইতেছে কিনা। তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার কথা লইয়া মাথা ঘামান একেবারেই অনাবশ্যক। বিদ্যালয়ের নীতিজ্ঞানের মধ্যে কখনও শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। অধুনা সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা এমন সব মনোবৃত্তি, চিন্তা, রূপ প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিতেছে, যাহা পূর্ব্বে কাহারও ধারণা ছিল না। এই সব কারণে রক্ষণশীলদের আৎকা চমকাইয়া উঠা অস্বাভাবিক নয়। সদ্যোতিতে আদর্শের প্রাচীনগণ্ডী আবার টানিয়া দাগান হইতেছে। নূতন আলোকের তীব্রদৃষ্টিতে তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগে স্বাধীনতার মতবাদ ও চিন্তা সাহিত্যে চলাচল করিতেছে। আমরা বোধ হয় সেই যুগ পার হইয়া আসিয়াছি যখন বদ্ধমূলসংস্কারের বিপরীত ধারণা পোষণকারীর নির্য্যাতন চলিত। ব্যক্তিত্বের উন্মেষেই বর্ত্তমান সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছে। স্বাধীন চিন্তাবলী দিয়া সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রাচীন সমাজ বিকাশ লাভ করিত, এখন আর সেই দিন নাই। এই উন্নতিশীল বিংশ শতাব্দীতেও কি আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদিগকে কুসংস্কারের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে চাহিব?

সাহিত্যের গতি সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। তাহার সম্মুখে মুক্ত উদার প্রান্তর পড়িয়া আছে। সেই প্রান্তরের বিভিন্ন দিকে চলিয়া ফিরিয়া আলো যাহাদের সাহায্য লাভ করিতে হইবে। বাঁধা পথে চলা উন্নতির কথা নহে। যেখানে সৃষ্টির বৈচিত্র্য কোথায়, দিকে দিকে বিকাশের অবসরই বা মিলিবে কেমন করিয়া? দেশের শ্রেষ্ঠ ভাবুকগণ দেশের ভাব সত্তরলোকেই খুঁজিয়া বাহির হইলেও তাহার যাহা আছে তাহারই মূর্ত্তবিকাশ নয়, তাহারা নবভাবসম্পদের আগমনী গাহিয়া সাহিত্যের নূতন তেজের সৃষ্টিকারী আগন্তুক ও বটে।

সাহিত্যের প্রকৃতি ঠিক করিয়া দিবার এবং সাহিত্যের গতি সুনিয়ন্ত্রিত করিবার বিরুদ্ধবাদী হইলেও কতকগুলি অসার ও বাজে পুস্তকের প্রচারে আরও দশজনের ন্যায় আমরাও সায় দিতে পারিব না। আসল কথা সেগুলি সাহিত্য নামেরই অযোগ্য। তাহাতে না থাকে রচনা-কৌশল, না থাকে ভাব-প্রকাশের দক্ষতা, না থাকে চিন্তার অভিনবত্ব ও মাধুর্য্য, না থাকে সৃষ্টি চাতুর্য্য। এই সব গুণান্বিত হইলে শ্লীলতা কিংবা সমাজের অমঙ্গল আশঙ্কায় আমরা কোনও পুস্তকের উপর খড়্গহস্ত হইতে পারিব না।

বহির্জগতের সঙ্গে পরিচয়ের সাথে সাথে সাহিত্য ও বহুমুখীন হইয়া যাবে। আজ যদি বিশ্ব সাহিত্যের ভোর

পাঠকগুলি আমাদের মনে দ্বন্দ্ব ও জিজ্ঞাসা তুলিয়া আমাদের সাহিত্যেও প্রতিধ্বনি না জাগায় তাহা হইলে ইহা আমাদের মনের অসারতা ও তেজহীনতা প্রকাশ করিবে। পরানুকরণ ব্যর্থ নয়, পরের ভাবে ভাবিত হইয়া অনুকারিত ব্যক্তিকেও ছাড়াইয়া উঠিতে দেখা যায়। অক্ষম রচনার ব্যক্তভাব প্রতিভাবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সার্থক হইয়া উঠে। মুকুন্দরাম "হাকন্দপুরাণ মতে মধুর ভট্টের পথে" অভয়ামঙ্গল রচিয়াও চণ্ডীর শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। নূতন চিন্তাধারার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে, উহা একদিনেই গড়িয়া উঠে নাই, ক্রমশঃই বিকাশ লাভ করিয়াছে। প্রেমের নূতন আদর্শ এক একজনের হাতে কিরূপ বিচিত্রতা লাভ করিয়াছে তাহা সকলেরই প্রণিধান যোগ্য। নূতন জিনিষের নব আগমন হঠাৎ বিশেষত্ব হীন প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু প্রতিভাশালীর হাতে পড়িলে তাহা সাহিত্যের সম্পদ হইয়া দাঁড়াইবে।

অসার ও বাজে পুস্তকের রুচ সমালোচক সময় সময় তাহাদের প্রচার হ্রাস করিয়া পক্ষত্ব ঘটায়। সাধারণ সমালোচকদের ঐ সব পুস্তকের নিন্দাপূর্ণ দীর্ঘ সমালোচনা একেবারেই নিরর্থক। তাহাদের কর্ত্তব্য ঐ পুস্তক যাহাতে বিস্মৃতিলাভ না করে, সেজন্য ঐসব পাঠে জনসাধারণকে নিরুৎসাহ করা।

বাজে রচনার বেলায় যাহা হউক আমরা যেন শ্রেষ্ঠ রচনার নীতির খুঁৎ ধরিবার জন্য উৎসুক্য প্রকাশ না করি। কারণ তাহাতে সময়ও শক্তির অপব্যয়ই ঘটিবে কারণ শ্রেষ্ঠ রচনা যুগে যুগে নীতিবাগীশদের শত উপদ্রবেও মরে নাই—সাহিত্যে তাহার স্থান অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাই আমাদের আজ উদ্দেশ্য হইবে আমাদের সাহিত্যকে শিল্প হিসাবে গড়িয়া তুলিতে এবং এই সাহিত্য হইবে সকল রকম বাঁধা গৎ এর বাহিরে—সমাজের দরকারী অদরকারী ভাল মন্দের অতীত।

গুণীর প্রতি

[শ্রীকালি দাস রায় বি-এ, কবিশেখর]

তোমার কণ্ঠে যেই সুর বাজে নিশিদিন
কেমনে লভিব তায়?
আমার কণ্ঠ চির কুণ্ঠিত দীন হীন
সদা লাজে মরে যায়।
আমি—অতি অভাজন চির অচেতন
নহে প্রসন্না জননী ভারতী
তোমার কণ্ঠে বীণাপাণি রহি সমাসীন
নিখিলের পূজা পায়।

মম—আধু পাধু করে প্রাণের আকুতি
বাণে মূর্চ্ছনা আকুল কাকুতি
প্রকাশিতে ঘরে, আমার কণ্ঠ চিরক্ষীণ
করে উঠে—হায় হায়।
তুমি—গাও সভামাঝে আমি দূর কোণে
তুমি গাও সুরে আমি গাই মনে
আমার কণ্ঠ তব বালাবধূ,—কৃপাধীন
শুধু মার্জ্জনা চায়।

রাজেশ্বর খামখানি পকেট হইতে একখানি খাম টানিয়া বাহির করিলেন, সেখানিকে কন্যার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া কহিলেন—তোমার মামার আর এক কীর্ত্তি কামনা!

আর এক কীর্ত্তি শুনিয়া কামনার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল, সে ভয়ে ভয়ে পিতার প্রসারিত হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া নিমেষহীন দৃষ্টিতে পিতার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

রাজেশ্বর কহিলেন—খুলে পড় কামনা!

তবুও কামনা পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে পারিল না; তাহার ভয় হইতেছিল, এই পত্র মধ্যে মাতুল আরও না-জানি কি কুৎসা লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন! শঙ্কিত-চিত্তে খামখানার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—এ কি বাবা?

পড়ে দেখ মা, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।

কামনা অতি সন্তর্পণে পত্র উন্মোচন করিল। হস্তলিপি মাতুলের নহে দেখিয়া যেন অনেকখানি ভয় ঘুচিয়া গেল। অভিনিবেশ সহকারে পত্র পাঠ করিতে লাগিল।

রাজেশ্বর আলোর পিছনের ডালাটি নিজের দিকে টানিয়া দিতেই সমস্ত আলো কামনার মুখের উপর বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল কিন্তু কামনা তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই, সে পত্র মধ্যেই বোধ করি মগ্ন হইয়া গিয়াছিল।

প্রায় পাঁচমিনিট কাটিয়া গেল, কামনা পত্রখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে বলিল—মহীন্দ্রবাবুর ছেলের লেখা! কখন পেলে বাবা?

বিকেলে। দেখ্‌লে, তোমার মামার কীর্ত্তি?

কামনা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল—কিন্তু বাবা মহীন্দ্রবাবুর বাড়ীতে মামার এত প্রতাপ কেন তা ত আমি বুঝতে পারছিনে।

না পারবারই কথা, তোমাকে কোন দিন সে কথা বলা হয়নি। মহীন্দ্র গরীব জান ত? এককালে তার যখন অবস্থা খুব খারাপ, তোমার মামা তাকে কিছু টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করেছিলেন; মহীন্দ্র সে টাকা বছর দুই পরেই শোধ করে দিয়েছে। কিন্তু অসময়ে সাহায্য করেছিলেন বলে মহীন্দ্র তোমার মামাকে দেবতা জ্ঞান করে থাকেন। এই যে কাণ্ডটি দেবতা করেছেন, এও সেই অসময়ে কৃত কর্মের ফল স্বরূপ।

কামনা একমিনিট নীরব থাকিয়া উদ্বিগ্নস্বরে বলিল,—চিঠি পড়ে দেখা যাচ্ছে যে সেই জোসেফ চৌধুরীকে মামাই ওখানে নিয়ে গেছলেন.....

সে ত স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে মা! শুধু নিয়ে যাননি, মহীন্দ্রকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবার মতলবেই নিয়ে গেছেন।

কামনা চুপ করিয়া রহিল। রাজেশ্বর উৎকণ্ঠিত মুখে কন্যার পানে চাহিয়া রহিয়াছিলেন, কামনা তাহা বুঝিয়াই বলিল—আচ্ছা বাবা, মামার এতে লাভ?

রাজেশ্বর সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন—লাভ অনেক। প্রথমতঃ খৃশ্চানে কন্যা দেওয়ায় তাঁর একজন সঙ্গী হবে; দ্বিতীয়তঃ একটা বিরাট কর্ম করেছেন বলে বাহবা নিতে পারবেন; তারপর সেই বোর্ডেটেটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাও বোধ করি আর এক উদ্দেশ্য।

কামনা আপন মনে চিন্তা করিয়া ইহা বুঝিল যে পিতা যাহা বলিতেছেন, তাহা অসম্ভব নহে। ভাবিলেই

তাহার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল, মাতুলের বিরুদ্ধে মন রি রি করিয়া উঠিল, বলিল, তুমি কি করবে বাবা ?

রাজেশ্বর গম্ভীর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—মহীন্দ্র ব্রাহ্ম যান ত, আমি ওদের সমাজে খবর দেব যে, যে কারণেই হোক, কোন পিতা যদি কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে এইরকম জোর করে পাত্রস্থ করতে চায়, তাতে তাদের ধর্ম্মের অবমাননা করা হয় কি না জানব ; তারপর পুলিস আনিয়ে সেই জোচ্চোর দানবটিকে ধরিয়ে দেব।

কামনা ভয়চকিতস্বরে কহিয়া উঠিল—পুলিস দিয়ে ?

তাতে দোষ কি মা ?

ঘরের কথা.....

রাজেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—ঘরের কথা আর রইল কৈ কামনা ! একটা লোক বার বার যদি অন্তঃপরিবারে ঢুকে অন্ধকারে মেয়েদের ফোটো তোলবার কৃতিত্ব জাহির করে বেড়ায়, তা'কে দমন করা ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য কর্ম কামনা ! মহীন্দ্র অতি ভালোমানুষ, তিনি তোমার মামার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবেন না, ঐ চিঠিতেই ত পড়লে ; বাইরে থেকেও আমরা কিছু করতে পারিনি, এ ক্ষেত্রে পুলিসে খবর দেওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে, বল ?

কামনার মন তবুও এ যুক্তি গ্রহণ করিতে পারিল না। সে শুধু ভাবিতেছিল, পুলিসে খবর না দিয়া অন্য কি উপায়ে মহীন্দ্রবাবুর কন্যাটিকে মামার কবলমুক্ত করিতে পারা যায়।

রাজেশ্বর কন্যার মনোভাব বুঝিলেন, বলিলেন—কি অমানুষিক অত্যাচার দেখত মা ! মেয়েটা চক্ষুশূল সেই দানব-টাকে দেখতে পারে না, তা'কে বিয়ে করতে হ'বে শুনে উপরি উপরি ক'বার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো, আত্মহত্যা করবে বলে, তবুও তোমার মামা আর তাঁর অনুচর মহীন্দ্রবাবুর খেদ গেল না। দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন ? মেয়েরা অবাধ্য হয়ে পড়ছে—একঘা মুয়ে সেই করতে হ'বে—অন্যায় নয় ?

বাবা, এ চিঠির সব কথা তোমার বিশ্বাস হয় ?

অক্ষরে অক্ষরে—কামনা। মহীন্দ্রবাবুর ছেলে, নির্ম্মলার ভাই সে, মিথ্যা লিখবে কেন ?

কামনা নীরব।

রাজেশ্বর বলিতে লাগিলেন—ওর কোন কথাই আমি অবিশ্বাস করিতে কামনা। এই যে আর একটা কথা লিখেছে, মেয়েটা যে ছেলেটিকে ভালবাসতো, তা'কে অপমান করে' তোমার মামা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—সে'টাও খুব সত্যি।

তুমি জান-না-কি ?

শুনেছিলুম। তবে তার ভেতরে যে এত কাণ্ড আছে তা জানতুম না তখন। এখন বুঝতে পারছি।

কামনা কথা কহিল না। এই কাণ্ডগুলা তাহার নিকট এত বিশ্রী বোধ হইতেছিল যে যদি তাহাকে আরো না শুনিতে হইত তবেই যেন সে সুখী হইতে পারিত।

রাজেশ্বর গম্ভীরকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—আগে শুনতুম, অশিক্ষিত হিন্দুরাই মেয়েদের উপর নানান অত্যাচার করে এখন দেখছি তারা এতখানি অত্যাচার কেমন করে' যে করতে হয়, তাই জানে না। এরা শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত, উদার ধর্ম্মাবলম্বী এরা সব বিষয়েই অগ্রসর দেখি ! মেয়েটাকে বাড়ী থেকে বিদেয় করে দেওয়া হবে বলছে, তার উপর অমানুষিক অত্যাচার চলছে, অপরাধ, সে সেই মর্কট-টাকে বিয়ে করতে রাজী হয় নি। আশ্চর্য্য তোমার এই মামাই নারী মর্য্যাদা রক্ষিণী সভার সভাপতি ! চমৎকার !

ভৃত্য সংবাদ দিল, মহীন্দ্রবাবু আসিয়াছেন, বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। রাজেশ্বর তাঁহাকে বসাইতে বলিয়া, চিঠিখানি পকেটে পুরিতে পুরিতে কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন—তুই কি এইখানেই বসবি কামনা ?

হ্যাঁ বাবা—বলিয়া কামনা মাথা নত করিল।

বেশ্—আমি আসছি—বলিয়া রাজেশ্বর প্রস্থান করিলেন। তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া, বাহির হইতেই ডাকিলেন—কামনা ?

কামনা সাড়া দিবার পূর্বেই বলিলেন—নির্ম্মলা এসেছে, কামনা !

নির্ম্মলা আসিয়াছে। নির্ম্মলা—লাঞ্ছিতা, অত্যাচার প্রপীড়িতা নির্ম্মলা !—কামনা কাচের ঘারটি ঠেলিয়া

বাহির হইতেই, দেখিল—ম্লানমুখী নির্মলা ধীরপদে সেই দিকেই আসিতেছে।

ইহাদের দুইজনের অল্প জানাশুনা ছিল, কোন দিনই সেই অল্প চেনাশুনা ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ পায় নাই; কিন্তু আজ প্রথম দৃষ্টিতেই কামনার মনে হইল, নির্মলা যেন তাহার কতদিনের বন্ধু! তাহার সহিত কত কালের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ছুটিয়া দুই হাতে নির্মলাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল—নির্মলা!

নির্মলা এতখানি আশা করে নাই। তাহার কত না সঙ্কোচ-সন্দেহ ছিল! হয়ত বিনা পরিচয়ে কামনা তাহাকে চিনিতে পারিবে না, সে এইরূপই ভাবিয়া রাখিয়াছিল। এখন অন্যরূপ দেখিয়া বিস্ময়ে আনন্দে তাহার বাক-রুদ্ধ হইয়া গেল।

কামনা বলিল—চল নির্মলা, ঘরে বসি গে।

নির্মলা তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আসিয়া বসিল বটে কিন্তু একটি কথাও বলিল না। কামনা তাহা দেখিয়া ঈষৎ অভিমানের সুরে বলিল—তুমি যে অবাক করে দিলে ভাই নির্মলা!

নির্মলা মুখ তুলিতে, পুনশ্চ কহিল—তুমি কি আমায় চিনতে পারছ না, নির্মলা?

পারছি।

নির্মলা হাসিয়া বলিল—'পারছি' যদি, কথা কইছ না কেন?

নির্মলা নতনেত্রে কহিল—কামনা-দিদি…

কামনা বলিল—দাঁড়াও ভাই নির্মলা, আগে তোমাকে একটা 'থ্যাঙ্কস' করে দিই, অপরিচিত থেকে একেবারে তোমার দিদি হয়ে গেছি।

নির্মলা তেমনি নতমুখে বলিল—আমি বরাবর আপনাকে আমার দিদি বলে জানি।

উঁচি ভাই তোমার সত্যি কথা নয়। বরাবর তুমি আমাকে যদি দিদি বলে জান, তাহ'লে 'আজ আপনি, আজ্ঞে, প্রাজ্ঞে, আপনাকে' করছ কেন? সে কথা বরং আমি বলতে পারি যে তোমাকে বোন্ বলে গোড়া থেকেই তুমি করে দিয়েছি—বলিয়া হাসিয়া নির্মলার একটা হাত ধরিয়া কৌচখানার কাছে হইয়া পড়িল।

নির্মলা ডাকিল—কামনা-দিদি?

কি নির্মলা বোন্টি?

দিদি, আমাকে এখানে থাকতে দেবে? আমি তোমার দাসী-বাঁদী হয়ে থাকব। তাহার গলাটা ধরিয়া আসিতেছিল।

কামনা তাহা বুঝে নাই, সে অত্যন্ত পরুষকণ্ঠে কহিল—এখানে সুবিধে হবে না!

প্রচণ্ড ঝড়ে মাথা গুঁজিবার চালটুকু উড়িয়া গেলে অশনি-কম্পিত আকাশের দিকে মানুষ যে ভাবে চাহে, নির্মলাও কামনার মুখের পানে তেমনি করিয়া চাহিতে লাগিল।

এক মুহূর্ত পরে আর্দ্রস্বরে বলিল—বাবা যে আমাকে তোমার এখানেই রাখতে এসেছিলেন কামনা-দিদি!

কামনা কৃত্রিম দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—আমার দাসী-বাঁদীর দরকার নেই। যারা রাখে, তাদের বাড়ী যাও।

নির্মলা কাণে শুনিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে এই কথাগুলি কামনার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইয়াছে! কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে অনন্তরা চোখে চাহিয়া, কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল—কামনা-দিদি…

দাসীবাঁদী হতে এসেছ, দিদি বলে ডাকতে সাহস হয়? বল—হুজুর, জনাবালি, খোদাবন্দ্!—বলিতে বলিতে কামনা হাসিয়া ফেলিল। এতক্ষণ সে নির্মলার মুখের দিকে চাহে নাই, এখন দৃষ্টি পড়িতেই দেখিল, মুখখানি বর্ষার জলধৌত পদ্মটির মত শ্বেত-পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে, চোখ দুটি ছলছল করিতেছে; আর কপোল দিয়া দুইটি সূক্ষ্ম জলের রেখা নামিয়া আসিতেছে। দেখিয়াই কামনার বুকটি ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। দু'হাতে কামনাকে বেষ্টন করিয়া ডাকিল—আমি যে ঠাট্টা করে বল্লুম নির্মলা!

তা জানি দিদি।

তবে—কাঁদ কেন বোন্?

তার জন্যে নয় দিদি। কামনা-দিদি, কাল সকালেই হয়ত খবরের কাগজে নির্মলার নামে কত কুৎসা বেরিয়ে যাবে!

খবরের কাগজে? কুৎসা? তোমার নামে? এ-সব কি নির্মলা?

বাবা লুকিয়ে আমাকে এখানে এনেছেন দিদি! মিঃ সেন-কে বল্‌বেন, আমি তোমার চলে গেছি, জানেন না! বলিয়া নির্মলা ম্লান মুখটি নত করিয়া লইল।

কামনা দুই মুহূর্ত্ত পরে বলিল—অর্থাৎ তুমি পালিয়েছ কিম্বা কেউ তোমাকে নিয়ে পালিয়েছে, এই ত! সে ত ভালই—নির্মলা?

নির্মলা আর্ত্তস্বরে কহিল—ভালই দিদি?

নয়? জোসেফ চৌধুরীর হাত থেকে অব্যাহতি পেলে ত? মন্দ কি! মুহীন্দ্রবাবু খুব ভাল মতলব করেছেন বল্‌তে হবে নির্মলা!

কিন্তু খবরের কাগজে যার হবে যে?

হলেই বা! তা'তেও তোমার ভয় কি! লক্ষ্মাই তুমি কিছু পালাওনি যে কবে ফিরবে, তখন লোকে তোমায় কি রকম ঘৃণা করবে, তাই ভেবে ভয় পাচ্ছ!

কিন্তু খবরের কাগজ যে! কত লোক পড়ে! কত-রকম খবর যার হবে!

সে ত ভালই নির্মলা! তোমার সম্বন্ধে কত লোক কত রকম লিখবে, কেউ বল্‌বে, আহা মেয়েটি কি ভালই ছিল, আবার কেউ বলবে, মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র কোন কালেই ভাল ছিল না, যারা শুধু মেয়ে-চুরী, হার চুরীর খবর দেয়, তারা কত রঙ-বেরঙ ফলিয়ে লিখ্‌বে—এসব যখন তুমি পড়বে, তখন ত তোমার আনন্দ হবারই কথা নির্মলা!

নির্মলা সবিস্ময়ে কহিল—আনন্দ?

নয়? ধর, আমি এই বেঁচে রয়েছি, হঠাৎ যদি তখন রটে যায়, আমি মরে গেছি, অমুকের মেয়ে বলে কম-বেশী সব কাগজেই একটা করে' খবর বার হবে; কত শত সান্ত্বনা-সূচক চিঠি আস্‌বে—আমার ত মনে হয়, তাই থেকে আমি অনেকের মনের ভাবই জান্‌তে পার্‌ব। যে-সব বাংলা-কাগজওলা বাবার খুব খপক্ষ, তারা নিশ্চয় লিখবে যে এমন মেয়ে শু-ভারতে এই একটি কি-রকম করে বিধাতার হাত ফস্কে পড়ে গেছল; আবার যারা বাবার বিপক্ষে, তারাও কত মজার খবর দেবে। সত্যি নির্মলা, আমার ভাই এক-একবার মরে দেখতে ইচ্ছে হয়! সত্যিই যখন মরছিনে, ইচ্ছে করলেই বেঁচে ওঠা যখন আমারই হাতের মধ্যে!—কামনা হাসিতে লাগিল।

নির্মলা ম্লানমুখে কহিল—কিন্তু...

চুপ করলে কেন নির্মলা? বল?

তিনি যে..

নির্মলা আবার নীরব হইল। কামনা কিছু বুঝিয়াছিল, বলিল—তিনিও কাগজ পড়বেন—এই ত?

নির্মলা নয়ন নীচু করিয়া লইল।

কামনা বলিল—তাঁকে চুপি চুপি খবর দিলেই হবে যে 'আমি মরিনি, গো, শুধু মরে' রয়েছি'!—কামনার মুখখানি হাস্যরঞ্জিত হইয়া উঠিল।

নির্মলা বলিল—কিন্তু তাঁকে খবর দেবার আগেই ত কাগজে যার হয়ে যাবে দিদি?

তিনি থাকেন কোথায়?

নির্মলা নত মুখে কহিল—সহরেই থাকেন।

কামনা সোৎসাহে কহিল—তবে আবার কি! দেখি বাবা ভিতরে আসুন, তখন যা হয় করা যাবে।

নির্মলা দুইহাতে কামনার হাত ধরিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল—দিদি একটি কথা রাখবে?

কি কথা শুনি আগে?

বল রাখবে?

তবেই ত মুস্কিলে ফেল্লে দিদি! হঠাৎ যদি একবার বলে ফেলি সূর্য্যাস্তের পূর্বে জহরব্রত যদি করি, তখন না পারলে যে অগ্নি প্রবেশ করতে হবে! সে হবে না ভাই! অগ্নি প্রবেশ আমি করতে পারব না, সব পুড়ে যাবে যে!—কামনার মুখে হাসি দেখিয়া নির্মলা অভয় পাইয়া বলিল—আমি জানি তুমি রাখবেই।

কামনা হাসিয়া তাহার গালটিতে দুইটী আঙুলের টোকা মারিয়া বলিল পাগলি কোথাকার! বল না কি কথা?

নির্মলা নতমুখে বলিল—জ্যেঠামশায়কে আমার নাম করে কিছু বল না।

কামনা হাসিয়া বলিল—না আমার নাম করেই বলব, তাঁকে আমার দরকার আছে কেমন?

আমি তোমাকে পরামর্শ দেব?

দোষ কি, সে না!

আমি কি জানি—বল?

ও বাবা! তুমি না জান কি তাই আগে বল! প্রেমে পড়তে জান...

নির্মলা আর্তকণ্ঠে কহিল—তোমার দুটি পায় পড়ি দিদি...

পায়ে পড়তে হবে না নির্মলা! তোর দিদি তোরই মত দুঃখিনী!

নির্মলা যেন সূচীভেদ্য অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল; ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—সত্যি দিদি, তোমার কথাও ত আমরা শুনেছি!

দুইটি তরুণ হৃদয় একই ব্যথায়, একই বেদনায় দুল দুল করিয়া উঠিল; কেহ কাহারো পানে চাহিতেও পারিল না।

এক মিনিট পরে কামনা জিজ্ঞাসিল—তাঁর নাম কি নির্মলা?

সত্যেন্দ্র।

কি করেন?

এম্-এ পড়েন;

তোমাদের বাড়ীতে কতদিন আসছেন?

যখন স্কুলে ফোর্থক্লাসে পড়তেন, বাবা তাঁর অঙ্কের মাষ্টার ছিলেন।

কামনা গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসিল—প্রেম, প্রকাশ পেল কবে?

নির্মলা উত্তর দিল না।

কামনা বলিল—আমার কাছে লজ্জা কি নির্মলা?

সেবার মা'র অসুখের সময়। তিনি থাকতেন।

তারপর?

আর কি!

না। আর কিছু না? হাঁ, মামার তাঁকে অপছন্দ কেন?

জানি-না। তবে তিনি হিন্দু—এই যা।

তুমি হিন্দু হবে?

নির্মলা কামনার কাঁধের উপর মুখ রাখিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল—তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করছ দিদি?

কামনা তৎক্ষণাৎ কহিল—অন্যায় হয়েছে দিদি, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। কিছু মনে করিস নে বোন্!

বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল, কামনা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—বাবা আসছেন।

নির্মলা বলিল—আমি এখানে থাকব দিদি?

থাকবি বৈ-কি!

রাজেশ্বর বলিলেন—সত্যেন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছি মা! আর কামনা, শান্তকেও টেলিগ্রাম করে দিলুম!

কামনার পা টলিতেছিল, সে দেহের সমস্ত শক্তি পদদ্বয়ে একত্রিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজেশ্বর ধীরপদে কন্যার নিকটে আসিয়া কন্যার হাত ধরিলেন; স্নেহকম্পস্বরে ডাকিলেন—কামনা!

বাবা!

অন্যায় করি নি মা?

কামনা কাঁদিয়া বলিল—কিসের অন্যায় বাবা?

তাই হলেই হল মা! আর কিছু না! শুধু তুই বল্ যে তোর বাবা অন্যায় করে নি—তাহলেই হবে।

(ক্রমশঃ)

জীবন রাখতে হলে
জীবন-রসায়ন
ইহা শরীরের রক্ত মাংস ও স্নায়ুর ক্ষতিপূরণ কর্ত্তে পারে অথচ উত্তেজক নয়।
—তথ্য লউন—শ্যামাদাস ঔষধালয়—৬৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাপ্রাণ এঞ্জিনিয়ার

('সার্ভেন্টে'র লেখা অবলম্বনে)

[শ্রীরাধাচরণ দাস]

বিগত অসহযোগ আন্দোলনের অগ্নিময় যুগে চট্টল জননীর বীরপুত্রগণ বীরত্বের যেরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা জাতির হৃদয়-পটে চির জাগরূক রহিবে।

সম্প্রতি চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন ঘোষ মহাশয় ত্যাগ ও মহত্বের আর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ দেখাইয়াছেন। রেবতীবাবু বহুদিন হইতে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিতে এঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেছিলেন। গত বৎসর মহাত্মা গান্ধী যখন ছয় বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হন তখন এই স্বদেশগতপ্রাণ মহাপুরুষ চট্টগ্রামের "জ্যোতি" (দৈনিক সংবাদপত্র) কার্য্যালয়ে যাইয়া বলিয়াছিলেন ;—

"আমি আর চাকুরী করিতে চাই না। আমি মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পথে চলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। দারিদ্র্য-বরণ করিয়া আমি জীবিকানির্ব্বাহ করিব। আত্ম-সম্মান রক্ষার পক্ষে চাকুরী নিদারুণ অন্তরায়।"

স্বজনগণের অবিরাম প্রতিকূলতায় এতদিন তাঁহার অন্তরের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় দমিত ছিল। এই নির্ভীক, আত্মত্যাগী, সত্যের উপাসক, স্বদেশপ্রাণ ও আত্মজয়ী পুরুষ সিংহ আর অধিক দিন এই "অপমানের বোঝা" বহন করিতে অসমর্থ হইয়া গত বৈশাখী পূর্ণিমার দিন কর্তৃপক্ষের নিকট ইস্তফা পত্র পেশ করিয়াছেন।

পদত্যাগ পত্রের একস্থানে আছে ;—

"আজিও মহাত্মাজী কারাক্লেশ ভোগ করিতেছেন, এমন অবস্থায় এখনো আমার চাকুরীতে লাগিয়া থাকা কখনই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত নহে, আমি আর এমন হৃদয়-হীনের মত চাকুরী করিতে পারি না।"

রেবতী বাবু এক্ষণে স্বগ্রামে গমন করিয়াছেন। তিনি এখন কৃষি-কার্য্যের দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি তিনি ৮ একর জমি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতেছেন। রেবতীবাবু শারীরিক পরিশ্রম ও হাতের কাজ করিতে কোনরূপ লজ্জা অনুভব করেন না। তিনি কোদালি ও লাঙ্গল লইয়া কৃষিকার্য্য করিতে চিরাভ্যস্ত। যখন তিনি এঞ্জিনিয়ার ছিলেন তখনও তিনি অবকাশকালে কোদাল ও লাঙ্গল প্রভৃতি যন্ত্রপাতি সহযোগে চাষবাস ও বাগানের কাজ করিতেন। তাঁহার এই কর্ম্মনিরত অবস্থায় যখন চাষরাশী অফিসের কার্য্যের জন্য তাঁহার নিকট আসিত তিনি তৎক্ষণাৎ কোদালাদি সরাইয়া রাখিয়া সে কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। কর্ত্তব্যপালনে তিনি কখনো ত্রুটী বা অবহেলা করেন না। আমরা এই মহাপ্রাণ, আদর্শ-স্থানীয় দেশবাসীর আত্ম-ত্যাগ ও স্বদেশপ্রাণতার গৌরব অনুভব করিতেছি। ভগবান্ ইঁহাকে নীরোগ ও দীর্ঘ-জীবি করিয়া বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করুন।

সহানুভূতি

(Schiller)

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

একটি বা কথা, একটু চাহনি,
কভু নিমেষের ধীর কারুতি
প্রাণে প্রাণ গাঁথে সোণালী সূতায়—
আখ্যা তাহারি সহানুভূতি।

৪৷৷ বিনামূল্যে লকেটসহিত ফটো
ফটো এনলার্জার ফটো ১২×১০
ফটো সমস্তশ্রীমতি সিকি মূল্য পাঠান
ক্যামেরা, লেন্স ও রবারষ্ট্যাম্প সেকার
৬৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

ভ্রমরের গর্ব্ব

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

আমি পদ্মে বস্‌ছে ডেকে মৌমাছি,
মধুর হবে মরণ যদি যাই বাঁচি।
মাকড়সা তোর টানা পড়েন শক্ত রে
ল'ক টেনে ল'ক আমার বুকের রক্ত রে
আমার গায়ে তোর যে গরল বিষ মিশি
আমার পাখায় সারঙ্গ ছেঁদে নিস্ নিশি!
চোখে আমার কমল কানন জাগ্‌বে রে
মুখে আমার ফুলের চুমাই লাগ্‌বে রে।
তুমি কেবল বার কর ভাই সূত্র যে
আমি ভ্রমর অমৃতেরি পুত্র যে।

২

সাধ্য নাহি শক্তি নাহি ছাড়বারই
তোমরা আমি আমি মধুর কারবারী
কমলা দেবীর বুকে আমি সতিন
আমি বাণীর কমল বনের চকরী
আপনা হারাই নাগকেশরের সৌরভে
আমিই বাড়াই গোলাপ ফুলের গৌরবে
শিউলি ফুলের উৎসবেরি ধুম বাড়াই
বকুলকে হায় আকুল করে ঘুম পাড়াই
মধুপ হায় মধুর করি বিশ্বকে,
বসন্তেরি সম্ভার দিই শ্রীমঞ্চে।

৩

তোমার ভালের দারুণ ব্যথা বইছি গো
তোমার বিষের টনটনানি সইছি গো।
তৃপ্তি লভ আমায় তুমি গ্রাস করি
আমি যেন বিশ্বটা তোমার নাশ করি।
তুচ্ছ দেহ ভঙ্গুর, হ'ক চূর্ণ তা
মধুকরের তাতেই যেন পূর্ণতা।
মধুস্রবা মধুর পরিবেষ্টা গো
ভাণ্ডারী সে অমর মধুর স্রষ্টা গো।
স্বাধীন সে যে রইনা কোথাও সঙ্কোচে
স্বর্গ তাহার হরির চরণ পঙ্কজে।

সার কথা

[শ্রীপঞ্চানন কাব্যবারিধি]

১। বিপদে যখন আনন্দ অনুভব হচ্ছে, তখন বুঝবে, তোমার প্রেম অমৃতে মুক্ত হয়েছে।

২। নিন্দাকারীকে একজন উপকারী বন্ধু ভাব্‌বে, কেননা, সে তোমার নিন্দারভার বহন করে' তোমায় মুক্ত কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে।

৩। দরিদ্র পরিবারে পুত্র উপার্জ্জনে অক্ষম হলে, পিতার উচিত নয়—জোর করে তার বিয়ে দেওয়া। সে ক্ষেত্রে বিয়ে হলে, পিতা প্রায়ই শত্রুস্থানীয় হন।

৪। মন খোলসা না হলে, সুখী হতে পারা যায় না।

৫। উপযুক্ত হতে হলে নিজের উপর নির্ভর চাই; পরের মুখ চেয়ে থাক্‌লে, ক্রমশঃ তোমার অস্তিত্বটুকুও লোপ পেয়ে যাবে।

৬। ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করে দিনরাত কাজ কর্‌তে থাক, পরিণামে নিশ্চয়ই জয়ী হবে।

৭। যেখানেই যাও, এই কয়টা জিনিস তোমার কাছে রাখ্‌বে!—একগাছি লাঠি, একখানি ছুরি, একটি আংটি ও একটি দিয়াশলাই। অনেক সময়, এগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে।

৮। সমান অবস্থাপন্ন বংশের কন্যাকে বিয়ে কর্‌বে। কন্যা গুণবতী হলে দরিদ্রবংশেও বিয়ে কর্‌তে ক্ষতি নাই।

৯। কথা বল্‌বার সময়, খুব সতর্ক হয়ে বল্‌বে; নিজের দুর্ব্বলতা অপরকে জান্‌তে দিয়ো না। আর, খুব গোপনীয় কথা গোপনেই রাখ্‌বে,—এমন কি, অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও প্রকাশ কর্‌বে না।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন এবার কাঁটালপাড়ায় বসিবে কথা হইয়াছে। সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন বর্দ্ধমানের মহারাজা। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, বৈজ্ঞানিক জগদানন্দ রায়, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র বসু প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, এবারকার সাহিত্য সম্মিলনের ফলে বঙ্কিম বাবুর বাড়ীটির হেল কোম্পানীর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে; কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয় ব্যাধি 'দলাদলি' এক্ষেত্রেও দেখা দিয়াছে। কয়েকজন অতিরিক্ত উৎসাহী দল বা 'সাহিত্যিক' মহলা করিয়া আলাদা একটা বৈঠক বসাইয়াছেন। তাঁহারা শরৎচন্দ্রের মহারাজা মণীন্দ্রনাথ নন্দীকে সভাপতি করিয়াছেন। শুনিতেছি মহেন্দ্রসুলতান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমল কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই দলছাড়া সম্মিলনে যোগ দিবেন। এ সংবাদ শুনিয়া আমরা বর্দ্ধাহত হইয়াছি। বর্দ্ধমানের মহারাজাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়ত ঠিক হয় নাই, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মহারাজাই কি তাঁর চেয়ে বেশী মূল্যবান? আমরা ত দুই দলের মধ্যে কোন তফাৎ দেখিনা। এসব দলাদলি কেন? ব্রাহ্ম-বৈদ্য-বিদ্বেষ না উত্তররাঢ়ী-পশ্চিমরাঢ়ী বিদ্বেষ না প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের বিদ্বেষ? যাহারা দলাদলি ও ঘোঁট পাকাইতেই আনন্দ পায়, তেমন সব মূঢ় জীবদের ইহাতে সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সাহিত্যিকও এই দলাদলিতে যোগ দিতেছেন—এইটাই পরম দুঃখের কথা। বঙ্কিম বাবুর বাড়ীটা ডুবুক যাক'—এমন বিদ্বেষের ভেকুও যখন তখন তুলিতেই লজ্জা উচিত। (আনন্দ বাজার পত্রিকা)

বঙ্কিম-দুহিতা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী আশুতোষ লাইব্রেরীর অধ্যক্ষিকার বিরুদ্ধে "চিত্রে চন্দ্রশেখর" নামক পুস্তকখানার স্বত্ব ভঙ্গ করার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। গতকল্য হাইকোর্টে জষ্টিস্ মিঃ ম্যাকলাউডের এজলাসে মামলাটী আপোষে মিটমাট হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী শরৎকুমারী বঙ্কিম বাবুর একমাত্র কন্যা এবং তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। তিনি এই মর্ম্মে নালিশ রুজু করেন যে, চন্দ্রশেখর তাঁহার পিতার লিখিত। আশুবাবু তাঁহার অনুমতি না লইয়াই ঐ বইখানার চিত্র সম্বলিত একটী সংস্করণ "চিত্রে চন্দ্রশেখর" নাম দিয়া প্রকাশ করেন।

আশুবাবু সমস্ত বই বাহির করা প্রকাশ করিবার অনুমতি চাহিতে পারেন নাই বলিয়া, দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৫০০৲ টাকা দিতে স্বীকার করেন। ভবিষ্যতে তাঁহার অনুমতি না লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের আর কোন বই তিনি প্রকাশ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বাদী পক্ষ হইতে এই মীমাংসায় খুসী হওয়া হয় এবং প্রকাশককে পুস্তিকা চন্দ্রশেখর সমেত যে বারো খানা বই এখন হইতে প্রকাশ করিতে অনুমতি দেওয়া। বিচারক এই মীমাংসায় সম্মতি দিয়াছেন।

এক বাঙ্গালী সংবাদিকা বাড়ী খুঁজিতে খুঁজিতে পুরাতিনীর মর্ত্তে এক কন্যা উৎপাদন করিয়া পরে সংবাদিকা অনুকূল অভিমুখে হন্। আদালতের বিচারে বাঙ্গালীকে কন্যার ভরণ পোষণার্থে ১০৲ টাকা করিয়া মাসিক দিবার আদেশ হইয়াছে, মামলায় যাহাতে প্রকৃতির বহন করিতে হইয়াছে। আমাদের দেশের সুবিজ্ঞের দেরেদের সন্ন্যাসীর বাবে ভর্ত্তি উচিত, এই দৃষ্টান্তে ভর্ত্তি একটু কমিয়া যাই।

এই স্বামী যে মন্দিরে আশ্রয় করিতেন, সেখান হইতেই তাঁহাকে বিতাড়িত করা হইবে কি না জানিতে পারি নাই। যোগানন্দ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ঐ মন্দিরে তাঁহাকে অবস্থান করিতে দিলে নারীদের সেখানে যাওয়া উচিত কি না তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। শুনিয়াছি ঐ মন্দির অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দ্বারে পরিচালিত হইয়া থাকে, তাঁহারা যোগানন্দ ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করেন, তাহা জানিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া রহিলাম। (শিশির)

ফরাসীরা জার্ম্মাণীর বিভিন্ন, কেট ও লাভটাইজ্‌কেবেল মন্ত্রের কারখানাগুলি অধিকার করিয়া ২০০০০০০০০ ফ্রাঙ্ক মূল্য মূল্যের ফ্র আত্মসাৎ করিয়াছে। জার্ম্মাণী ৩ মাস পূর্ব্ব হইতেই অতিপুরা যাবত ফ্র প্রদান বন্ধ করিয়া এগুলি মজাইয়া রাখিয়াছিল। ফরাসীরা সেগুলি পাইয়া ভারী খুসী হইয়াছে।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, আগামী মে মাস হইতে লণ্ডন ও বোম্বাইএর মধ্যে উড়ো-যাত্রী-জাহাজ চলিবে। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার ২০০ যাত্রী লইয়া উড়োজাহাজ লণ্ডন হইতে যাত্রা করিবে। ৪ দিনে বোম্বাই পৌঁছিবে। ভাড়া প্রায় ১০০০ টাকা। পড়িবে।

বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার সভ্যগণ :—প্রধান মন্ত্রী—মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড, ফাইন্যান্সের লর্ড প্রেসিডেন্ট—মার্কুইস্ অব্ সালিসবারি, লর্ড চ্যান্সেলর—ভাইকাউন্ট কেভ, রাজস্ব সচিব—মিঃ স্নোডেন ফ্যাকেন্স, হোম সেক্রেটারী—মিঃ ডবলিউ. সি, ব্রিজম্যান, পররাষ্ট্র সচিব—মার্কুইস কার্জন, উপনিবেশ-সচিব—ডিউক অব্ পেনব্রোক, ভারত সচিব—ভাইকাউন্ট পিল, সমর সচিব—আর্ল অব্ ক্রার্ণি, ডাকঘরের সেক্রেটারী—ভাইকাউন্ট মোরার, লর্ড প্রিভিসিল—লর্ড হার্বার্ট সিসিল, প্রেসিডেন্ট বোর্ড অব্ ট্রেড—সার ফিলিপ স্নোডেন স্নিড্, শিক্ষা সমবায় প্রেসিডেন্ট—মিঃ উইন, ফুড বিভাগের মন্ত্রী—সার আর, এ, ভাভাসর, শ্রমিক বিভাগের মন্ত্রী—সার মাইকেল মার্থো, স্যাডেল্টারের চ্যান্সেলর—মিঃ ফ্রেডিকস্, বিমান-পোত বিভাগের মন্ত্রী—সার তাম্বুলেন হোম, রাজস্ব সেক্রেটারী—সার ফলসন্ বিল্।

"ভুলে গেল তার কাজ"

শিল্পী—শ্রী এ, এম্ দাস।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ৮ই আষাঢ় শনিবার ১৩৩০, ইং ২৩শে জুন । [৪৭শ সংখ্যা

বাসন্তীর—২য় বর্ষ

"বাসন্তী" বহু দোষ ত্রুটী সত্ত্বেও বঙ্গীয় জনসাধারণের মনস্তুষ্টি করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিতেছে। আগামী ২২শে আষাঢ় ১৩৩০ শনিবার ২য় বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা প্রথম বর্ষের বাসন্তীর গ্রাহক গ্রাহিকা ছিলেন, ২য় বর্ষে তাঁহাদের যে আমরা গ্রাহক গ্রাহিকারূপে পাইবে তাহাতে আমাদের আদৌ সন্দেহ নাই ; যাঁহারা কলিকাতা সহরে প্রতি শনিবার নগদ ক্রয় করিতেন, তাঁহারাও যে বাসন্তীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিতে বিরত হইবেন না, ইহাও আমরা খুব আশা করি। কারণ আমরা জানি, প্রথম বৎসরের বাসন্তী সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছে। বাসন্তীর গল্প, উপন্যাস, নির্ভীক স্পষ্ট আলোচনা পাঠক-পাঠিকাগণকে আনন্দ দান করিয়াছে। বাসন্তীর রঙ্গিন চিত্রগুলির প্রশংসা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। বাসন্তীর ব্যঙ্গ চিত্র, কার্টুন প্রভৃতি জনসাধারণকে যেমন আনন্দ দিয়াছে, তেমনি ভাবাইয়াছে। বাসন্তীর তেড়ি কলমক্রম, বাসন্তীর নিখিল-বিশ্ব-গুপ্ত প্রদর্শনী, লাফিৎ গ্যালারি প্রভৃতির কথা বঙ্গের সর্ব্বস্থানে প্রবচনের মতই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। ২য় বর্ষের বাসন্তীতে এ সকল ত থাকিবেই, চিত্রসংখ্যা যাহাতে আরও বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহারই চেষ্টা করিতেছি।

১ম বর্ষের বাসন্তীতে যে সকল খ্যাতনামা সুধী লেখক লেখিকাবৃন্দ লিখিয়াছেন, তাঁহারা ত লিখিবেনই, তাহা ব্যতীত আরও কয়েকজন প্রতিভাবান লেখক লেখিকার রচনা-সম্ভারে বাসন্তী সমৃদ্ধ হইবে। বিশেষ আনন্দের কথা, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্-এ ডি-এল মহাশয়ের ছোট গল্প-ও বাসন্তীতে প্রকাশিত হইবে। সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প—প্রথম সংখ্যা হইতেই বাহির হইবে। বাঙ্গালীরা ঘরের নিখুঁত ছবি আঁকিতে সিদ্ধহস্ত। সুলেখিকা শ্রীমতী সরসীবালা বসুর একখানি সুন্দর উপন্যাস ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে আরম্ভ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ভূতপূর্ব্ব 'বাঙ্গলার কথা'—সম্পাদক মেঘ-প্রাণ সুভাষচন্দ্র, হেমন্তকুমার প্রভৃতি তরুণ লেখকবৃন্দের রচনাও বাসন্তীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবে। ভারতী-সম্পাদক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল্ ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা ও গল্প বাসন্তীতে প্রকাশিত হইবে। চিন্তাশীল লেখক যমুনা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিত্র এম্-এ বি-এল ও প্রতিভাবান শ্রীযুক্ত দুর্গাদাসপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা-ও বাসন্তীর সম্পদরূপে দেখা দিবে।

আগামী ২য় বর্ষ হইতে বাসন্তীতে বাংলার মেয়ে বলিয়া একটি বিভাগ থাকিবে। ইহাতে বাংলার মেয়েরা তাঁহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির বিষয়ে আলোচনা করিবেন। বাংলার মেয়ে বিভাগে মেয়েদের জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার আছে, তাহা ৭৫ সংখ্যার বাসন্তীতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুমদার মহাশয় বাসন্তীর রঙ্গীন চিত্র-বিভাগের ভার লইয়াছেন।

আমরা আশা করি ১ম বর্ষের গ্রাহকগ্রাহিকাগণ যাঁহাদের ৪৮শ সংখ্যা পত্রিকা (যাহা ১৫ই আষাঢ় শনিবার প্রকাশিত হইবে) প্রাপ্তিতেই বর্ষ পূর্ণ হইবে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া ২০ই আষাঢ়ের মধ্যে গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা করিলে টাকা মণিঅর্ডার করিবেন, যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা ঐ তারিখের মধ্যেই একখানা কার্ডে সে কথা জানাইয়া দিবেন। যাঁহাদের মণিঅর্ডার অথবা নিষেধপত্র আমরা ১৫ই আষাঢ়ের পূর্ব্বে পাইব না, তাঁহার নামে বার্ষিক মূল্য চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিতে ১৫ই আষাঢ়ের সংখ্যা তাকে পাঠাইব। ভিঃ পিতে গ্রাহকদের কিঞ্চিৎ বেশী খরচ পড়িবে এবং ভিঃ পি ফিরিলে, আমাদের অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। অনর্থক কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্থ করিতে কেহই ইচ্ছুক নহেন, আমরা জানি।

তাই বিশেষ অনুরোধ, গ্রাহক গ্রাহিকারা তাঁহাদের অভিপ্রায়মত ব্যবস্থা যেন ৮ই অথবা ১০ই আষাঢ়ের মধ্যেই করিয়া ফেলেন, কারণ সাপ্তাহিকপত্র প্রতি সপ্তাহেই বাহির হয়, এক সপ্তাহ দেরী হইলে কাগজ পাইতে অনেক গোল হইতে পারে।

স্মরণ রাখিবেন—১ম বর্ষের শেষ সংখ্যা ১৫ই আষাঢ় ১৩৩০।
স্মরণ রাখিবেন—২য় বর্ষের প্রথম সংখ্যা ২২শে আষাঢ় ১৩৩০।
পত্রাদি ও টাকাকড়ি আমার নামে পাঠাইবেন :—

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, পরিচালক, বাসন্তী
১৪ নং জগন্নাথ সেনের লেন,
পটুয়াটোলা, কলিকাতা।

কেরামতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পরে)

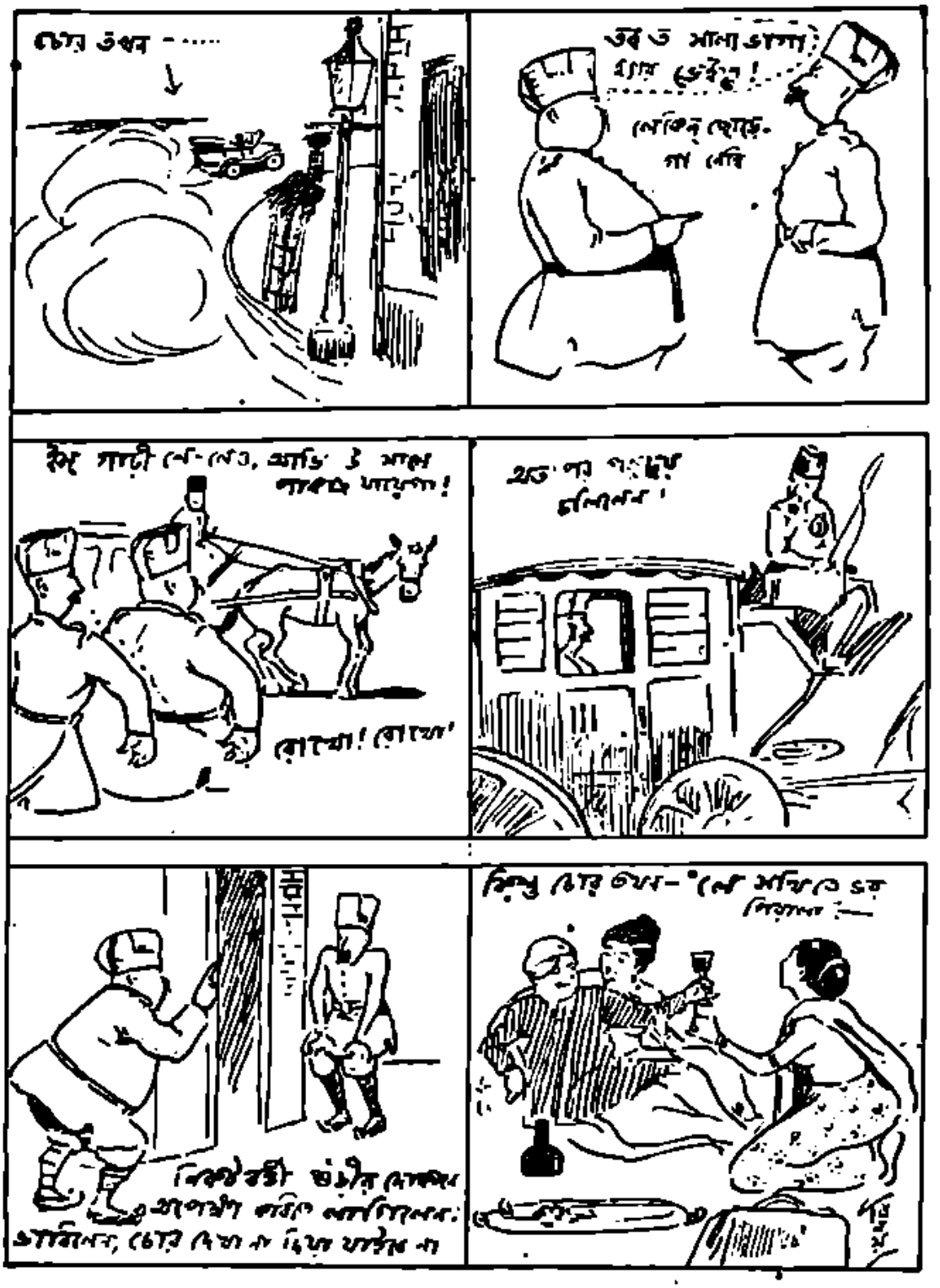

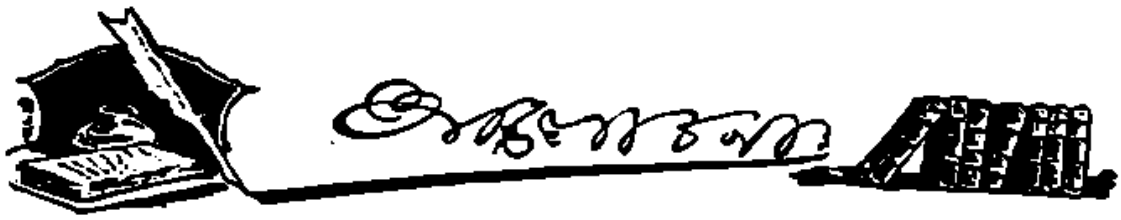

গত শনি রবিবার বাংলার বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি অমর বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়ার বাসভবন বঙ্কিমতীর্থে সাহিত্য-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমতীর্থে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া বাঙ্গালী ধন্য হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ও বাংলার ভাবাদর্শের নবীন যুগ প্রবর্ত্তক। তাঁহার ভাবাদর্শের পুত্র মন্ত্র নিখিল ভারত গ্রহণ করিয়াছে। বন্দেমাতরম্ রচয়িতার বাসভবনে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে যাওয়া দেশবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য—সৌভাগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবন বিশাল সাতমহলা প্রাসাদ, বাংলার গৌরব বঙ্গদর্শনের সূতিকাগার—বঙ্কিমের লিখিবার—সাহিত্যিক মজলিস্ বসাইবার বৈঠকখানা, সেই সুবৃহৎ অর্জ্জুনা পুষ্করিণী আজিও সব আছে। তবে সে বিশাল প্রাসাদের অবস্থা শোচনীয় জরাজীর্ণ। বৈঠকখানায় সে নবভাব প্রচারের বৈঠক আর বসে না—অর্জ্জুনার নির্ম্মল কাল জলরাশি আর নাই। সব ম্রিয়মান—তবু স্মৃতি আছে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের অনুগ্রহে বাংলার সাহিত্য-সম্রাটের বাসভবনের স্মৃতিটুকুও অতি শীঘ্র লোপ পাইবার সম্ভাবনা। দেশের এমন গৌরবের এমন পুণ্যস্মৃতির স্থান লুপ্ত হইতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে সরকার চালিত—বিলাতের লোক এমন পুণ্যস্মৃতির স্থানকে কত আদরে যে রাখে তাহা আমাদের শিখাইতে হইবে না। কিন্তু সরকার চালিত রেলপথ বঙ্কিম-ভবন গ্রাস করিবে এই অতি অবিশ্বাস্য কথাটি আমরা কিছুদিন হয় শুনিয়া আসিতেছি। রেল কোম্পানী পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ বঙ্কিম-ভবনের চারিপাশের বহুস্থান লইয়াছেন—এক্ষণে এই বাসভবনের দিকে তাহাদের দৃষ্টি আর না পড়িলেই সুখের বিষয় হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্যিক সকল দেশেই পূজা পাইবার যোগ্য—আশা হয় তাঁহার পবিত্র স্মৃতি-চিহ্নের কেহ লোপ করিবেন না। রেলওয়ের প্রসার স্বচ্ছন্দ বহু হইতেছে—কিন্তু দেশের এই তীর্থস্থানে সে প্রসারের গতি সঙ্কুচিত থাকাই ভাল।

• • • •

বঙ্কিম স্মৃতি রক্ষা প্রসঙ্গে দেশবাসী সরকার বা তৎ-চালিত রেলকোম্পানীর অনুগ্রহ চাহিতেছে—আর বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে দেশবাসী দেশবাসীরই নিকট অনুগ্রহ চাহিতেছে। বিদ্যাসাগর বাসভবনও তাঁহার পুত্রের দেনার দায়ে নিলামে চড়িয়া ৭২০০০৲ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। দেশীয় হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী বিদ্যাসাগর বাসভবন ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন। মহাপ্রাণ দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের বাসভবনও বাংলার গৌরব—একটা পুণ্যস্মৃতি। এই পুণ্যস্মৃতি লোপ হইতে দেওয়া জাতীয় অগৌরব—কলঙ্ক। এই কলঙ্ক মোচন হইতে পারে দেশ-বাসী যদি অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই স্মৃতি-মন্দিরকে জাতীয় সম্পত্তি করিয়া বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত দেশ-উন্নতিকর কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান তাঁহারই পুণ্য নামে উৎসর্গ করিতে পারে। দেশে বিদ্যাসাগর ভক্ত লোকের অভাব নাই—যাহারা লেখাপড়া কিছুমাত্র শিখিয়াছে তাহারাও নিত্য বিদ্যাসাগরের ঋণ স্মরণ করিতেছে। তাই আশা হয় জাতীয়তার এই দিনে জাতির গৌরব এই পুণ্যস্মৃতি লোপ পাইবে না। বিদ্যাসাগর স্মৃতি উৎসবের আর বিলম্ব নাই—এসময়ে বিদ্যাসাগর বাসভবন রক্ষাই দেশ-বাসীর প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিৎ।

• • • •

দেশবাসীরও এ সম্বন্ধে যেমন কর্ত্তব্য আছে—স্মৃতির সম্মান পাইবার যোগ্য ব্যক্তিদেরও এ সম্বন্ধে তেমনি কর্ত্তব্য আছে। স্যার তারকনাথ বা রাসবিহারীর স্মৃতি যতদিন দেশের শিক্ষা প্রথা রহিবে ততদিন দেশে অমর থাকিবে। ইতিহাসে ইঁহার স্থান আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুকালে নিজকৃত ঋণ শোধ হয় ছিল না। তারপর তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির আয়ও সামান্য নহে। কিন্তু তাঁহার বংশধর সে সব আয় থাকা সত্ত্বেও কি হেতু বিদ্যাসাগর-বাসভবন বাঁধা দিয়াছিলেন; তাহার কারণ জানিবার উপায় নাই। এই বাসভবন জনহিতকর কার্য্যের জন্য কিম্বা দেবোত্র ভাবেও যদি রাখা হইত তবে ইহা অপরে অধিকার করিতে পারিত না। বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থাও খারাপ ছিল না। তাঁহার গ্রন্থগুলির আয় আজিও প্রচুর আছে। কিন্তু এমন লোকের প্রাসাদও সংস্কার অভাবে জীর্ণ পতনোন্মুখ কেন যে হয় তাহা বোঝা যায় না। অথচ বঙ্কিমের অর্থে ও গ্রন্থের আয়ে তাঁহার আত্মীয়েরা সুখে আছেন। এই আয়ের কতকাংশ দেবোত্র ভাবে রাখিয়া তাহা দ্বারা এসব সংস্কার ও বংশের চির আচরিত সৎকার্য্যসমূহ রক্ষণের ব্যবস্থা সহজে হইতে পারিত।

• • • •

স্বরাজ্য দলের শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধীর ত্রুটি ও ভ্রম প্রদর্শনে ব্যস্ত। দাশ মহাশয় বলিতে-

ছেন মহাত্মা নাকি লর্ড রেডিংএর সেই পুরাতন আপোষের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া অতি বড় ভুল করিয়াছিলেন। ভারতীয় ইতিহাসে আমলাতন্ত্রের প্রথম পরাভব স্বীকার এ ভাবে উপেক্ষা করাটা দাস মহাশয়ের মতে মহাত্মার অপরাধ হইয়াছে। মহাত্মা লর্ড রেডিংএর সেই কূট রাজনৈতিক আপোষ নিষ্পত্তির চালে কেন মুগ্ধ হন নাই এবং ভারতের ভবিষ্যৎ নীতি সম্বন্ধে রিফর্মের এক ডিগ্রী উপরে প্রতিশ্রুতি পাইয়াই কেন বিস্ময়-বিমূঢ় কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়েন নাই তাহা মহাত্মার তৎকালীন প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বিশেষ ভাবে দেখাইয়াছেন। লর্ড রেডিং যুবরাজের অভ্যর্থনা সফল করিবার জন্যই ঐ চাল দিয়াছিলেন—পরে সে দাবী অসম্ভব বলিতেন। বিলাতের অনুমতি ভিন্ন লর্ড রেডিংএর সে প্রতিশ্রুতি পালন সম্ভব ছিল না। সে প্রতিশ্রুতির মোহে মহাত্মা মুগ্ধ হন নাই—দেশবাসীও সে দান লোভে আহ্লাদে আত্মহারা হয় নাই। সে অনেক দিনের পুরাণ কথা—কিন্তু আজ দাস মহাশয় তাহারই যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাতে দাস মহাশয়ের আইন জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার প্রত্যাবর্তন দেখিয়া এক শ্রেণীর দু'চার জন লোক উল্লসিত হইতে পারে কিন্তু দেশের জনসাধারণ অনেকেই ক্ষুব্ধ। অবশ্য দাস মহাশয় সগর্ব্বে বলিতে পারেন আমি যাহা বলি তাহা যুক্তি-সহ, আইন-মাফিক কথা কিন্তু দেশবাসী সাধারণ জনেরও একটা যুক্তি ও মত আছে এবং তাহা আছে বলিয়াই দেশবাসী অন্তরের স্বরাজকামী প্রচণ্ড আগ্নিস্রাবী মতিত দাস মহাশয়ের মতবাদের ঘূর্ণিলীলা দেখিয়া স্তম্ভিত। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বলিতেছেন মহাত্মা ফিরিয়া আসিলেও তিনি স্বমতেই চলিবেন। উত্তম কথা—ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ হয়তো আমরা দেখিতে পাইব। তাহাতে ব্যক্তি অনেক উর্দ্ধে উঠিতে পারেন—কিন্তু জনসাধারণ সে সঙ্গ-সুখ পাইবার জন্য তত উর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হইবে কি?

• • • •

কৌন্সিল প্রবেশের আন্দোলনের চক্কানিনাদ লইয়া মত-বিরোধ, দল বিচ্ছেদ ঘটেই হইয়াছে। দেশের প্রকৃত হিতকর কার্য্যের সহিত ইহার সম্পর্ক অতি সামান্য হইলেও, ভূতপূর্ব্ব মহাত্মা-পন্থী কতিপয় অ-সহযোগী এই তুচ্ছ বিষয়কেই দেশ কর্ম্মের কেন্দ্র করিয়া লইয়াছেন। রিফর্ম যুগের কৌন্সিলে এ-দেশবাসী কতটা আত্মকর্তৃত্ব দেখাইতে পারে—দেশবাসীর কৌন্সিলী হইয়া দৌড়ের সীমা কতদূর তাহা কৌন্সিলের ভাগ্যবিধাতারা অনেকটা স্পষ্ট কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—ভারতকে স্বায়ত্তশাসন আমরা দেই নাই—কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে দিব এমন কথাও নাই। এসেম্বিলীর বহু-জন-মত বার বার অগ্রাহ্য করিয়াও সার্টিফিকেটী ব্যবস্থা চলিতে পারে কারণ রিফর্ম আইনে সে বিধান আছে। এরূপ স্পষ্ট ঘোষণার পরেও ভারতীয় নেতাদের কৌন্সিল-ভরসাই দেশ মুক্তির চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত কি? মহাত্মার মুক্তি আন্দোলনকে এই কৌন্সিলী আন্দোলন অনেক বাধা দিয়াছে। জাতীয় আন্দোলন ভাবে যাহারা এই ব্যাপারটাকে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি জানি না—তবে জাতীয় ভাবে ইহা না চালাইয়া ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ভাবে এ আন্দোলন চালাইলে কাহারও বলিবার কিছু থাকিত না।

• • • •

দেশকর্ম্মী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এতদিন মহাত্মার চরকা ও খদ্দর বাংলার প্রচার করিবার ভার লইয়া কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন। আজ প্রকাশ্য ভাবে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালও কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন। কংগ্রেস ইঁহাদের মত কর্ম্মী পাইয়া লাভবান। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিতেছেন মহাত্মাজীর প্রেম দেশাত্মবোধ রূপে অবতীর্ণ হইয়া আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে নূতন পথে লইয়া চলিয়াছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমস্তই কেন্দ্র একটি মাত্র নীতিতে পর্য্যবসিত।...মিথ্যাচার, অনাচার হিংসাদ্বেষী সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়—ইহাই মহাত্মা ঘোষণা করিয়াছেন। বিদেশীর শাসন-শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষে নিরুপদ্রবে সকল অত্যাচারের অবসান করিবার অন্য পথ নাই। স্বরাজের পথ, মহাত্মার বাণী সফল করিবার পথ—কৌন্সিলে নহে; স্বরাজ্যের পথ পল্লীজীবনের সারল্যে। ভোগৈশ্বর্য্যের স্বপ্নমুগ্ধ বিকৃতরুচি দেশবাসীকে ধার করা আধুনিক সভ্যতার মেকী অলঙ্কার ত্যাগ করিতে হইবে। চরকা—খাদী ইহার প্রতীক।

• • • •

লালা লাজপত রায়, মৌলানা হসরত মোহানী প্রভৃতি দেশকে ভালবাসিবার দায়ে কারারুদ্ধ। লালাজী মরণাপন্ন সাংঘাতিক পীড়িত। এইরূপ মরণাপন্ন অবস্থায় ইঁহাদের কারাগারে না রাখিয়া মুক্তি দিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন চলিয়াছে। অন্তত, মরণাপন্ন অবস্থায় দেশের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন, দেশ বিদেশ জানিত জ্ঞানী ও গুণী লোককে মুক্ত করিলে সরকারের অখ্যাতি বা দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইবে না।

• • •

দেশের চারিদিকে বিক্ষোভ চলিতেছে। নাগপুরে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম, আকালী সংগ্রাম, স্বরাজ পতাকা সংগ্রাম চলিয়াছে। জাতীয় পতাকা প্রত্যেক জাতিরই থাকা

বাঞ্ছনীয়। ভারতে জাতি নাই—জাতীয় ভাব নাই, তাই ইহার জাতীয় পতাকার গৌরব নাই। জাতীয় পতাকার গৌরব রক্ষার জন্ত যুগে যুগে দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানব আত্মদান করিয়াছে। ভারত জাতীয় ভাবে প্রবুদ্ধ হইলে জাতীয় পতাকার গৌরব নিশানও উড়াইতে পারিবে সন্দেহ নাই। তাই ভারতকে জাতীয় ভাব প্রসারের জন্ত নিজেদের মধ্যে মিলন বন্ধনকে সুদৃঢ় করিতে হইবে। জাতীয় গৌরবের কাছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও দল স্বাতন্ত্র্যকে মাথা নত করিতে হইবে। মিথ্যাচার অন্যায় এগুলি রোধ করিতে হইবে। দেশের ভিতরের মিলন বন্ধন দৃঢ় হইলে জাতীয়তার বোধ জন্মিলে বাহিরের বাধা বিঘ্ন আপনিই কাটিয়া যাইবে।

• • • •

এ-দেশী ঐতিহাসিক এবং বিদেশী ঐতিহাসিক এ-দেশের স্কুল পাঠ্য ইতিহাসগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান। ঐতিহাসিকের বিচারে যাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন এ-দেশী ইতিহাসে তাহা এখনও নির্বিচারে চলিতেছে। অন্ধকূপ হত্যা ব্যাপার ঐতিহাসিক বিচারে অসত্য—অসত্য যাহা ইতিহাসে তাহা অচল। কিন্তু এমন অনেক জিনিসও যে কি করিয়া এ-দেশী ইতিহাসে কি কারণে সচল হয় তাহা আমরা বুঝি না। দেশীয় শিক্ষাব্রতী ও ভাইসচ্যান্সেলর মহোদয় তাহা আমাদের বুঝাইয়া দিবেন কি!

• • • •

একদল লোক অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙিবার যে চেষ্টা করিতেছে ইহাকে পাগলের পাগলামো বলিয়া উপেক্ষা করা যাইতে পারে। কারণ এমন ভাবে কেহ স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙিতে পারে না। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে যদি অন্ধকূপের ঘটনাটাই মোটে সত্য না হয় তবে এমন একটা অগৌরবের, লজ্জার জিনিস দেশের বক্ষের উপর কেন চাপিয়া থাকিবে—তাহার সঙ্গত কি হেতু থাকিতে পারে দেশবাসী তাহা জানিতে চাহিতে পারে।

• • • •

অতি শীঘ্রই দেশে কৌন্সিল প্রবেশের হুজুগ আরম্ভ হইবে। অনেক রকম লোক অনেক উদ্দেশ্য লইয়া কৌন্সিল প্রবেশার্থী হইবে। এইবার আবার ভোটারদের কাছে প্রবেশার্থীদের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। নিজ যোগ্যতায় ও প্রভাবে কেহ দাঁড়াইতে পারেন কিন্তু সেরূপ লোক বেশী নাই। যোগাড়-যন্ত্র, সাময়িক হুজুং এগুলির খেলাও এ সময়ে বিশেষ ভাবে চলিবে। কৌন্সিল প্রবেশকামীদের জন্ত পরাজয় লইয়া অনেক দিন ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় কাটাইতে হইবে। অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হইবে। প্রবেশ যাঁহারা করিবেন তাঁহারা ভাগ্যবান মনে করিবেন। কিন্তু এত যোগাড়-যন্ত্র, অর্থব্যয় করিয়া এমন উৎকণ্ঠা সহিয়া সকলেই কি দেশের মঙ্গলকামী হইয়া কৌন্সিলে ঢুকিয়া ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইবেন? সে আত্মত্যাগের আদর্শ লইয়া এ যুগের কয় মানুষই চলে। পরের ভোট পাইয়া আত্মকার্য্য উদ্ধার—ইহাই বোধ হয় অনেকের আদর্শ। তাই এ বিষয়ে ভোটারদেরও তীব্র দৃষ্টি রাখা উচিত যেন দশের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া কেহ আপন কার্য্যই শুধু সাধন না করিতে পারে।

বঙ্কিম-বন্দনা

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

সায়াহ্ন গগন-লোকে পূর্ণচন্দ্র যথা
দীপ্ত শুভ্র জ্যোৎস্নাধারা করি উদ্ভাসিত,
উন্মোচিয়া ধরণীর আঁধার গুণ্ঠন
প্রফুল্ল রজত-কান্তি শান্ত প্রকৃতির
প্রকাশ করিয়া যেন নিখিল ভুবনে,
তেমতি হে পূর্ণি চন্দ্র বঙ্কিম রেখায়
বঙ্গের সাহিত্যাকাশে হ'য়ে সমুদিত,
শতাব্দীর ঘনীভূত তীব্র অন্ধকার
বিদূরিয়া দিয়াছিলে প্রতিভা-কিরণে!
রহস্তে রূপকে রসে কাহিনী কথায়
তোমার প্রথম রশ্মি যে ভাষারে দেব,
অর্দ্ধ শতাব্দীর আসে করেছিলে আলো,
নিস্প্রভ-বিমুগ্ধ বিশ্ব আজি তার রূপে।
হে আদি সাহিত্য-গুরু, গৌড়ের গৌরব!
বিনম্র কোটি কর পরশি চরণে
চিরদিন প্রণমিবে অমর স্মরণে।

বঙ্কিমচন্দ্র*

[শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী এম-এ, বার-এ্যাট-ল]

আমরা কান পাতিলে শুনিতে পাই, আমাদের রাজনৈতিক জাগরণের কারণ বহুবিধ নেতা, নাম করিয়া সময়ের অপব্যবহার ও শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে চাহি না, তবে ভাবিয়া দেখিলে ঠিক বুঝিতে পারি, রাজনৈতিক নেতা যদি কেহ আমাদের থাকেন, তবে সে অনামধন্য, অপরাজেয় বঙ্কিম। তিনি বক্তৃতার বজ্রমন্ত্র মাতাইয়া আমাদের বলেন নাই, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। তাঁহার বাণী ইষ্ট মন্ত্রের মত নিঃশব্দে আমাদের মনের সমস্ত জড় বৃত্তিকে চেতন, জাগরূক, ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। এই বাণী তাঁহার মনঃকল্পিত উপন্যাস ও কমলাকান্তের দপ্তর প্রভৃতির মধ্য দিয়া, আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া, আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। তিনি বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালীজাতিকে যে কতদূর ভালবাসিতেন, তাহা তাঁহার দান হইতে বুঝিতে পারি। শুধু যে এ ভালবাসা নিজে দিয়াই, তিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, এ জাতীয় প্রীতি ও স্বদেশ প্রেম আমাদের প্রত্যেকের মনে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াসী ছিলেন; তাঁহার সে প্রয়াস ব্যর্থ হয় নাই। আজ এই জাগরণ, স্বদেশ সেবার প্রেরণা, জাতীয় স্বাধীনতা-সাধনার প্রচেষ্টা, সবই তাঁহার দান। আজ বঙ্গদেশ যে জাতীয় মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিতেছে, সমগ্র ভারতবর্ষ একদিন তাহার উদ্যাপন করিবে। বন্দেমাতরং মন্ত্রই যে দেশের মুক্তি মন্ত্র সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যে স্বাধীনতার জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহা একান্ত সত্য বলিয়াই, তাহা শুধু বঙ্গ নয়, ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্বে যেখানেই মুক্তিকামী, সাধনা-নিরত সেইখানেই প্রেরণা রূপে প্রকাশ পাইবে। সে অনুপমে দীক্ষিত বিশ্ববাসী স্বাধীনতার সাধনাকে সফল করিবেই।

আজ নব জাগরণের দিনে, মাতৃপূজার সন্ধিক্ষণে, যে সাধক, পূজার কোন উপচার সংগ্রহ করিয়াছ? সেই রাঙ্গুল কমল-রাঙ্গা চরণে কি উৎসর্গ করিবে?

তোমার সকল উদ্যম, বাণিজ্য, কৃষি, ধর্ম, বিদ্যা সবই সেই পূজার উপাদান হউক। মুক্তি পথে অন্য সাধনা নাই, নানাঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়!

কবে যথার্থই আমাদের জাতীয় জীবন গঠিত হইবে? কবে আমরা মুক্তি লাভ করিব? যতদিন পরাধীনতার শৃঙ্খল আমাদের জীবনকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছে, ততদিন মুক্তি দুরাশা। যে স্বাধীনতা-হীনতায় জীবন দুর্বহ, অন্তরাত্মা জীবন্মৃত, যতদিন সে শৃঙ্খল না উন্মোচিত হইতেছে, ততদিন জাতীয় জীবন, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য গঠিত হওয়া, একটা অসম্ভব ব্যাপার!

তিমির রাত্রির অবসানে, প্রতি প্রভাতেই যখন উৎসুক নেত্র উন্মীলিত করি, তখনই সম্মুখের সমস্ত আলোক ম্লান হইয়া যায়, অনুভব করিয়া কাতর হই যে, আমি আজিও পরাধীন, দাস্যের শৃঙ্খল আমার দেহ মনকে গভীরতর ভাবে পীড়িত করিতেছে। প্রতি পদক্ষেপে এই বিদেশী বস্তুতার অসংখ্য নিদর্শন চারিদিকে নেত্রগোচর হয়। এ জীবন জীবনী-শক্তি বিহীন, কেবল যখন বঙ্কিমের তূর্য্য নিনাদ অন্তরে বাহিরে ধ্বনিত হইয়া উঠে, তখনই অনুভব করি, আমি জীবিত। জীবনের আদর্শ আমার সম্মুখে উজ্জ্বল হয়, কোন্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, কোন সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য আমার দেহ মনের প্রতি পরমাণু অনুপ্রাণিত, সে কথা স্মরণ করিয়া পুলকিত হই। বঙ্কিমের ভাষায় দেশমাতৃকার বন্দনা করি,

"বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।"

বন্দেমাতরং মন্ত্র শুধু সম্মোহন মন্ত্রে বশ করে না, তাহা

---

* বঙ্গিম সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত।

শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্যের ন্যায় সমস্ত চিত্ত বৃত্তিকে উদ্বোধিত করে।

এই যে সুফলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি, এই সূর্য্যচন্দ্রালোক, এই নক্ষত্রদীপিত নীলাম্বর, এই পত্র-পুষ্প-তরুবল্লী-ভূষিত বনরাজি, এই শৈল বন্ধুর, সাগর-মেখলা, নদী-মুখরিত বিগত-কাকলি-নিনাদিত নন্দন তুল্য দেশ—তবুও আনন্দ নাই কেন? বুদ্ধের মধ্যে শূন্যতা হাহাকার করিয়া উঠে। জড়াইয়া ধরিয়াও এ জনকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিতে পারি না কেন? পরদেশীর প্রাধান্য সকল মিলন ব্যর্থ করিয়া দেয়, ব্যথিত হৃদয়ে কেবলি ধ্বনিত হয়, এতো তোমার নয়, তোমার নয়! যখন এ দেশ সম্পূর্ণ আমাদেরই হইবে, তখনই ইহার সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিতে সমর্থ হইব। আমার বালক পুত্র শ্রীমান্ কালী প্রসাদের ভাষায়, "মাঠ দেখ্‌লেই দৌড়তে ইচ্ছে করে, মাঠ যেখানে ঐ আকাশে মিশেছে, সেই পর্য্যন্ত! জল দেখ্‌লেই ঝাঁপ দিতে মন চায়,"—সে এখনও স্বাধীনতার অভাবটা বোঝে না, তাই তার আশা, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, উচ্ছ্বাসের ভাষায় প্রকাশ করে, আর শৃঙ্খল-পীড়িত আমরা পদে পদে ব্যাহত, আমাদের মনের বাসনা দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় "উথায় হৃদি লীয়তে"। আমরা জানি দেশ যতই সুন্দর, আমার মিলনাকাঙ্ক্ষা যতই প্রবল হৌক না কেন, মিলনের অন্তরায় বন্ধন ও সীমা, কায়মনে সে দিবা স্ফূর্ত্তি কখনই হয় না, যাহাতে স্বর্গ-সুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি!

আমাদের এ জন্মবাসা তখনই সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করিবে, যখন আমরা ন্যায় ও ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে শিখিব। যখন আমরা আমাদের স্বাধীন দেহ মন দিয়া তোমাকে বরণ করিতে পারিব, তখনই আমাদের এ পূজা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিবে।

পিতামাতা নামকরণ করিয়াছেন,"কুমুদনাথ," সাহিত্য-কাশে এই আমার প্রথম উদয়। নিজেকে প্রতিপক্ষচন্দ্রের সহিত তুলনা করিতে চাহি না, কেননা তাহা হইলে, আজিকার দর্শকবর্গের সকলেরি রাজ-সৌভাগ্য লাভ, সুনিশ্চিত; এমন বহুরাজক দেশ অরাজকতারই প্রতিরূপ, সে বড় সমূহ ব্যাপার! যাহাই হৌক; আমার এই ক্ষণিক ও ক্ষণপ্রভ আবির্ভাবকে, দ্বিতীয়ার চন্দ্রের সহিত তুলনা করিলে ক্ষতি নাই—তবে ক্রমে ষোড়শ কলায় পূর্ণতা লাভ করিয়া, আবার কোন দিন আপনাদের হৃদয় মন হরণ করিতে পারিব কিনা, এই সন্দেহ-কাতর হৃদয়ে আজ আমি আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলন

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

স্থানীয় নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও বিগত ১লা আষাঢ় তারিখে বঙ্কিম ভবনে বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। উদ্যোক্তাদের অমায়িক আচরণ ও বিনীত ব্যবহারে কলিকাতা ও মফঃস্বলের বঙ্কিম তীর্থ-যাত্রীরাও পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। আমরা রবিবার কাঁটাল-পাড়া যাই। সেদিন সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনশাখার সভাপতি হয়েছিলেন যথাক্রমে,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এম-এ ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। সম্মিলনে কাঁটালপাড়া ও ভাটপাড়ার বহু পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা থেকে বহু সাহিত্যিক এ সম্মিলনে যোগ দিয়াছিলেন।

সম্মিলনটি এতই আকস্মিক হয়েছে যে সভাপতিরা অভিভাষণ-রচনারও সময় পান নাই। তাঁরা তিন জনেই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেছিলেন। চন্দ মহাশয়ের ইতিহাসের বক্তৃতার ভাষা যেন সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। সভাস্থলে দুটি গান,—একটি আবাহনী ও অপরটী বিসর্জ্জন সঙ্গীত, হারমোনিয়ম যোগে গীত হয়েছিল।

উদ্যোক্তারা নানা বিষয়ের প্রবন্ধ ও কবিতা পেয়েছিলেন। বহু প্রবন্ধ ও কবিতা সভাস্থলে পঠিত হয়েছিল। সময়ের স্বল্পতা নিবন্ধন অনেক প্রবন্ধ পঠিত ব'লে গৃহীত হয়েছিল। কবিতার ভিতর কবি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'বঙ্কিম তর্পণ' মর্ম্মস্পর্শী হয়েছিল। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী মহাশয়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক সভাস্থলে পঠিত মুদ্রিত-প্রবন্ধটি ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের 'বঙ্কিম বন্দনা' আমরা এই সংখ্যার বাসন্তীতে অন্যত্র প্রকাশ করেছি।

বঙ্কিম-তর্পণ*

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

বাঙালীর ছেলে ! বাঙালীর মেয়ে ! যে থাকো যেখায়—
শোনো গো আজ !
ভেদের তন্ত্র তুলুক কণ্ঠ,—পরশো বন্ধু, পূজার সাজ !
কাঁটালপাড়ার প্রতি-ধূলিকণা যাঁহার চরণ-ছোঁয়াতে সোনা,
তর্পণে তাঁরি আহ্বান আসে, ভক্তিতে ভরো প্রাণের দোনা !
ভাষার সেবক ! ভাবের সাধক ! পূজার লগন তাকে
তোমায়—
আজি আষাঢ়ের সজল বাতাসে স্মৃতির বরষা চিত্ত ছায় !
ঋষি বঙ্কিম—হে মহারথ !
মন্ত্র-মুহূকে মুক্ত করেছ বঙ্গভাষার তীর্থপথ !

চির-পরাধীন, চির-পথ-লীন, চির-উদাসীন—ছিলাম যেহ,
মৃত-সাহিত্যে জীবন অপি তুমিই সেখালে—আমরা স্নেহ !
তুমিই প্রথম শিখালে, বুঝালে,—জননী মোদের জন্মভূমি,
যা-বন্দনার গায়ত্রী নব আনন্দ-ভরে রচিলে তুমি।
মুখে দিলে ভাষা, বুকে দিলে আশা, বলিলে—"বাঙালী,
নয়গো ছোট,
সারা-ভারতের প্রাণ-সরোবরে শতদল-সম ফুটিয়া ওঠ।"
গুরু বঙ্কিম—হে পুরোহিত !
তব-তপোবনে তরুণ প্রভাত শুনেছে তোমার সাধন-গীত !

আজো তব বাণী – মাতৃপূজারাণী, নিখিল ভারত ভরিয়া
আছে,
শত জাতি-ধারা এক হয়ে গেছে তোমার বৈজয়ন্তীর কাছে।
হে-'রবি'র আলো ভারত ছাড়ায়ে যায় দূর-শ্বেত-সাগর-তীরে,
বুক-চাপা-ব্যথা তুমি না দরালে, এত জল্-জল্ জ্বলিত কি রে ?
নয়ন তোমার দেখেছে অতীত, অনাগত আর বর্তমান,
কল্পনা যেন আলো-আঁধারিতে কান্না-হাসির বেঁধেছ বান !
কবি বঙ্কিম—কল্পতরু !
মর্ত্যেতে ঢেলে নন্দন-সুধা স্নিগ্ধ করেছ দগ্ধ মরু !

সঙ্গীতে তব বিশ্বপ্রেমের সাম্য-রাগিণী উচ্ছ্বসিত,
ওজস্বীতে তব চন্দ্রালোকের তন্দ্রা-তানও ঝঙ্কারিত।
কখনো হয়েছ কুলিশ-কঠিন, কখনো হয়েছ ফুল-কোমল,
কখনো জেলেছ ক্রোধের অনল, কখনো টেনেছ চোখের জল !
যুগ-বর্ষের নব-বন্যার ভরেছ হৃদয়ে প্রণয় শত,
চিত্রপটেতে সম্রাট-সাথে দুঃখীর ছবি এঁকেছ কত !
ভাবের রাজ্যে হে মহারাজ !
ভক্ত আমরা, শিষ্য আমরা,—তুলি নি তুলি-নি তোমাকে
আজ !

বীণাতে যে-সুর দিয়েছ শুনায়ে, সেই সুরে আজো আমরা
গাহি
তোমার পরশে যাদের জীবনে জেগেছে চেতনা হৃদয়-দাহী
অন্ধ আঁখিতে দৃষ্টি দিয়েছ,—সৃষ্টি টুটিয়া সাজা নব,
সমাজে এনেছ উদারতা তুমি—বিদ্রোহ, সেও সৃষ্টি তব !
হে মহামানব ! বাঙালী-প্রধান ! মরিয়া-অমর !
বিশাল-চেতা
দীক্ষায় তব, শিক্ষায় তব বাঙালী আজিকে ভারত-নেতা !
বিপুল-প্রতিভা হে অবতার !
বাংলা-মায়ের কণ্ঠে তুমি যে যত্নে-সাজানো রত্ন-হার !

* কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।

নৈষ্ঠিক উপায়ে

সেতার শিক্ষা

৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১৷৷০

সেতারের অতিরিক্ত গত ,, ৷৷০

প্রকাশক :—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

৩১।১এ সেন লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা

এবং গুরুদাস লাইব্রেরী ও

ডোয়ারকিন কোংর নিকট প্রাপ্তব্য।

গোলামখানার গোলামদের অঙ্গে কি পোষাক পরাইবে না পরাইবে ইহা ভাবিতে সরকারের মাথায় ঘাম পায়ে করিয়া পড়িতেছে। ক্যালকাটা গেজেটে দেখিলাম প্রকাণ্ড এক উপদেশ ও ছাপা হইয়াছে, তাহাতে লেখা আছে, ভারতীয় মন্ত্রীরা ইচ্ছা করিলে পায়জামা ব্যবহার করিতে পারেন। মন্ত্রীরা হয়ত প্যাণ্টালুন পরিয়া সেজেছি বিলাতি বাদর হইতেই চান, তবু যে সরকার এতখানি ঔদার্য্য দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ!

• • •

পরীক্ষার খাতিরেও সরকার যদি গোলামখানার গোলামদের ভারতীয় ধুতি চাদর পরিতে বলেন, তাহা হইলে যে কি বিপর্য্যয় ঘটিবে তাহা ভাবিতেও আমাদের হৃৎকম্প হয়! "ভারতীয়," কথাটি তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে সংযুক্ত হয়, ইহাতেই তাঁহারা যথেষ্ট নাস্তানুবাদ, আবার ভারতীয় পোষাক! এ তো অপমান! ধন্বন্তরীর অপমান! পায়জামা পরিতে বলিয়া সরকার কতকটা মানহানি করিয়াছেন, গোলাম এই যা, নতুবা এতদিনে দুই তিন নম্বর ডিফামেশন রুলিত!

• • • •

কলির কর্ণধার! যদি কেহ কলিকালের কর্ণ দেখিতে চাহেন, তবে বাঙ্গলা দেশের যাবতীয় মন্ত্রীবরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে বলি। কলির দানবীর তিনটি চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের জন্য পাঁচশত টাকা 'প্রত্যেকে' দান করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, তাঁহারা চাঁদাইদের অন্তর্গত বাখিল স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য আবার প্রত্যেকে একশত টাকা করিয়া দান করিয়াছেন! যাহারা ও সর্ব্বস্বান্ত হইতে চলিলেন, এবার কি ব্যাস-কাশীতে বাস করিবেন?

দেশের জন্য খাটিতে খাটিতে মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী যারা পড়িলেন দেখিতেছি। এই কিছুদিন আগে বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া দেশের কাজে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন, আবার তিনি দেশের দুঃখে বিগলিত হিয়ার বহুলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে বিদেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন। গিয়া লণ্ডনে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। দেশের কাজে প্রাণটা না যাইলেই মঙ্গল।

•

বিলাতে বড় বড় সাহেবদের ভয় হইয়াছে, ভারতবর্ষে ভারতীয়দের যেরূপ প্রাধান্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে বড় বড় পদে আর বড় বড় সাহেবেরা আসিতে রাজী হ'ন্ না। চিন্তার কথাই বটে।

• •

ভারতীয়দের প্রাধান্য বলিতে কি বুঝায়? সবল কর সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও বসিল; সিবিলসার্ভিস কমিশন ভারতীয় লোকগণের দারুণ আপত্তি সত্ত্বেও বসিয়াছে, তাহার খরচ-ও ভারতবাসীদের ঘাড়ে চড়িয়াছে তাহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও—ভারতবাসীর প্রাধান্য নয় আবার?

• • • •

বিলাতের বড় সাহেবদের এই নিদারুণ ভীতির কারণ বুঝিতে আমরা একান্ত অক্ষম। ভারতবর্ষে ১৩জন পুলিস অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া বিলাতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, বড় সাহেবদের ভীতি বিদূরিত করিতেই বোধকরি তেরো বাহাত্তর তিনশো তিরানব্বইখানা দরখাস্ত খাটি ইংরেজবাসীদের নিকট হইতে পড়িয়াছিল! তবু যদি বলেন ভয়ের কারণ আছে—তবে নিরুপায়!

দর্পচূর্ণ

[শ্রীসুধা দেবী]

নিজের ছয়ছাড়া জীবনের দিনগুলো যে আমার কেটেছিল কেমন করে আজ তা নিজেই লিখতে বসেছি। গরব করা যে আমাদের সাজে না এ কথাটা কি ছাই আগে জানতুম? তা যদি জানা থাকত তাহলে বোধ করি আজ আমায় এমন করে নিজের পরাজয়-কাহিনী লেখবার জন্যে বসতে হতো না। এখন তাই কেবলই ভাবি, হায়! কেন আমার তখন হয়েছিল অতি দর্প। আমার এ রূপে বুকে কেন তুমি এত দর্প দিয়েছিলে ওরে ওগো দেবতা আমার, যদি তুমি নিজেই একদিন তা চূর্ণ করে দেবে মনে করেছিলে। জয়ের চেয়ে পরাজয়েই যে এত সুখ তা কি ছাই জানতুম আগে!

আমার পরাজয় হোয়েছে আজ। দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে যে যুদ্ধে আমি নেমে ছিলুম, দর্প করে আজ সে যুদ্ধে আমি পরাজয় স্বীকার করেছি, নিজেই। তাই আজ আমার এত আনন্দ বুক সাগর-হিল্লোলের মত তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। তাই আজ আমার পরাজয় কাহিনী লিখতে বসেছি। জয়ী হোলে বোধ করি লিখতে পারতুম না। তাতে যে নিজেরই কলঙ্ক বেড়ে যাবে, তাত আগে জানা ছিল না আমার, তাই জয়ের আশাই করেছিলুম—

রূপের গর্ব্ব ছিল আমার ছেলেবেলা থেকেই, কিন্তু হায় সে গর্ব্ব করবার এখন কিছু নেই, আয়নাতে যখন নিজের এই কুৎসিৎ জরাগ্রস্ত দেহখানার পানে তাকাই তখন নিজেই শিউরে উঠি ঘৃণাতে, লজ্জায় নিজেই মরে যাই। ওরে হতভাগী, যার জন্য তোর এত দর্প ছিল, এত গৌরব ছিল এখন তা তোর কোথায় গেল বল! নিজের অহঙ্কারে নিজেই মস্ত জোরে অসংযমে দলত হারালি। যার আদরে তোর আদর তা থেকে নিজেই বঞ্চিত করে গর্ব্ব করতে গিয়েছিলি কিন্তু এখন তোর কোথায় রইল সেই দর্প? বিজন বনে ফুটে ঝরে যাওয়া ফুলের মত তোর রূপও ঝরে গেল।

যাক, দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে আমি যা আমার অজ্ঞাতে হারিয়ে এসেছি তার জন্য আজ আমার দুঃখ করবার কিছু নেই।—তার কারণ আজ আমি তার সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় পেয়ে গিয়েছি; লাভ বই আমার লোকসান হয়নি। কিন্তু তবুও আমার প্রাণে দুঃখ রাখবার স্থান নেই। দুঃখের মাঝে এ পুলক শিহরণও আমার ভাল। হাজার হোক্, আমি যে নারী।

রেণুকা নামটা ছিল আমার বাবার দেওয়া! ছেলে-বেলাই মাকে হারিয়েছিলুম কিন্তু বাবাই আমার মায়ের অভাবটা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। আমি যে মা-মরা মেয়ে একথা অনেক দিন বুঝতে পারিনি। আমার মা থাকলে হয়তো আমার এ কাহিনী লিখতেও হোত না। এ দর্প আমার তিনি ভেঙ্গে দিতেন এ ঘটবার আগেই। সকলেই আমাদের সংসারে ছিল—শুধু ছিল না মা। বাবা ছিলেন সরকারী উকিল। অর্থেরও কিছু অভাব নেই। বাবার আদর যত্নে আমি একরকম বাড়ীতে সর্ব্বময়ী হয়ে উঠতে লাগলুম। বাড়ীতে কারও কিছু বলবার অধিকার নেই আমাকে। আমি যা করবো তা হাজার অন্যায় হোক্ আর ন্যায় হোক্ সকলকে মেনে নেতে হবে। তার কারণ আমি বাড়ীতে সকলের ছোট আর মা-মরা। অবশ্য এটা এখন বুঝেছি। একটা কথা আমার মনে পড়লে কান্না হাসি পায়। কালো কুৎসিৎ মেয়েদের সঙ্গে আমি ভুলেও কখনও বেড়াই নি। তার কারণ তারা যে আমার এই গোলাপী রং ওরা দেহখানার পানে তাদের কালো রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, তা আমি জীবনে সহ্য করতে পারবো না। তখন কি জানতুম এ রূপ আমার চিরদিনের নয়? নীলাকাশে ইন্দ্রধনুর মত

খানিক থেকেই আবার মিলিয়ে যাবে। এ শুধু অধিকের। কে জানতো প্রদীপের তেল থাকা সত্ত্বেও নিভে যায় তার আলো, যদি তাকে উস্‌কে দেবার জন্য কোন শলাকা না থাকে; তেল থাকা সত্ত্বেও সে নিভে যেয়ে থাকে। শুধু, একটির অভাবে তার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়।

এমনি করে আমি আমার বাবার স্নেহের মধ্যে দিয়ে উঠেছিলুম বেড়ে। বাবা আমার ছিলেন শ্রেষ্ঠ কুলিনের ছেলে। ঠাকুর দেবতায় ছিল তার ভক্তি অচলা। বাড়ীতে রাম সীতার যুগলমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। এটা নাকি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি। বাবার ছিল রাম-সীতা অন্ত প্রাণ; তাঁর দেখাদেখি আমারও বড় ভাল লাগতো তাই রোজই সকাল সাঁঝে ঠাকুরের পূজার আয়োজন করা ছিল আমার একটা প্রধান কাজ। যখন আমি মাঝে মাঝে পলকহারা দৃষ্টি দিয়ে সেই যুগলমূর্ত্তির দিকে চেয়ে থাকতুম, তখন আমার সারা দেহে একটা তড়িৎ খেলে যেত, মনে মনে ভাবতুম আমারও যদি সীতার মত স্বামী সৌভাগ্য হয়, তাহলে কি হয়! ধর্ম্মের জন্য স্বামীর সাথে সাথে থাকবো সকল দুঃখ মাথায় পেতে নিয়ে হাসিমুখে—আর স্বামী আমার রামের মত আমার প্রেমে উন্মাদ হয়ে যাবেন। এমনি যারা কত শত লক্ষ্য-হীন ভাবনাই আমার মনের পরতে পরতে জেগে উঠতো। তারপর আপনা হতেই কি জানি কখন নত হোয়ে পড়তো আমার মাথা বর্ষায় ভরে পড়া শেফালির মত ঐ যুগল মূর্ত্তির পায়ের তলায়। আমার হিয়ার পরতে পরতে উঠতো ফুটে অজস্র কুসুম।

এমনি আনন্দে আহ্লাদে আমার দিন যাচ্ছিল কেটে। তারপর হঠাৎ একদিন ফাগুন বনে বসন্তের আগুন লেগে গেল। সে আগুন ছুটে এলো আমার মনে। এ বাড়ীতে হঠাৎ প্রজাপতির দূতের ঘন ঘন আসা যাওয়া সুরু হোলো। আমি জেনেছিলুম না আমি কোন রাজপুত্র হঠাৎ এসে আমাকে পক্ষীরাজ ঘোড়ার উপর চড়িয়ে নিয়ে যাবে বলে দাঁড়িয়েই আছে, তেপান্তরের মাঠে। কিন্তু একি সব উল্টে গেল! বাবা নিজে গিয়ে ছেলে দেখে এলেন। ছেলেটী এম্-এ পাশ। বাপ মা উভয়েই বর্ত্তমান। অবশ্য সে খুব ভাল তা নয় তবে মধ্যবিত্ত। দেখে কিছু অভিজ্ঞতা আছে। ছেলে দেখে এসে বাবার খুব পছন্দ। তারপর একদিন ভোরের পূরবী আমাদের আশেপাশে বেজে উঠলো। আমার হৃদয় বনে যে ফুল এতদিন ফুটী ফুটী করেও ফোটেনি, আজ তা ফুটে গেল। শুভদৃষ্টির সময় আমি তাঁকে দেখবার লোভ সামলাতে পারিনি। বেহায়ার মত দু'চোখ দিয়ে দেখে নিতে যাব বলে যেই চোখ খোলা, অমনি তাঁর সাথে আমার দৃষ্টির বিনিময় হ'ল। কি সুন্দর তাঁর মুখের জ্যোতি। কি সুন্দর চাউনি। মনে মনে ভাবলুম বুঝি বা এতদিনে আমার সাধনা সিদ্ধি হোলো। কাজ কি আমার অর্থে যার এমন স্বামী শঙ্করাচার্য্যের মত তার অভাব কিসের। মাথা আমার নত হয়ে পড়লো আমার দেবতার পায়ে নীরবে।

শ্বশুর বাড়ী এসে দেখি, বাস্তবিক শ্বশুর বাড়ী আমার গর্ব্বের জিনিষ। শ্বশুর শাশুড়ীর আমি যেন অন্ধের যষ্টি হয়ে পড়লুম। এত আদর এত যত্ন বোধ হয় আমি আর কারো কাছে খেকেও পাইনি। একদিন দুপুরে একা ঘরের মধ্যে বসে বসে বাড়ীর কথা ভাবছিলুম এমন সময় আমার স্বামী হাসতে হাসতে পাশে এসে বসলেন। তারপর ধীরে ধীরে আমার মাথাটী তাঁর বুকের মধ্যে চেপে ধরে তাঁর রক্তরাঙ্গা অধর আমার পিপাসিত অধরে রেখে দিয়ে বল্লেন, সত্যি রেণু আমার সঙ্গে তোমার যানায় না। তুমি আমায় চাইতেও সুন্দর। নিজেকে তাড়াতাড়ি মুক্ত করে নিতেই তিনি বল্লেন রেণু আমি কাল, না? ...সত্যি দেখ আয়নাতে কত কাল...বলেই তিনি বড় আয়নাটা আমার সামনে ধরলেন মুখে কে যেন সিঁদুর ঢেলে দিয়ে গেল। তিনি আবার আমায় বুকের মধ্যে চেপে ধরে...। যাক্ এবার কিন্তু নিজেকে আমার মুক্ত করতে ইচ্ছা ছিল না। আর ইচ্ছা থাকলেও বোধ করি শক্তি ছিল না। ভয়ত্ত শিশু যেমন তার মায়ের বুকে পড়ে থাকে আবেশে তার সমস্ত দৌরাত্ম্য ভুলে আমিও তেমনি পড়ে রইলুম।

তারপর একদিন মৌন ম্লান সাঁঝে তাঁকে ছেড়ে এলুম, বাপের বাড়ী ফিরে আসবার সময় তিনি কত দিব্যি দিয়ে দিলেন শুধু তাঁকে মনে করে রোজ চিঠি দিতে

একখানি করে। আমিও তখন চিঠি দেবার ছলে তাঁকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে আসি। আসার কালে তিনি বলেছিলেন আমার হাত দুটি নিবিড়ভাবে—ধরে আবার কবে আসবে রেণু?—আমি বলে দিলুম ধরে আনবে। তিনি আমার অধরে বিদায় চিহ্ন এঁকে দিলেন। কে জানতো এই যাত্রা আমার অনন্ত যাত্রা হয়ে যাবে। কে জানতো এই আমার আবাহনেই বিসর্জন। কে জানতো আমার কমল না ফুটতেই অকালে মুকুলে ঝরে যাবে।

ওরে হতভাগী! এ শুধু তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তা নইলে এমন সব হবে কেন?

দেখতে দেখতে চার মাস গেল কেটে। এর মধ্যে কত চিঠি যে তাঁর পেয়েছিলুম তা বলা যায় না, রোজই সন্ধ্যার বসন্তের হিল্লোলের মত তাঁর একখানি করে চিঠি আমার বিরহক্লান্ত তাপিত হিয়া শীতল করাবার জন্য আমার শুভ্র দুয়ারে ঘা দিয়ে যেতো। আমাদের এরকম ব্যাপার দেখে আমার বন্ধুরা আমাকে ব্যঙ্গ করে তুলতো। তাতে আমার বুক আনন্দে অধীর হোয়ে উঠতো। তাই আজ এই রোগ শয্যায় শুয়ে ভাবি, কি সুন্দর ছিল সে অতীত দিনগুলো। তখন কি ভেবেছিলুম যে এত সুখের দিন আমার উবে যাবে কর্পূরের মত। মধ্যে মধ্যে যখন তিনি আসতেন তখন আনন্দে আমার সারা দেহ শিউরে উঠতো। বুকের মাঝে মহা সমুদ্রের তাণ্ডব নাচন সুরু হোতো।

এমনি ধারা করে যাচ্ছিল আমার দিন। তারপর হঠাৎ একদিন আমার সুখের পথে একটা ধূমকেতু দেখা দিল। আমার সমস্ত আশা আনন্দ নিরানন্দময় করে দিয়ে গেল। সে দিন সন্ধ্যা বেলা দাদা এসে জ্যাঠামশাইকে বল্লেন, শুনেছেন আমাদের সুধীর ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছে। জ্যাঠামশাই চীৎকার করে বলে উঠলেন কি? হিন্দুত্ব ত্যাগ। দাদা বল্লেন—শুধু কি তাই। শীঘ্রই সে ঐ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভারতের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াবে।

যাদুনের ছেলে হ'য়ে কি না বিধর্ম্মী হয়ে গেল শেষে। তখন সবে মাত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বাঙ্গালা দেশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মকে বধ করতে। যারা পাশ্চাত্য শিক্ষায়, মাথা তুলে নিজেদের খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষা নিতে যাত, তারাই কেউ কেউ এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিল। দাদার কথা শুনে তাঁর ওপোর আমার মন ঘৃণায় ভরে গেল। ছি ছি একি তাঁর ব্যবহার যাঁর ব্যবহার অমন সুন্দর শান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি যাঁর, নয়নে যাঁর ভাস্বর জ্যোতি সদা জ্বলছে—যাঁর অধরে শিশুর সুন্দর হাসি, যাঁর অধরে কপটতার লেশ নেই, তাঁর এ কি কাজ। যাঁর শরীরের প্রতি শিরায় শিরায় আর্য্যরক্ত টগ্‌বগ করে পূর্ব্ব পুরুষের রক্ত বয়ে আসছে আজ তাঁর এ কি হল! ফুলের যে এত কীট থাকে তা তো জানা ছিল না আমার। চোখ জলে ভরে উঠলো। বাবা যখন এ কথা শুনলেন তিনি মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। তিনি হঠাৎ কেঁদে বল্লেন, আমি বড় আশা ক'রে রেণুকে আমার হৃদয়ে দান করেছিলুম। কিন্তু কে জানতো এমন হবে? না জানি পূর্ব্ব জন্মে ও কত পাপ করেছিল, তাই আজ ওর সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো। তাঁর কথার অর্থ আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। দু দিন পরে স্বামী আমার চিঠি দিলেন, যে শীঘ্রই তিনি এসে আমায় নিয়ে যাবেন। আরও লিখেছেন যে আজ তিনি সমাজচ্যুত। তাঁর মা বাপও আজ সমাজের বাইরে। তার কারণ তাঁরা তাঁকে ফেলতে পারেন নি। সমাজের চোখ রাঙানিকে তাঁরা ভয় করেন নি। ছেলেকে কে কবে ত্যাগ করেছে? বাবা যখন এই চিঠির কথা শুনলেন, তিনি গম্ভীর হয়ে বল্লেন—যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই হোলো! তার পরে আমায় বল্লেন—রেণুকা আজই তুমি সুধীরকে লিখে দাও, যে রমনী বাঁড়ুয্যের মেয়ে কখনো বিধর্ম্মীর জল স্পর্শ করবে না, আজ থেকে তার সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। বাবার কথা শুনে আমার প্রাণ চম্‌কে উঠলো, হায় এ কি কঠোর আদেশ। মুখে আমার কোন কথা এলো না। বাবা বল্লেন রেণু আজ থেকে মা তোকে শক্ত হতে হবে। পারবি ত? কি জানি হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করে বসলুম যে আর জীবনে কখনও তাঁর দ্বারে যাবো না। বাবা আমার মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন—সে ত আমি জানি মা। তুই তো আমারই মেয়ে।"

"আজ তাই ভাবি, ওরে কালামুখী, কোন সাহসের

ওরে এত বড় স্পর্দ্ধার কথা বলতে সাহস করেছিলি ? যে সতী স্বামী নিন্দায় দেহত্যাগ করেছিল, যে সীতা স্বামীর জন্য বনে বনে আজীবন কষ্ট সহ্য করেছিল, তুই না তাদেরই অংশ ? আজ তুই নারী হয়ে এ কি ভীষণ কাজ করলি। তাই ভাবি আজ তখন কেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত করে চূর্ণ করে দাওনি আমায় প্রভু ?

হঠাৎ একদিন তিনি আমায় নিতে এলেন। বাড়ীর সকলেই দূর থেকে তাঁর গায়ে বিষের বাণ মারতে লাগলো ছুঁড়ে। বাবা খোলা খুলি তাঁকে বলে দিলেন। যাবার সময় তিনি আমাকে বল্লেন—রেণু সত্যি তুমি আমাকে চাও না। আমিও তখন উপেক্ষার হাসি হেসে বলেছিলুম – হাঁ। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। বেশ তাই হোক্—বলে তিনি একটু হেসে উঠলেন, তারপর বল্লেন—কিন্তু এটাও তুমি জেনো যে আমি তোমায় তা বলে ত্যাগ করতে পারি না। আমার দুয়ার তোমার জন্য সদাই উন্মুক্ত থাকবে ; যখন ইচ্ছা তখনই যেতে পার। রেণু, তুমি যে আমায় এমন তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আচ্ছা রেণু তুমি কি পরকাল বলে জিনিষটাকে মানো ? আর যদি মানো তা হলে জেনো বেশ করে আমাদের এ বাঁধন শুধু ইহকালের নয়, এটা পরকালেও থাকে। একদিনের পরিচয়ের মিলন এ নয়। এ যুগ-যুগান্ত ধরে চলে আসছে। তাঁর কথা শুনে তখন আমি বলেছিলুম যে হিন্দুর শাস্ত্র মানে না, তার আবার পরকাল কি ?

তিনি ম্লান মুখে চলে গিয়েছিলেন, বোধ করি আমার এই দর্প দেখে। থাক্ সে দিন নিজের ভবিষ্যতটাকে এমনি করে অন্ধকারের অতল আঁধারে তলিয়ে দিয়ে একটু বেশী রকমের জয় উল্লাস অনুভব করেছিলুম আমার অন্তরে। ওরে ও হতভাগী সে দিনকার সে দীনেশ তোর প্রাণের না, সেটা লোক দেখানি। কোথায় গেল তোর সেই স্বামীপ্রেম। বিরহ ? সে সব কি ভুলে গেলি। শুধু কি মুখের ওপর সাদা কাগজে কালির আঁক কেটে যাওয়া—এই বইত নয়।

* * * *

তারপর অনেকদিন গেল চলে। দীর্ঘ দশ বৎসর। কত গ্রীষ্ম, কত বর্ষা, কত বসন্ত গেল ঘরে আমার মনের মনের পাতায়, তার ঠিক নেই। কত যে পরিবর্ত্তন হোয়েছে তারও ঠিক নেই। বাবা মারা গিয়েছেন। জ্যাঠামশায়েরও সেই গতি। দাদার সংসারের কর্ত্রী এখন দাদার শ্বশুরের মেয়ে অর্থাৎ কি না আমার বৌদি। সবারই পরিবর্ত্তন হোয়েছে, হয়নি কেবল আমীর আর আমার শ্বশুর কুলের। শ্বশুর আমায় অনেকদিন অনেক চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু কিছু হয় নি। দিন আমার বেশ যাচ্ছিল, দাদার ভাত আর বৌদির নথ নাড়া।

* * * *

হঠাৎ সহরে প্লেগ দেখা দিল। পাড়ার আশে পাশে কত শত লোক মারা পড়তে লাগলো। সরকার থেকে খুব কড়া নিয়ম বলো যে রোগীকে আর সহরে রাখা হবে না। সকল রোগীকে সহরের বাইরে নিয়ে যেতে লাগলো ; জোর করে বিশেষ করে যারা গরীব—যাদের অর্থ নেই। কি ভীষণ কষ্ট তাদের। শুনে মানুষের প্রাণ শিউরে উঠতো। সকলেই ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছে মরতে আর কার ইচ্ছে হয় বল। এমন সুন্দর পৃথিবী থেকে কেউ কি যেতে চায় সহজে, তাই মৃত্যু তার ভীষণ সংহার-কারী মূর্ত্তি নিয়ে মানুষের সাথে যুদ্ধে নেমে পড়ে।

* * * *

একদিন রাতে আমার গাল গলা ফুলে জ্বর হোলো। প্রাণ ভয়ে আমার শিউরে উঠ্‌লো। এ যে প্লেগ তাতে আর সন্দেহ নেই। দেখতে দেখতে সারা অঙ্গে প্লেগের লক্ষণ দেখা দিল। ওঃ—সে যে কি অসহ্য যন্ত্রণা। যার হয় সেই জানে। দাদার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। তখন কি জানতুম যে আমার মৃত্যু নিকট বলে দাদার এমন অবস্থা হোয়েছে। দাদাকে বল্লুম, দাদা তুমি আমায় বাড়ী থেকে নিয়ে যেতে দিও না, লক্ষ্মীটী সেখানে বড় কষ্ট। এমন সময় বৌদির কথা শুনে আমি চমকে উঠলুম, ভয়ে আমার প্রাণ কেঁপে উঠলো। বৌদি যেন কাকে ডেকে বল্লে—যা শীঘ্রী ছুটে ঘরের দিয়ে আয়, বাড়ীতে ওকে কিছুতেই রাখা যেতে পারে না। আমার ও ছেলে মেয়ে দেখতে হবে আগে।

* *

কিন্তু হায় কিছু হোলো না। আমার চোখের জল, আমার কাতর মিনতি সবই ব্যর্থ হোলো। সরকার থেকে লোক এসে একটা ছোট, গাড়ীর মধ্যে তুলে নিয়ে চললো। রোগের সে কি অসহ্য যন্ত্রণা! সে কি চীৎকার। দাদা আমায় কোন কথা বল্লে না, আমি যে তার ছোট বোন, এ কথা দাদা ভুলেই গেল।

• • • •

তখনও বুঝিনি এ আমার মহাপাপের সাজা। এখন বুঝতে পারছি স্বর্গ নরক বলে আর কিছু কোথাও নেই, এইখানেই স্বর্গ, এইখানেই নরক। তখনও বুঝিনি এ আমার নরক যন্ত্রণা। আজ দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে তাঁর কথা মনের মধ্যে এলেও তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। যাঁর স্মৃতি আমার হিয়ার পরতে পরতে ভুলে যাওয়া কবিতার চরণের মত জেগে উঠতো, আজ তাঁর কথা আমার মনে হোলো। হায় আজ যদি আমি আমার স্বামীর কাছে থাকতুম তা হোলে বোধ করি এমন করে তিনি আমায় ঘর ছাড়া করতেন না। ইচ্ছে হোলো জোর খুলে ছুটে যাই তাঁর কাছে, আজ দশ বৎসর পরে স্বামীর জন্যে আমার প্রাণ কেঁদে উঠলো। ছুটে ত যাব কিন্তু শক্তি কোথায়? আর চলেই যদি যাব তবে আমার এ মহাপাপের ফল কোথায় যাবে বল। নারীর যা সাজে না আমি নারী হয়ে তাই করেছি—শুধু অহঙ্কারে।

•

গাড়ীর দরজা খুলে গেল। একদল তরুণ যুবা ছুটে এলো আমায় বার করবার জন্যে। চেয়ে দেখি একি, তিনি না? না না তিনি হবেন কেন? তিনি তো গৈরিক বসন পরেন না। তিনি যে বিধর্মী। আমি কি স্বপ্ন দেখছি! হঠাৎ কে যেন আমায় নাম ধরে ডাকলে, রেণু! তুমি এখানে। আমি চমকে উঠলুম, না না এতো আর আমার ভুল নয় গো। তাড়াতাড়ি নিজের মাথাটা তাঁর পায়ের কাছে এগিয়ে দিয়ে বল্লুম—ওগো দেবতা আমার খুব সাজা হোয়েছে—আর পারি না। দর্প আমার চূর্ণ হোয়েছে।

আজ স্বামীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। রোগ সেরে যাচ্ছে। এখন শুধু ভাবি, ওগো ভগবান যদি এত ব্যথা তোমার আমার পরে তবে শেষের দিনে যেন তাঁর পায়ে মাথা রেখে যেতে পারি এই অধিকারটুকু আমায় দিও তুমি। এর বেশী আর আমি কিছু চাই না।

সার্থকতা

[শ্রীগিরিবালা দেবী]

যে দিন দুঃখীর অশ্রু মুছাইয়া স্নেহভরে
দিয়াছি শীতল জল—তৃষাতুর ব্যথিতেরে;
সেদিন করুণা তব—স্নিগ্ধ মন্দাকিনীসম,
বর্ষিত হ'য়েছে প্রভু, তাপিত হৃদয়ে মম!

সহানুভূতি

খেলিতে খেলার ঘরে অবোধ শিশুর প্রায়
কেহ'যদি ধূলা মাখি'—খেলা লয়ে রহে হায়,
যাইও না হে নির্দ্দয়, তাহারে চরণে দলি—
মলিনতা হ'তে তারে—নিয়ো, নিয়ো বুকে তুলি!

৪৷৷ বিনামূল্যে লুকোসাইজ ফটো
ফটো এনলার্জ ১৫×১০
ফটো সহ অগ্রিম সিকি মূল্য পাঠান
কলিকাতা ও লেটার রবারষ্ট্যাম্প মেকার
৩৩নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

সুখ ও দুঃখ

সুখেতে তুমি হাসিয়া আকুল, দুঃখেতে ঝ'রে অশ্রুবারি
যেও না ভাস্ত! যে দেয় সুখ—শোক, ও দুঃখ রচিত তারি।

স্বাস্থ্যের কথা

[শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়]

(তৃতীয় পর্ব্ব)

ব্যায়ামের কথা বললেই সর্ব্বপ্রথমে যে প্রশ্ন উঠে থাকে, সে হচ্ছে এই—(১) কখন ব্যায়াম করতে হবে, আর (২) কতক্ষণ ব্যায়াম করা দরকার। (৩) কখন ব্যায়াম করা দরকার। কখন ব্যায়াম করা উচিত অর্থাৎ দিন-রাত্রির মধ্যে কোন সময় ব্যায়ামের পক্ষে অনুকূল সে সম্বন্ধে নানা লোকের নানাবিধ মত দেখতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে প্রত্যূষকালেই ব্যায়াম করা ভাল; কেন না সে সময়ে মন স্বতঃই প্রফুল্ল থাকে—শরীর ও মন থেকে অবসাদ দূর হয়ে যায়;—গ্রীষ্মকালেও এ সময়ে বেশী উত্তাপ থাকে না। কাজে কাজেই প্রভাতবেলা ব্যায়াম করাই বিশেষ সুবিধাজনক। আবার এমন অনেকে আছেন, যাঁরা বলেন, বিকালে বা সন্ধ্যাকালে ব্যায়াম করা ভাল। সে সময় অত্যধিক শীত ও গ্রীষ্ম অনুভূত হয় না। সন্ধ্যার সময় ব্যায়ামের ফলে শরীর ও মন যেন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। প্রভাতে ত প্রফুল্লভাব স্বতঃই সকলের মনে উদয় হয়। সন্ধ্যার সময় ব্যায়াম অভ্যাস করলে সন্ধ্যাতে ও শরীরে অবসাদ আসতে পারে না। আবার এমন অনেকে আছেন, যাঁরা রাত্রিকালেও ব্যায়াম চর্চ্চা করে বিশেষ ফললাভ করেছেন। এই সব নানা মতের জন্য ব্যায়ামের উপযুক্ত নির্দ্দিষ্ট কোনও সময় নিরূপণ করা যায় না। ব্যায়ামকারীর পক্ষে দিবারাত্রির মধ্যে যে সময় বিশেষ অনুকূল বলে বিবেচিত হবে, সেইই তাঁর ব্যায়ামের পক্ষে উৎকৃষ্ট সময়। সকালেই হোক্ কিম্বা রাত্রিতেই হোক্ যখন তিনি ব্যায়াম করবার জন্য সময় পাবেন সে সময় তাঁর ব্যায়ামের পক্ষে সুবিধাজনক হবে, তখনই তিনি ব্যায়াম করতে পারেন। ব্যায়ামকারীর পক্ষে যে সময় বিশেষ সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হবে সেই সময়েই ব্যায়াম করা দরকার। তবে লক্ষ্য রাখা দরকার যেন প্রতিদিন একই সময়ে ব্যায়াম করা হয়। নিরূপিত সময়ে ব্যায়াম না করলে বিশেষ ফললাভ হয় না! আহার নিদ্রার জন্য যেমন এক একটি বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে, ব্যায়ামের জন্যও ঠিক সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা দরকার। নিয়মিত ভাবে কাজ না করলে কোনও কাজেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। এই কারণে ব্যায়ামের জন্য ও এক নির্দ্ধারিত সময় থাকা দরকার আজ প্রত্যূষে, কাল সন্ধ্যায়, পরশু বৈকালে ব্যায়াম করা বড়ই অহিতকর। এর ফলে শারীরিক উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি হয়। ব্যায়ামে এরূপ স্থলে সুফল অপেক্ষা কুফলই অধিক হয়ে থাকে। যাঁরা সন্ধ্যার সময় বা সন্ধ্যার পর ব্যায়াম করার সময় নির্দ্দিষ্ট করেন, তাঁদের এক বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। এরূপ সময়ে ব্যায়াম করার ফলে ঘুমের কোনওরূপ ব্যাঘাত না ঘটে। ব্যায়ামের জন্য অত্যধিক পরিশ্রম বা উত্তেজনার ফলে রাত্রে যদি সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হলে রাত্রে ব্যায়াম করা বন্ধ করা উচিত। নিদ্রার ব্যাঘাত যদি না ঘটে, তাহা হলে রাত্রিতে ব্যায়াম করার পক্ষে কিছু আপত্তি থাকতে পারে না।—আর এক বিষয়ে ব্যায়ামকারীর লক্ষ্য থাকা দরকার। আহারের অব্যবহিত পরেই ব্যায়াম শরীরের পক্ষে বড় অনিষ্টকর। আহারের অন্ততঃ দুইঘণ্টা বা আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ব্যায়াম বা কোনও প্রকার শ্রমকর কার্য্যকরা অনুচিত। এরূপ সময়ে ব্যায়াম করার ফলে পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, কাজে কাজেই ব্যায়াম বা পরিশ্রম স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হয়ে ওঠে। তাহা হলে ব্যায়ামের নির্দ্দিষ্ট কাল সম্বন্ধে এই বলা যেতে পারে যে, আহারের পর দুইঘণ্টা বাদ দিয়া যে সময় ব্যায়ামকারীর পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই সময়ই ব্যায়ামের জন্য নির্দ্ধারিত করা দরকার।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—কতক্ষণ ব্যায়াম করতে হবে। এ সম্বন্ধে কোনও সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যায় না। কোনও ব্যক্তির পক্ষে দশ মিনিট ব্যায়াম হয়ত যথেষ্ট,

আবার তাহারও পক্ষে আধঘণ্টা সময় না হলে উপযুক্ত ব্যায়াম হয় না। সাধারণতঃ পাঁচ মিনিট হতে আধঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত ব্যায়ামের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা যেতে পারে। প্রথম প্রথম পাঁচ মিনিট থেকে আরম্ভ করা যেতে পারে। পরে কালক্রমে সেই সময়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। একজন সাধারণ সুস্থকায় ব্যক্তির পক্ষে দশ বার মিনিট সময় ব্যায়াম করাই যথেষ্ট। এইটুকু বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার যেন অত্যধিক পরিশ্রম না হয়। শরীর অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে শরীর ওর হয়—ফলে শীঘ্রই স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়তে হয়। একেবারে বিশেষ ফললাভের আশায় ব্যায়ামের মাত্রা বেশী করলে ফললাভ যে প্রায় শূন্য হয়ে পড়বে—সে কথা জানা দরকার। বেশী লোভে সমস্ত সোনার ডিমগুলি পাবার আশায় যে মুরগীকে কেটে ফেলেছিল, তার ভাগ্যে সোনার ডিম পাবার আশা চির-তরেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ব্যায়াম করতে আরম্ভ করে দুদিনেই বলশালী হবার আশা করলে এইভাবে আশাহতই হতে হবে। সহিষ্ণু হয়ে থাকতে হবে, না হলে কোনও প্রকার মঙ্গল ঘটবে না। শারীরিক উন্নতি সাধন করতে হলে সেই কারণে প্রথম প্রথম পাঁচ বা দশ মিনিট ব্যায়াম করা দরকার। পরে শক্তি ও সামর্থ্যের অনুপাতে উত্তরোত্তর ব্যায়ামের কাল বৃদ্ধি করলে ক্ষতি হবে না।

ব্যায়াম করতে হলে আর একটি কথা যা মনে আসে সে হচ্ছে ব্যায়ামের জন্য স্থান নির্ব্বাচন করা। ঘরের মধ্যে বা ঘরের বাহিরে ব্যায়াম করা উচিত, এরূপ প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায়। একথা বোধ হয় কাকেও বলতে হবে না যে বদ্ধ বায়ুর অপেক্ষা মুক্ত বায়ুই শরীর রক্ষার রক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। জীবন ধারণের প্রথম আর প্রধান উপাদান বায়ু। সেই বায়ু যত বিশুদ্ধ নির্ম্মল হয় ততই মঙ্গল জনক। সেই কারণেই ঘরের ভিতর কার বায়ু অপেক্ষা বাহিরের বায়ুই জীবন রক্ষার পক্ষে সহায়ক। যতক্ষণ সম্ভব ঘরের বাহিরের বাতাস গ্রহণ করা স্বাস্থের পক্ষে অনুকূল। কাজে কাজেই স্বাস্থ্য আহরণের জন্যই যখন ব্যায়ামের চর্চ্চা তখন সে ব্যায়াম কার্য্যটা যাতে একটু মুক্ত আর নির্ম্মল বায়ুতে হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। ঘরের মধ্যে বদ্ধ বায়ুতে ব্যায়াম করা কোনও মতেই যুক্তি সঙ্গত নয়। ঘরের বারান্দা বা ছাদে ব্যায়াম করার ফলে অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল ঘরে মুক্তবায়ু সেবন করা হয়। শীতল নির্ম্মল বাতাসে শরীর ও মন স্বতঃই প্রফুল্ল হয় সেই জন্য এরূপ স্থলেই ব্যায়াম করা দরকার। গ্রীষ্মকালে আমাদের মত গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এরূপ উন্মুক্ত স্থান ভিন্ন ব্যায়াম করা কষ্ট কর। বাধ্য হয়েই এরূপস্থলে ব্যায়াম করতে হয়। শীতকালেও মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম করা উচিত। তবে তখন হিম পড়বার সময় ছাদের উপর ব্যায়াম করা উচিত নয়। মাথার উপর আচ্ছাদন থাকে অথচ যদি বায়ু সঞ্চালনের মত বেশ প্রশস্ত স্থান থাকে, তাহা হলে সেরূপ স্থানে ব্যায়াম করা যেতে পারে। ঘরের বারান্দাতেও তখন বেশ ব্যায়াম চলতে পারে কিন্তু ঘরের মধ্যে কোনও মতেই ব্যায়াম করা উচিত নয়। অবশ্য যদি প্রশস্ত ঘর হয় সমস্ত জানালা দরজা খোলা থাকায় বায়ু চলাচলের ব্যাঘাত না হয় তাহা হলে অভাব পক্ষে ঘরের মধ্যেও ব্যায়াম করা যেতে পারে। শীত কালেও যদি সূর্য্যোদয় হয় তাহলে উন্মুক্ত ছাদের ওপরও ব্যায়াম করা বিশেষ আরামপ্রদ। অল্প অল্প রৌদ্র যদি শরীরের ওপর এসে পড়ে তাহলে ব্যায়াম করবার সময় বিশেষ আনন্দ অনুভব করা যায়। শীতের জন্য কোনওরূপ কষ্ট হয় না আর অল্পক্ষণ ব্যায়াম করলেই শরীর উত্তপ্ত হয় তখন আর আদৌ শৈত্য অনুভব করা যায় না। একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে কোনও কালেই কোনও স্থানেই বেশী বস্ত্রাদিতে অঙ্গ আবৃত রেখে ব্যায়াম করা উচিত নয়। যতদূর সম্ভব অনাবৃত দেহে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। দেহের ওপর কোনও স্থানে যেন কাপড় আঁটিয়া না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। কোমর থেকে উরু পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে এরকম ছোট আর বেশ ঢিলা পায়জামা পরলে ভাল হয়। কাপড়ও বেশ ভাল করে গুছিয়ে পরলে চলতে পারে। যতদূর সম্ভব শরীরে মুক্ত বাতাস লাগান দরকার আর অঙ্গ বা পেশী সঞ্চালনের সময় যাতে কোনওরূপ বস্ত্রাদিতে সে চালনা বাধা না পায়, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। গেঞ্জী বা ঐ ভাবের কোন আঁটা জামা ব্যবহার করা উচিত নয়।

শীতকালে প্রথমে বিশেষ শীত অনুভব করলে তিনা হাত-কাটা জামা পরে ব্যায়াম আরম্ভ করা যেতে পারে, কিন্তু শরীর একটু উত্তপ্ত হলেই সে জামা পরিত্যাগ করা বিধেয় —অনাবৃত দেহে ব্যায়াম করাই শ্রেয়ঃ।

নানাবিধ ব্যায়ামের মধ্যে কোন ব্যায়াম যে শ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে হঠাৎ কিছু বলা যায় না। এর পূর্ব্বে নানাবিধ ব্যায়ামের কথা উল্লেখ করার সময় আমি সেই সব ব্যায়ামের পক্ষ সমর্থন করেছি, যাদের অনুশীলন করতে হলে অপরের সাহায্য গ্রহণ করতে হয় না বা যে সব ব্যায়াম সকলে সহজেই, বিশেষ অসুবিধা ভোগ না করেই অনুশীলন করতে সমর্থ হয়। মুগুর, বারবেল, চেষ্ট-এক্সপ্যানডার, ডন দেওয়া, ডাম্বেল ভাঁজা প্রভৃতি যে সব ব্যায়াম অনায়াসেই করতে পারা যায় তার মধ্যে শ্রীং ডাম্বেলকেই একটু উচ্চে স্থান দেওয়া যায়। অবশ্য অন্যবিধ ব্যায়ামকে মন্দ বলতে পারা যায় না—বা সে রকম উদ্দেশ্যও আমার নয়। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ কারণে শ্রীং ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম বেশ সুফল প্রদান করে। ডাম্বেল বাল্যকাল হতে আরম্ভ করে যাবজ্জীবন ব্যবহার করা চলতে পারে বৃদ্ধ বয়সেও শ্রীং ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম করলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে না। এই ব্যায়ামের এক প্রধান সুবিধা হচ্ছে এই যে, শ্রীং ডাম্বেলে ইচ্ছাশক্তির স্বতঃস্ফূরণ ঘটে থাকে। ইচ্ছা শক্তি (will power) ই ব্যায়ামকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অধিক উন্নতি সাধন করাতে সমর্থ হয়। অন্যবিধ ব্যায়ামে এই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। ডন দেওয়া, ঝাঁপ দেওয়া প্রভৃতি যে সব অঙ্গ চালনা প্রণালী ব্যায়ামের প্রধান অঙ্গ, সেই সব শ্রীং ডাম্বেলের প্রণালীতে বেশ সুচারু রূপেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এক কথায় এই শ্রীং বা গ্রীপ ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম করার ফলে সমস্ত দেহটার প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ আর পেশীকে ইচ্ছানুরূপ চালনা করতে পারা যায়। শরীরের মধ্যে কোনও এক বিশেষ প্রত্যঙ্গ অবথাঙ্গরূপে অন্য প্রত্যঙ্গের অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিলাভ করতে পারে না। একযোগে সমস্ত প্রত্যঙ্গের উন্নতি সাধিত হয় বলেই এই ব্যায়াম অন্য ব্যায়ামের অপেক্ষা অধিক সমাদর পাবার আশা করতে পারে।

কিন্তু এখানে বলে রাখা দরকার যে, কতকগুলি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি না রাখলে শ্রীং ডাম্বেলেও বিশেষ ফললাভ করা যায় না। এই দৃষ্টি না রাখার ফলে অনেকে গ্রীপ-ডাম্বেলে ব্যায়াম করেও শারীরিক উন্নতি সাধন করতে পারেন না। অন্ততঃ দুটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ নিশ্বাস প্রশ্বাস আর দ্বিতীয়তঃ ইচ্ছাশক্তি। এই দুটি বিষয়ে দৃষ্টি না রাখলে ব্যায়াম করা আর না করা, উভয়ই প্রায় সম-পর্য্যায় ভুক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম লক্ষ্য রাখা দরকার নিঃশ্বাস যেন মুখ দিয়ে লওয়া না হয়। অনেকে নিদ্রিত অবস্থায় মুখ দিয়াই নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পাদন করেন—যাতে এই বদ অভ্যাস শীঘ্র দূর হয় সে বিষয়ে সবিশেষ যত্ন নিতে হবে। কখনও কোনও ভাবেই নাক ভিন্ন মুখ দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করা উচিত নয়। নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য তাড়াতাড়ি করা উচিত নয় বা ব্যায়ামের সময় বন্ধ রাখা উচিত নয়। কি ব্যায়ামের সময় কি অন্য সময় ধীরে ধীরে যত বেশী সম্ভব শ্বাস গ্রহণ করে' ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ত্যাগ করতে হয়। বক্ষস্থলে বায়ুকোষ যতক্ষণ না একেবারে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে ততক্ষণ শ্বাস গ্রহণ করা উচিত। তারপর ধীরে ধীরে সেই বায়ু যতদূর সম্ভব নিঃশেষে বাহির করে দেওয়া প্রয়োজন। ব্যায়ামের অনেকখানি গুপ্ত রহস্যই এই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার মধ্যেনিহিত আছে।

ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ হচ্ছে ব্যায়ামের মূল মন্ত্র। ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করতে অভ্যস্ত হলে, ব্যায়ামকারী গ্রীপ ডাম্বেল বা অন্য কোনও যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করেই ব্যায়াম করতে সক্ষম হন। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের কৌশল না জানাতেই, ব্যায়াম দ্বারা অনেকে আশানুরূপ ফললাভ করতে সক্ষম হন না। গ্রীপ ডাম্বেলে এই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ অত্যাশ্চর্য্য ফল দান করে। জাণ্ডো, সিসিল বা এরূপ কোনও বিখ্যাত ব্যায়াম-ক্রীড়কের অনুমোদিত প্রণালীতে আধুনিক শ্রীং যুক্ত ডাম্বেলে ব্যায়াম করলে অনায়াসেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের রহস্যটুকু অবগত হওয়া যায়। প্রত্যেক রকম অঙ্গভঙ্গীর সময় কোন কোন পেশীর উন্নতি সাধন হয় তা প্রায়ই চিত্র দিয়ে ব্যায়াম তালিকাতে বুঝিয়ে দেওয়া থাকে। সেই পেশীগুলির অবস্থান জেনে, একটু ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করলে, সেই পেশীর দ্রুত উন্নতি সাধন হয়ে থাকে। কোন ভঙ্গীতে ব্যায়াম করলে কোন্ কোন্ পেশীর উন্নতি হয় তা এর পর সংক্ষেপে দেখাবার চেষ্টা করা যাবে।

স্মৃতি মন্দির

রাজেশ্বর দুই মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—পাখী পালিয়েছে।

ডক্টর লাহিড়ী লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—পালিয়েছে? আমার গাড়ী? তিনি দ্বারের দিকেই অগ্রসর হইতেছিলেন, রাজেশ্বর বলিলেন—গাড়ী আছে, খাঁচা ঠিক আছে, পাখীকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে! তোমার কোচম্যান বল্লে—জ্যোসেফ সাহেব একখানা ভাড়াটে ফিটন গাড়ীতে তুলে তাদের নিয়ে চলে গেছে।—রাজেশ্বর কথাগুলা বলিয়া যখন সেন-সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সেন সাহেব এতই মনোযোগ সহকারে ধূমপান ও প্রবল উৎসাহে ধূম উদ্গীরণ করিতেছেন, যে তাঁহার মুখ কিছুতেই দেখা যাইতেছে না। মহীন্দ্র অতি কষ্টে টেবিলের কানা দুইটা হাতে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়াছিলেন, তবে তাঁহার বিরাট রুক্ষ মুখে চোখে যে বর্ণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অমাবস্যার ঘন আঁধারকেও উপহাস করিতে পারিত!

ডক্টর লাহিড়ী সেন-সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আমাকে এখনি একবার বাড়ী যেতে হচ্ছে, সে আমার ওখানে গিয়ে পড়বার আগে আমি দরজা বন্ধ করে দিতে চাই!

সেন সাহেব এক গাল ধোঁয়া গলার মধ্যে পুরিয়া বোধ করি চিন্তা করিতেছিলেন, কথা বলিবার উদ্যোগ করিতেই অকস্মাৎ সমস্ত ধোঁয়া বাহির হইয়া তাঁহার মুখখানিকে ঢাকা দিয়া দিল. সেন-সাহেব ক্ষুব্ধ একটি আজ্ঞা বলিয়া অন্ধকারেই মুখ ঢাকিলেন।

ডাক্তার লাহিড়ীকে গমনোদ্যত দেখিয়া রাজেশ্বর হাসিমুখে বলিলেন—তোমার যাবার দরকার হবে না ডক্টর!

লাহিড়ী সবিস্ময়ে কহিলেন—আপনি কি বলছেন মিঃ মিত্র! সেই পাখীটাকে আমি আবার আমার কটকের মাটী মাড়াতে দেব?

সে তোমার কটকের মাটী মাড়াতে ডাক্তার!

নিশ্চয় যাবে। আমি জানি, সহরে তার অন্ন চুলো নেই!

তবু সে যাবে না। যে কাজ সে গোপনে করে এসেছিল, গোপনেই রেখেছিল, রেখে দুরভিসন্ধি পূর্ণ করতে সহর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিল. তাই যখন প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন সে আবার তোমাদের কাছে মুখ দেখাতে পারবে ভেবেছ? কখনই যাবে না। আমার মনে হয়, কাল সকালে...

রাজেশ্বর থামিলেন, উপস্থিত সকলেই তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া শেষ কথাগুলার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; সেন-সাহেব ফু ফু করিয়া ধোঁয়া সরাইয়া ব্যগ্রদৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন, রাজেশ্বর বলিলেন—কাল সকালে খবরের কাগজে যদি খুন বা আত্মহত্যার খবর না বেরোয় ত জাহাজ অফিসে খবর নিয়ো, দেখবে পাখীটি বুকুত!... মনস্তত্ত্ব-শ্লোক নিয়ে সাহেবদের আপদের এমন সব কাণ্ড হয়। দু'তিনটে ঘটনা আমি জানি, বিলেতে গিয়ে মাসীরা খুন পর্যন্ত করে এসেছিল।

রাজেশ্বর এক মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া পুনশ্চ কহিলেন—তোমাদের ফোটোগ্রাফারের সেই দশাই ঘটবে যদি না মিটমাট করে সরে পড়ে। সর্বনেশে জাত ওরা শুনেছি।

ডাক্তার লাহিড়ীর আত্মীয় হইলেও তাঁহার সাধু অন্তঃকরণ বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল, যে লোক একবার

একজনের সর্বনাশ করিয়া তাহাকে ফেলিয়া আসিতে পারে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া আবার বিবাহ করিতে যাইতে পারে, বোধ হয় সে লোক ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিলেও তিনি দুঃখ হইতেন না। শুধু কি তাই? লজ্জা কি তাঁহারই কম? তিনিই ত মর্কটটাকে ভদ্র-পরিবার মধ্যে আনিয়া পরিচয় করাইয়াছিলেন, তিনিই যথেষ্ট রকমে ভদ্র মহিলাদের সহিত মিশিতে পর্যন্ত তাহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন! তাঁহার মনে হইতেছিল, কাল সকালে কাগজ খুলিতেই যদি দেখিতে পান, মিঃ মিত্রের কথাই সত্য হইয়াছে তবেই যেন তাঁহার ক্ষোভ দূর হয়। বলিলেন—মিঃ মিত্র, আপনি যা বলছেন, যদি সত্য হয়, আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হ'ব না!

কেহই কোন কথা কহিলেন না।

লাহিড়ী চেয়ার ছাড়িয়া সেন সাহেবের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—আপনি আমাকে মাপ করুন, আমি এ কল্পনাও করতে পারিনি!

তোমার দোষ কি লাহিড়ী, বোস বোস—বলিয়া সেন তাঁহাকে বসাইয়া দিলেন।

মহীন্দ্র গাঢ় নিঃশ্বাস ছাড়িয়া মাথাটা টেবিলের কোণে রাখিয়া চক্ষু মুদিলেন।

রাজেশ্বর বলিলেন—ও কথা যেতে দাও সেন! মহীন্দ্র, ও কি হে? একেবারে শুয়ে পড়লে যে!

মহীন্দ্র খাঁটি ব্রাহ্ম। চক্ষু মুদিয়া তিনি তাঁহাকেই ধন্যবাদ দিতেছিলেন যিনি এই মাত্র একটা নর-রাক্ষসের গ্রাস হইতে তাঁহার কন্যাকে উদ্ধার করিয়া ঘোর অনর্থ নিবারিত করিয়াছেন। রাজেশ্বরের কথা শুনিয়া টেবিলের কোণ হইতে মাথাটাকে সবলে তুলিয়া চেয়ারের পৃষ্ঠে রাখিয়া এলাইয়া পড়িলেন।

রাজেশ্বর বলিলেন—সন্ধ্যেটা এমন করে' নষ্ট কর না সেন।

নাঃ, নষ্ট আর কি—বলিয়া সেন সাহেব গাল-গলা ফুলাইয়া চুরুটে টান দিলেন।

আমি কামনাকে ডাকি। সন্ধ্যেটা যাতে নষ্ট না হয়, তার ব্যবস্থা করুক সে!—বলিয়া তিনি পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

লাহিড়ী সেন-সাহেবের উদ্দেশে বলিতেছিলেন—বোধেটে আমাকে বলেছিল, বিলেত থেকে ফোটোগ্রাফী শিখে এসে নিদাপুরে সে ষ্টুডিও করেছে। সারা জীবন একা থাকা অসম্ভব বলে...

পর্দা নড়িয়া উঠিল, তখনি কামনা কক্ষে ঢুকিল, কামনা একা নয়। তাহার হাত ধরিয়া একটি স্বাস্থ্যবান যুবকও ঘরে ঢুকিল। সেন-সাহেব চেয়ারটা ঠেলিয়া দিয়া আবার সেটাকে টানিয়া গম্ভীর হইয়া বসিলেন।

কামনা মহীন্দ্রর সম্মুখে আসিয়া ডাকিল—কাকাবাবু!

কামনার গলা দিয়া যেন চোখের জল ঝরিয়া পড়িতেছিল!

মহীন্দ্র তাড়াতাড়ি চেয়ার ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কামনা নতমুখে বলিতে লাগিল—অনুমতি করুন কাকাবাবু, নির্মলাকে ডাকি! আপনি না ডাকলে সে আসতে পারবে না।

মহীন্দ্র মূঢ়ের মত এ-দিক ও-দিক চাহিতেছিলেন, কি বলিতে হইবে, কি বলিলে সব দিক বজায় থাকে, খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।

কামনা আবার বলিল—চুপ করে কেন কাকাবাবু?

সেন সাহেবের এতখানি বেয়াদবি সহ্য হইতেছিল না, তিনি চেয়ার ঠেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; কোনদিকে না চাহিয়াই মস্ মস্ শব্দে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, লাহিড়ী-ও চলিলেন। মহীন্দ্র ইঁহাদের দেখাদেখি চেয়ার হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেই কামনা ঘাটীতে বসিয়া পড়িয়া বলিল—যাবেন না কাকাবাবু!

মহীন্দ্র বিশ্রী মুখ আরো বিশ্রী করিয়া যে পর্দা ঠেলিয়া এইমাত্র দু'টি লোক বাহির হইয়া গেল, সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন।

কামনা গদ্গদকণ্ঠে ডাকিল—কাকাবাবু!

মহীন্দ্র আর পারিলেন না। স্নেহশূন্য নীরস বক্ষের উপর দিয়া ভাদ্রের বারিধারা বহিয়া গেল; এ ত কামনার আর্ত্ত আহ্বান নয়, মনে হইল, কামনার রূপ ধরিয়া নির্মলা তাঁহার পা জড়াইয়া কাঁদিতেছে, এমন করিয়া নির্মলা কোনদিন কাঁদে নাই, কোন দিন কাঁদে নাই, কোন দিন না। তবে একজন কাঁদিয়াছিল, এমনই

কাঁদিয়াছিল। সে-দিন-ও মহীন্দ্রর মন বক্ষে ভোগবতী উৎস হইয়া উঠিয়াছিল; অনেক দিনের কথা সে! যে দিন সে ধরণী হইতে চিরবিদায় লয়, সেইদিন সে এতটুকু একটি মেয়েকে মহীন্দ্রর কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া, রোগ জীর্ণ হাতখানায় মহীন্দ্রর পায়ে জড়াইয়া ধরিয়াছিল—স্পষ্ট মনে আছে, অতি স্পষ্ট মনে আছে! সেইদিন সে এমনি কাঁদিয়াছিল।

কামনা ডাকিল—কাকাবাবু!

মহীন্দ্র চমকিত হইয়া দেখিলেন, তাই ত সে যে এখনো পা ঝুলিয়া বসিয়া আছে; তাড়াতাড়ি নত হইয়া কামনার হাত ধরিয়া বলিলেন—ওঠ মা-কামনা! তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্!

কামনা উঠিল না, মৃদুস্বরে কহিল—না কাকাবাবু! এ আপনারও ইচ্ছা! বলুন—না?

মহীন্দ্র ভাবিতেছিলেন, সত্যই যে হিন্দু! তাই ত! তাঁহার কন্যা!

রাজেশ্বর নির্মলার হাত ধরিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন—পাগ্‌লী কোথাকার! এরা কি বাঘ ভালুক যে খেয়ে ফেল্‌বে! বুঝলি কামনা, নির্মল এ-ঘরে আস্‌তে চায় না!

নির্মলার মাথাটি বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল! এমন নাটকাভিনয়ের মধ্যে না আসিতে হইলেই সে-যেন বাঁচিত।

কামনা নিমিষে তাহাকে দেখিয়া লইয়া বলিল—কাকাবাবু!

মহীন্দ্র চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—ওঠ মা, নির্মলা তোমার বোন্! তোমার বাবা যা করবেন, তাই হবে!

রাজেশ্বর তৎক্ষণাৎ যাহা করিলেন, তাহা আর লিখিয়া জানাইবার আবশ্যকতা দেখি না। রঙ্গমঞ্চে মিলনান্ত নাটকের দৃশ্যে যাহা চিরদিন লক্ষিত হয় তাহাই হইল।

মহীন্দ্র চক্ষু মুদিয়া বোধ করি পরম ব্রহ্মের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতেই মগ্ন ছিলেন, সে দৃশ্যটা দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইল না।

তের

রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত নানা গল্প-গুজব উৎসবের মাঝে কাটিয়াছিল, তারপর একেলা হইতেই কামনার ছবিখানির উপর বীর-বাহু-সঞ্চালিত মেঘমালা আসিয়া জমিতে লাগিল। কোথা ছিল তার এত মেঘ যে অল্পক্ষণের মধ্যেই আকাশের এতটুকু অংশও অনাবৃত রাখিল না।

ঘরের মধ্যে গাঢ় নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে তাহারই প্রবল নিঃশ্বাসের শব্দ তাহাকে চমকাইয়া দিতেছিল; কক্ষ-বিরাজিত ঘোর অন্ধকারে কামনা আপন অন্তরের করুণ বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া আপনিই শিহরিয়া উঠিতেছিল। একি নিবিড় ঘন আঁধারের মাঝে, নির্জ্জন শূন্য প্রান্তরের মধ্যে সে আসিয়া পড়িল! এর যে কোথায় কোন আলো নাই, ব্যাকুল দৃষ্টি যে একটা দিক্-ও খুঁজিয়া পায় না। কামনার মনে হইতেছিল, আজ এ আঁধারে সে একেলা থাকিতে পারিবে না, আজ হয় তাহার ছুটিয়া গিয়া পিতার শয়ন-মন্দিরে ঢুকিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া শান্তি লভিতে হইবে, নয়ত এমনই বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া মরিতে হইবে। কান্নার চিন্তা-মাত্রেই তাহার কান্না আসিতেছিল। অথচ এই কিছুক্ষণ আগেও সে উৎসব কোলাহলের মাঝখানে মধ্য

জীবন রাখতে হলে
জীবন-রসায়ন
ইহা শরীরের রক্ত মাংস ও স্নায়ুর ক্ষতিপূরণ করে পাকে অথচ উত্তেজক নয়।
—তথা লউন—শ্যামাদাস ঔষধালয়—৬৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যদি হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল ; সতীন্দ্রর সঙ্গে যেহালা বাজাইয়া হাস্য-কৌতুকে যোগ দিয়া সে-যেন বহুদিনের প্রবাসি স্নেহ মনকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল। উৎসব মিটিল, গানের শেষ ঝঙ্কার সুরে মিলিল,আহারান্তে সতীন্দ্র বিদায় লইল, মহীন্দ্র কন্যাকে লইয়া বাড়ী গেল, রাজেশ্বর ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন ; গাড়ী যখন মোড় ফিরিয়া বড় রাস্তা ধরিল, আর দেখা গেল না, রাজেশ্বর কন্যার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে 'হলে' আসিয়া দাঁড়াইলেন, বাড়ীটা তখনও যেন আনন্দে ভাসিতেছিল, তার আলোয় দেওয়াল লম্বিত চিত্রে, মার্বেল পাথরের মেঝেতে পর্য্যন্ত যেন কথা উৎসারিত হইতেছিল, রাজেশ্বর বলিলেন—মা, অনেক-দিনের পর এ বাড়ীতে আজ হাসির উৎস উঠেছে! মনে হচ্ছে, আর এতদিন বাড়ীটা সোণার রঙে সেজে সোণার হাসি হাসবে!

সে-যে কোন্ শুভদিনের ইঙ্গিত তাহা বুঝিতেই কামনার মুখ-টি নত হইয়া পড়িল ; চোখ-দুটিতে, কাণ দু'টিতে, সারা মুখখানিতে রক্তাভা ফুটিয়া উঠিল, কামনা অস্বাভাবিক উত্তেজনা গোপন করিতেই ব্যস্ত ছিল, রাজেশ্বর কৌচে বসিয়া মেয়ের মুখখানি সযত্নে বুকে টানিয়া বলিলেন—কামনা, তোর মা বলেছিল, কামনা যদি সুখী হয়, যেখানে থাকি, আমি সুখী হ'ব—জেনো! তোর মনে নেই কামনা, কিন্তু সে তোর সামনেই বলেছিল! মনে আছে কি মা?

না বাবা!

নেই! থাকবেই বা কোত্থেকে বল্! তুই যে তখন এ:তোটুকু-টি!—রাজেশ্বরের কণ্ঠে অশ্রু উথলে হইয়া উঠিয়াছিল, পাছে অশ্রু ঝরিয়া কন্যার মুখেই পড়ে, ঊর্দ্ধে চাহিয়া অশ্রু রোধ করিতে লাগিলেন।

পাঁচমিনিট-কাল এমনই নীরবে কাটিয়া গেল, তারপর রাজেশ্বর কন্যার মস্তক চুম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—শোও গে মা, রাত ঘরে গেছে।...এক মুহূর্ত্ত থামিয়া আবার বলিলেন—কাল, শান্ত আসবে, সে-যেন তোমাকে শুদ্ধ না দেখে যা।...কামনা, তোর বাবার এই একই আশীর্বাদ মা, জীবনে কোন দিন শুদ্ধ যেন তোকে কেউ না দেখে!—আবার অশ্রু ছুটিয়া দৃষ্টি রোধ করিবার উপক্রম করিতেছিল ; রাজেশ্বর কন্যাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—যা মা, যা, রাত করিসনে, যা!

কামনা চলিয়া আসিয়াছিল! পিতার আশীর্বাদ! মুখের নয়, অন্তরের! কত ভালবাসায়, কত স্নেহে, কত যত্নে, ঐকান্তিক অনুরাগের সে আশীর্বাদ—তবু কেন অন্তর তাহার, ব্যথায় আকুল হইয়া উঠিতেছিল! সে ত জীবনে এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ কল্পনাও করিতে পারিত না, তাহাই পাইয়া তবু কেন সে আনন্দ পায় না—কামনা এই কথা ক'টা ভাবিতে ভাবিতেই দুই হাতের মধ্যে হাত রাখিয়া ভাবিতে বসিয়া গিয়াছিল। আজ সকল দিক দিয়াই সে লাভ করিয়াছে, আজ তৃপ্তিতে তাহার মন প্রাণ ভরিয়াই ত গিয়াছিল, তবু যে এ-অবসাদ কেন তাহাকে পীড়িত করিতেছিল, কামনা কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিল না। নির্ম্মলাকে সে সুখী দেখিয়াছে, ম্লান আকাশ পরিষ্কৃত হইয়া নীল-বুকে নীল জোছনায় ভরিয়া যাইতেছে, তবু এ মেঘের রাশি কেন তাহার আকাশকে এমন কালো করিয়া দিল, কামনা তাহাই ভাবিতেছিল।

মানুষ যে তথ্যানুসন্ধানে ভাবিয়া গলদঘর্ম হয়, অতি সহজ সরল মীমাংসাও তখন তাহাকে ধরা দিতে চায় না। কামনা অনেক ভাবিয়া-ও যখন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না, নিতান্ত অহেতুক-বোধে সর্ব্বচিন্তা পরিহার করিয়া, আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িল।

চিন্তা—অঙ্কের বদন নয়, ত্যাগ করিলেই যাইবে, চিন্তা—মুখের কথা নয়, যে শেষ হইবে! কামনা সব পারিল,চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিল না। যত ভাবে ভাবিবে না, বিষাদ সৃষ্টি করিবে না, ততই তাহারা তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরে! কাল তাহার আসিবার দিন, মিলনের মধ্যে ব্যবধান, এই নিশাটুকু! এটুকুকে সে চিন্তার জলে বিরস বিষাদ করিবে না ভাবিয়া যতই নিশ্চিন্ত হইতে যায়, ততই মনে হয়, যেন অনেকখানি ফাঁক থাকিয়া গেছে, যেন মিলনের অন্তরায়, অনেকটা ও অনেকখানি!

কবি বলিয়াছেন—ভালবাসার পাত্রকে বক্ষে ধরিতেও মনে হয়, ব্যবধান আছে! এই যে রাত্রিটুকু, তাহাও

কামনার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। কামনা ঘুমাইতে পারিল না, সারা রাত তাহার কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া গেল, কে জানে, চক্ষু মেলিতেই দেখিল প্রাতঃ-সূর্য্যোজ্জ্বল ধরণী যেন তাহার হরষানির মধ্যেই লুকাইয়া রহিয়াছে! প্রথমেই মনে হইল সে আসিবে! কিন্তু সারারাত যে তাহার ঘুম হয় নাই, বিনিদ্র চিন্তাজীর্ণ রজনী যদি তাহাকে শুষ্ক করিয়া গিয়া থাকে! মনে হইতেই কামনা দু'হাতে অঞ্চল তুলিয়া মুখ ঢাকিয়া স্নানঘরে চলিয়া গেল।

রাজেশ্বর ডাকিতেছিলেন—কামনা! কামনা!—কামনার হাতের ঘটি-টা শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল; দেরী করিয়া বাহির হইতেই তাহার ইচ্ছা অন্নিতেছিল পারিল না, বাহির হইয়া আসিতেই দেখিল, বিরস, বিষণ্ণ-মুখে শান্ত টেবিলের ধারে চেয়ারে বসিয়া!

কামনাকে দেখিয়াই শান্ত দাঁড়াইয়া উঠিল।

কামনা দু'হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, শান্ত তাহার উত্তর দিতে পারিল না। কামনার এ-সকল দিকে লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা ছিল না, নিকটে আসিয়া বলিল,—সব ভাল শান্ত বাবু?

শান্ত ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না!

কামনা আর্ত্ত-মুখে চাহিতে চাহিতে বলিল—আপনার মা...

শান্ত বলিল—মা ভালো আছেন।

কামনা বিস্মিত হইয়া গেল। শান্তর সংসারে মা ছাড়া যে আর কেহই নাই, জানিত বলিয়াই ভাবিতে লাগিল—তবে কি তাহার নিজেরই শরীর খারাপ! সম্ভাইত, কি শুষ্ক রুক্ষ মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে! কামনার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল, অতি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—আপনার শরীর কি ভালো ছিল না শান্তবাবু?

শরীর আমার ভালই ছিল, কা...নামটা উচ্চারণ করিতে গিয়া শান্ত থামিল। আবার তখনই বলিল—আর আমি তোমাকে নাম ধরে ডাকব না!

কামনার পা টলিয়া গেল; সে ঘুচ হইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসিল—গোপন করছেন কেন শান্তবাবু, আপনার নিশ্চয়ই শরীর···

কামনার কথা শেষ হইবার পূর্বেই শান্ত তাহার দক্ষিণ হস্তের আস্তিন গুটাইয়া বেদনাক্ষুব্ধ নয়নে কামনার দিকে চাহিতেই, কামনা মণিবন্ধে বদ্ধ হরিদ্রা রঞ্জিত সূত্রগুচ্ছ দেখিতে পাইল। বাঙ্গালীর মেয়ে—এই রঞ্জিত সূত্রগুচ্ছ যে কিসের নিদর্শন, তাহা ভাল করিয়াই বুঝিল, সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অচেতন-প্রায় দেহটিকে লইয়া ব্রহ্মাণ্ড যেন একটা ভীষণ বিবর্ত্তে পড়িয়া গেল।

ঠিক সেই সময়ে রাজেশ্বর ইহাদের সম্মুখীন না হইলে কামনা হয়ত পড়িয়া যাইত; পিতাকে দেখিয়া কামনা আত্মবল সঞ্চয় করিয়া লইল।

রাজেশ্বর বলিলেন—কলেজের ছেলেদু'টো একখানা মাসিকপত্রের ছবি নিয়ে খবরের কাগজে ঝগড়া বাধিয়েছিল, এখন এসে বলছে, আপনি মিটিয়ে দিন। তুই ত বিশ্বনাথীর সে ছবি-টা দেখেছিস্ কামনা, সেই যে-রে মানুষের হিরণ্যবাবুর, দেখেছিস্ ত?

কামনার কণ্ঠে শক্তি ছিল না, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, দেখিয়াছে।

এই দেখনা চিঠি! বলে মিটিয়ে দিন। একজন বলছে ছবি টা চমৎকার! আর একজন বলছে—রাবিশ! যে ভাল বলছে, দুঃখের বিষয়, সে চিত্রকরের অন্তরঙ্গ, আর যে রাবিশ বলেছে, সে আবার সমালোচক-চিত্রকরের সেটোরা! মুস্কিল দেখছি—আমারই! দাঁড়িয়ে কেন কামনা, বোস্, নিধি গেল কোথায়? চা দিক্ না।

চা প্রস্তুত হইয়া আসিতেই রাজেশ্বর উপর্য্যুপরি দুই পেয়ালা টানিয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন—তোরা গল্প কর, আমি আসছি!

কামনা পিতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

কোনও এক কবির প্রতি।

(১)

বিদ্রোহী, কবি, বীর !
শৃঙ্খল তব, বজ্র চরণে,
উন্নত তবু শির।
বীর মহিমায় দীপ্ত ললাট,—
বক্ষ তোমার বিশাল বিরাট—
চিত্ত তোমার মুক্ত, স্বাধীন
ব্যসনেও মতি স্থির !

(২)

দুর্জ্জয় অভিমান—
অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘোর
অদ্ভুত অভিযান।
অবাধে যেখানে হতেছে পীড়ন
সেথা ক্রোধে তব দীপ্ত আনন :—
অগ্নি দৃষ্টি বিনাশে সৃষ্টি
শঙ্কিত করে প্রাণ !

(৩)

নির্জ্জীব সব প্রাণে
তুমি রেখ আনি তীব্র চেতনা
বিদ্যুৎ ভরা গানে !
অগ্নি ভরিলে বীণা তারে তারে,
রুদ্রের সুরে জাগালে সবারে—
ঝঞ্ঝার তার সপ্তার শিরে
প্রলয় বহ্নি হানে।

(৪)

নির্ভীক, বীর তুমি ;—
সন্তান সতি' তোমারে যোগ্য
ধন্য মাতৃভূমি !
অশ্রু নেহারি চক্ষে মাতার
বক্ষে জাগিল তব হাহাকার
দেশ পূজা ব্রত নিলে তাই তুমি
জননী চরণ চুমি'।

(৫)

উদার বেগে চলি'
ধূমকেতু রথে পথের বাধারে,
অবহেলে গেলে দলি।'
বঙ্গীয় বেশে নির্ভীক প্রাণে
গেলে কারাগৃহে ক্ষুব্ধ বয়ানে
অত্যাচারের যূপের কাষ্ঠে
আপনারে দিতে বলি।

কবি কাজী নজরুল।

(৬)

মৃত্যু বীরের মত,
হেথায় সহিলে, সব দুঃখ ক্লেশ
স্থির করি নাহি নত।

অনশন ব্রত করিলে বরণ,
তুচ্ছ করিলে আপন জীবন ;—
বিদ্রোহী সম, সহ্য করিলে
অত্যাচার শত শত !

(৭)

বন্যার মত আসি',
দূর করে দিলে, মন্ত্রের বলে,
অশিব পীড়ন রাশি।
বিপ্লব সাথে ভৈরব রবে
নিস্তিত দেশে জাগাইলে সবে ;—
অন্ধকারের মধ্যে ছড়ালে
দীপ্ত আলোর হাসি।

(৮)

নিজ্জীব মৃত দেশে,
গৌরবে এস উদ্‌যাপি ব্রত
মুক্ত বীরের বেশে।
অঙ্গে অঙ্গে ছুটাও তড়িৎ
প্রাণ করে দাও নূতন, হরিৎ,—
বজ্র কঠোর কর সব ছিন্ন।
রুদ্র হাস্য হেসে।

ডাক্তার নবীন পালের টোট্‌কা।

[শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]

যুবা বাবুটি কলেজে পড়েন, পরীক্ষা আসন্নপ্রায় কিন্তু পড়া তেমন সুবিধের হচ্ছে না, শরীর ভাল নয়, অম্বল-অ্যাসিড করে, বই খুললে হাই ওঠে, রাত্রে ঘুম হয় না, খিদে নেই। বাবু ভেবে চিন্তে বাড়ীর কাছের বড় ডাক্তার নবীন পালের দাওয়াইখানায় হাজির হলেন। ডাক্তার রোগী পরীক্ষা করে বসতে বললেন, জিজ্ঞাসা করলেন—বিয়ে হয়েছে ? বাবু মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" "স্ত্রী কোথায় ?" "বাড়ীতে।" "বাড়ী-টাড়ী যাওয়া হয় ?" বাবু বল্লেন, পরীক্ষা দিয়ে যাব। নবীন ডাক্তার বল্লেন—পরীক্ষার দেরী কত ? "একমাস।" "আচ্ছা, দিন দশেক একবার দেশ থেকে ঘুরে এস।" যুবা-পুরুষের কিন্তু বাড়ী যাবার ইচ্ছে নয়, পরীক্ষা সামনে। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—স্ত্রীর বয়স কত ? "পনেরো ষোল।" ডাক্তার চটপট বল্লেন—আজই বাড়ী যাও, দিন দশেক থেকে এস, তারপর আমার এখানে এসে ঔষধ নিয়ে যেয়ো। আর দেখ, ওষুধের দাম তখনি নেব, বুঝলে ?" যুবা পুরুষ দেশ থেকে দিন দশেক পরে ফিরে এসে ডাক্তার নবীন পালের দাওয়াইখানায় দর্শন দিলেন। ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে বাপু, দেশে গেছলে ?" "আজ্ঞে হ্যাঁ।" "তোমার স্ত্রীর খবর কি ? ভালো ছিলেন ত ?" "আজ্ঞে হ্যাঁ।" ডাক্তারবাবু বল্লেন—অসুখ-বিসুখগুলো গেছে ত ?" যুবা-পুরুষ অতি মৃদু-কণ্ঠে উত্তর দিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। নবীন পাল বল্লেন—কি রকম টোটকা—বুঝলে ত ? আবার যখন মাথা ধরবে, ঘুম হবে না—দেশে যেও—বুঝলে ?

গ্রীষ্মের দিনে

স্নানের আরাম পাইতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে, আমাদের আইডিয়াল্ গ্লীসেরিন্ এবং মেসিনে প্রস্তুত :—চন্দন, গুলেবকুল মাখ ও ভায়লেট সাবান ব্যবহার করুন।

ইণ্ডিয়ান্ সোপ কোম্পানী
৬৪।১এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪৯৬

আজ শনিবার ও আগামী কল্য রবিবার মৈমনসিংহে চতুর্থ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্মেলনের বিভিন্ন বিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সাধারণ সভাপতি—ময়মনসিংহের মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর কে-সি-এস্-আই, কে-সি-আই-ই, ও-এম্; সাহিত্য-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু বাহ্যবিশারদ; ইতিহাস-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্-এ, বি-এল্, পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস্; দর্শন-শাখার সভাপতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন এবং বিজ্ঞান শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় বি-এ। সম্মিলনের দ্বিতীয় দিন (১৭ই আষাঢ় রবিবার) প্রাতে প্রতি-নিধি, দর্শক প্রভৃতি সকলে সমবেত হইয়া সম্মিলনমণ্ডপ হইতে 'বন্দে-মাতরম্' গান গাহিতে গাহিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবনে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউর মন্দির প্রভৃতি দর্শন করিতে যাইবেন।

——

তামিলনাড়ু কংগ্রেস কমিটির অন্যতম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি তারা-বস্তু বেত্তা মৌলানা মহম্মদ আলিকে আগামী কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন।

——

বাগপুর সত্যাগ্রহ সংগ্রামে এ পর্য্যন্ত প্রায় ছয়শত স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। শেঠ যমুনালাল বাজাজ, ডাঃ মুঞ্জে প্রভৃতিও গ্রেপ্তার হইয়াছেন। শেঠ যমুনালাল প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী, কংগ্রেস কর্ম্মের অর্থ সংকটের ইনি বরাবরই সাহায্য করিয়াছেন।

——

বাঙ্গালার কংগ্রেস অধিবেশনগুলিতেও জাতীয় পতাকা উড়ডীন হইয়াছে। তবে পতাকা বিক্রয়ের এরূপ ধারা হয় নাই।

——

পঞ্জাবের স্বরাজ্য দলের আবালবৃদ্ধ নেতা মিঃ মুহম্মদ সিদ্দিকি দুইটি সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি সিভিলসার্ভিসিয়ানদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন কৌন্সিলে মন্ত্রীরেটের বিরুদ্ধাচরণ না করেন। কারণ মন্ত্রীরেটরা দেশবাসীর হিতকর কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্বরাজ্যদলের নির্ব্বাচনপ্রার্থীদিগকে ভোট দেওয়া। তাহার স্বরাজ্যদলের নেতৃবর্গ অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা দেশবাসীর স্বার্থোদ্ধার লাভের জন্য কৌন্সিলে সহযোগে কার্য্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন।

——

শ্রীযুক্ত সি, আর দাশ বলিয়াছেন, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত আলাপ হইয়াছিল। এই যোগ ঋষির যোগের কঠিন সমস্যাগুলির ভাবনা ভাবিতেছেন। অরবিন্দ তাঁহার বাণী প্রচার করিতেছেন; তাঁহার বাণী প্রচারার্থ যে দিন তিনি সাধারণের সম্মুখে অবিভূত হইবেন,—চিত্তরঞ্জন সেই দিনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন।

কার্জ্জনের বিরুদ্ধে বোলশেভিক

লর্ডের মুখোসে বন্ধ পত্র

বোলশেভিক কবির বক্তৃতা

"টাইমস" পত্রের প্যারিস সহরের সংবাদদাতা আনাটোলেন, লর্ড কার্জ্জনের কূটপুত্তলিকা লইয়া বোলশেভিকরা এক মিছিল করে। বোলশেভিক কবি মেলাকোভাস্কি, ঐ মিছিলের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া এক বক্তৃতা দান করেন। তিনি বলেন, আমার মতে লর্ড কর্জ্জন লর্ডের মুখোস পরিয়া থাকিলেও বাস্তবিকপক্ষে তিনি বন্ধ পশু। আর একটি জায়গায় বোলশেভিকরা লর্ড কার্জ্জনের কূটপুত্তলিকা সভীমোর খোঁয়াড় কুড়িয়াছিল ঐ সময় তাও বাজিতে থাকে, পরে ঐ কূটপুত্তলি-কাটিকে পরবর্ত্তিত করা হয়। আর একটা জায়গায় লর্ড কার্জ্জনের ঐরূপ একটি কূটপুত্তলিকাকে বোলশেভিকরা ফাঁসিতে লটকাইয়াছিল, অন্য একটী স্থানে, সোভিয়েতের বোলশেভিক বিরোধী নেতা সিমনভিচি এক ইটালীয় ভাগিনী প্রধান মন্ত্রী সিনর মুসোলিনির কূটপুত্তলিকার সহিত খাঁচায় পুরিয়া মহাসমারোহে সহকারে মিছিল করা হয়।

——

অভিনন্দন পত্র দিবার অধিকার

লণ্ডন হইতে ১৭ই জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, মিউনিসিপ্যালিটি বা জেলা বোর্ড কেবলমাত্র রাজপ্রতিনিধি বা প্রবেশের পরিবর্ত্তে অভিনন্দন পত্র দিবার জন্য নিজ নিজ ফণ্ডের টাকা ব্যবহার করিতে পারিবেন, অন্য কাহাকেও অভিনন্দন পত্র দিবার জন্য সে ফণ্ড ব্যবহার করা যাইবে না। এই বিষয় লইয়া সম্প্রতি লণ্ডন মিউনিসিপ্যালিটিতে এক দীর্ঘ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হয় যে, গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ মানিয়া চলা হইবে, কারণ এ আদেশ অমান্যকারী কার্য্য করিলে দেশের সম্রাট বা অন্য কোন বরেণ্যপ্রেরিত মহানুভব ব্যক্তিকে অভিনন্দন পত্র দিতে হইলে মিউনিসিপ্যালিটির ফণ্ড ব্যবহার করা যাইবে না। হিন্দুস্থান

——

পোড়া বাজারের পোড়া এবর্ণমেণ্ট কত যে তোলাই তোলে। কিন্তু আমরা না ভুলিলে কি হয়, আমাদের যে এসব কথা উঠে। 'ডেলি নিউস' কাগজের স্বত্বাধিকারী একলিবিসনের বিজ্ঞাপন ছাপায় জন্য প্রাপ্য টাকার বাকী কালিবন্দরাজের মহারাজা, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও নাইটহুডের রোজের এ, দের প্রভৃতি লোকের নামে নালিশ করিয়া পুরা টাকা আদায় করিয়া ডিক্রী পাইয়াছেন। স্বরাজ

——

দুনিয়ায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা:—

আমেরিকায় শতকরা ৯৭, ইংলণ্ডে ৯৯, সুইডেনে ৯৯, সুইজারল্যাণ্ডে ৯৯, অষ্ট্রিয়ায় ৯৯, হল্যাণ্ডে ৯০, বেলজিয়মে ৮৮, আয়র্লণ্ডে ৭১, ইটালীতে ৫৯, স্পেনে ২৫, রাশিয়ায় ৭, বলকেনে ৭। শিক্ষা বিষয়ে ভারতবাসী প্রতিজনের জন্য বার্ষিক এক আনা ব্যয় করে আর মার্কিন দেশে প্রতি-জনের জন্য ১২৲ টাকা ব্যয় হয়।

[illegible]।

শিল্পী—শ্রীশক্তিকুমার সেন।